রূপান্তর

শক্তিপদ রাজগুরু



রূপান্তর

শক্তিপদ রাজগুরু

এডুকেশন ফোরাম
স্টল-৪১, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

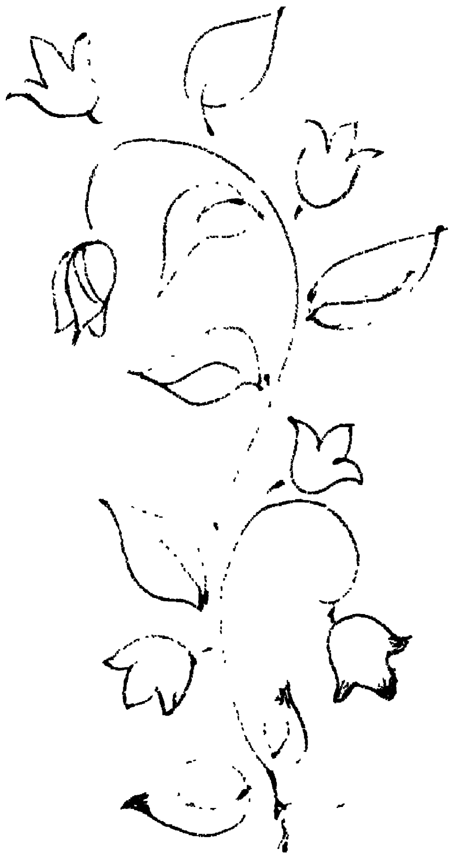
প্রকাশক ▢ আজিজুল হক
এডুকেশন ফোরাম
স্টল-৪১, ভবানী দত্ত লেন (কলেজ স্ট্রীট)
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

অক্ষরবিন্যাস ▢ ডি এণ্ড বি ডেটা সার্ভিসেস, কলি-৫৪

মুদ্রক ▢ [illegible] প্রেস
[illegible] স্ট্রীট [illegible]

প্রচ্ছদ ▢ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক
অক্ষর প্রকাশন
৩০/২ টি. সি. মুখার্জী স্ট্রীট
রিষড়া, হুগলী



কল্যাণীয়াষু

তানিয়াকে—

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গোঁসাইগঞ্জের পাঁচালি
অধিকার
দিন অবসান
অনিকেত
অগ্নিযুগের পদাতিক
দশচক্র
আবির্ভাব
সপ্তম গোস্বামী
অন্য মানুষ
সংঘাত
দেশ কাল পাত্র
সওদাগর
চোখের কাজল
অমৃতের আস্বাদ
শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ
সেরা গল্প সংগ্রহ
মণিবেগম
মেঘে ঢাকা তারা

দুর্গাপুরের চাটুয্যে বাবুরা ওখানের বনেদী জমিদার। দুর্গাপুর গ্রামখানা খুবই ছোট। এদিকের মাঠের পরেই বয়ে চলেছে দামোদর। নদীর এদিকে বর্ধমান জেলার অরণ্যভূমি। দিগন্ত অবধি শালবন সবুজের সমারোহ নিয়ে উঠে গেছে। ক্রমনিম্ন হয়ে এর বুকের ঘন অরণ্য জমেছে নদীর ধারে।

তারপর দামোদরে বিস্তার। গ্রীষ্মের সময় এর বুকে মরুভূমির শূন্যতা জাগে। ধু ধু বালুচর, মাঝের চরভূমিতে মানা ঘাসের ঘন অরণ্য। সাপ, বনশুয়োরও এসে আশ্রয় নেয় ওই ঘন বনভূমিতে। নদীর বুক বারোমেসে খালে একটু জল পায় চলে মাত্র। বাকি মাইল দুয়েক ধু ধু বালুচর।

এদিকে বর্ধমান ওপারে শুরু হয়েছে বাঁকুড়ার সীমান্তে আবার কপিশ তাম্রাভ প্রান্তর, দু একটা ছোট্ট গাঁ নির্জন প্রান্তরে পরিত্যক্ত শূন্যতার মাঝে মাটি কামড়ে পড়ে আছে, আবার শুরু হয় বড়জোড়া, শহার জোড়া অরণ্যভূমি, তার বিস্তার শুশুনিয়া পাহাড় ছাড়িয়ে চলে গেছে।

যেন নিঃসঞ্চার, শূন্যতার জগৎ।

মাঠ রয়েছে, দিগন্ত জোড়া মাঠ। ধাপে ধাপে উঠে গেছে দিগন্তের দিকে। জলের আশ্রয় নেই। আকাশমুখী শস্যক্ষেত। বৃষ্টি হলে ফসল হয়, কিছু চাষীদের কঠিন পরিশ্রমে, নাহলে পরিশ্রমও বৃথা। বন্ধ্যাই পড়ে থাকে জমি। হতদরিদ্র গ্রামগুলো কোনোমতে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মাত্র।

দুই জেলার দুই বাতাবরণ। বর্ধমানের দিকে পূর্ণতা—মাটিতে ফল ফসল হয় বন গড়ানী জলে, ওদিকে শূন্যতা, রুক্ষতা। মাঝে দামোদর যেন এপারের সব পূর্ণতাকে আড়াল করে রয়েছে ওপারের সামনে।

ওদিকে গ্রামবসতির লোকজনদের ওই দুস্তর বালুচর পার হয়ে ওদিকে স্টেশন, বাজারে আসতে হয় ধান—কিছু ফসল বিক্রি করতে। গরুর গাড়িতে ধান বোঝাই করে গ্রীষ্মের সময় ভোরের দিকে ওরা নদীতে নামে। বালিতে চাকা বসে যায়। গরুর কাঁধ পিঠ বেকে যায় ধনুকের মত, বালি ভেঙ্গে গাড়ি এপারে আসতে হাঁপায় মানুষও তবু বেলা নটার আগেই এপারে আসতে হয়।

কারণ রোদে বালি তেতে গেলে আর যাওয়া যাবে না। নদীতে তখন দাবদাহ শুরু

হয়। আবার নদী পার হবে সন্ধ্যার আগে, বেলা পড়লে।

তাও বেশীরাত হলেও বিপদের ভয় রয়েছে। নদীর বুকে তখন হানা দেয় অন্ধকারে বেশ কিছু হিংস্র মানুষের দল। যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠে নেবে। প্রাণেও মারতে পারে। বাধা দিলে কিংবা মুখচেনা কাউকে দেখলে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করার জন্য ওটা প্রায়ই করে। তাই সন্ধ্যার পর ওই নদী তখন দুর্গম হয়ে ওঠে ওই ডাকাতদের জন্যই।

বর্ষায় আবার দামোদরের তখন অন্যরূপ : বালিচর আর জেগে থাকে না। বিস্তীর্ণ বালুচর তখন বন্যাপ্লাবিত হয়ে যায়। গেরুয়া ঢল নামে নদীর বুকে। গেরুয়া জলস্রোত প্রবল স্রোতে শতসহস্র ঘূর্ণি তুলে কলহাস্যে চারিদিক মুখর করে বয়ে যায়।

নদীর তখন মত্ত রূপ। নৌকা চলে তবে তাও সবদিন চলে না। নদীর প্রবল বন্যায় দু'তিনদিন পারাপার বন্ধ থাকে। কখনও নৌকাও ওই প্রবল স্রোতে ডুবন্ত বালুচরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। লোকজনও ডোবে।

এপার ওপারে তখন দুস্তর ব্যবধান।

বাঁকুড়ার শেষ সীমান্ত তখন অবজ্ঞাত অবহেলিত। বর্ষার ক'মাস কোনমতে বেঁচে থাকে ওই অঞ্চলের মানুষ।

সদর শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে একটা খোয়াঢালা রাস্তা। বর্ষার জলে তাও ক্ষতবিক্ষত। দীর্ঘ তিরিশ মাইল দূরে সদর শহর যেতে গভীর অরণ্য আর দুটো নদী শালি আর গন্ধেশ্বরী। নদীগুলো ছোট। কিন্তু বর্ষার সময় তাদের মরা বুকে মত্ত যৌবনের গেরুয়া ঢল নামে।

ব্রিজও নাই। নদীর বুকে নীচু কংক্রিকেট কজওয়ে, সেটা তখন জলের নীচে। প্রবল বেগে দুকুল ছাপিয়ে বয়ে যায় নদীর প্রবাহ। শহর থেকে দুটো ধ্যাড়ধেড়ে জরাজীর্ণ বাস যাতায়ত করে নদীর এদিক থেকে সদর শহর অবধি।

তখন তাদের যাতায়াতেরও কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ফলে এই পথ্য দুর্গম।

বড়জোড়া থানাটা গ্রামের বাইরে। একদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, লাল কাঁকুরে মাটি। রুক্ষ বন্ধ্যা মৃত্তিকা। ডাঙ্গার মধ্যে দুচারটে আম কাঁঠালগাছও কঠিন সংগ্রাম করে টিকে আছে। দৈর্ঘ্যে বাড়েনি। মাটির কয়েক ফিট নীচেই জমাট পাথরের স্তর। তাই বেঁটে বামন হয়েই রয়েছে। দুচারটে বট অশত্থগাছ তবু মাথা তুলেছে। ওদিকে শহার জোড়ার বনভূমি।

নির্জন প্রান্তরে ওই দুর্গাপুর বাঁকুড়া রোডের ধারে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে থানাটা ওদিকে দুচারটা কোয়াটার। মাঝেমাঝে বন থেকে মহুয়াফুলের সময় ভালুকের দলও চলে আসে মহুয়ার ফুল খেতে।

ওরা আসে গ্রামের দিকে চাষীদের আখ, আলুর ক্ষেতেও হানা দেয়। ওই জন্তুদের

অত্যাচার সহ্য করে—প্রকৃতির মার খেয়েও মানুষ বাঁচার লড়াই করে। দুঃখ কষ্ট অভাব অজন্মা এদের নিত্যসঙ্গী, তবু—জীবন এখানে আদিম রীতিতেই তার পথ করে নেয় আপন ছন্দে।

ওদিকে বনের ধারে চড়াই এর নীচেই গোপগাঁ, দইপুর আরও কিছু গ্রামবসত রয়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়াও সব জাতেরই বাস এদিকে, বনের ধার ঘেঁষে দু-একটা আদিবাসী বস্তিও রয়েছে।

গোপগাঁয়ের কালিকান্ত ভটচায মশায় এই অঞ্চলের নামী ব্যক্তি। পঞ্চতীর্থ-নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দুর্গাপুরে চাটুয্যেরা তার যজমান। দুর্গাপুরে জমিদারদের কিছু মহাল, জঙ্গলমহল এদিকেও আছে। তাই চাটুয্যেবাড়ির মেজতরফের প্রতাপবাবু এদিকেও বাড়িঘর, জমিদারি কাছারিও করেছেন।

সেই সুবাদেই ভটচায মশায়ের সঙ্গে তাদের পরিচয়।

সেবার প্রতাপনারায়ণ রয়েছেন গোপগাঁয়ের পাশেই গোসাইগাঁয়ে ওঁর বাড়িতে। প্রতাপ বাবু এমনিতে সৌখিন ব্যক্তি। দীর্ঘ দশাসই চেহারা—বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি উদাত্ত কণ্ঠস্বর। নিজে সৌখিন অভিনেতা। তাই এখানের জমিদারিতে থাকার ফলে গোসাই গ্রামেও সৌখীন যাত্রার দল খুলেছেন।

গোসাইগাঁ, দইগাঁ, গোপগাঁ-জগন্নাথপুর প্রভৃতি পাশাপাশি গ্রামের ছেলেরাও আসে তার যাত্রার আখড়ায় মহড়া দিতে। মাঝে মাঝে দুর্গাপূজা সরস্বতী পূজা নাহয় জগন্নাথপুরের বাবা বুড়োশিবের গাজনের মেলায তার সৌখিন দলের যাত্রাগানও হয়। প্রতাপবাবু নিজেও অভিনয় করেন।

এই অঞ্চলে তাঁর পরিচিতি জনপ্রিয়তাও আছে। পাঁচগ্রামের কোন সালিসীতেও তার ডাক পড়ে। তখন গ্রামসমাজে একটা বাঁধন রয়েছে। সমাজের উপর তলার মানুষজন চাইত না তুচ্ছ কারণে গ্রামের কেউ আদালতে যাক, কারণ কোর্ট-কাছারি করা মানেই খরচান্ত। তাছাড়া গ্রামের সাদাসিদে মানুষরা তাদের বিবাদগুলো পঞ্চায়েতকে জানাতো।

তারা উভয়পক্ষকে ডেকে দুজনের বক্তব্য শুনে বিধান দিতো। অনেক সময় সামাজিক অর্থদণ্ডও দেওয়া হতো অপরাধীকে।

সেও দণ্ড দিয়ে সমাজের বিধান মেনে নিতো।

এমনি এক মীমাংসার সভায় প্রতাপবাবু দেখেছিলেন ওই পণ্ডিত তেজস্বী ব্রাহ্মণকে। ওর বিধানও ছিল শাস্ত্রসম্মত।

কোন ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে কায়স্থদের ছেলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিল। কিছুদিন পর ছেলেটি ফিরে আসে গ্রামে, মেয়েটিকে তার বাবা বাড়িতে নিয়েছিল। নিজের মেয়েকে শত অপরাধ সত্ত্বেও ফেলতে পারেনি।

এই অপরাধে গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সেই মেয়ের বাবাকে একঘরে করে তার ধোপা-নাপিত এমনকি চাষের মজুরও বন্ধ করে দিল। তার জমিজমার চাষবাসও বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রামসমাজের দাবী ওই মেয়েকে পরিত্যাগ করতে হবে। ও অপবিত্র কুলটা।

অসহায় ব্রাহ্মণ সেদিন গ্রামের মানুষদের অনুনয়-বিনয় করেও তার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। অসহায় মেয়েটাও দেখেছে তার বাবা মা, ভাই বোনদের অবস্থা। তার জন্যই ওদেরও অনাহারে, অপমানে জর্জরিত হয়ে মরতে হবে।

তাই অন্য কোন পথ না পেয়ে মেয়েটিই বিষ খেয়ে অত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু মরেনি, কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়।

এই ঘটনা নিয়েই আশেপাশের গ্রামেও আলোড়ন ওঠে। তারাই উদ্যোগী হয়ে পঞ্চগ্রামের সকলকে ডাকে এর বিহিত করার জন্য।

দইগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেই জমায়েত হয়েছে। প্রবীণদের মাঝে এসেছেন কালীকান্ত পঞ্চতীর্থও। প্রতাপবাবুকেও এই সভায় আসতে হয়েছে। তিনি সব শুনে এসেছেন।

প্রচুর কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমেছে এই সভায়। গোপগাঁয়ের ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি শরৎ মুখুয্যে ঘোষণা করে।

—সমাজকে রক্ষা করতেই হবে। সমাজের শুচিতা, পবিত্রতা চলে গেলে আর রইল কি হে। দেশ অনাচারে ডুবে যাবে। তাই ওই বিধানই বহালি থাকবে। ওই মেয়েকে গ্রামে রাখা যাবে না।

অনেকের ওই অভিমতই। এবার কালীকান্ত পঞ্চতীর্থ বলেন

—মেয়েটি দোষী?

সকলেই সমবেত ভাবে জানায়

—হ্যাঁ! কুলত্যাগ করেছে ও।

কালীকান্ত বলেন—ওই ছেলেটিও দোষী, সেই তাকে নিয়ে গেছল।

—হ্যাঁ!

—তাহলে ছেলেটি, ছেলেটির পরিবারের কোন শাস্তি কেন দাওনি তোমরা? সেও তো সমানই দোষী। বরং বেশি।

গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ সঙ্গতিপন্ন লোক। তার বড় ছেলে কলকাতায় ভালো চাকরি করে, শিক্ষিত। আর ছোট ছেলে বরুণ গ্রামে থাকে। জমিজায়গা অনেক। ধান-সাজা খাজনা, ধান আদায়ও হয় ভালই। তাদের কেউ ঘাঁটাতে চায়নি।

তাই বলে গোপগাঁয়ের মুরব্বিরা

—মেয়েটিই ছেলেটিকে বিভ্রান্ত করেছিল।

প্রতাপবাবু একক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনিও বুঝেছেন ব্যাপারটা। দেখেছেন তিনি,

ওই গ্রাম সমাজের মাথারা ধনী ঘোষ মশাইকে চটাতে সাহস করেনি।

বরং তাকে রক্ষাই করেছে, আর নির্দয় ব্যবহার করেছে ওই হতদরিদ্র পিতার উপরই। প্রতাপবাবু বলেন

—এই ছেলেটির, তার পরিবারেরও শাস্তি হওয়া উচিত।

বরুণ চুপ করে বসে আছে ওদিকে। প্রথম থেকেই তার এসব ভালো লাগেনি। সে বাসন্তীকে ভালোবাসে। ভেবেছিল একটা সুরাহা হবে। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বাবা গোবিন্দবাবুর নজর অন্যদিকে। ধনী গৃহস্থ সে, বরুণও বাঁকুড়া কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছে। পাত্র হিসাবে তাব মূল্য অনেক। এর মধ্যেই দু-এক জায়গা থেকে ভালো দামই দিতে চায় তার ছেলের জন্য, ওই গরীব বামুনের মেয়েটাকে মেনে নিতে চায়না গোবিন্দবাবু।

তাই ওই বাসন্তীর বাবা নরেশ মুখুয্যের গ্রামের বাসই তুলে ওর সবই দখল করে তাড়াতে চায়। এর মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ নরেশকে লোক মারফৎ তার বাড়িঘর দু-চার বিঘে ধান জমি যা আছে তা কেনার কথাও জানিয়েছে।

যাতে গ্রাম থেকে আপদ চিরতরে দূর হয়। সেই চেষ্টাই করছে সে।

কিন্তু নরেশ মুখুয্যের এই মেয়েটা যে ধুতুরা ফলের বীচি খেয়ে মরার চেষ্টা করবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি গোবিন্দ ঘোষ। ব্যাপারটা চাপা পড়েই যেতো। নরেশ মুখুয্যেও ঘর-বাড়ি, জমি-জারাত বিক্রী করে অন্যত্র চলে যাবার কথাও ভাবছিল।

এমনি দিনে মেয়েটা বিষ খেয়ে বসলো। মরলে সব ল্যাঠা চুকেই যেতো। পথ পরিষ্কার হতো গোবিন্দ ঘোষের। দু-চার দিন দু-চার জন মানুষ এনিয়ে কথা বলতো। আলোচনা করতো মাত্র। মানুষের স্মৃতি খুবই দুর্বল।

ক্রমশ ওসব কেলেঙ্কারীর কথা গামের মানুষরা ভুলে যেতো। আর পুরুষের কলঙ্কও বেশি দিন থাকে না। মানুষ ভুলে যেতো সব। গোবিন্দ ঘোযও বেশ শাঁসালো পাত্রীপক্ষ দেখে ছেলের বিয়ে দিয়ে বেশ কিছু টাকা, সোনদানা ঘরে তুলে তার পুঁজি বাড়াতো।

কিন্তু মেয়েটা বেঁচে গেল। আর তারও বিপদ বাড়লো।

এবার পঞ্চগ্রামের সমাজের সামনে তাকেও হাজির হতে হয়েছে। প্রতাপবাবুর কথায় তাই গোবিন্দ ঘোষ চটে ওঠে।

কিন্তু প্রকাশ্যে ওই মানুষটার কথার প্রতিবাদ করতে পারে না।

গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠাও কম নয়। সে এই এলাকার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। ধনী লোক। কিন্তু এই প্রথম সে বুঝেছে ওই প্রতাপবাবু এই এলাকার জমিদার। আর বনেদী পরিবার ওরা।

প্রতাপবাবুর নামও সে জানে। জানে ওই লোকটার দুর্জয় সাহসের কথা।

দুর্গাপুরের আশপাশে গভীর জঙ্গল। মাঝে-মাঝে বাঘের উপদ্রবও হয়। গরু-বাছুর

মারে। একলা পেয়ে বনের মধ্যে মানুষ পলকেও মারে। এমনি নরখাদক বাঘ ওই প্রতাপবাবু বেশ কয়েকটা মেরেছেন। তাই লোকে বলে বাঘমারা প্রতাপবাবু।

তাকে ওইসব কথা বলতে দেখে গোবিন্দই প্রতিবাদ করে

—ওই মেয়েটিরই দোষ। বরুণ আমার নিরীহ সৎ ছেলে—

গোবিন্দ ঘোষ তার ছেলের সাধুতা প্রমাণের জন্য গ্রামের কয়েকজনকে সাফাই সাক্ষীও এনেছে। তারাও এবার অবতীর্ণ হয়েছে আসরে। কালিকান্ত ভটচায ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেন

—ওসব আলোচনা এখানে অবান্তর। ঘটনা যা ঘটেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা দরকার। মেয়েটির জীবন নষ্ট হতে দেওয়া অন্যায়ই হবে। ঘোরতর অন্যায়।

অনেকেই কথাটা স্বীকার করে।

কালিকান্ত ভটচায বলেন—এখন সমাজের রূপ বদলাচ্ছে। সহরে তো এর ছবি তোমরা দেখছো। গ্রামের সমাজেও সেই পরিবর্তন আসবেই আর সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যত কঠিনই হোক সেই আঘাতকে মেনে নিতেই হবে।

শ্রোতারা নীরবে শুনছে ওর কথা। ভটচায মশায়ের প্রতিটি কথায় ফুটে ওঠে কাঠিন্য। শ্রোতারা বুঝতে পারেনা এরপর তিনি কোন দিকে যাবেন।

ভটচায মশায় বলেন

—আজ সমাজের মঙ্গলের জন্য, অসহায় একটি পরিবার একটি মেয়ের মঙ্গলের জন্যই যা বলবো সেটা তোমাদের অনেকেরই হয়তো ভালো লাগবেনা। অনেকে অমতও করতে পারে। কিন্তু তবু আমি আমার মত প্রকাশ করবোই। এ আমার কর্তব্য।

ভটচায মশায় সারা অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাই তার কথায় অনেকেই বলে—বলুন আপনি, আপনার কি নির্দেশ।

ভটচায বলেন

—গোবিন্দ ঘোষ মশায়কে তার ছেলের সঙ্গে ওই নরেশের কন্যার বিবাহ দিতে হবে।

স্তব্ধতা নামে সারা শ্রোতাদের মধ্যে। ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থের ছেলের বিয়ে। আর এই সমাজে, গ্রামে! ব্রাহ্মণের মেয়ে যাবে কায়স্থ ঘরের বৌ হয়ে।

স্তব্ধতার মাঝে ক্রমশ এবার গুঞ্জন ওঠে।

গুঞ্জন উচ্চতর হতে থাকে। আনেকেই নীরব। গোবিন্দ ঘোষই এর প্রতিবাদ করে—তা কি করে সম্ভব। বামুনের মেয়ে হবে ঘরের বউ!

গোবিন্দের অনুগৃহীত লোকদের সংখ্যাও কম নয়। এবার তাদেরই দু-একজন বলে ওঠে—এ অসম্ভব। এটা কি বিধান দিলেন পণ্ডিতমশাই?

প্রতাপবাবু কথাটা শুনেছেন। এবার তিনিই বলেন

—উনি ঠিক বিধানই দিয়েছেন। ওই ঘোষ মশায়ের ছেলে স্বয়ং ঘোষ মশায় কেন আগে ভাবেননি যে এটা অন্যায়। এ কাজ না করলে এসব ঘটনা ঘটার কোন কারণই হতো না। এখন আর কোন পথই নাই। মেয়েটির কথা ভেবে এ বিধান শাস্ত্রসম্মতই।

হরিশমাষ্টার ওদিকে চুপ করে বসেছিলেন। ভদ্রলোকের চেষ্টাতেই এখানের মাইনর স্কুল এখন হাইস্কুলে পরিণত হতে চলেছে। স্পষ্টবাদী ভদ্রলোক এবার বলেন

—এই একমাত্র সমাধান। ভটচায মশায় ঠিকই বলেছেন।

গোবিন্দ ঘোষের দলের শশীমাষ্টার বলে

—এ বিবাহ হতে পারে না? অশাস্ত্রীয় বিধান—

ভটচায মশায় বলেন—শাস্ত্রও যুগ অনুসারে বদলায় শশী।

সমাজের বুকে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সারা দেশে আজ নানা সমস্যা। পূর্ববঙ্গেও একটা সুষ্ঠসমাজ জীবন ছিল, সেখানে দাঙ্গায় কি সর্বনাশ হয়েছে জানো তো? আজ তারা দলে দলে এদেশে এসেছে— কেউ হারিয়েছে মা, বোন-বাবাকে। আজ সেই ছন্নছাড়া ছত্রভঙ্গ মানুষ গুলোর কেউ যদি আবার ফিরে আসে তাকে কিসমাজ নেবেনা? মেনে নিচ্ছে। তবে এটুকুকে কেন মেনে নেবেনা তোমরা?

প্রতাপবাবু বলেন

—নিতেই হবে। গোবিন্দবাবু আপনিই এই অঞ্চলের একজন নামী লোক হয়ে এই দৃষ্টান্ত আপনিই রাখুন সকলের সামনে।

বরুণ এতে খুশী। এই সেও চেয়েছিল অন্তর দিয়ে। আজ সমবেত জনতার চাপে শেষ অবধি গোবিন্দবাবু রাজী হয়। সকলের সামনেই গোবিন্দ বলে।

—ঠিক আছে। এতে মঙ্গল কি হবে জানি না। তবু জন দেবতার যদি এই বিধান হয় আমি মেনে নিলাম।

এ যেন জনতারই জয়। সকলেই খুশি হয়।

এই অঞ্চলে এমনি ঘটনা প্রথম ঘটলো। এর আগে দু একটা জনতারই হয়। সকলেই খুশী হয়।

এই অঞ্চলে এমনি ঘটনা প্রথম ঘটলো। এর আগে দু-একটা এমন আশাস্ত্রীয় ঘটনা ঘটেছে। তবে তা নিয়ে সামাজিক বৈঠকও বসেনি। গোপনে সেগুলো চাপা পড়ে গেছে। কোন সুষ্ঠ প্রতিবিধান হয়নি।

আজ ভটচায মশায়ের বিধান সমাজের বুকে একটা নতুন সাড়া এনেছে।

সুখদা ঠাকরনে গ্রামের মেয়ে মহলের শুধু মেয়ে মহল কেন সকলের কাছেই একটা আতঙ্ক বিশেষ। বুড়ির এককালে সবই ছিল। স্বামী-ছেলে-সংসার সব।

তবে একটা দোষ ওই মেজাজ। গলাখানাও ফাটাকাঁসার মত। অবশ্য তখন গলা তত উচ্চগ্রামে উঠতো না।

সুখদার স্বামী বসন্তমুখুটির তখন ঘরেই চাষবাষ। তার দোষ ওই যাত্রা করা। সুন্দর চেহারা—গানের গলাও সুন্দর। যাত্রার দলে কৃষ্ণ, হরিশচন্দ্রের পাঠ করতো। প্রথম প্রথম গাঁয়ের যাত্রায় স্বামীকে ওইসব সেজে পাট করতে দেখে খুশি হতো সুখদা।

যাত্রাপালা শুরু হবার আগে সাজগোজ করে বসন্ত এসে হাজির হতো কৃষ্ণের বেশে ওর বাড়িতে। সন্ধা হয়ে গেছে। সুখদাও ঘরদোরের কাজ শেষ করে যাত্রার আসরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

এমন সময় হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোয় ওই কেষ্টঠাকুরকে দেখে চমকে ওঠে সুখদা। মন্দিরে দেখা কেষ্টঠাকুরের মত পরণে পীত ধড়া, মাথায় মুকুট, গলায় মুক্তোর মালা—হাতে বাঁশি! মুখে মৃদু হাসি।

সুখদা শিউরে ওঠে।

—ওমা!

কৃষ্ণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলে ওই মূর্তি বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে —-তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি সুখদা, বল কি বর চাই তোমার? সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে সুখদার। কিন্তু পরক্ষণেই ওই গলার স্বর শুনে বুঝেছে এ তার সেই পতিদেবতাই! এবার সুখদা হেসে ওঠে।

—ওমা! তুমি! বাঃ কি সুন্দর সেজেছো গো! তা পালা শুরু হবে কখন?

—তুমি গেলেই। তোমার প্রতীক্ষায় রইছি রাধে।

—মরণদশা। যাও তো। কেউ দেখলে কি ভাববে! সুখদাই ওকে পাঠিয়ে দেয় যাত্রার আসরে।

সুখদার সেই দিনগুলো এখনও মনে পড়ে।

ক্রমশ ওই যাত্রাই হলো বসন্তের কাল। নিজেই এবার যাত্রার দল করলো।

সুখদা বাধা দেয়।

—ওসব খেয়ালে যেওনা, শুধু শুধু খর্চা।

বসন্তের জীবনের স্বপ্ন সে যাত্রার দল খুলবে নিজে। দেখেছে সোনামুখীর সুবল দত্তকে। যাত্রার দল করে এখন নিজের এস্টেটপত্র করেছে—পোষাক আশাক-যন্ত্রপাতি, ডেলাইট সব নিজের। বায়নাও বেশ ভালোই পায়।

তার যাত্রার দলের নাম এ দিগারে ছড়িয়েছে। ব্যবসাতো করে ভালোই আর নিজে এখন শকুনি, চাঁদসওদাগরে নিজে চাঁদসওদাগর, কর্ণ এসব রোলও করে। বসন্ত ওর দলেই গেছল অভিনয় করতে।

বসন্তের কর্ণ—কৃষ্ণসুদামায় কৃষ্ণের অভিনয় ওই সুবলদত্তকেও ছাপিয়ে যায়। তখন

ওর দলের বায়না করতে আসতো যারা তারাই চাইত বসন্ত মুখুটি থাকবে তো?

সুবল দত্তেরও ভয় হয়। ওই বসন্ত মুখুটিই তাকে টেক্কা দিতে চায়। এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারে না। তাই ভেবে-চিন্তে সুবল বলে

—বসন্ত, তুমি বরং বাঁকুড়ার কোন দলেই দ্যাখ। চাই কি কলকাতার দলেই যাও হে, এখানে ছোট দলে তোমাকে রাখতে পারবোনি।

বসন্ত মুখুটিও বুঝেছে ব্যাপারটা।

ক'বছর দল করে সুবল দত্ত ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তাকে আর নিজের দলে রাখতে চায়না। বসন্তের সম্মানে লাগে। সে দল ছেড়ে এসে এবার নিজেই দল করার কথা ভাবছে।

বসন্তের সঙ্গে সুবলের দলের দু-চারজন বিদ্রোহী অভিনেতা, কর্নেটওয়ালা হারুও বের হয়ে আসে। বসন্ত বলে

—দল এবার আমি নিজেই করবো।

হারু বলে—খুব ভালো কথা। তোমার নামেই বায়না হয়। আর আমি আছি। ভূষণদা আছে—দুজনের চেষ্টায় পঞ্চাশপালা গান তো হবেই।

ভূষণও সুবলের দলের সেকেন্ড ম্যানেজার ছিল। বেশ করিতকর্মা লোক। নায়ক পাটির সঙ্গে তার পরিচয়। লোকটা সন্ধ্যার পর আর ঠিক মত দাঁড়াতে পারেনা। মদ তার চাই।

এছাড়া আর কোন নেশা নাই। মদের জন্যই ওই সুবল দত্ত তাকে দেখতে পারেনা। বকাঝকা করে। দু-একবার দল থেকে তাড়িয়েও দিয়েছে। ভূষণ আবার নাক-কান মুলে ফিরে এসেছে। আবার সন্ধ্যার পর তার নাটক শুরু করেছে। সুবলও অতিষ্ঠ হয়ে ওকে বের করার উপরই ছিল।

এবার ভূষণ নিজেই বসন্তের কাছে এসে বলে

—আর মদ খাবো না বসন্তদা। দ্যাখো তোমার দলকে কোথায় নে যাই। ওই সুবল দত্তের ক্যাতায়নী অপেরাকে কোণঠাসা করে দোব। সব বায়না হবে তোমার। নিদেন ষাট-সত্তর পালা বছরে।

বসন্তও ভাবে বছরে সত্তর পালা গান হলে এক বছরেই তার খর্চা উঠে যাবে। তারপর দল জমাতে পারলে সে গ্রাম ছেড়ে সোনামুখীতে বাড়ি করে ওখানেই সুবলের নাকের উপর দল চালাবে।

সুখদা সব শুনে বলে

—ওসবে যেও না। যাত্রা করছ করো। এত খর্চা করে দলটল করোনা।

বসন্ত বলে-ভয় কি! মাত্র বিঘে চারেক জমি বেচলেই দল করার এস্টেট কেনার খর্চা এসে যাবে। এক বছরেই ওসব জমি বন্ধক থেকে ছাড়িয়ে নোব। পরের বছর

থেকে শুধু লাভ। ব্যস, সোনামুখীতে বাড়ি করবো—যাত্রার দল নে যাবো ওখানের সহরে। দেখবে দিন বদলাবেই।

স্বামীর জেদের কাছে সেদিন হার মেনেছিল সুখদা।

তার একমাত্র ছেলে শম্ভু তখন স্কুলে পড়ছে। সুখদা বলে

—জমিজায়গা বন্ধক দেবে? ছেলেটার ভবিষ্যৎ আছে।

বসন্তের তখন ইজ্জতের প্রশ্ন। বলে সে,

—এত ভেবোনা তো! দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গ্রামের কমল দাস এর চালু ব্যবসা। এলাকার ধান-গুড় সব সে পাইকারীতে কেনে আর ধানকলে সব ধান চালান দেয়। বেশ দুপয়সা করেছে। ওই ধানের ব্যবসা ছাড়াও তার পৈত্রিক ব্যবসা মুদিখানার দোকান। সেটা ছোটভাই কেষ্ট দেখাশোনা করে।

বসন্ত কমল দাসের আড়তেই যায় সেদিন সন্ধার পর। সারাদিন ব্যস্ত থাকে কমল। ধান কেনা-দরদস্তুর করা—ধানের গাস্তে করতে এখান-ওখানেও যেতে হয় তাকে। এসব নিয়েই দিনভোর ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যার পর গদি ঘরে বসে হিসাবপত্র করে। তখনই ফাঁকা পাওয়া যায় তাকে।

বসন্ত সেই সময়ই এসেছে কমলের কাছে। কমল এমনিতে মিষ্টভাষী।

সকলকে সম্মান দিয়ে ধীরে-সুস্থে কথা বলে।

বসন্তকে দেখেই বুঝেছে কমল ব্যাপারটা।

কারণ সেও শুনেছে গ্রামে বসন্ত ঠাকুর এবার নিজে যাত্রার দল করছে।

এর মধ্যে এনিয়ে গ্রামে আলাপ-আলোচনাও শুরু হয়েছে হবু অভিনেতাদের মধ্যে।

কারণ অনেকেরই কাজকর্ম তেমন নেই।

এই দূর প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার আলো তেমন আসেনি। স্কুল বলতে ওই মাইনর স্কুল। হাইস্কুল এখান থেকে দূরে। সেখানে বোর্ডিংএ রেখে লেখাপড়া শেখাবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। এরা ক'খানা জমি চাষবাষ করে যা ধান সামান্য অন্য ফসল পায় তাতে কোনমতে দিন চলে মাত্র। পড়ানোটা এদের কাছে বিলাসিতাই।

তাই গ্রামের ঘরে ঘরে সমর্থ যোয়ান মদ্দরা চাষের ক'মাস কাজ করে। বাকী সময় কাজ নাই। আটচালায় তাস খেলে—মাঠে ফুটবল খেলে সময় কাটায়।

তাদের অনেকে যাত্রার দলে ভিড়ে অভিনয়ের সুবাদে তবু এখান-ওখান ঘুরবে, কাজ করবে বলে তারাই এর মধ্যে আসর গরম করে তুলেছে।

খবরটা এই ভাবেই হাওয়ায় ভেসে কমলের কানে পৌঁচেছে। আর কমল জানে বসন্ত ঠাকুর কেন এসেছে। তবু নিজে থেকে কমল কোন কথা বলে না। কথাটা সে কমই বলে, শোনে বেশি।

বসন্তই বলে—হাজার আষ্টেক টাকা চাই কমল, দশহাজার হলে ভালো হয়।

—টাকা! কমল যেন টাকার নাম এই প্রথম শুনছে।

বসন্ত বলে—দশহাজার টাকার দরকার, তার জন্য আমার বিঘে চারেক জমি তোমার কাছে খাইখালাসী বন্ধক রাখবো। একবছরের ফসলও পাবে। টাকার সুদও দেব। একবছর পর টাকা দোব জমি ফিরিয়ে দেবে।

এই ধরণের শর্তে জমি বন্ধকীর রেওয়াজ আছে। কমল দাস বুঝেছে টাকাটা ওর দরকার। তাই কমল একটা বেশি মোচড়ই মারে।

—দা ঠাউর, এতটাকা তো হাতে নাই।

—একটা ব্যবস্থা করো কমল, এটা করতেই হবে।

কমল শেষ অবধি বলে—এত চাপ দিচ্ছেন, দেখি সহরের মহাজনের কাছে দেনা করেই দেব যদি পাই। তবে পাঁচবিঘে জমি বন্ধক দিতে হবে। চারবিঘেতে পোষাবে না। মহাজনের সূদ তো দিতে হবে।

টাকা দোব কমলই। তবু ওই ভাবেই মোচড় মারে আর জমি বের করার জন্য। বসন্তের চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন। সে ওতেই রাজি হয়।

সুখদা দেখে স্বামী এখন যাত্রা নিয়েই মেতেছে। বাড়ির চাষও তুলে দিয়েছে। বলদও বিক্রি করে দিয়েছে। বাকী সামান্য যেটুকু জমি তা ভাগে দিয়ে এখন পুরোপুরি যাত্রার দল নিয়েই মেতেছে সে।

দিনরাত পাঠ লেখা চলছে, রিহার্সেল বসছে বাইরের ঘরে। সুখদা চা করতে-করতে হাঁপিয়ে ওঠে। ওদিকে কর্নেট-বাঁশি-ঢোলের কনসার্ট চলেছে। শম্ভুও দ্যাখে বাবার কাণ্ড।

সেও মাঝে-মাঝে আসরে গিয়ে বসে। সুখদা বকাবকি করে—তোর পড়াশোনা নাই?

শম্ভুর অবশ্য পড়াশোনাতে তেমন আগ্রহ নাই। স্কুলে আটকে থাকতে তার মন চায় না।

এরমধ্যে সে একটা বিদ্যাতে স্পেশালিষ্ট হয়ে উঠেছে। মাছ ধরার বিদ্যে। ছিপ নিয়ে পুকুরে ফাতনার দিকে একদৃষ্টে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বই-এর দিকে চেয়ে থাকতে পাঁচ মিনিটও পারে না।

আর মাছ যেন তাকে ডাকে।

ছিপ নিয়ে যেখানেই যাক মাছ সে ঠিক ধরে আনবেই। ফলে সুখদাও ছেলেকে বিশেষ বাধা দেয় না।

শম্ভু ছিপ নিয়ে আর অবসর সময়ে যাত্রার দলের হারমোনিয়াম বাজিয়ে সারেগামা সাধে।

হারু বলেছে তার নাকি গানের গলাও চমৎকার।

সেইই তাকে তালিম দেবে। আর শম্ভুও সময়-অসময় গলা তুলে সারেগামা সাধে,

মাস ছয়েক পর হারু তাকে একখানা গানও দিয়েছে।

"আশার তরীখানি হয়ে গেল খান খান
নীরবে কেটে গেল সারাটি দিন মান"

শম্ভুও এখন স্বপ্ন দেখে সে আসরে গাইছে।

সুখদা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে। দেখেছে চাষের জমিগুলোও প্রায় সব চলে গেছে এখন কমলের হাতে। এদিকে বসন্ত যাত্রার দলের সাজপোষাক, যন্ত্রপাতি কিনতে সবই প্রায় শেষ করেছে, তারপর রিহার্সেলের খর্চা, হ্যাঁপাও কম নয়।

সংসারের পুঁজিতে টান ধরেছে। ভরা বর্ষাকাল।

এইসময় এই অঞ্চল অন্যজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে দুর্গাপুরের সঙ্গেও সংযোগ বিচ্ছন্ন হয়ে যায় দুর্দাম দামোদরের জন্য। এদিকে সদর সহরের সঙ্গে ও যোগসূত্র প্রায় বিচ্ছিন্ন।

তখন গ্রামের মানুষকে সঞ্চয় ভেঙ্গেই খেতে হয়।

চাষের খর্চাও থাকে এইসময়। সুখদাও বুঝেছে সামনে তার চরম দুর্দিন। বসন্ত বলে—কটা মাস কাটাও, পুজোর সময় থেকেই বায়না আসতে শুরু হবে। একেবারে ষষ্ঠী থেকে জ্যৈাষ্ঠি অবধি গান গাইব। সব দেনা শোধ হয়ে যাবে।

সুখদা কোনোমতে দিন চালায়।

বসন্তের স্বপ্ন যেন সার্থক হতে চলেছে। এবার দুটো পালা ধরেছে সে। একটি ঐতিহাসিক অপরটি পৌরাণিক। পূজার সময় থেকে বায়নাও আসছে। দল নিয়ে বের হয়েছে সে।

এখন তার জীবনমরণ প্রশ্ন।

যেভাবে হোক তাকে গান করে টাকা তুলতেই হবে।

আর তার গানের নামযশও হয়েছে বেশ। ফলে বায়নাও আসছে অনেক আসরে।

সুবল দত্ত ভাবেনি যে এভাবে তাকে ঘা দেবে বসন্ত ঠাকুর। ভেবেছিল সুবল বসন্ত ফের তার দলেই আসবে আবার মাথা নীচু করে।

তখন বসন্তকে সে দুনম্বরেই রাখবে আর দলের টপ অভিনেতা হবে সে নিজে কিন্তু বসন্ত যে দল করে তারই দলের সব বায়না নিজেই টেনে নেবে এটা ভাবতেও পারেনি সুবল।

বসন্ত এখন পালা গাইছে চুটিয়ে। ভূষণ বলে

—কি বলেনি বসন্তদা, শালা সুবলের দলকে লাটে তুলে দোব, এখন দ্যাখো দিলাম কিনা?

হাসে বসন্ত।

শীতের দিন, এখানে কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে। যাকে বলে হাড়কাঁপানো শীত। রুক্ষ

পাথুরে মাটি—শালবনের বুক চিরে খোলা ট্রাকে দল নিয়ে এখান থেকে ওখানে যেতে হয় তাদের, যাত্রার দলের জীবনই আলাদা। এ যেন অসুরের জীবন। এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই।

এক আসরে গেয়ে আবার রাতের ওই হিম-ঠাণ্ডার মধ্যেই মালপত্র গোছগাছ করে কোনরকমে চাট্টি মুড়ি-আলুর চপ খেয়ে আবার রাতারাতি যাত্রা করতে হয়। ঘরের আসরে সকালবেলাতেই গিয়ে হাজির হতে হবে।

সেখানে কোন ইস্কুলবাড়ি না হয় কারো চণ্ডীমণ্ডপে ওদের থাকার ব্যবস্থা। দলের লোকজন রাত জেগে ওই খোলা ট্রাকে বনজঙ্গলের বুক চিরে এগোচ্ছে। ঠাণ্ডায় জমে যাবার মত অবস্থা।

তাই দলের লোকজন ওখানে নেমে কোনমতে হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে শুয়ে পড়ে।

শোবার মাত্র তারা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ততক্ষণে ওদিকে দলের ঠাকুর-চাকররা নায়ক পার্টির কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্থানীয় হাট-বাজার থেকে জিনিষপত্র কিনে রান্নার আয়োজন করে। তাদের ভরপেট খাবার মেলে ওই একবেলাই?

কারণ গানের পর তখন রাত্রি হয়ে যায়। আর রান্নার লোকও থাকে না। তখন দলের লোকদের জলপানির নির্ধারিত পয়সা দেওয়া হয়, তাই দিয়ে ওরা যা পায় তাই খেয়েই রাত কাটিয়ে আবার অন্যত্র যাত্রা করে। ফলে দিনের বেলার খাওয়াই তাদের আসল খাওয়া।

অন্যরা ঘুমাতে ব্যস্ত। কিন্তু তখন বসন্তের সময় নেই।

সে দলের মালিকও। ম্যানেজারের সঙ্গে তখন দলের পরের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে হয়। হিসাবপত্রও দেখতে হয়।

খাবারের ব্যবস্থাদি করতে হয়। ফলে বিশ্রাম তার হয় না।

ওদিকে রান্না-বান্না হয়ে গেছে।

তখন বেলা দুটো বাজে। এবার দলের লোকদের ডেকে খাওয়াবার ব্যাপার রয়েছে।

ঐ শেষ দুপুরে ওরা খেতে বসে।

বসন্ত নিজেও এতকাল যাত্রা করেছে। কিন্তু সে এসব করত না।

দেখে বসন্ত অনেকেই অবেলা করেই খেতে বসে। আর খাবার ব্যাপারটাও দেখার মতই।

তখনকার দিনে যাত্রার দলের একটা প্রচলিত কথা ছিল।

—তেল মাখবে আবা-থাবা

চিৎ হয়ে শোবে বাবা।

খাল দেখে পাড়বে পাত,

তবে খাবে যাত্রার দলের ভাত।

যাত্রার দলের কিছু রীত্ রেওয়াজ ছিল। দলবেঁধে যেতো যাত্রা গাইতে। সেখানে দলের মাখার জন্য তেলও দেওয়া হতো একটা বড় পাত্রে। শীতের দিন। গায়ের চামড়ায় টান ধরে। তেল মাখার দরকার।

কিন্তু এত লোকের জন্য তো আলাদা তেল নেই, সকলেই ওই একটা পাত্র থেকেই তেল নিয়ে গায়ে মাখে। তাই হাতের মধ্যে খাবলা খাবলা তেল নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে গায়ে পায়ে থাবড়া থাবড়া তেল লাগিয়ে ভিড়ের বাহিরে এসে সেই তেল চারিয়ে মাখতে হতো।

আর শোবার জায়গাও সীমিত। একটা ঘরে ফরাস পেতে রেখেছে নায়ক পক্ষ, সেখানেই পঁচিশ-তিরিশ জনকে শুতে হবে। জায়গা কম।

তাই প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে জায়গা দখল করতে হবে। তারই পরে পাশ ফেরার জায়গা মিলবে। নাহলে এক কাতেই রাত কাটাতে হয়।

তারপর খাবার ব্যাপার। পাইকেরী ঘ্যাট একটা আর আলু মাছ দিয়ে হড়হড়ে ঝোল। ভাত মাখাতে হবে তাই পাতাও পাততো তারা অসমান জায়গা দেখ, যাতে ভাতের গহ্বরে ঝোল বেশিই ধরে। নাহলে ভাত মাখাও যাবে না।

এখন সেদিন বদলেছে। বসন্তের দলেও সেই রীতি বদলেছে। বাবুরা খেতে বসেছে। যেন পেটে ওদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। ভাতের রাশি দেখতে-দেখতে উঠে যাচ্ছে। ভাত দিয়ে কুলোতে পারে না ঠাকুর।

ওই অবেলায় এক বেলার খাওয়া নয়, যেন দুবেলার খাওয়াই। ওই যেভাবে উট কুঁজে জল সংগ্রহ করে। ওই যাত্রার দলের লোকরাও ওদের জঠরে একসঙ্গে দুবেলার আহার্যই পুরে নেয়। যাতে রাতের বেলায় আর তেমন খাবার দরকার না হয়।

তবু বসন্ত সব নিয়েই দল চালাচ্ছে।

সুখদাও স্বপ্ন দেখে বাড়িতে বসে। লোকটা সর্বস্ব পণ করে একটা কঠিন কাজে নেমেছে। তার সাফল্যের উপর নির্ভর করছে ওর বাঁচামরা। সে কোনমতে কায়ক্লেশে সংসার চালাচ্ছে। শম্ভুকে বলে, পড়াশোনা কর বাবা, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তোকে। শম্ভু অবশ্য তার নিজের খেয়ালেই আছে।

এবার ধান হয়েছে ভালোই। বৃষ্টির যোগান ঠিক ছিল তাই জলের অভাব হয় নি জমিতে। ধানগাছগুলো মাথা তুলেছে আর পাকা ধানের মঞ্জরিতে ক্ষেতে তারা মাথা নোয়ান দিয়েছে পূর্ণতার তৃপ্তি নিয়ে।

সুখদা ঠাকরনের খামার এবার শূন্যপ্রায়। সামান্য ভাগের জমির ধানই উঠেছে। আসল পাঁচ বিঘে সরেশ জমির ধান এবার খামারে ওঠেনি, সেই ধান গেছে এবার

কমলের খামারে। মালক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে নি সুখদা। তবু আশা করে বসন্ত এবার পালাগান গেয়ে সব জমি আবার ছাড়িয়ে নেবে কমল দাসের টাকা মিটিয়ে।

বসন্ত মুখুটির দল ভালোই চলছে। বসন্ত ওর দলের নায়ক রেখেছে ওই সুবল দত্তের দলের বাতিল নায়ক অরুণকুমারকে।

আর নায়িকা রেখেছে নতুন একটি মেয়েকে। যাত্রার দলের ভাষায় ওদের বলা হয় টপা আর টপী।

ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ট্রাকের সামনের সিটে ওরা দুজনে থাকবে। বাকীরা ট্রাকের খোলা অংশে মালপত্র সমেত যাতায়াত করে। মায় দলের মালিক এক নম্বর অভিনেতা হয়েও বসন্তও ওইভাবে যাতায়াত করে। হিমেল বাতাসে হাড় কাঁপায়, শরীরটা কদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। তবু প্রাণপণে পরিশ্রম করে চলেছে সে। দেনা শোধ করতেই হবে যে ভাবেই হোক না কেন।

সুবল দত্তও বসে নাই।

তার এতদিনের দল এবার ওই বসন্তেব জন্যই বিপদে পড়েছে। দলের বায়না নাই তেমন। সারা এলাকায় বসন্তের সুখদা অপেরাই গান গাইছে।

সুবল দত্ত তাই এবার চালটা জব্বরই দেয়।

কিছু টাকা তার বেশি খরচ হয়ে গেল। কিন্তু দলকে বাঁচাতে গেলে এমন খরচ করতেই হবে।

তাই সুবল আটঘাট বেধেই এবার পথে নামে।

মেদনীপুরের গড়াবতোয় সর্বমঙ্গলা তলায় বেশ বড় মেলা বসে। সাতদিন ধরে নানা উৎসব-সমারোহ চলে। যাত্রাগানেরও বড় আসর বসে। এতদিন সুবল দত্তের ওই আসর ছিল বাঁধা। সেই ভালো টাকা নিয়ে সেখানে দুপালা গান করতো।

এবারও সেই আসরে যাত্রাগান হচ্ছে কিন্তু সেখানে সুবলের ছত্রভঙ্গ দল বায়না পায়নি। সেখানে দুরাতের আসর পেয়েছে বসন্ত মুখুটির সুখদা অপেরাই। তার জন্য ভালো টাকাও দেবে তারা। সুবল দত্ত সব খবরই রেখেছে।

কারণ এখানেও তার লোকজন আছে। পয়সা দিয়ে কিছু স্থানীয় ছেলেদেরও হাতে এনেছে সে।

বসন্ত মুখুয্যে দল নিয়ে এসেছে এখানে।

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এদের ভালোই। ভিড়ও হয় প্রচুর কিন্তু বসন্ত সকাল থেকেই ভাবছে কথাটা। গতকাল ওদের এগরাতে গান ছিল। গানের পর রাতেই ওরা বের হয়েছে ট্রাকে। ওই হিরো অরুণকুমার আর হিরোইন ওরা খড়গপুর এসে বলে রাতটা এখানে ওদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাল বেলা বারোটা নাগাদ ট্রেনে করে

ওরা গড়বেতায় পৌছে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে আসরে যাবে।

বসন্ত তবু বলে—আবার পথে নামবে? কোন ঝামেলা হবে না তো অরুণ?

অরুণ বলে—না-না। এত আগেও তো মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়েছি। কিন্তু গানের আগেই পৌচেছি। কোন অসুবিধা হয়েছে?-

বসন্ত দেখছে মাঝে-মাঝে ওরা দুজনে দু-একদিন ফাঁকা থাকলে ছুটি নেয় আবার ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

তার গানের কোন অসুবিধা হয়নি।

এবার তাই আবার মাঝপথে ছুটি নিতে বসন্ত বলে—'তা হয়নি' কিন্তু যা দিনকাল কোথায় কি ঝামেলা হয় তার ঠিক নাই। তাই বলছিলাম দলছুট না হওয়াই ভালো।

অরুণ বলে

—তোমার কোন ভয় নাই বসন্তদা। আমি ঠিক সময়েই পৌছে যাবো।

ওরা মাঝপথে নেমে গেল দুজনে।

ভূষণ বলে—আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কথা ছাড়ো বসন্তদা। যুগলে উড়ছেন। আরে বাবা যাত্রার দলে কতকি দেখলাম। কত জনকে উড়তে দেখলাম। পড়তেও দেখলাম। যেতে দাও তো।

ওরা ট্রাকে করে এসে পৌচেছে।

বিরাট আসর। টিকিট বিক্রি করে শো। মাইকে দিকে দিকে ঘোষণা চলছে। বসন্তের নাম নানা বিশেষণ প্রয়োগ করে ঘোষণা চলেছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে।

বেলা বাড়ছে। তখনও অরুণকুমার আর নায়িকার দেখা নাই।

বসন্ত ভাবনায় পড়ে। ভূষণ বলে

—ট্রেনের সময় তো বারোটায়, ওই ট্রেনে এসে পড়বে এত ভাবছো কেন?

বসন্ত বলে—তখন ছেড়ে দেওয়াই ভুল হয়েছে।

হারু বলে—এসে পড়বে আমি নিজে স্টেশনে যাচ্ছি।

হারু নিজেই গেছে স্টেশনে।

তারও বুক কাঁপছে দুরু-দুরু করে। ট্রেনটা আসছে। ঠাকুরকে ডাকছে সে ব্যাকুল ভাবে। ট্রেন প্লাটফর্মে থেমেছে। লোকজন যাত্রীরা ওঠানামা করছে। হারু ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে ওই ভিড়ের দিকে কোন কামরা থেকে এখুনি নামবে ওরা দুজনে।

কিন্তু ট্রেনের বাঁশি বাজে। বিশাল অজগরের মত ট্রেনটা আবার গা নাড়া দিয়ে চলতে থাকে। স্টেশনের বাইরে বের হয় শীলাবতীর ব্রিজের দিকে ট্রেনটা চলে যায়।

প্লাটফর্মের ভিড়ও কমে আসে।

লোকজন কমে যায় আবার শূন্য হয়ে আসে প্লাটফর্ম কিন্তু কই দুজনের দেখা মেলে না।

হারু হতাশ হয়ে চিন্তিত মনে বাসায় ফেরে।

তখনও যাত্রার দলের অনেকেই ঘুমে মগ্ন। ওদের কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। যত ভাবনা হারু-বসন্তেরই।

বসন্ত শুধোয়—কি রে হারু? ত্যানারা কই?

হারু বলে, এ ট্রেনে তো নামেনি।

এমন সময় যাত্রার দলের সাজঘরের একটা ছেলে একটা চিঠি নিয়ে আসে। বলে সে

—বসন্তবাবু, একজন ভদ্রলোক সাইকেলে এসে চিঠিখানা দে গেল।

বল্লে আপনাকে দিতে। খড়গপুর গেছল সে, সিখানেই অরুণবাবুর ভাই না কে তাকে চেনে সেই চিঠিখানা দিল।

বসন্ত ব্যাকুল ভাবে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে বলে —বাবুর কাণ্ড দ্যাখ হীরে!

হীরু, ভূষণও এসেছে। তারাও চিঠিটা পড়ে বলে —বাবু সন্ধ্যা পাঁচটার ট্রেনে আসছেন। দাদার বাড়িতে কি একটা অনুষ্ঠান তাই সকালে যেতে পারছেনা। ওবেলায় অতি অবশ্যই এসে আসরে নামবে কোন ভয় নাই।

বসন্ত বলে—বোঝ কাণ্ড। যদি ট্রেনের গোলমাল হয়, কথাটা ভাবলো না? হারু বলে এখন ভেবে কি হবে বলো। ওবেলায় আসুক তারপর যা বলার বলবে।

আসরও বেশ বড়। বৈকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে গরুর গাড়ি, ভ্যান রিক্সায় করে লোকজন আসতে শুরু করেছে। কাউন্টারেও জোর টিকিট বিক্রী হচ্ছে।

আসরে তখন বাতি, মাইক টাঙানো হচ্ছে।

সাজঘরে সাজের বাক্স, যন্ত্রপাতি এস্টেটপত্র এসে গেছে। সাজঘরের লোকজন সাজের বাক্স সব নাম্বার মত বসিয়ে ত্রিনাথের পূজার আয়োজন করছে।

ওদিকে বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

ভিড় বেড়ে চলেছে। উদ্যোক্তারাও খুব খুশি। এবার তাদের রেকর্ড সেল হয়েছে। এদিকে বসন্তের বুক কাঁপতে সুরু হয়।

তখনও অরুণ আর নায়িকার দেখা নাই। বসন্ত সাজঘরে সাজবে কি পায়চারী করছে দুরু-দুরু বুকে।

ভূষণ গেছে স্টেশনে পাঁচটা সাতাশের গাড়ি দেখতে, তারপর গাড়ি সেই সাতটায়। এই গাড়িতেই নামার কথা অরুণদের।

কিন্তু এ গাড়িও আসে, প্লাটফর্মে দাঁড়ায়।

কিন্তু কেউ নামে না ওদের।

ওদিকে আসরে যন্ত্রপাতি রাখা হয়ে গেছে।

হাজার দশেক লোক আসরে। ঘণ্টাও পড়ে বসন্ত জানে হিরো-হিরোইনের সিন

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে।

তার মধ্যে ওরা এসে ঝটপট মেকাপ নিয়ে আসরে নামতে পারবে। সে প্রথমে একটু দেরী করে আরম্ভ করতে চাইছিল।

অনেক সময় নায়কপক্ষই তাদের দেরী করে আরম্ভ করতে বলে। হাউসফুল বা আশানুরূপ টিকিট বিক্রি না হলে তারা একটু সময় নেয় টিকিট বিক্রির জন্য কিন্তু এখন তাদের হাউসফুল হয়ে গেছে। তাই তারাও তাড়া দেয়।

—টাইমলি যাত্রা শুরু করুন নাহলে দর্শকরা গোলমাল করবে।

বসন্ত ওদের তার সমস্যার কথা শোনায়নি।

ভেবেছে ঠিক সময়েই এসে পড়বে তার নায়ক-নায়িকা। বিশেষ করে অরুণ চিঠি লিখেছে তাকে। সেও কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল।

প্রথম ঘণ্টা বেজে গেছে।

কনসার্ট সুরু হয়। ঢোল কর্নেট ফ্লুটের সঙ্গে ঢোলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ওঠে।

বসন্তের বুকে ঢোলের শব্দ ওঠে।

তখনও আসেনি তার নায়ক-নায়িকা। ওদিকে সেকেন্ড বেলও পড়েছে আবার দুনম্বর কনসার্ট শুরু হয়।

হঠাৎ ভূষণকে ঢুকতে দেখে চাইল বসন্ত।

সাজঘরের বাইরে বসন্তকে ইশারায় ডাকে ভূষণ। বসন্ত বাইরে আসতে ভূষণ বলে —এট্রেনেও ওরা কেউ নামেনি।

চমকে ওঠে বসন্ত।

—সেকি! তাহলে এখন কি হবে?

ভূষণও জানেনা কি সর্বনাশ হবে। বসন্ত বলে

—তাহলে অরুণ আর ওই মেয়েটা আমাদের সর্বনাশই করলো? ইচ্ছা করেই এসব করেছে আর এর মূলে নিশ্চয়ই ওই সুবল দত্তেরই হাত রয়েছে। সেই আমাদের সর্বনাশ করার জন্য ওদের দুজনকে টাকা দিয়ে সরিয়ে নিয়েছে।

—হতেও পারে! ভূষণও ভাবছে কথাটা।

ওদিকে তিন নম্বর কনসার্টের পর প্রথম দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে।

ওরাও জানে না যে এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে। ওরা যথারীতি ওদের সিনে নেমেছে অন্যদিনের মত। ওরা জানে অরুণরা এসে যাবে, সিনে ঠিক আসবে।

কিন্তু খবরটা এর মধ্যে কারা ছড়িয়ে দেয়।

সুবল দত্ত এখানের উপর নজর রেখেছিল। তার লোক তখন অরুণদের টাকা দিয়ে সামনের বছর তাদের দলে নেবার চুক্তি করে ওদের দুজনকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য দীঘার কোন হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলেছে।

সেখানে ওদের আনন্দ-অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই রাখেনি।

অরুণ আর নায়িকা স্বর্ণকুমারী তখন সমুদ্রতীরে ঝাউবনে সমুদ্রের রূপ দর্শন করছে।

এখানের জনসমুদ্র তখন উত্তাল হয়ে ওঠে।

ওদের দলের ছেলেরাই আওয়াজ তোলে "টপা-টপী আসেনি, যাত্রা হবে কি করে র‍্যা" একজন চীৎকার করে ঘোষণা করে—শালা টপা টপীকে নে ভেগেছে।

এরপরই শুরু হয় প্রলয়কাণ্ড।

নায়কপক্ষও জেনেছে খবরটা সত্যিই। বসন্তবাবু তাদের এসন্ধে কিছুই জানায়নি। তারাও টিকিট বিক্রি করেছে।

এবার সেই দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শকরাও চীৎকার করে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? দলে টপা-টপী ফৌৎ আর যাত্রা হচ্ছে? মার শালাদের, মার।

চারিদিকে তখন বিশৃঙ্খলা, ওদিকে দমাদ্দম টিনের বেড়ায় ইটপাটকেল পড়ছে ওরা ঢিল ছুড়ে লাইটগুলোই ভেঙে ফেলে। আসরে তখন লোকজন বের হবার জন্য ঠেলা ঠেলি ধস্তাধস্তি করছে। মেয়েদেরও কাতর আর্তনাদ ওঠে।

এদিকে গোলমালের সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু লোক তার থেকে লাভ করবার চেষ্টাতেই থাকে। সুবল দত্তের সেই টাকা-খাওয়া লোকরাও পরবর্তী কাজের জন্যই তৈরি ছিল।

তখন প্যান্ডেলে দক্ষযজ্ঞ চলেছে। ভাঙচুর চলছে, আলোও নাই। ওই দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা দেখতে-দেখতে যন্ত্রপাতি সাজের বাক্স, মায় ক্যাস বাক্সটা অবধি ওই গোলমালে কেড়ে নিয়ে পালায়।

যাত্রাদলের অভিনেতা অন্যরাও তখন প্রাণের দায়ে প্যান্ডেল ছেড়ে যে-যেদিকে পেরেছে দৌড়েছে, কেউ-কেউ ওদিকে সেগুনবনের আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছে।

বসন্ত প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করতে কারা তাকেও উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়েছে। তবু বসন্ত তার এস্টেটপত্র বাঁচাতে পারেনি। ওদিকে প্যান্ডেলের চটে কারা আগুনও লাগিয়েছে।

লোকজনের চেষ্টায় আগুন বেশি ছড়াতে পারেনি। তবে চেয়ার অনেক চুরি হয়ে গেছে। বাকি সব ভেঙ্গে চুরমার করেছে, আহতও হয়েছে অনেকে।

ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ এসে যখন গোলমাল থামায় তখন সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আর বসন্তের সুখদা অপেরার সব মালপত্র লোপাট, যন্ত্রপাতি মাইক কিছুই আর নেই।

বসন্ত তখন আহত।

কপালে রক্ত পড়ছে। আহত বসন্ত দলের আরও কিছু লোককে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

বসন্ত নির্বাক যেন বজ্রাহত একটা তালগাছ।

নায়ক পক্ষও শাসায়—আপনার জন্য আমাদের তিরিশ হাজার টাকার প্যান্ডেল মালপত্র গেছে। আপনাকে ছাড়বো না।

পুলিশও এবার কেস লিখে বসন্তকে বলে—পরে কোর্টে হাজির হতে হবে। এদের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

বসন্ত বলে—আমার যে সর্বস্ব চলে গেল হুজুর!

দারোগাবাবু বলেন—আগে কেন বলেননি এসব কথা? সময় থাকতে যাত্রা বন্ধ করলে এসব হামলা হতো না। এত লোক চোটও পেতো না।

—চোরদের ধরবেননা স্যার? বসন্ত বলে—আমার সর্বস্ব লুঠ করে নিল এসব ষড়যন্ত্র। তারাই হিরোদের আটকে রেখেছে, দোষী আমি নই। এসব সুবল দত্তর দলেরই কাজ।

দারোগাবাবু বলেন—তদন্ত হবে। পরে দেখা যাবে।

সর্বস্ব হারিয়ে দিন তিনেক পর আদালত থেকে জামিন পেয়ে যেদিন ঘরে ফিরলো বসন্ত সে তখন সর্বহারা নিঃস্ব একটা মানুষ। কদিনেই তার দেহ-মন ভেঙ্গে পড়েছে। কপালের ক্ষতটাও বিষিয়ে গেছে।

মুখ ফুলে ঢোল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

সুখদা চমকে ওঠে—একি হলো?

বসন্তকে ধরে কোন রকমে বাড়িতে এসে তোলে। বসন্ত বলে— সর্বনাশ হয়ে গেছে শম্ভুর মা।

—সেকি!

—তোমার কথা শুনিনি, তাই আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। বসন্তের কথার সুরে কি হাহাকার ফুটে ওঠে।

সুখদা পাশের গ্রামের ডাক্তারকে আনায়। ডাক্তার দেখে বলে—এদিকে ঘাও বিষিয়ে গেছে। হার্টের অবস্থাও ভালো নয়। সাবধানে থাকতে হবে। ওষুধ পত্র দিচ্ছি একটু সেরে উঠলে সদরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে। অনিয়মে দুশ্চিন্তায় শরীর-মন ভেঙ্গে পড়েছে।

সুখদার আর করার কিছুই নাই।

এমনি ভাবে সর্বস্ব চলে যাবে তা কোন দিনই ভাবেনি। এবার চাষের ধানও তেমন পায়নি সুখদা। সংসারের খরচা আছে, তার উপর অসুখের খরচা সুখদার সামনে অতল

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

বসন্তও বুঝেছে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছিল সে। আজ সবই চলে গেছে। আর দেহমনও ভেঙ্গে পড়েছে তার। যেন জীবনের শেষ দিন গোনার জন্যই ফিরে এসেছে তার ভিটেতে। সুখদা তার গহনা যা ছিল তার থেকেই দু-চারগাছা চুড়ি বিক্রি করে রাধু স্যাঁকরার দোকানে। দামও সঠিক জানেনা। রাধু স্যাকরাও এবার তাক বুঝে কোপ মারে।

মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মারতেও যারা দ্বিধা করে না রাধু সেই দলেরই মানুষ। সুখদাও যা টাকা পায় তাই আনে। যে ভাবে হোক মানুষটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু বসন্ত জানে তার শেষদিন ঘনিয়ে আসছে। সে বলে সুখদাকে—আর ভস্মে ঘি ঢেলো না শম্ভুর মা। তোমাদের নিজেদের কথা ভাবো। তোমাদের পথে বসিয়ে গেলাম, ওই জমিও আর ফেরৎ পাবো না, এদিকে সব গেল। এখন তোমাদের কি হবে?

সুখদা বলে—তুমি সেরে ওঠো আবার সব হবে। যা গেছে যাক্ তারজন্য দুঃখ করো না। ম্লান হাসে বসন্ত। ওই মলিন পাণ্ডুর মুখে হাসিটা যেন নীরব কান্না হয়েই ফুটে ওঠে।

সুখাদর সেবা-যত্নের অভাব ছিল না।

স্বামীকে ঘিরে সংসারকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্নই ছিল। কিন্তু বিধি বাম, ক'দিন পর বসন্তের অসুখের বাড়াবাড়ি হলো।

রমন ডাক্তারও অনেক চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু কিছুই করা গেল না। ধ্বংসস্তূপের মত মানুষটাকে আর সুস্থ করতে পারল না সে। সেইদিন রাতেই মারা গেল বসন্ত।

সুখদা অসহায়-কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

জীবন তবুও থেমে থাকে না। একজন চলে গেল সংসার থেকে তবু যারা রইল তাদের বাঁচতে হবে। জীবনযাত্রার গতি অব্যাহতই থাকে।

সুখদা বুঝেছে এবার তার জীবনে আসছে দুঃখের দিন। তবু আশায় বুক বাঁধে সে। শম্ভুকে মানুষ করে তুলবে। একটা ছেলে মানুষ হলে তবু দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে তার।

তাই শম্ভুকে বলে—মন দিয়ে পড়াশোনা কর বাবা।

শম্ভু বাবা মারা যাবার পর কিছুদিন একটু চুপচাপই ছিল। তার মনেও একটা দুঃখ গভীর ভাবেই বেজেছিল। কিন্তু তার স্বভাব ছিল অন্যরকমের। একটা বয়স আসে মানুষের জীবনে তখন সবকিছু আঘাতকে সহজভাবে মেনে নেবার শক্তি তার থাকে।

শম্ভুও সব দুঃখ-কষ্টকে মেনে নিয়ে আবার ছিপ নিয়ে বের হতে শুরু করলো। এ-গ্রাম সে-গ্রামের পুকুরে গিয়ে ছিপ ফেলে কখনও অনুমতি নিয়ে, কখন লুকিয়ে-ছাপিয়ে।

এই নিয়ে গোলমালও হয়।

সুখদা ক্রমশ বদলাচ্ছে। জীবন সংগ্রামের কঠিন রূপটাকে এতদিন ঠিক সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেনি সে। বসন্ত নিজের চেষ্টাতে কিছু রোজকার করতো, সংসারের আয়পয়ও কিছু ছিল।

সবমিলিয়ে তাদের দিন মোটামুটি চলে যেতো।

কিন্তু ক্রমশ দেখেছে সংসারের কঠিন কঠোর রূপটাকে। আর ঈশ্বর নামক অদৃশ্য কোন শক্তির বিরুদ্ধেও তার মনে একটা কঠিন প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই জ্বালাটা তার দৈনন্দিন জীবনেও ক্রমশ ফুটে উঠছে।

স্নেহ-ভালোবাসার কমনীয়তা অভাবের কাঠিন্যে কঠিন হয়ে ওঠে। শম্ভু এবারও ফেল করেছে স্কুলে।

পড়াশোনা করে না সে। কিন্তু সুখদার আশা অনেক। তাই ছেলে ফেল করতে এবার সুখদাও তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তার অন্তরের সব জ্বালার উত্তাপে কণ্ঠস্বরের কমনীয়তা হারিয়ে যায়। কঠিন স্বরে বলে সে ছেলেকে—একজন কথা না শুনে অকালে গেল। জীবন-ভোর জ্বালিয়ে গেল, এবার তুইও জ্বালাবি আমাকে? যেমন বেয়াড়া বাপ আর তেমনি বাঁদর ছেলে!

শম্ভু চুপ করেই থাকে। সুখদার গলাও সপ্তমে চড়তে থাকে। অসহায় রাগে অন্ধ সে বলে, আমাকে এবার মুক্তি দে। আমি আর পারছিনা। দূর হ তুই আমার সামনে থেকে।

শম্ভুও মায়ের কথায় বলে—তাই দোব। দূরেই যাবো। এত দূরে যাবো যে সেখানে আর ধরতে পারবে না আমাকে।

সুখদাও কঠিন স্বরে বলে—তাই যা। আমার হাড় জুড়ায়।

মা ছেলেতে ঝগড়া এমন প্রায়ই হয়। মা চায় ছেলেটা মানুষ হোক, কিছু একটা করে তো বাঁচতে হবে। বাবা সর্বস্ব ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সরেশ জমি গুলো এখন কমল দাসের দখলে। সেও বুঝেছে মায় সুদ টাকা দিয়ে এসব জমি আর কোন কালেই ছাড়াতে পারবে না সুখদা ঠাকরুন।

শম্ভুকে তবু মানুষ করতে চায় সুখদা।

কিন্তু ছেলে চলে নিজের পথে। কোন কথাই শোনেনা। সুখদার গলাও ক্রমশ উদারা, মুদারা থেকে তারায় ওঠে। জীবনের উপর সংসারের উপর ছেলের উপর তার বিরক্তি এবার সোচ্চার হয়ে ওঠে।

শম্ভু নিজের পথেই চলে। ওর সহচর নিতে খবর এনেছে পীরপুকুরে নাকি বেশ ভালো মাছ খাচ্ছে। এক একটা তিন-চার সের করে রুই মাছ।

শম্ভু বলে, তাহলে একদিন চল। নিতে বলে—বোলতার টোপ জোগাড় করি

তারপর জানাবো। আর তুই বাউরিপাড়া থেকে মেহুয়া কিছু জোগাড় কর। মেহুয়া চার দিলে খোসবুতে মৌ মৌ করবে, চারদিক থেকে মাছও জমবে চারে।

মেহুয়া বলতে ধেনো মদের পচা পুরু তলানি। বাউরী পাড়ার অনেকেই বাড়িতে ধেনো মদ তৈরি করে।

ওই দ্রব্য শম্ভু ওদের কাছ থেকেই পায়। বিনিময়ে মাছের কিছু অংশ দিতে হয়। শম্ভু ওসব বিষয়ে উদার। মাছের অংশ সে ঠিকই দেয।

তাই গৌর বাউরীর ঘরে রাখলেই মদের মেহুয়া করা ঠিক পৌঁছে দেয় ঘরে।

সুখদা গলা তুলে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে গর্জন করে।

—ওইসব ছাইপাঁশ ঘরে ঢোকাবিনা। যত্তো সব নোংরা জিনিষ। শম্ভুও তা জানে। তাই বলে—বাড়িতে তো আনিনি। গোয়ালের বাইরে রেখেছি। গোয়ালে গরু-বলদ আর নাই। সুখদার সামনে সেই প্রাচুর্যের দিনগুলো ফুটে ওঠে। আজ সব গেছে। শূন্য গোয়াল ঘরটা টিকে আছে কোনমতে। ক্রমশ ধ্বসে পড়বে এইবার ছাউনির অভাবে।

দেখারও কেউ নাই। জমির খড়ও তত নেই যে ঘরটা ছেয়ে বজায় রাখবে। শম্ভুর ও কোনদিকে নজর নাই।

এখনও সকালে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। হারুর শেখানো সেই গানখানাই গায় বিকটস্বরে —আশার তরীখানি হয়ে গেল খান খান
নীরবে কেটে গেল সারাটি দিন মান—

সুখদা ঠাকরুন গলা পঞ্চমে তুলে চীৎকার করে। —এখনও গানের সখ হয় মুখগোড়ার? একজন ওই গান করতে গে সর্বস্ব খোয়লো। নিজের জীবনটাই বরবাদ করে সংসারকে ভাসিয়ে দে গেল। তুই মুখপোড়া আবার গান নিয়ে পড়েছিস? মরণ নাই!

শম্ভু হাসে, বলে—গান-এর সাধনা মস্ত সাধনা।

—ঝ্যাটা মারি এমন সাধনার মুখে আর তুর মুখে। ওঠ, দোকান থেকে নুন তেল আন, নালে পিণ্ডির যোগাড় হবে কি করে?

শম্ভু বলে সহজভাবেই

—ওসব তুমিই করো। আমার সময় নাই

সুখদা ঠাকরুনের মেজাজ সপ্তমে ওঠে। তার গলার স্বর তখন পাড়া মাৎ করেছে। শম্ভু অবশ্য মাকে চেনে। সে নির্বিকারই।

দুপুর থেকে মাছ ধরার তোড়জোর শুরু হয়। নিতে এর মধ্যে চাটুয্যেদের পুকুর পাড়ের বিশাল তেঁতুলগাছের মগডালে উঠে সেখান থেকে বেশ কিছু বোলতার চাক ভেঙ্গে চাক ভর্তি বোলতার ডিম এনেছে। অবশ্য এই আপকর্মের জন্য বেশ

কিছু বোলতার কামড় খেয়ে ওর মুখ-চোখের আকার-প্রকারও বদলে গেছে। তবু বিজয়ীর মত বলে নেত্য।

—এনেছি শম্ভু, দ্যাখ কত বোলতার ডিম। শম্ভুও খুশি হয়। সাকরেদের দেখে বলে সে—না। তোর হবে নেত্য। শোন, কিছু মাল রেখে দে, কাল পরশু দুদিন সয়রামপুরের হালদার পুকুরে বসতে হবে। নিত্য বলে—ঠ্যাটা লোক রতনবাবু। হাসে শম্ভু। বলে সে বিজ্ঞের মত

—শম্ভুও কম নয়, ওর ব্যাটাকে হাত করেছি। মাছ পেলে একটা দিতে হবে। নিতে বলে, তাতেও লুকসান নাইগ! জলে-মাছে সমান ওই পুকুরে প্রথমে যা ধরবে নে এসে নীচে ধানক্ষেতের পাঁকে পুঁতে দোব। পরে ওরা এলে যা মাছ পাও তার থেকে দোব।

শম্ভুও খুশি হয় সাগরেদের বুদ্ধির ধার দেখে। বলে—তাই হবে। কথাটা মন্দ বলিসনি। এখন আজ চল দেখি পীরবাবার পুকুরে কি মেলে।

দুপুরে ছিপ চারপত্র নিয়ে দুই মূর্তি বের হয়ে যায়। সুখদা ঠাকরনে বলে—ওই নেশাতেই শেষ হবি, পড়াশোনাও করলিনা। শম্ভু বিজ্ঞের মত মাকে জ্ঞান দেয়।

—বুজলে মা, লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে”

তুমি বেশ করে কালিয়ার মশলা বানাও, একটা সের পাঁচেক রুই মাছই নে আসছি।

নিত্যও সায় দেয়—ছিঃ গ! ইয়া ইয়া মাছ।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

বর্ষার শেষ। তখনও আকাশে জলভরা কালো মেঘের আনাগোনা থামেনি তবু বর্ষার সেই ধমক আর নেই। মাঝে মাঝে রোদের আভাসও ওঠে। বৃষ্টিধোয়া আকাশ। ঝকঝকে গাছের পাতায় সেই রোদের ঝলক। দিগন্তপ্রসারী সবুজ ধানের ক্ষেত কাছিমের পিঠের মত নীচুর দিক থেকে উপরে উঠেছে।

আজ মাছ ভালোই ধরেছে। কেজি চারেকের একটা রুই শম্ভু ধরেছে। নিত্য বলে—ভালো মাছ গো। পাকা রুই। এবার চল। ঢের পথ, ধানমাঠ ভেঙ্গে যেতে হবে। সাঁঝ নামার আগেই গাঁয়ে পৌঁছতে হবে। শম্ভুর তখনও নেশা ধরেছে। চারে বুজকুড়ি দেখে বলে শম্ভু—আর দুটোপ দেখিরে। চারে বড় মাছ ফুট কাটছে। নেত্য বলে —চলো। বেলা পড়ে গেছে ধানমাঠে যেতে অসুবিধা হবে। দিনকাল ভালো না।

শেষ অবধি ছিপ গুটিয়ে উঠল শম্ভু।

চার ছেড়ে এসময় উঠতে হলো তোর জন্যে। চারে মাছ এসেছে আর তুই তুললি। হালদার পুকুরে তাড়া দিলে নে যাবো না।

নেত্য বলে—ওখানে তো শুকনো ডাঙ্গা দে পথ। ওখানে সাঁঝ হলেও আসার

অসুবিধা হবে না। ই শ্যালো ভর্তি বরসা, ধানমাঠ. বিপদ তো এদিকেই।

ওরা ফিরছে। কেঁদবেদের যোড় পার হতেই সূর্য অস্ত গেল। ওদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। গাছ-গাছালি বাগানের আমগাছগুলো, বেনেদের দোতলা বাড়িও দেখা যায়।

ওরা খুশি মনে আলধরে ফিরছে। দুদিকে ধানক্ষেতে সবুজ ধানের গোছ পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে। বাতাসে মাথা নাড়ে কি পূর্ণতার আশা আনন্দ নিয়ে। বাতাসে ভিজে মিষ্টি সুবাস জাগে, মাটির বুকে সুপ্ত আনন্দের প্রকাশ। প্রকৃতির বুকে সবুজ মখমলের মত জমি গুলোন।

ওরা ফিরছে। নেত্যের বগলে ছাতা আর গামছা জড়ানো মাছটা। কোনমতে নেত্য টাল সামলে চলেছে। বলে সে—সাঁঝ হয়ে এল, পা চালিয়ে মাঠটা পার হও গো। শম্ভুর হাতে ছিপ। সে খুশিতে গান ধরেছে—সেই গানখানাতেই একটু কেলোয়াতি টান দিয়ে ফাঁকা মাঠে বেশ গলা খুলে গাইছে।

—এখনও নদীতীরে রয়েছে তরীখান—

তারপর একটা বিকট ফোঁস শব্দ শুনে সামনে চেয়েই লাফ দিয়ে ওঠে। নেত্য পেছনে, সে এই ভয়ই করেছিল।

পড়ন্ত বেলায় ধানমাঠের শামুখ-গেঁড়ি খেতে আলের ভিতর থেকে আলকেউটে, কালো খরিস সাপ বের হয়। ওদের একটা জাত শামুক ভেঙ্গে খায় তাই তাদের বলা হয় শামুকভাঙ্গা। যেমনি হিংস্র আর তেজী আর তেমনি বিষাক্ত তারা।

এসময় মাঠে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বিষাক্ত আলকেউটের কামড়ে চাষীদের অনেকেই মরে। ওদের বিষও ভীষণ তীব্র।

শম্ভু লাফ দেবার আগেই সাপটা বিদ্যুৎ গতিতে তার পায়েই ছোবল মেরেছে। শম্ভু ছিপটা ধরে সজোরে এক ঘা মেরেছে সাপটাকে। সাপটা আঘাত খেয়েও ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে শনশন শব্দ তুলে কোথায় হারিয়ে যায়।

শম্ভু বসে পড়ে আলের মাথায়। নেত্যও দৌড়ে আসে। দেখে ডান পায়ের গোড়ালির উপর ছোবল মেরেছে। দাঁতের গভীর ক্ষতের দাগ। ক্ষীণ রক্তের ধারা নেমেছে।

গামছাটা দিয়ে হাটুর নীচে জোরে বাঁধন দিয়ে সে ওদিকের জমিতে দু-চার জনকে ডেকে হাঁক পাড়ে।

—দৌড়ে আয়রে। ঠাকুরকে সাপে কেটেছে।

যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বিষের জ্বালা কম নয়। শম্ভুর মুখ ভীত, বিবর্ণ। —কি হবে নেত্য।

ততক্ষণে দু-চারজন এসে পড়েছে। ওরাই শম্ভুকে তুলে নিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়লো। ওদের একজন ছুটলো দৈগায়ের ভজন ওঝাকে ডাকতে। ভজন মাঝি

ওঝাগিরি করে।

গ্রামের লোক অনেকেই এসে পড়েছে সুখদা ঠাকরুনের উঠানে। সুখদা ঠাকুর কপাল চাপড়াচ্ছে।

—আমার একি সব্বোনাশ করলা ঠাকুর। সব কেড়ে নিয়েছো কিছু বলিনি। অন্ধের ওই নড়িটুকুকে কেড়ে নিওনা।

মাথা ঠুকছে সে। গ্রামের অন্য বৌ-গিন্নিরা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। গোবিন্দ ঘোষও এসে হাজির হয়েছে।

ঘোষ গিন্নী বলে—শান্ত হও দিদি, এসময় ধৈর্য হারালে চলবেনা। ওঝা তো এসেছে। ঝাড়ফুকও করছে। দেখবে মা-মনসার দয়ায় শম্ভু ঠিক সেরে উঠবে।

ভজন ওঝাও খবর পেয়েই এসেছে। গ্রামে সর্পাঘাতের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। জগন্নাথপুরে সরকারি ডাক্তারখানা আছে তা নামেই। ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকেনা। তবে বেশির ভাগ সময় ডাক্তারও থাকেনা। ওষুধ তো থাকেই না।

গ্রামে-ঘরে সর্পাঘাত এসময় হয়ই। তাদের ভরসাও ঝাড়ফুক আর জরিবুটি। ভজন ওই সব করে। সর্পাঘাতের ওঝার প্রতি গুরুর নির্দেশ থাকে কোন রোগীর কাছ থেকে কোন পয়সা কড়ি নেবেনা। আর সর্পাঘাতের খবর সারারাতে দুর্যোগের মধ্যেও আসে তখনই যেতে হবে। নিজের কথা নয়—ভাবতে হবে রোগীর কথা।

ভজনও খবর পেয়েই ছুটে এসেছে জরিবুটির থলি নিয়ে। ঝাড়ফুঁক চলেছে। জরিবুটিও খাইয়েছে। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। ক্রমশ জ্বালাও বাড়ছে।

আর মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছে। কণ্ঠস্বরও বুজে আসছে। সুখদা ঠাকরুন দেখছে চোখের সামনে তরতাজা ছেলেটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে তীব্র বিষক্রিয়ায়।

কিছু করার নাই। নিষ্ঠুর বিধাতা তার জন্যে এই শাস্তিবিধানই নির্ধারিত করে রেখেছে।

রাত হয়ে আসছে। ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসে শম্ভুর হৃদস্পন্দন। ভজন ওঝা বলে —লারলাম গো ঘোষ মশায়, গুরুর কৃপা পেলাম নাই গ।

সুখদা ঠাকরুন আর্তনাদ করে ওঠে—শম্ভুরে, তুইও চলে গেলি আমাকে ফেলে।

তার অসহায় আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধ আকাশে ধ্বনিত হয়। বাঁশবনে হাওয়া কাঁপে, মেঘমুক্ত আকাশে দু-চারটি তারা উঁকি দেয়। নীরব নিশীথ রাতে কোন দিগন্তে উধাও হয়ে গেল দামাল সেই ছেলেটা। নেত্যর চোখে জল নামে। তার প্রিয়জন আজ হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

সুখদা ঠাকরুন সেই চরম বিপর্যয়ের দিনগুলোকে ভোলেনি। আজও তার মনে

পড়ে সেইসব ঘটনা। চোখের সামনে ফুটে ওঠে স্বামী, হারানো শম্ভুর মুখ, বুকের ভিতরটায় জ্বালা পোড়ার যন্ত্রণা।

আজ সে নিঃসঙ্গ, একা।

কোন অদৃশ্য ভগমান, এমনকি সমাজ, মানুষদের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ তাই কারণ-অকারণে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ওর প্রতিবেশী নরেশ মুখুয্যে লোকটার অবস্থা আরও শোচনীয়। জমি-জায়গা যা আছে তা সামান্যই গ্রামে, আশেপাশের গ্রামে কয়েকঘর যজমানদের ধরে পুজো, অন্নপ্রাশন কখনও বিয়ে শ্রাদ্ধ এসব করে কিছু আমদানী হয়, তারও স্থিরতা নাই। তাই বাঁধা রোজগারও নেই তার।

ছেলেমেয়েও দু-তিনটে। তার মধ্যে বাসন্তীই বড়।

মেয়েটা সুখদা ঠাকরুনের খুবই প্রিয়।

অনেকেই সুখদা ঠাকরুনকে এড়িয়ে চলে, কারণ দুনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওই ঠাকরুনের। ছুতোয়-নাতায় সুখদার গলায় সপ্তসুর বেজে ওঠে। আর যতদিন যাচ্ছে যত শীর্ণ হচ্ছে ঠাকরুন তার গলার স্বরও তত চড়ছে।

একখান কথা সে কতখান করে অলংকার ছন্দ প্রয়োগ করে ঝগড়া সুরু করে। তাই সকলেই ওকে এড়িয়ে যায়।

পুকুরঘাটে স্নান করতে গেছে। বয়সের সঙ্গে শুচিবাঈ স্বভাবটাও বেড়েছে বুড়ির। ডুব দিয়ে শেষ হয় না। বেশ কয়েকবার ডুব দিয়ে বুড়ি পবিত্র হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বামুনপাড়া ঘোষপাড়ার দুচারটে ছেলে কমল দাসের কোন ভাইপো পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়েছে সাঁতার কাটার জন্য তাদের জলের ছিটে সুখদার গায়ে লেগেছে কিনা — ব্যস শুরু হয়ে গেল তার বাক্যবাণ।

—মরাবি রে, ওলাওঠায় যাবি। কাঁচা বাঁশে যাবি। ধড়ফড়িয়ে যাবি।

ওই ছেলেদের মা-কাকীমারা ঘাটে এয়েছে। তাদের কেউ বলে

—খুড়িমা ছেলেমানুষ করে ফেলেছে একটা কাজ। ওইভাবে গালাগাল দেবেন?

ব্যস আগুনে ঘি পড়ে। সুখদা গলা সপ্তমে তুলে এবার ঘাট মাৎ করে —ওগো তুমি কোথায় গেলেগো, ওরে শম্ভু দেখে যা তোর মায়ের কি হেনস্থা করছে সবাই। মুখপোড়া ভগমান কি চোখে কানা হয়েছো?

বুড়ি লাফ দিয়ে বাক্যবাণ প্রয়োগ করে।

এসময় বাসন্তীও ঘাটে এসেছে। সেইই এগিয়ে যায়।

—কি করছ খুড়ি! এবার চান করে ঘরে যাও—এত চেল্লাচেল্লি কেন? চুপ করো। ওর গায়ে হাত দিতে সুখদা ঠাকরুন শান্ত হয়। ওর দিকে চেয়ে বলে—তুই বলছিস।

ওই স্পর্শটুকু যেন বুড়িকে কোন হারানো অনুভূতির স্বাদ এনে দেয়। বাসন্তীই

বুড়িকে স্নান করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে ফেরে।

সুখদার বাকী জমিজমা বাড়ির লাগোয়া বাগান এসবের দেখা শোনা করে এখন নেত্যই। নেত্য বুড়িকে সেই শম্ভু মারা যাবার পর থেকে আর ছেড়ে যেতে পারেনি।

নিজের জমিজায়গা তার কিছু আছে। মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন চাষীই। নিজেও খাটে। নেত্যই বলে

—খুড়িমা, শম্ভুদা নাই। আমিতো আছি। আমিও তোমার একটা ছেলে। আমার যদি দুমুঠো জোটে—তোমারও জুটবে। সুখদা বলে—জমি-জারাতের কি হবে? অবলা বিধবা, খাবো কি? পাঁচবিঘে তো গেল কমলের গব্বে! বাকী যা আছে, নেত্য বলে—ওসব আমিই ভাগে করবো। তোমার ধান আলাদা করে তোমার খামারে তুলে দেব। একা মানুষ তোমার দিন ঠিকই চলে যাবে।

সুখদার বাড়ির লাগোয়া বিঘেদুয়েক খামার মত। সেখানে সুখদা নেত্যকে দিয়ে বেড়া দিয়ে আনাজপত্রের চাষ করে। ওদিকে দুটো পেয়ারা গাছ, বাতাবী লেবু, কুলগাছও আছে। দুটো আমগাছেও অজস্র আম ফলে।

সুখদা এখন ওইসব নিয়েই থাকে।

দেখেছে নরেশের মেয়েকে। মেয়েটা সুখদার কাছেই বেশির ভাগ সময় থাকে। বাড়িতে ওদের অভাবের জ্বালা। বাসন্তী দেখেছে দারিদ্র কত নির্মম হতে পারে।

কোনদিন শাকপাতার সঙ্গে কিছু যজমানদের বাড়িতে পাওয়া বোগড়া আতপ চাল সেদ্ধ করেই খেতে হয়। পরণে ঠিক মত কাপড়ও জোটেনা। নরেশ পুজোয় অন্য কাজ করে ক্যাটকেটে লাল পাড় মোটা শাড়ি যা পায় তাই ভাগাভাগি করে পরে মা-মেয়েতে।

এমনি কিন্তু এত অভাবের মাঝে অদৃশ্য দেবতা বাসন্তীর দেহে রূপ-যৌবন দিতে কার্পণ্য করেনি। সেটা যেন উজাড় করে দিয়েছে। ওই লাল শাড়িতেই বাসন্তীকে যেন বনদেবীর মতই মনে হয়।

তাই নজরে পড়েছিল সে গোবিন্দ ঘোষের ছেলে বরুণের। বরুণ গ্রামে বিশেষ থাকেনা। গোবিন্দ ঘোষের অবস্থা বেশ ভালোই। জমিজারাত সাজা-খাজনা আদায় ভালোই আছে। পুকুরের মাছ বিক্রি করেও মন্দ আয় হয়না।

ছেলেকে বাইরের স্কুল বোর্ডিংএ রেখে ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে কলেজেই পড়িয়েছে। সহরে বোর্ডিংএ থাকে বরুণ। মাঝে-মাঝে বাড়িতে আসে। এই সময়ই দেখেছিল সে বাসন্তীকে।

বরুণ সেদিন সুখদা ঠাকরুনের বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, পথটা এখানে নির্জন। কয়েকটা গাছগাছালির জন্য জায়গাটা ছায়ান্ধকার। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। বাতাবী ফুলের সুবাসে জায়গাটা মৌ-মৌ করছে। সবুজের মাঝে হঠাৎ দেখেছিল বাসন্তীকে

বরুণ!

বাসন্তী গাছ কোমর করে করমচা গাছের লাল ফলগুলো পাড়ছে। সুখদা ঠাকরুনের গাছে হাত দেবার উপায় কারও নাই। বুড়িকে সকলে মায় পাড়ার কুদো-চৈতন্য, কানাই-এর দলও সমীহ করে। ওর বাক্যবাণকে এড়াবার জন্যই ছেলেগুলো পরাতপক্ষে এদিকে মাড়ায় না।

যদিও বা গাছভর্তি পেয়ারা, কুলের লোভ সামলাতে পারেনা। কিছু সংগ্রহ করতে বাগানে ঢোকে সন্তর্পণে, তবু প্রায়শই ধরা পড়ে যায়। গালাগাল-এর বৃষ্টি নামে। ছেলেরাও পালায়।

ওই বাগানে বাসন্তীরই অবাধ অধিকার। মেয়েটাকে নিয়ে অতীতে সুখদাও হয়তো কোন সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিল। শম্ভুর সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই মিশছে বাসন্তী। পালটি ঘর।

বুড়ির ইচ্ছা ছিল বাসন্তীকেই ঘরে আনবে। মেয়েটা লক্ষ্মী। লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে হলেও মেয়েটার লক্ষ্মীশ্রী আছে। দয়ামায়া আছে।

সেই স্বপ্ন সত্যি হয়নি।

তবু বুড়ি ওই বাসন্তীকেই যেন একমাত্র অবলম্বন বলেই মনে করে। সেবাযত্ন করে বাসন্তী ওই নিঃসঙ্গ বুড়ির। সুখদা ঠাকরুন বলে—আরজন্মে তুই আমার মা ছিলিরে। বাসন্তী ওসব কথা গায়ে মাখে না।

হঠাৎ সেদিন বৈকালে বরুণ ওকে দেখে অবাক হয়।

—বাসন্তী না?

বাসন্তীও দেখছে বরুণকে। কোঁচড়ে দুটো পেয়ারা ছিল বাসন্তীর। তার একটা সহজভাবেই বরুণের হাতে দিয়ে বলে—চিনতে পেরেছো তাহলে? তুমি তো এখন মস্ত লোক গো!

—কেন?

বাসন্তী বলে—কলেজে পাশ দিয়েছো!

হাসে বরুণ—ওতো সবাই দেয়। এখন বেকার। বাবা বলে ব্যবসাপত্র দ্যাখ। ওই ধান-চাল-গুড়ের আড়তের হিসাব রাখা আমার দ্বারা হবেনা। কে থাকবে এই অজ পাড়াগাঁয়ে?

বাসন্তী বলে—তা সত্যি। এখানে পড়ে থাকবো আমরাই। যাদের যাবার আর কোনো চুলে নাই।

বরুণ বলে—না, না। তোমারও দেখবে এই গাঁয়ে থাকতে হবেনা।

—কেন? অবাক হয় বাসন্তী।

বরুণ দেখছে বাসন্তীকে। পড়ন্ত বেলায় এই নির্জন সবুজে ওর স্নিগ্ধরূপ-লাবণ্য

তার মনে ঝড় তুলেছে। সদ্যজাগর যৌবনের মত্ততা ওর চোখে। বলে বরুণ —তোমার জন্য দেখবে অনেকেই আসবে।

—কেন? বাসন্তী জানেনা তার নিজের ঐশ্বর্যের খবর। বরুণ বলে—পদ্মফুল ফুটলে আপনা থেকেই অনেক ভ্রমর আসে। দেখবে তোমার সন্ধানেও অনেকে আসবে। জীবনে অনেক কিছুই পাবার যোগ্যতা তোমার আছে বাসন্তী।

চলে যায় বরুণ। বাসন্তী তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন তার নবপরিচয়ের উন্মেষ। বরুণের চোখে এই নীরব নির্জন অপরাহ্ণে সে যেন নিজেরই এক সদ্যজাগর নতুন সত্তাকে আবিষ্কার করেছে, যে ছিল এতদিন বাসন্তীর কাছে অজানা অচেনা।

বাতাবীফুলের সৌরভ আজ বাসন্তীর মনে এক নতুন সাড়া এনছে। সুখদা ঠাকরুণের গলা শোনা যায়।

—কোথায় গেলি মা অ মুখপুড়ি। একটুন দোক্তা দিতে বললাম তা কথা কানেই গেল না।

বুড়ির ওই একটা নেশা। দোক্তা চাই। তাও আবার যে সে দোক্তা হলে মুখে রুচবেনা। দাসদের দোকান থেকে বাঁড়োর লগেন দত্তের বসরাই গোলার দোক্তা চাই।

বাসন্তীর খেয়াল হয়। বলে সে গলা তুলে

—যাই গো, কলুঙ্গীতে দোক্তা রেখেছি, নাও।

বুড়ির নজর সবদিকে। মেয়েটাকে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ঢুকতে দেখে চাইল

—কিলা, হঠাৎ খুশির মটক! কি হলো?

সহজভাবে বলে বাসন্তী—কি আবার হবে!

বাসন্তীর মনে কি সুর বাজে। শূন্য আশাহত জীবন তার কোথাও কোন পাওয়া আসা নাই। অবাব অভিযোগ সয়ে সয়ে ভাগ্যের কাছে কোন নালিশ জানাতেও ভুলে গেছে মেয়েটা।

হঠাৎ এমনি দিনে বরুণ এলো তার জীবনে।

বরুণ এখন বাড়িতেই রয়েছে।

গোবিন্দ ঘোষও খুশি হয়। তার পঞ্চায়েতের কাজকর্মে লেখাপড়ায় বরুণ অনেক সাহায্য করে। আর ব্যবসার ব্যাপারটাও দেখছে সে।

গোবিন্দ ঘোষ বলে

—বরুণ, বাইরে চাকরি করে কত টাকা মাইনে পাবি? তার অনেক বেশি পাবি এই এস্টেট থেকেই। তোর বড়দা তো কলকাতাতেই রইল চাকরি নিয়ে। গ্রামের পরিবেশ বাবুর, বৌমার বিশেষ করে ভালো লাগেনা। তুই ই এসবের ভার নে। ঠাটে-বাটে থাকবি। ব্যবসা পত্র-জমি জায়গা দ্যাখ আর পাবলিকের সেবা কর। পঞ্চায়েতের

মেম্বারই করে দোব তোকে। তারপর দু-চার বছর পর আমি এসব ছেড়ে দোব। তুই হবি পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট।

বরুণ বাবার প্রলোভনে কান দেয়না।

এর মধ্যে সে বাসন্তীর সঙ্গে দেখাও করে। সহরে বাড়ি আছে ওদের, বড় দোতলা বাড়ি, গোবিন্দ ঘোষ নীচের তলাটা ভাড়া দিয়েছে, উপরের খানিকটাও।

আর একটা অংশে গোটা তিনেক ঘর, বাথরুম রান্নাঘর নিজেদের ব্যবহারের জন্য খালিই রেখেছে। সহরে গেলে বরুণ ওই বাড়িতেই ওঠে।

কলেজের বন্ধুবান্ধবরা কিছু আছে সহরে। তাদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বরুণ স্বপ্ন দেখে সহরেই আসবে। কিন্তু পারে না।

বারবার বাসন্তীর কথাই মনে পড়ে।

বাসন্তীও বরুণকে এড়াতে পারেনা। বৈকালেওই নির্জন বাগানের পথে সে আসবেই। বাসন্তীও ভাবে যাবেনা সে। কিন্তু পারেনা। কি যেন দুর্নিবার আকর্ষণে সেও আসে।

বরুণ বলে, কখন থেকে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। বাসন্তী বলে—এসোনা আর। কেউ যদি দেখে ফেলে। বরুণ এখন নিজেই ভালো রোজকার করছে। দেখেছে বাবাও খুশি। আরও অবাক হয় বরুণ সেদিন দু-চারজন ভদ্রলোককে তাদের বাড়িতে আসতে দেখে। বেশ একজোড়া উত্তরী বলদের গাড়ি। বলদদুটো দেখেই মালিকের স্বচ্ছল সুখী অবস্থার কথা মনে পড়ে। বরুণ দেখে বাবা সাদরে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসালেন ওদের।

বসার ঘরটা ইদানীং বরুণের রুচিমতই সাজানো হয়েছে। সহর থেকে সাজাবার জিনিষ কিনে এনেছে বরুণ, এখানের নকড়ি মিস্ত্রীকে দিয়ে বাগানের একটা পুরোনো শিশু গাছকে কেটে সুন্দর আলমারী বানিয়েছে। কাচের পাল্লা—ওতে বরুণ বেশ কিছু বই রেখেছে।

দেওয়ালে দু-চারটে ল্যাণ্ডস্কেপ-এর ছবি। ওদিকে ফুলদানীতে বাগানের কিছু ফুলও রাখে। আজ ঘরটাকে বিশেষভাবে ঝাড়পোঁছও করানো হয়েছে।

বাড়িতে যেন যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার চলছে। পুকুরের মাছও ধরা হয়েছে। মা কাজের মেয়ে, বাড়ির রান্নার বামুন মাসীকে নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির সরকার মশাইকে বোলতোড়ে পাঠিয়ে উৎকৃষ্ট সন্দেশ বোলতোড়ের অভারী মেচা সন্দেশ আরও দু-তিন পদের সন্দেশ দই এসব আনানো হয়েছে।

মাই বলে—আজ বাড়িতে থাকবি বরুণ। আড়তে আর যেতে হবে না।

সেকি মা। জরুরি কাজ আছে। বরুণ বলে

বাবাই বলেন—ওসব সরকার মশাইকে বলা আছে। সেই সামাল দেবে। তুমি

আজ বের হবেনা। ওরা এসেছেন।

পরে মায়ের কাছেই জানতে পারে বরুণ ওদের পরিচয় আর ওদের এখানে আসার কারণটা।

মা বলে—তোকে বিয়ে-থা করতে হবে বাবা। বড় বৌমা তো এখানে আসবে না। ঘরসংসার কে সামলাবে? আমারও বয়স হচ্ছে। বাতের ব্যাধি, তাই ভাবছি এবার ঘরে বৌমাই আনবো। ওরা এসেছেন বড়জোড়া থেকে। ওখানের জমিদার।

বরুণ বলে—বলা নাই কওয়া নাই ওদের আসতে বল্লে? আমাকে জানাবে তো?

মা অবাক হয়।

তোকে আবার জানাবার কি আছে?

বরুণ বুঝেছে এরা তার কোন কথার দামই দেবেনা। বাবার সামন্ততান্ত্রিক স্বর ফুটে ওঠে তার কথায়।

—তোমাকে জানাতে হবে কেন? আমার মতামতের কি দাম নেই?

বরুণ বলে—দিন বদলেছে বাবা। বিয়ে করার প্রস্তুতি চাই। কাযকর্ম করি। তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।

বাব জানান—ওসব আমাকেই ভাবতে দাও। ওরা এসেছেন। আমার মানসম্মানের ব্যাপার। আশাকরি এনিয়ে কোন তিক্ততার সৃষ্টি করবেনা। আমার কথামতই চলবে তুমি।

বরুণ চুপ করে যায়! বেশ বুঝেছে সে বাবার কথার প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি জটিলতরই হয়ে উঠবে। তাই চুপ করেই যায় সে।

বরুণ শুনেছে বাবার সঙ্গে ওই ভদ্রলোকদের কথা। তারা বরপণ, অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে বাজারে মাছের দরাদরির মত কথা বলছে। গোবিন্দবাবু ছেলের গুণপনা—তার রূপ ইত্যাদি নিয়ে প্রশস্তি রচনা করে তার বাজারদর বাড়াবার চেষ্টা করে চলেছে।

হাটে যেন সওদায় পরিণত করে তুলেছে তাকে। বরুণ এটাকে মেনে নিতে পারেনা। তার রুচিতে বাধে। মা একটা ফটোও দেখিয়েছে সেই হবু পাত্রীর। বরুণের আদৌ পছন্দ হয়নি। বেঢপ মোটা—একরাশ গহনা পরে যেন আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। কপালটা ঢিবিরমত উঁচু আর সামনের দাঁতগুলো বের হয়ে আছে। কুরূপাই, বাবার টাকার জোরে বিকিয়ে যাবে। আর বরুণকে মুখ বুজে সব মেনে নিয়ে ওকেই স্বীকার করতে হবে।

বরুণ এটাকে মেনে নিতে পারেনা। বাসন্তীর কথা মনে পড়ে। ফর্সা সুন্দর। ডাগর কালো চোখদুটোয় কি গহন প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছে সে;

গরীবের ঘরের মেয়ে কোন দাবীও নাই তার।

জীবনে পায়নি কিছুই, তাই প্রত্যাশাও নাই। অল্পেই তৃপ্ত। সেই তৃপ্তির স্পর্শে

সকলকে তৃপ্ত করতে পারে বাসন্তী।

বরুণ সহরে তার বন্ধুদেরও কথাটা জানিয়ছে। তাদের মধ্যে অশোক বড়লোকের ছেলে। এখন সেই সহর থেকে একটু দূরে নিজেই একটা মিনি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী বানিয়ে ভালোই ব্যবসা করছে। অশোকই বলে—তাহলে বিয়ে-থা করে চলে আয় এখানেই। আমার কারখানায় ম্যানেজারী কর। ছোট্ট বাংলোও রয়েছে। সাহসী হ, নাহলে জীবনের পদে পদেই ঠকবি।

গোবিন্দবাবু ওই ভদ্রলোকদের সঙ্গে দরদস্তুরও প্রায় পাকা করে ফেলেছে। একদিন মেয়েকে দেখতে যাবার দিনও স্থির করেছে।

বাসন্তীও সব খবরই পায়। গ্রামের সকলেই সকলের খবর জানতে পারে। ক্রমশ কথাটা চাউর হয়ে যায়।

বরুণের বিয়ের কথা পাকা হচ্ছে।

বাসন্তীর মনে হয় তার পাবার কিছুই নাই। মিশেছে সে বরুণের সঙ্গে।

কত অপরাহ্নে বরুণ আসতো বাগানে।

বরুণই বলতো তুমি অমত করোনা বাসন্তী। আমি সব জেনেও তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

চমকে ওঠে বাসন্তী—তা কি করে হয়? তোমরা বড়লোক আমরা গরীব। আর তুমি কায়স্থ আমরা ব্রাহ্মণ।

বরুণ বলে—এখন আর ওসব কেউ মানেনা। শহরে কত এমন বিয়ে হচ্ছে।

বলে বাসন্তী—সহরের কথা ছাড়ো। পাড়াগাঁয়ে এসব এখনও মেনে নেবেনা। তোমার বাবা এসব কথা জানতে পারলে বিপদ হবে আমাদেরই। বরুণ বলে—আমি থাকতে তোমাদের কোন বিপদই হতে দেবনা বাসন্তী। কোন ভয় নাই।

বাসন্তীও ওই বলিষ্ঠ বরুণটিকে বিশ্বাস করে। মনে হয় ওকে নির্ভর করে জীবনের কঠিন পথে পা বাড়ালে সে ঠকবে না।

সেদিন বরুণ চলে যাচ্ছে। বাসন্তী দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সুখদা ঠাকরুনের কথায় চাইল বাসন্তী।

—ওটা ওই গোবিন্দের ব্যাটা, না?

বুড়ির চোখে ছানি পড়ছে, ইদানীং দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখতে পায়না। তবু আন্দাজেই কিছুটা ধরেছে সে। আরও অবাক হয় সুখদা ঠাকরুন বাসন্তীকে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখে। সে এটা ভাবতেও পারেনি।

তাই শুধায় কথাটা। বাসন্তীও যেন ধরা পড়ে গেছে বুড়ির কাছে। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য বলে

—হ্যাঁ।

বুড়ি শুধোয়

—তা অবেলায় এখানে কি করতে এসেছিস ছোঁড়া?

বাসন্তী বলে—না, মানে ওদের একটা বকনাবাছুর হারিয়ে গেছে—তাই এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছিল। আমাকে দেখে শুধোচ্ছিল বাছুরটার কথা।

বুড়ির চোখ-কান এখনও বেশ ধারালোই। সে দেখেছে ওদের ঘনিষ্ঠতা। ওদের কিছু কথাও শুনেছে। কিন্তু বাসন্তীকে ওইভাবে বাছুরের গল্প বলতে দেখে বলে—তা বকনাবাছুরের সন্ধানে এসে এত কি কথা হচ্ছিল লা? কথা আর ফুরোয় না! এ্যাঁ! বেশ চালু হয়ে গেছিস দেখ্‌ছি। শাক দে এই সুখদা ঠাকরনের কাছে মাছ ঢাকতে যাস না লা।

বাসন্তীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়।

সে বুঝেছে জেঠিমা সব জেনে ফেলেছে। তাই বলে বাসন্তী—আমার কোন দোষ নাই জেঠিমা! ওই আসে, কত বারণ করি শোনেনা।

বুড়ি দেখছে মেয়েটাকে, ওর মুখে-চোখে যৌবনের দীপ্তি।

বয়সটা কম নয়। এই বয়সে গ্রামের অনেক মেয়ের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তাদের ঘর-সংসারে চলে গেছে তারা।

গরীব-হতদরিদ্র ঘরের মেয়ে রূপ থাকলেও বাপের রূপোর জোর নাই। তাই এইভাবে দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করে পড়ে আছে এখানে।

বুড়ি বোঝে ওর মনের অবস্থাটা। তবু বলে—এত মেলামেশা করিসনা। যা, ভিতরে যা।

বাসন্তীর ভয় তবু যায় না। সে চেনে তার বাবা-মাকে। ওরা জানতে পারলে তার দুঃখের শেষ থাকবেনা। বাবা-মা কিছুই দিতে পারেনি তাকে। যা দিয়েছে তা দুঃখ-কষ্ট আর লাঞ্ছনা, সেটা আরও বাড়বে মাত্র।

তাই বলে বাসন্তী—মা-বাবাকে কিছু বলোনা, জানোতো ওদের!

বুড়ির কঠিন মুখে ক্ষণিকের জন্য কমনীয়তা ফুটে ওঠে। বলে সে—ঠিক আছে, তবে আর মেলামেশা করিসনা। দুঃখই পাবি লা।

তবু মানুষ চেষ্টা করেও দুঃখকে এড়াতে পারেনা। মেয়েদের জীবনে এটা স্বাভাবিক ঘটনাই। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ সমাজে মেয়েরা পুরুষদের হাতের পুতুল হয়েই রয়েছে। নারী স্বাধীনতার কোন স্পর্শই তারা পায়নি। সেদিন সমাজে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগও তত ছিলনা।

সবেমাত্র নারীশিক্ষার কথা ভাবছে সেদিনের গ্রাম্যসমাজ। বাসন্তীর সে সুযোগ আসেনি। তার বিদ্যার দৌড় গ্রামীণ পাঠশালা অবধিই। বরুণ সেদিন মনস্থির করে

নিয়েই আসে বাসন্তীর কাছে।

বাসন্তী ওকে দেখে এড়াবার চেষ্টা করেও পারেনা। কি দুর্বার আকর্ষণে বাগানে আসে বুড়ির চোখ এড়িয়ে। বাসন্তীর বাবা তখন বাড়িতে কোন যজমানের বিয়ের ফর্দ করাতেই ব্যস্ত।

নরেশ জানে এই তার কিছু পাওয়ার সুযোগ। আর নরেশের স্ত্রীও এই সময় ঘরের ভিতরে দরজার কাছেই হাজির থাকে।

নরেশ ফর্দ করতে বসে

—শুভ বিবাহের শাড়ি-ঘটস্থাপনের জন্য, দরজার আড়াল থেকে নরেশ ইশারা করে জানায় দুটো লালপাড় তাঁতের সাড়ি।

নরেশও ফর্দ দেখে লেখে সেই মত বাড়ির চাহিদা অনুযায়ী। এইসব কারণেই কর্তা-গিন্নী দুজনে ব্যস্ত। যজমানও ফর্দের পরিধি কমাবার চেষ্টা করে।

—এত লাগবে পুরোহিত মশাই?

পুরোহিত মশাইও এবার শাস্ত্রবচন আওড়ায়,

—দীয়তাং ব্রাহ্মণায় মানাস্কামনা পূর্ণং ভবিষ্যতি। বুঝলে নকড়ি, শাস্ত্রে স্বয়ং মহামুনি বেদব্যাস বলেছেন, ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য দেবে, তবেই তোমার সব মনবাসনাপূর্ণ হবে। ফর্দ কমাতে নাই হে। হ্যাঁ তারপর ব্রাহ্মণবরণ, স্বর্ণাঙ্গুরীয় বিধান আছে।

—আজ্ঞে সোনার আংটি! সে তো অনেক দাম?

নরেশ বলে—এত ভাবছ কেন? মূল্য বাবদ একান্ন টাকা ধরে দিলাম। সস্ত্রীক নরেশ এখন বাড়িতে ব্যস্ত।

বাসন্তী এই কাঙ্গালপনা সইতে পারেনা। সে বের হয়ে গেছে ওবাড়িতে। সুখদা ঠাকরুন বৈকালে একটু আফিম খায়। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। বৈকালে বাসন্তীই চা করে দেয় বুড়িতে। সরষের দানা ভোর আফিম ওই চায়ের সঙ্গে গিলে এই সময় বুড়ি একটু ঝিমোয়।

বাসন্তী বাইরের বাগানে দেখে বরুণকে। বাসন্তী শুনেছে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। তাই আর দেখাও করতে চায়না বরুণের সঙ্গে।

কিন্তু বরুণও যাবেনা। বাধ্য হয়েই আসে বাসন্তী। বেশ অভিমানভরা স্বরেই বলে বাসন্তী।

—আবার কেন এসেছো? বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে শুনলাম। জমিদারের মেয়ে, সোনায় মুড়ে দিচ্ছে, নগদ টাকাও দিচ্ছে অনেক। আবার এখানে কেন?

বরুণ বলে—ওখানে বিয়ে করছি না, করবোনা।

—তবে? অবাক হয় বাসন্তী।

বরুণ বলে—আমার পাত্রী আমি ঠিক করে রেখেছি, আর তাকেই বিয়ে করবো।

—তাই করগে।

বাসন্তীর কথায় বলে বরুণ—তাহলে তোমার মত আছে। ব্যস! আজ রাতেই চলো সহরে চলে যাবো। সেখানেই বিয়ে হবে আমাদের।

বাসন্তী চমকে ওঠে—কি বলছ?

—ঠিকই বলছি। বরুণের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর ফুটে ওঠে। বলে সে

—বাসন্তী এর নাম বেঁচে থাকা? কি পেয়েছো জীবনে? তোমার জন্য দুঃখ হয়। নিজেও ঠকতে চাইনা, একটা আচেনা মেয়েকে টাকার জন্য সারা জীবন মেনে নিতে হবে। এ হয়না। আমারও পছন্দ-অপছন্দ আছে। বাসন্তীও ভাবছে কথাটা। তার বঞ্চিত জীবনে আজ পূর্ণতার এই ডাককে সে ফেরাতে চায় না। তবু বলে বাসন্তী।

—তোমার বাবা মা?

—তাদের অন্যায় জেদকে মেনে নিতে পারবোনা। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বাসন্তী।

এটুকু বিশ্বাস করতে পারো না আমাকে?

বাসন্তীর হাতে বরুণের হাতটা। বাসন্তীও আজ ওই স্পর্শে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে জানে তার জীবনে কোন ভবিষ্যৎই নাই। দিন যাপনের গ্লানিতেই সে ক্লেদাক্ত! তাই তাদের সামনে অন্ধকারই।

এই ঝুকি সে নেবেই। বাসন্তীর মনে এতদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা আজ প্রতিবাদে সোচ্চার হতে চায়। তার প্রতিবাদ এই সমাজের বিরুদ্ধেই। বরুণ বলে—সন্ধ্যার পর এখানে আসবে। আমিও আসবো। আজ দুটি মন যেন সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চায়।

পরদিনই খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

বরুণ আর বাসন্তীকে পাওয়া যাচ্ছেনা। বাসন্তীর বাবা নরেশ এদিক-ওদিকে খুঁজেছে। মেয়েকে সে কিছুই দিতে পারেনি। তাহলে কি রাগে-অভিমানে আত্মঘাতীই হল মেয়েটা?

বাগানে গাছের ডালেই ঝুলে পড়েছে কিনা কে জানে, পুকুরেই ডুবলে বোধ হয়, এদিক-ওদিকে খুঁজছে।

ওদিকে বাসন্তীর মাও পাড়ায় ঘরে খুঁজছে। সুখদা ঠাকরুনের কাছেই বেশি সময় থাকে মেয়েটা, সুখদাও অবাক হয়।

—তাহলে মেয়েটা গেল কোথায়?

বাসন্তীর মা বলে'—তোমাকে কিছু বলেনি দিদি?

—না তো! বুড়িও ভাবছে।

নরেশ বাবু গলদঘর্ম হয়ে খুঁজছে!

ওদিকে খোঁজ চলছে বরুণেরও। গোবিন্দবাবু ভেবেছিল বরুণ বোধ হয় ভোরে ম্যাঠের দিকে গেছে। চাষবাড়িতেও যায় সে। গ্রামের বাইরে যোড়ের ধারে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গোবিন্দবাবুর এগ্রিকালচারাল ফার্ম। নদীতে পাম্প বসিয়ে জল তুলে বেশ খানিকটা এলাকায় নানা চাষ করে, পাওয়ারটিলার বলদ কিছু লোকজন সেখানেও থাকে।

বেলা হয়। সেখানেও যায়নি বরুণ। ওদিকে আড়তেও নেই। এবার খোঁজ শুরু হয়। বাড়িতে মা-বাবা ভাবছে। কোথায় গেল ছেলেটা। গোবিন্দবাবুই বরুণের ঘরে টেবিলে চিঠিখানা আবিষ্কার করে। স্ত্রীনামের চিঠি। সেটা পড়েই গোবিন্দবাবু গর্জে ওঠে।

—শূয়ার, ইষ্টুপিড।

গিন্নীও এসে পড়ে। গর্জন শুনে বলে—কি হলো?

গোবিন্দবাবু বলে—পড়ো চিঠিখানা, তোমার ছেলের কীর্তি দ্যাখো। এ্যা, হতচ্ছাড়া ওখানে বিয়ে করবেনা সে তার পছন্দমত বিয়েই করবে। আর তাই নরেশমুখুয্যের মেয়েকে সে পছন্দ করেছে। তাকেই বিয়ে করবে। তাই চলে যাচ্ছে তারা গ্রাম ছেড়ে।

গিন্নী অশহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—একি সর্বনাশ হলো গো! এ্যা—ওই বিটলে বামুনের ক'টা মেয়েটার পেটে পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি। আমার এমন ছেলেকে ঠকিয়ে বশ করলো? যদি সত্যিই বিয়ে করে বসে?

গোবিন্দবাবু গর্জে ওঠে।

—নেভার। এত বড় সর্বনাশ হতে দেবনা। দেখছি আমি। এসব ওই নরেশেরই শয়তানি। আমারই খেয়ে আমারই সর্বনাশ করছে। এ আমি সইবনা।

নরেশ মুখুয্যে মেয়েকে না পেয়ে হতাশ, ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে একঘটি জল খেয়ে সবে দম নিচ্ছে। ওর স্ত্রী শুধায়

—খবর কিছু পেলে মেয়েটার?

নরেশ হতাশাভরা কণ্ঠে বলে—এত খুঁজলাম কোথাও কোন সন্ধানই পেলাম না। কোথায় যে গেল মেয়েটা।

এমন সময় ঝড়ের বেগে গোবিন্দকে সপবিষদ রণমূর্তি ধরে ঢুকতে দেখে চাইল নরেশ।

—আপনি? গোবিন্দবাবু?

গোবিন্দ গর্জে ওঠে এবার ওর কথায়

—ন্যাকামি হচ্ছে? কিছুই জানোনা তুমি? শয়তান, বেইমান। আমার সর্বনাশ করার মতলব? জানো, এখান থেকে তোমার বাস উঠিয়ে দোব। ভিটেতে ঘু-ঘু চরাবো

তোমার।

নরেশ বলে অসহায় কণ্ঠে —কি বলছেন কিছুই বুঝছিনা। কি সর্বনাশ করলাম আপনার? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে আমারই।

সুখদা বুড়িও গোবিন্দবাবুদের ঢুকতে দেখে পায়ে-পায়ে সেও ওদের পিছু-পিছু এ বাড়িতে এসে ঢুকেছে, মেয়েটা হারিয়ে যাবার খবর শুনে সুখদার মনেও কথাটা এসেছিল।

তাই গোবিন্দবাবুকে আসতে দেখে বুড়ি কৌতূহলী হয়েই এগিয়ে আসে।

গোবিন্দবাবু পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে নরেশের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে

—দ্যাখো তোমার বিদ্যেধরী মেয়ের কীর্তি! দ্যাখো।

নরেশের গিন্নীও ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নরেশ চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠে। বলে সে

—এসব কি লিখেছে বরুণ? বিশ্বাস করুণ আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনা। জানতাম না।

গোবিন্দ বলে—এখন তো বুজলে। তোমার মেয়েই আমার সোনার টুকরো ছেলেকে এই ভাবে বিগড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে চলে গেছে। বিয়ে করবে তারা। এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল আর তুমি কিছুই জানোনা?

—তোমার প্রশ্রয় না থাকলে তোমার মেয়ে এতবড় কাণ্ড করতে সাহস পায়?

নরেশ বলে বিশ্বাস করুণ, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না।

গোবিন্দ গর্জে ওঠে

—কোথায় গেছে তারা বলো?

নরেশ বলে—জানিনা। মেয়ে আমার বংশের মুখে আগুন গিয়ে গেছে। তার কোন খবর আর জানতে ত চাইনা।

গোবিন্দ বলে—এবার দেখছি তোমাকে, যার মেয়ে ঘর ছেড়ে পালায়, তার বাবার আর বামনাইগিরি কিসের হে? তোমার বামনাগিরিই ছুটিয়ে দোব। আমার সর্বনাশ করবে চুপ করে থাকবো?

চলে যায় শাসিয়ে গোবিন্দ ঘোষ।

আজ তার হাত থেকে এমন টাকা গহনা জমি সব ফস্‌কে গেল ওই মেয়েটার জন্য। ছেলেটাও বিগড়ে গেল।

তাই গোবিন্দ ঘোষই এবার গ্রামে ঘোষণা করে

—ওই নরেশের মেয়ে যা করেছে তাতে বামুন সমাজকে ওকে চরম শাস্তি দিতেই

হবে। নাহলে সমাজের কোন শাসনই কেউই মানবে না।

গোবিন্দ ঘোষের নামডাক আছে।

অঞ্চল প্রধান। অনেককেই তার কাছে যেতে হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ সব জাতের লোকের ধান-গম সব ওই গোবিন্দই কেনে। সময়-অসময়ে ধান-দাদন বাবদ টাকাও নিতে হয় অনেককে তার কাছে।

তাই গোবিন্দও ওদের সমাজের ওপরও কর্তৃত্ব করতে পারে।

নরেশও নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করে।

নিঃস্ব গরীব হতে পারে সে, তবু সে ছিল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ যজমানের পূজা ক্রিয়াকর্ম সে মন দিয়েই করে।

তাই এ-গ্রাম, আশপাশের গ্রামের আনেকেই ঢাকে পূজা-ক্রিয়াদি করার জন্য ডাকে।

কিন্তু এখন তাকে লোকে যেন এড়িয়েই চলে। গ্রামের যজমানরাও এখন নরেশকে না ডেকে ফটিক চাটুয্যেকেই ডাকে। নরেশও বুঝেছে আজ মেয়ে কুলত্যাগ করেছে ওই গোবিন্দ ঘোষের ছেলের সঙ্গে তাই তাকেও প্রকারান্তরে পতিতই করেছে সকলে। আর এর মূলে ওই গোবিন্দবাবুই।

সুখদাও দেখে ব্যাপারটা।

তার মনে হয় আর সে একটু সাবধান হলে বাসন্তী একাজ করতে পারতনা। আবার ভাবে সুখদা—বাসন্তী অন্যায় তেমন কিছু করেনি। বরুণ ছেলে হিসাবে ভালোই, তারা যদি বিয়ে করে বুড়িও খুশি হবে।

আজ তার মনে হয় এই জাতপাতের বেড়াটাও মানুষ নিজেদের স্বার্থেই গড়েছে।

সেই বাধা যদি বরুণ বাসন্তী ভাঙ্গতে পারে তাদের স্বীকৃতি দিতে সুখদারও বিন্দুমাত্র বাধবে না।

বুড়িই বলে বাসন্তীর মাকে।

—কাঁদছিস কেন লা, দেখবি ওরা সুখী হবেই। ঘরে ফিরলে মেনে নিবি!

নরেশই গর্জে ওঠে—না। তাকে দূর করে দোব! আমার উঁচু মাথা হেট করেছে। ওকে ঘরে ঠাই দেব? না।

বুড়ি বলে ওঠে

—বাপের কি কর্তব্যি করতে পেরেছিস তুই নরু? সোমও মেয়ে বিয়ে দিতে পারিসনি। দুবেলা পেট পুরে ভাত-পরণের বস্ত্র দিতে পারিসনি। কি আমার বাপ্‌গে! মুয়ে আগুন এমন বাপের।

নরেশ বলে

—আমার যা খুশি করবো তুমি বলার কে?

বুড়িও ফুঁসে ওঠে।

—গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল। মুরোদ কত বোঝা গেছে। তোর দৌড় দেখেই মেয়েটা নিজের পথ নিজেই বের করেছে। ঠিক করেছে।

গ্রামে এই নিয়ে অনেক মুখরোচক আলোচনাই শুরু হয়। গোবিন্দ ঘোষ বড়লোক। সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি। তার গায়ে কোন আঁচই লাগেনা।

কিন্তু তার তুলনায় নরেশের গায়ে আঁচটা বেশিই লাগে।

শরৎ ভটচায গ্রামের অন্যতম মাতব্বর, শীর্ণ কালো বিটলে চেহারা, পা দুটো তেমনি লম্বা। গলাটাও।

শরৎ ভটচায এর মধ্যে হরির আটচালায় পাশার ছক নিয়ে বসে। আরও দু-চারজন এসে জোটে। দুপুরটা তাদের ওখানেই কাটে। আর শরৎ ভটচায নাকি পাশার ছকেও চুরি করে দান ফেলে একেবারে শকুনি মামার মত।

দুহাতের মুঠোর মধ্যে পাশার দান ফেলার লম্বা কাঠির মত গুটিগুলোকে নিয়ে দুহাতে কচলাতে থাকে। কড় কড় শব্দ ওঠে। তারপর হাঁক পাড়ে—কচ্চে বারো!

গুটিগুলো যেন ওর কথা শোনে, ঠিক কছে বারোই পড়েছে। এহেন বাকসিদ্ধ পুরুষ শরৎ ভটচায বলে—এত বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নরেশের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

সতীশ চাটুয্যে নিরীহ ধরণের মানুষ।

সে দেখেছে এর মধ্যে নরেশের পূজাপাঠ, যজমানবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তার খুবই কষ্ট চলেছে। সতীশ চাটুয্যে বলে

—শাস্তি তো তার হয়েই গেছে হে।

—মানে? শরৎ জেরা করে খ্যানখ্যানে গলায়।

সতীশ বলে,—ওর যজমানী সব বন্ধ। কি করে ওদের দিন চলছে জানো?

শরৎ বলে ওঠে—কৃতকর্মের ফলতো ভুগতেই হবে।

—তাই ভুগছে। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা নাইবা দিলে তোমরা, মেয়েটারও খবর নাই।

শরৎ তবু থামাতে চায়না। সমাজের কল্যাণ চিন্তায় তার নাকি রাতেও ঠিকমত নিদ্রা হয় না। সে বলে—মরুকগে সে মেয়ে। সমাজকে বাঁচাতেই হবে।

বরুণ বাসন্তী বিয়েই করেছে।

বরুণের বন্ধুরাই বিয়ের সব আয়োজন করেছে। বাসন্তী আজ যেন এত সুখের মাঝেও সেই সুখকে ঠিকমত অনুভব করতে পারেনা।

বিয়ের পর বরুণ অশোকদের কারখানাতে চাকরি নিয়ে এসেছে। শালবনের ধারে একটা ছোট পাহড়ী নদী, বালুর মাঝে তিরতিরে জলধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। শালবনে মঞ্জরীর সুবাস।

বৈকালে বাসন্তী আসে নদীর দিকে। এদিকটা নির্জন তিরতিরে জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে চলে। বরুণ বলে—কেমন লাগছে?

হাসে বাসন্তী। এ-যেন এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছে তারা দুজনে। বাসন্তী বলে—সুন্দর, কিন্তু—

কিন্তু কেন?

বরুণ ওকে কাছে টেনে নেয়।

এখন বরুণও এখানে এসে নিজের ব্যক্তিত্বকে খুজে পেয়েছে। নিজের বুদ্ধি-বিদ্যা দিয়েই সে নিজের মত করে বাঁচার পথ পেয়েছে।

বাসন্তী বরুণের কথায় বলে

—তবু মনে পড়ে বাড়ির কথা। মা-বাবার কথা। তাদের স্বীকৃতিরও দরকার। তাদের আশীর্বাদও চাই গো!

বরুণও ভাবছে কথাটা, বাসন্তী জানেনা বরুণ জানে গ্রামের কিছু খবর। অশোকের অফিসের একজনের বাড়ি তাদের ওই দিকেই। তার মারফৎই খবর পেয়েছে বরুণ গ্রামে এনিয়ে অনেক তোলপাড় হয়েছে। আর তার বাবা ওই নরেশবাবুদের অনেক ক্ষতিই করেছে প্রতিশোধ নেবার জন্যই।

বরুণ জানে নরেশবাবু এই ব্যাপারে নির্দোষ। সব দোষ বরুণেরই। সে ভাবেনি তার জন্য নরেশ মুখুয্যেকে এমনি কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

আজ বরুণের মনে এসেছে সাহস, আত্মবিশ্বাস। আজ বাবার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ, দরকার হলে প্রতিবিধান সে করবে।

তাই বলে বাসন্তীকে বরুণ

—চলো না হয় গ্রামে, বাবা-মায়ের আশীর্বাদ যদি পাই নিয়ে আসবো। বাসন্তীরও মন চায় গ্রামে যেতে, কিন্তু ভয় হয় কি কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়বে তারা কে জানে। তাই বলে বাসন্তী।

—যেতে তো মন চায় গো। কিন্তু ভয় হয়

বরুণ বলে

—ভয়ের কিছুই নাই। আমাদের দিন ঠিকই চলে যাবে। তবু আমারা যে কোন অন্যায় করিনি সেটা গ্রামের মানুষকে জানাবার সাহস আমার আছে। তাই তোমাকে নিয়েই যাবো সেখানে।

গ্রামের লোক সেদিন বিস্মিত হয়।

বাসরাস্তা থেকে তাদের গ্রাম একটু ভিতরে। মাঠ, তারপর শালবন পার হয়ে, তাম্রাভ প্রান্তরে কিছু ছড়ানো-ছিটোনো মহুয়া বন পার হয়ে গ্রামখানা, তেমন রাস্তাও নাই।

রাস্তা বলতে মাটি কিম্বা কাঁচা সড়কের মত, গরু-মোষের গাড়ি যাতায়াত করে। অন্যকোন গাড়ি বিশেষ ঢোকে না।

ভোটের সময় নেতাদের গাড়ি কোনমতে ধুলো উড়িয়ে আসে, আর আশেপাশের গ্রামের ছেলে, রাখালের দল গাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে তারাও দেখাতে চায় এখানে যন্ত্রের চেয়ে মানুষের দৌড় বেশি আর গতিবান তারাই।

সেদিন বেলাতে হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে একখানা গাড়িকে গোপগাঁয়ের দিকে আসতে দেখে অনেকেই চেয়ে থাকে। ভোটের সময় নয়, এখন কারা আসবে গাড়ি হাঁকিয়ে গ্রামে।

অনেকেই দেখছে গাড়িটাকে। সকলেই অবাক হয় বাসন্তী আর বরুণকে দেখে। বাসন্তীর কমাসে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। পরনে দামী শাড়ি-গহনা। গ্রামের সেই হতদরিদ্র মেয়েটা যেন রাজরানীর বেশে গাঁয়ে ঢুকছে।

বরুণ তাকে তাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজে একটু ওদিকে নিজেদের বাড়ির দিকে চলে গেল।

তারপরই বাধে গোলমাল।

বাসন্তীকে আসতে দেখেছে ওর বোন। সেই ছুটে গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়।

—মা, বাবা, দিদি ফিরেছে। একেবারে নতুন বউ-এর মত। পরনে ভাল শাড়ি, গহনা—কি সুন্দর মানিয়েছে।

নরেশ দাওয়াতে বসেছিল, সে গর্জে ওঠে—কি বললি? সেই মুখপুড়ি এখানে এসেছে? এতবড় হিম্মৎ।

বাসন্তীর মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে দরজায়। বাসন্তীকে দেখে মা দুহাত দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—এতদিন পর এলি মা। আমাদের কথা ভুলে গেছলি।

বাসন্তীও মাকে জড়িয়ে ধরে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, গ্রামের অনেকেই এসেছে।

এবার নরেশ গর্জে ওঠে—খবরদার। এ বাড়িতে আর তুই ঢুকবি না।

চাইল বাসন্তী, তার চোখে জল, আর্তকণ্ঠে বলে সে—বাবা!

নরেশ গর্জে ওঠে কঠিন স্বরে—বাবা, তুই আমার কেউই নোস। আমার শত্রু, পরম শত্রু। তাই বলছি এ বাড়িতে আর পা দিবি না তুই। আমার এত বড় সর্বনাশ করেও খুশি হস্‌নি। এসেছিস সেজেগুজে বাজারের মেয়ের মত।

আর্তনাদ করে ওঠে বাসন্তী—বাবা, আমি ঘরের বৌ! এসব কি বলছ?

—থাক-থাক, তারা নিয়েছে ঘরে? তোকে পথেই ফেলে দিয়ে গেছে। এবার জাহান্নামেই যা। স্ত্রীকে বলে নরেশ

—যাও, পাপকে ছুঁয়েছো, চান করে শুচি হয়ে ঘরে ঢুকবে।

—হাগা কি বলছ? নিজের মেয়ে—বাসন্তীর মা স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টাই করে। বলে ওঠে নরেশ

—ও আমার কেউ নয়। বের হ্য়ে যাক এখান থেকে। ঘরের বউ! দুদিন ফূর্তি করে ফেলে দিয়ে গেছে। তাকে ঘরে নরেশ মুখুয্যে ঠাই দেয় না।

বাসন্তীর চোখে জল, বরুণও চলে গেছে। মনে হয় তাহলে বাবার কথাই সত্যি। কদিনের জন্য ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল সে এখন তার এ ঘরেও স্থান নাই। বরুণদের বাড়িতেও যাবার মুখ নাই। অসহায়, কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটা।

সুখদা ঠাকরুন এসে দাঁড়িয়ে নরেশের নাটক দেখছিল। বুড়ি ভাবেনি যে সত্যিই এই ভন্নি দুপুরে বাবা হয়ে মেয়েকে এইভাবে দরজা থেকে দূর করে দেবে। সকলেই দেখছে ব্যাপারটা নীরব দর্শকের মত।

এতবড় অন্যায়ের কেউ কোন প্রতিবাদই করছে না। দরজায় দাড়িয়ে কাঁদছে বাসন্তী। সমাজ যেন তাকে আজ তার কৃতকর্মের জন্য বেরই করে দিতে চায় অন্ধকারের নরকে। বুড়ি এগিয়ে আসে।

বাসন্তী দেখছে সুখদাকে। আজ তার ব্যাকুল মন তাকেই জড়িয়ে ধরে। ডুবন্ত কোন মানুষ যেন আবার অসীম আগ্রহ নিয়ে সামান্য তৃণখণ্ডকেই আঁকড়ে ধরেছে।

— জেঠিমা, বাবাকে বলো— আমি নির্দোষ।

নরেশ গর্জে ওঠে— জেঠিমা কি করবে? যা করার আমিই করবো, তাই বলছি দূর হয়ে যা এখান থেকে। এ বাড়িতে তোর কোনদিন ঠাঁই হবে না। এ বাড়ির আর তুই কেউ নোস। সুখদা ঠাকরুন এবার স্বমূর্তি ধরে। এতক্ষণ নীরবে সে সবকিছুই দেখছিল। এবার গলা তুলে বলে—বাপের মুরোদ দেখাচ্ছিস নরু? মেয়ে কি ফ্যালনা? কোন পাপ করেনি সে। সতী-লক্ষ্মীর রূপ দেখেও চিনতে পারলিনা এমনি লক্ষ্মীছাড়া তুই।

বাসন্তীর মা বলে—তাই বল দিদি ওকে।

নরেশ বলে—আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি, এবাড়িতে ওর ঠাঁই নাই।

সুখদা ঠাকরুন বাসন্তীকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—কাঁদিস না বাসন্তী। আমার ঘরখানতো আছে। সেখানেই ঠাঁই আছে তোর। তুইও আমার মেয়ের মতই, চল।

শরৎ ভটচাযও এসে জুটেছিল। সে নরেশকে ওইভাবে মেয়েকে তাড়াতে দেখে খুশিই হয়েছিল। কিন্তু বুড়িকে এগিয়ে এসে ওকে ঠাঁই দিতে দেখে এবার সমাজের একনিষ্ঠ সেবক শরৎ ভটচায বলে ওঠে—ওকে ঠাঁই দিলে তোমারও বিপদ হবে বৌঠান। সমাজের পাঁচজন তোমাকেও ছাড়বে না।

সুখদা ঠাকরুনের মাথায় রক্ত ওঠে, যেন গোখরো সাপের ল্যাজেই পা দিয়েছে শরৎ ভটচায। সুখদা ফুঁসে ওঠে।

—কি বললে ভটচায? সমাজ আমাকেও দণ্ড দেবে? সমুদ্রে শয়ন যার/শিশিরে

কি ভয় তার। তোমাদের মুখপোড়া ভগবানও আমাকে দণ্ড দিতে দিতে জ্বালাতন হয়ে গেছে। তোমার সমাজ আর বেশি কি দণ্ড দেবে এই সুখদা ঠাকরুনকে যে তার ভয়ে দরজা থেকে একটা নির্দোষ মেয়েকে ফিরিয়ে দেবে? শোন ভটচায—তোমাদের সমাজ কোন—দরকার হয় পঞ্চগ্রামী সমাজের কাছেই এর বিহিত চাইব। আর সেদিন দেখবে সুখদা ঠাকরুন কোন ধাতুতে গড়া। আমাকে ভয় দেখিয়ো না।

আয় মা।

সুখদা ঠাকরুন যেন অর্ধমৃত সমাজের বুকের ওপর দিয়ে সদম্ভ পদক্ষেপে সবকিছু মাড়িয়ে বাসন্তীকে নিয়ে তার ঘরে চলে গেল।

এরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে সর্বহারা তেজস্বী মহিলাকে। সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যেন দ্বৈরথ সমরেই নামার জন্য প্রস্তুত।

বরুণও বাড়িতে বেশ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয় না। গোবিন্দবাবু ছেলেকে দেখে গর্জে ওঠে—ফের এখানে কেন এলে? ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না তোমার?

বরুণ বলে—লজ্জার কোন কাজই করিনি।

গোবিন্দবাবু কি বলতে যাবে, ওর স্ত্রী কমলা দেবীই বলে—কতদিন পর ছেলেটা ঘরে ফিরলো, আর তুমি শুরু করলে ওইসব। কে কোথায় চলে গেল তার ও কি জানে?

গোবিন্দ বলে—সেটা কোথায়? সেই মেয়েটা?

বরুণ বলে—ওভাবে কথা বলবেন না।

—কেন? তবে কি তাকে দেবী বলতে হবে?

বরুণ বলে—তা না বলুন সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিত। সে এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

গোবিন্দবাবুর সামনে যেন একটা বোমাই ফেটেছে। চীৎকার করে সে—শুনলে? শুনলে কথা? ওই মেয়েটাকে ঘরের বউ করে নিতে হবে?

বরুণ বলে—সেটা আপনার ইচ্ছা। নিতে পারেন ভালো, না পারেন আমাকে চলেই যেতে হবে এখান থেকে। তাকে ওর বাবার ওখানে রেখে এসেছি।

কমলাদেবী বলে—এখন ওসব থাক। সবে এল ছেলেটা। তোমার কথা পরে হবে। চল ভিতরে চল।

মা বরুণকে নিয়ে চলে যেতে গোবিন্দ গর্জে বলে—ওই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে? এ বিয়ে মানিনা।

কিন্তু এবার ওই সুখদা ঠাকরুনই নেমেছে আসরে। বরুণও এসেছে এখানে। সুখদাই জানে এ ব্যাপারে ওই প্রতাপ বাবুর স্মরণাপন্ন হওয়াই উচিত হবে। আর তার আগে কালিকান্ত ভটচায, এই পঞ্চতীর্থ পণ্ডিতকে সব কথা জানানো দরকার।

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থের বাড়িটা গ্রামের প্রায় বাইরে। অবশ্য তার সাবেকী বাড়ি ওই ভটচায পাড়াতেই। পুরোনো পাড়া, ঘন বসতি। মাটিরই দোতলা কোঠা।

দু'একটা পরিবার খড়ের চালের বদলে টিন দিতে পেরেছে। কালিকান্ত ভটচাযের পিতা সর্বময় ভটচাযের ছিল দুই সংসার। কালিকান্ত ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিল। এখানের স্কুলে পড়ার সময়ই বাবার সঙ্গে যেতো নবদ্বীপে। সেখানে সর্বময়ের গুরুদেবের টোল।

ক্রমশ গুরুদেব কিশোর কালিকান্তের মেধার পরিচয় পেয়ে বলেন—ওকে এখানেই রেখে যাও সর্বময়, গ্রামে পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা নেই। ওর মত মেধাবী ছাত্র। ওকে পড়ার সুযোগ দাও। ও এখানেই থাকুক।

সর্বময় ভটচায এমনিতেই অশান্তিতে ছিল। কারণ প্রথমা স্ত্রী ওই শিশু কালিকান্তকে রেখে মারা যেতে সংসার চালাবার জন্যই দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সর্বময়। সেটা বছর আষ্টেক আগের ঘটনা। তখন কালিকান্ত ছোট। ভেবেছিল সর্বময় দ্বিতীয় স্ত্রী এলে তবু মা-হারা ছেলেটার দেখভাল হবে।

কিন্তু বিধি বাম। দ্বিতীয় পত্নী যিনি এলেন, তিনি যেন কাঁঠালগাছ। বছর যেতে না যেতেই মা হলেন, আর এই আটবছরের মধ্যে তিনি সর্বসাকুল্যে চারটি সন্তানের জননী হয়ে সংসার নিয়ে ন্যাটা-ঝামটা খাচ্ছেন। সংসারের আয়পয় তেমন নেই।

ফলে অভাব-অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। আর তার জন্য সংসারে ঝামেলা লেগেই আছে। বিশেষ করে এই কালিকান্তকে নিয়ে।

কালিকান্ত পড়াশোনা করতে চায়। আর দুনম্বর গৃহিণী বলে—পড়ে দিগগজ পণ্ডিত হবে? যা চাটুয্যে বাড়িতে ষষ্ঠী পুজোটা করে আয়।

কালিকান্ত ছেলেবেলা থেকেইও যজমানি বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় না। ওতে স্বভাবের নীচতাই যেন বাড়ে। তাছাড়া এবার পড়ায় মন দিয়েছে সে। তাই বলে— ওসব পারবো না।

গৃহিনীও গর্জে ওঠে—পারবিনা মানে? চাল না আনলে তোর পিণ্ডি জুটবে কোথা থেকে? ঘরে বসে বসে গেলাতে পারবো না।

কালিকান্ত বোঝে ব্যাপারটা। সর্বময় বাড়ি ফিরে বলে—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। ও পড়ছে, পড়তে দাও।

গৃহিণী ফুঁসে ওঠে—ওই আপদকে লাই দিয়ে তুমিই মাথায় তুলেছো। পরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।

সর্বময় জানে কালিকান্তও পড়তে চায়, মুক্তি পেতে চায় ওই জীবন থেকে। ওই বাড়ির পরিবেশ থেকে। তাই গুরুদেবের কথায় সর্বময় বলে—আপনি যখন আদেশ

করছেন তাই হবে। কালিকান্ত এখানেই থাকুক।

কালিকান্তও যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। মাকে হারিয়ে সে নিঃসঙ্গই হয়ে পড়েছিল। গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গেও তার তেমন মেলামেশা ছিলনা।

তাদের থেকে দূরেই থাকতো কালিকান্ত নিজের পড়াশোনা নিয়ে। কিন্তু সৎমায়ের ওই ব্যবহারটাকে মেনে নিতে পারত না সে। মাঝে মাঝে চোখ ফেটে জল আসতো।

মনে মনে দেবতার কাছে প্রার্থনা করতো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও ঠাকুর। তবু সর্বময়, তাকে নিয়ে মাঝে-মাঝে গুরুবাড়ি, এখান-ওখানে শিষ্যদের বাড়িও যেতো। তবু কদিন শান্তিতে থাকতো সে।

এবার ঠাকুর তার প্রার্থনা শুনেছেন। সর্বময় ওকে নবদ্বীপে গুরুর কাছে রেখে এল।

নবদ্বীপের একটু বাইরে প্রাচীন মায়াপুর এলাকা। গঙ্গার ধারেই সবুজ গাছগাছালি ঘেরা মন্দির আশ্রম। ওদিকে চতুষ্পাঠী। গদাধর ন্যায়তীর্থ মশায়ের কাছে অনেক ছাত্রই পড়তে আসতো। কালিকান্ত সেই পণ্ডিতব্যক্তিটির সান্নিধ্য লাভ করে যেন নিজেকে ধন্য মনে করে। উদারমনা নৈয়ায়িক।

সবকিছু তিনি নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেন। আর ছাত্রদেরও সেই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে বলেন।

ওই আশ্রমিক পরিবেশে কালিকান্ত নিজেকে মানিয়ে নেয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করে, মন্দিরের সেবাপূজার ভারও গুরুদেব তার উপর অর্পণ করেছেন।

গঙ্গার বুকে সূর্য ওঠে। পূব আকাশে আরক্তিম আবেশ, গঙ্গার বুকে সেই আলোর স্পন্দন, কালিকান্ত ওই উষালগ্নে সূর্যদেবকে প্রণাম করে গঙ্গাস্নান সেরে মন্দিরে মঙ্গলারতির পর পাঠ নিয়ে বসে।

সারাটাদিন কোনদিকে কেটে যায়। আদ্য মধ্য উপাধি সব পরীক্ষাতেই তার ভালো ফল হয়। এর মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত পড়েছে।

কালিকান্ত বেশ কয়েক বৎসর পর দেশে ফেরে বাবা গত হবার কিছুদিন আগে। তখন সে তরুণ যুবক। সারা এলাকায় তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত।

কাজোরার জমিদার পঞ্চকোটের রাজারা তার গুণগ্রাহী। সর্বময় তখন অসুস্থ। ওদিকে সংসারে দুইছেলে আর তিন মেয়ে। বড় ছেলে সুধাময়, আর ছোট ছেলে গুণময় দুজনের কেউই মানুষ হয়নি। মাত্র একটি কন্যার বিবাহ দিয়েছে সর্বময় কোনমতে। এখনও দুই কন্যা আর ওই দুই পুত্ররত্ন বিরাজমান।

সুধাময় গুণময়ের গলায় দুগাছি পৈতে কোনমতে ঝুলিয়ে দিয়েছে সর্বময়, ওরা গ্রামে—আশেপাশের গ্রামের টুকটাক পুজোটুজো কোনমতে করে। কিন্তু লেখাপড়াও শিখলনা তাদের কেউ।

সুধাময় বার তিনেক ক্লাশ ফাইভে গড়ান দিয়ে স্কুল ছেড়ে এবার তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে পড়েছে। কিছু পুঁথি-পাত্তাড়ি যোগাড় করে, গেরুয়া পরে ঘোরে। আর সে নাকি দৈবকৃপাই পেয়েছে, সাক্ষাৎ মা কালীর দর্শন পেয়েছে এই কথাই ঘোষণা করে।

সর্বময় বলে

—ওসব বুজরুকি ছাড় সুধা। ধর্ম নিয়ে বেসাতি করিস না। পড়াশোনা কর, পুরোহিত দর্পণটা পড়। ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম শেখ ওসব ছেড়ে।

সুধাময় বলে

—ওসব করে কি পেয়েছো তুমি? অনেক যজমানি তো করলে? ঘণ্টা নেড়ে পেট ভরার দিন চলে গেছে। এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে সোজা পথে পেট ভরবে না।

গুণময় অবশ্য তার চেয়ে এক কাঠি উপরে। সে বছর কয়েক স্কুলে গিয়েই সব শিখে ফেলেছে। এবার সে নিজেই পরিক্রমা শুরু করে।

ছেলেটা এখন কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিচ্ছে। দেখতে-শুনতে ভালোই। আর মাঝে-মাঝে উধাও হয়ে যায় গ্রাম থেকে। কখনও বর্ধমানে চলে যায়, কোন দোকানে কাজকর্ম করে। আবার কখনও কলকাতাও চলে যায়।

কি করে তা কেউ জানে না। গ্রামে ফেরে তখন তার পোষাক ফিটফাট। এখন সে মাঝে-মাঝে প্যান্টও পরে। সর্বময় সুধায়

—কি করিস তুই?

ছেলে জবাব দেবার আগে তার মা বলে

—বর্ধমানে চাকরি করে।

—চাকরি। অবাক হয় সর্বময়। এখন সে বৃদ্ধ। হাঁপানির রোগী। বাড়িতেই থাকে। দিন চলে কোনমতে। শুধোয় ছেলেকে

—চাকরি করিস? কি চাকরি?

গুণময় বলে

—দোকানে। সেলসম্যান। এবার আমাদের মালিক কলকাতাতেও দোকান খুলছে। সেখানেই নেবে আমাকে।

সর্বময় বলে

—চাকরি করিস তা বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাবি তো!

মাই এবার বলে

—দুধের ছেলে ওকেই তুমি দেবে, তা নয় তার কাছেই টাকা চাইছ?

সর্বময় চবলে

—ছেলেদের বাপ-মা, সংসারের প্রতি কিছু কর্তব্য করতে দাও, ওদেরও কর্তব্য

কিছু আছে সেটা জানতে দাও নতুন বৌ!

নতুন বৌ ফুঁসে ওঠে

—তোমার বড় ছেলে তো শুনি একটার পর একটা পাশ দিয়েই চলেছে। মস্ত পণ্ডিত হয়েছে। সে কি দেখে বাবা-মাকে, সংসারকে? যে আমার ছেলেরা দেখবে?

সর্বময় বলে

—সংসার কি দেখেছে কালীকান্তকে? কি দিয়েছে তাকে? ছেলেবেলা থেকেই পরের দয়ায় মানুষ হয়েছে সে। নিজের চেষ্টায় এতবড় পণ্ডিত হয়েছে। দেখবে সেইই দেখবে তোমাকে, ওই অকালকুষাণ্ডরা নয়।

— ঢের দেখা আছে। ফুঁসে ওঠে নতুন বৌ।

গুণময় এসব কথায় থাকতে চায় না। সে সেজেগুজে হাটতলার দিকে চলে যায়।

তার মাথায় এখন অন্য মতলব ঘুরছে। সে ওই কলকাতার গল্প শুনিয়ে এর মধ্যে এ গ্রামের জগন্নাথপুরের দু-একজনকে বেশ হাতে এনেছে, হাটতলার নন্দের চায়ের দোকানে তারাও আসবে।

গুণময় তাদের পয়সাতেই চা-সিগ্রেট খায়। আর সন্ধার পর সে চলে যায় ঈশ্বর মোড়লের ওখানে।

ঈশ্বর নাম করা জুয়াড়ি। গুণধর দেখেছে ঈশ্বরের হাতে জুয়ার গুটি, তিনতাসের গোলাম, আর ফিতেখেলার ফিতেটা অবধি কথা বলে।

ওর কাছেই সে এই বিদ্যা শিখছে।

ঈশ্বর বলে—গুরুদক্ষিণা দিতে হবে কিন্তুক ঠাকুর।

গুণময় বলে—ঠাকুর বলোনা হে, তুমি তো নিজেই ঈশ্বর। ভগমান, আর করছো জুয়োর, তিনতাসের কাজ।

ঈশ্বর গলায় মদের পাঁইটটা ঢেলে বলে

—ভগমান তো পয়লা নম্বরের জুয়াড়ি হে। নালে বামুন ঘরের ছেলে হয়ে তোমাকে এই কাজে নামায়? লোককে ঠকানোই তো ভগমানের কাজ, তা ঈশ্বরের দোষটা হল কুনখানে বলো তো?

সুধাময় ঈশ্বরের দেওয়া এই বিদ্যে ভাঙ্গিয়ে এর মধ্যে দুচারজন সাগরেদ করেছে বর্ধমানে, বাঁকুড়াতেও। তাদের নিয়ে স্টেশনে, বাজারে হঠাৎ-হঠাৎ তাসের খেলা, ফিতের খেলা শুরু করে।

বাজীর টাকাও পড়ে ভালোই। গুণময়ের হাতের গুণে সেসব তার পকেটেই আসে সহজেই। ওর এই ব্যবসার কথাটা কেউ জানে না। সবাই জানে গুণময় বর্ধমান, কলকাতা চষে বেড়ায়। কোন মহাজন তাকে ছেলের মত ভালোবাসে। ভালো মাইনেও দেয় তাকে।

সর্বময়ের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। চিকিৎসাও ঠিকমতো হয় না। ছেলেরা খুবই ব্যস্ত। তাই বাবাকে দেখার সময় তাদের নেই। এমনিদিনে কালিকান্ত পঞ্চকোট রাজের টোলের অধ্যক্ষ হয়ে কাশীপুরে এলো।

বড় চতুষ্পাঠী। অনেক আবাসিক ছাত্র রয়েছে সেখানে। রাজাও চান তার টোলের নাম প্রতিষ্ঠা হোক।

আর কালিকান্তর পাণ্ডিত্য-নিষ্ঠায় রাজা মুগ্ধ হয়ে তাকে সভাপণ্ডিতও করেছেন। সুন্দর বাসা, বিরাট পাঠাগার। কালিকান্ত ওই পড়াশোনার রাজ্যেই রয়েছে।

তবু এসেছে গ্রামে বাবাকে দেখতে।

দেখে ভাইদেরও সর্বময় বলে

—আমার দিন ফুরিয়েছে কালি, তোব জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি তাই তোর কাছে কিছুই চাইবার অধিকার আমার নেই।

কালিকান্ত বলে,

—ছেলের কাছে বাবার অধিকার চিরন্তন, এত সঙ্কচ করছেন কেন? বলুন কি বলবেন?

সর্বময়ের তখন নাভিশ্বাস চলছে। প্রসন্ন কবরেজ মকরধ্বজ দিয়ে শেষ চেষ্টা করছে। বলে সর্বময়

—ওসবের আর দরকার নাই কবরেজ।

কালি, কথা দাও তোমার মা-ভাইবোনদের দেখবে। ওদের আর কেউ রইল না।

কালিকান্ত বাবাকে বলে—আপনি নিশ্চিন্ত হন বাবা। আমি ওদের ভার নিলাম। ওদের সব ভার নিলাম।

সর্বময়ের জীর্ণমুখে তৃপ্তির আবেশ ফুটে ওঠে। বলে সে—ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।

সর্বময় মারা যাবার পর এই সংসারের ওই অকর্মণ্য জীবগুলোর সব দায়দায়িত্ব কালিকান্তই মাথায় তুলে নেয়। তখন সে পঞ্চকোট রাজার চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ। সুধাময়ের বিবাহ হয়েছে।

সেও দুছেলের বাবা। বিধবা মা, সুধাময়ের সংসার, সুধাময়কে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে কালিকান্ত। ওদের সংসারের বোঝা টানতে-টানতেই সে সংসারের যে বিষময় দিকটি দেখেছে তাতে আর নিজের সংসার করার কথা ভাবতে পারেনি কালিকান্ত।

সাহসও হয়নি তার। তাই কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ জীবনে পরের বোঝাই বয়ে চলেছেন নিজের কোন দায়দায়িত্বই নেই।

পঞ্চকোটরাজ জমিদারী প্রথা চলে যাবার আগে কালিকান্তকে বেশ কিছু জমি ব্রহ্মোত্তর দানপত্র করে দিয়েছিলেন। এখন কালিকান্ত তার জন্যই কিছুটা নিশ্চিন্তে আছেন

গ্রামে।

সাবেকী বাড়ি, ভাই ভাইপোদের ছেড়ে দিয়ে নিজে গ্রামের বাইরে বেশ খানিকটা জায়গায় গাছগাছালি লাগিয়ে সবুজ বাগান মত করেছেন। কিছু ফুলের গাছ ছোট একটা দেবমন্দির করে সেখানেই থাকেন তাহার পঠন-পাঠন নিয়ে।

এখন ক্রমশ সংস্কৃত পাঠ উঠেই যাচ্ছে। দেবভাষার প্রতি কোন স্বীকৃতি মর্য্যাদা এখন আর কেউ দিতেও চায়না! তবু দুচার জন আসে কালিকান্ত তাদের কাব্য-অলঙ্কার-ন্যায় পড়ান।

আর নিজের কিছু লেখাপত্র নিয়েই থাকেন; তার দু'একটা বই স্কুলপাঠ্য, তাব কাজই করেন।

ইদানীং তিনি দেখেছেন সমাজে একটা নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে আছে পরিবর্তনের আভাস, স্থান-কাল ভেদে সব কিছুরই রূপান্তর ঘটে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। গাছের পাতাও জীর্ণ হলে ঝরে যায়। আবার আসে কিশলয় নতুন রূপে ঔজ্জ্বল্য, প্রাণের স্পর্শ নিয়ে।

তখন সে সজীব প্রাণময়।

কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সেই সজীব পত্রপুষ্পও শুকিয়ে যায়, ঝরে যায়। কিন্তু শাখা কখন পত্রহীন থাকে না। নতুন সাজে সেজে ওঠে আবার।

মানুষের সমাজেও এমনি পরিবর্তন আসে। কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ বৃহত্তর সমাজকে দেখেছেন বহু বড় জমিদার, ধনী সমাজ, রাজ পরিবারকেও দেখেছেন, দেখেছেন তাদের বনেদীআনা, তাদের মনের ভিতরটাকেও।

একদিন সমাজে ছিল তাদের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি। তাদের মধ্যে লোভী, অত্যাচারী দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষও কিছু ছিল, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তারা কমই।

তার চেয়ে হৃদয়বান সৎ অনেককেই তিনি দেখেছেন। তাঁরা পথঘাট বিদ্যায়তন, চিকিৎসাকেন্দ্র করেছেন। তখন ইংরেজ সরকারের দিন। সাধারণ মানুষের জন্য তারা বেশি ভাবেন নি।

কিন্তু ওই ধনী জমিদার সমাজই সেদিন সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছুই করেছিলেন।

ক্রমশ সেই জমিদার রাজন্যবর্গের দিনও ফুরিয়ে আসছে। সমাজের বুকে মাথা তুলছে ক্রমশ বৈশ্য শ্রেণী, বণিকের দল। আর জমিদারী ব্যবস্থা ধ্বসে যাবার মুখে দেশের মধ্যে শাসক শ্রেণীই মাথা তুলছে সমাজের সাধারণ মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে। সদ্য ক্ষমতার মোহে তারা এখন নির্মম।

এদের বনেদীআনা সংস্কার সমাজে সচেতনা, মহত্ত্ব, মনুষত্বের কোন বোধই নাই। হঠাৎ অনেক পেয়ে এরা আরো পেতে চায়।

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ দেখেছেন সহরের বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে, তখন অজন্মার বৎসর। সারা দেশের ধান-চাল-গম এরা আগে থেকেই সব কম দামে কিনে গুদামজাত করেছে।

তারপর মানুষের চরম দুর্দিন নেমে আসে। মাঠে ধান নাই। মাটি ফেটে চৌচির। কাজ নাই। শতশত মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলেছে।

তখন ওই লোভী ব্যবসাদারের দল তিনগুণ চারগুণ লাভে চাল বিক্রি করেছে। মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে বেসাতি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে।

তাদের দুচারজনের দেখেছে কালিকান্ত। পরিবারিক শান্তি নাই। কারোও সন্তান অবাধ্য, কার মেয়ে, স্ত্রী ব্যাভিচারিণী। কেউ কঠিনরোগে আক্রান্ত।

তারাই আসে—পণ্ডিতমশাই, ঠিকুজিকুষ্ঠী দেখে গৃহশান্তি করেন। এতবড় পণ্ডিত আপনি। এই বিপদ থেকে বাঁচান!

কেউ তার মুনাফাবাজির জন্য ইনকাম টাক্সের পাল্লায় পড়েছে। অনেক টাকাই দিতে হবে সরকারকে। শাস্তিও হতে পারে। সে এসে টাকার বাণ্ডিল পায়ের তলে নামিয়ে বলে,

—হম্‌কো বাচা লিজিয়ে পণ্ডিতজী। যিতনা রূপায়া লাগে দিব। ই মুস্কিল আসান কর দিজিয়ে।

কালিকান্ত বলেন—আমি ওসব বিদ্যাতো জানিনা বাবা। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হবে। কি করে বাঁচাবো?

শেঠজী টাকার বাণ্ডিলটা ব্যাগে পুরে হতাশ কণ্ঠে বলে—তব কিসের পণ্ডিত আপ্‌নে? ক্যা শিখা?

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ ওই ধাপ্পা দিয়ে টাকা রোজকার করতে শেখেননি। সুধাময় ইদানীং বড়দার আশেপাশেই থাকে।

এখানে সে জানে বড়দাকে ধরে থাকতে হবে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে পুথিও দেখে মাথায় ওসব ঢোকে না তার।

তবে সুধাময় কিছু শ্লোক কিছু ধ্যানমন্ত্র মুখস্থ করেছে। ওই তার পুঁজি। সেগুলো আওড়ায় আর বাড়িতে সে নিজেরই একটা ছোট মন্দির করে শিব, কালী মূর্তি করে রেখেছে।

কালিকান্ত অবশ্য ওই বাড়িতে থাকেন না। তিনি থাকেন গ্রামের বাইরে ওই সবুজ নির্জন আশ্রমে। তবু বাড়িতে ওসব মন্দিরে ঠাকুর রাখতে দেখে বলেন—সুধা, দেব-বিগ্রহ শাস্ত্রমতে অভিষেক করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নিত্যসেবা পূজা করতে হয়। নাহলে গৃহস্থের সেবা অপরাধ হয়।

সুধাময় বলে—ওসব করলে তো অনেক ঝামেলা। এমনি রেখেছি পুজো-টুজো

আমিই করি।

কালিকান্ত আর কথা বলেন না। তবে শোনেন এখন সুধাময় শিবলিঙ্গও রেখেছে। *সুধামায় জানে শিবপূজার প্রচলন রয়েছে গ্রামে, শিবরাত্রির দিন সুধাময় হুঙ্কার ছেড়ে* শিবস্তোত্র আওড়ায়। ওসব কিছু বড়দার কাছেই শিখেছে।

—তব প্রসাদাৎ বরদে বরিষ্ঠে

কালং যথেমং পরিপালয়িষ্কা।।

যমোহুথ রুদ্রং তব সুপ্রসাদাৎ

তথা অয়ং কুরু বৈ প্রসাদম্।।

ওর মন্ত্র উচ্চারণ আর ওই গেরুয়া বাস দেখে অনেকেই ভাবে পণ্ডিত বড়দার কাছে অনেক বিদ্যাই রপ্ত করেছে সুধাময়। শিবরাত্রির দিন ভালোই আমদানী হয়।

তেমনি আমদানী হয় কালীপুজোর দিনও, দুর্গাপুজোর ক'দিন সেও বাড়িতে অংবং করে পুজো করে। চণ্ডীপাঠও করে গলা তুলে।

কালিকান্ত বলেন ওকে—অশুদ্ধ ভাবে চণ্ডীপাঠ করিসনা সুধা। সংস্কৃতটা শেখ, শেখার বয়স মানুষের ফুরোয় না। তারপর ওসব করবি।

সুদাময় আড়ালে বলে ওর স্ত্রীকে—বড়দার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আরে অংবং করলেই সংস্কৃত পড়া হয়। স্ত্রী বলে—এসব করছো পয়সার জন্য, এতো পাপই। সুধাময় খিচিয়ে ওঠে। —থামোতো। কিছুদিন ওই ঠিকুজিকুষ্ঠীর ধাপ্পাটা শিখে তারপর দেখবে কি হয়। বড়দা বোকা।

—সেকি গো। বৌ অবাক হয়—কত বড় পণ্ডিত।

সুধাময় বলে

—পণ্ডিত না ছাই। কত শেঠজী, ওই সহরের কনট্রাকটার, সমান্তমশাই, ধানকল মালিক, গুপী দত্ত কত টাকা দিতে চাইল, একটু শান্তি স্বয়তম করে তা করলেন না। হোমযজ্ঞি করে আগুন জ্বেলে একই অংবং করে পোয়াটাক ঘি পুড়িয়ে দিলে হাজার একটাকা—তাছাড়া কাপড়-চোপড় আরও কত কি পেতেন।

—তাই নাকি গো? সুধাময়ের বৌও আপশোষ করে।

সুধাময় বলে

—এবার দেখা যাক কি হয়।

সুধাময় বড়দার সঙ্গে দু-চারটে অনুষ্ঠানে যায়। সে মন দিয়ে শোনে নানা শাস্ত্রবচন। সুধাময় মনে মনে নিজেকে যেন ওই পঞ্চতীর্থ মশায়ের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবেই তৈরি করতে চায়।

তার অন্য ভাই গুণময় এখন বর্ধমান, কলকাতা, আসানসোল জুড়ে তার ক্ষেত্র

তৈয়ারি করেছে। সব জায়গাতেই তার কিছু চেনাজানা লোক আছে। তাদের আস্তানাতেই থাকে।

আর ওই জুয়ার এখন নানা প্রকারভেদ করে নানা ভাবে লোক ঠকানোর কাজে নেমেছে সে।

সাট্টার দলেও ভিড়েছে। আসানসোল এলাকার চারিদিকে কোলিয়ারী। সেখানে আকাশে পয়সা ওড়ে। এক ঝুড়ি কালোমাটি অর্থাৎ কয়লার দাম বিশটাকা কম করে।

এছাড়া শনিবার সারা কোলিয়ারী এলাকা জুড়ে মালকাটা কুলিদের সপ্তাহের পেমেন্ট হয়। কোলিয়ারী এলাকায় সেদিন অনেক জায়গাতেই হাট বসে। জামা কাপড়ে মনোহারি জিনিস থেকে শুরু করে আনাজ, শুট্‌কি মাছ হাড়িয়া সবই মেলে, আর একপাশে বসে জুয়োর আসর।

কুলিরা দমকা কিছু রোজকারের আশায় জুয়োর ছকে টাকা ধরে। আর গুণময়ের চ্যালাদের হাতে সর্বস্ব সপে দিয়ে আসে।

গুণময় ইদানীং একটা মটরবাইক হাঁকিয়ে বিভিন্ন ঠেকে ঘুরে বেড়ায় আদায়পত্র করে আর কোথাও গোলমাল হলে পুলিশকে হাতে এনে দলের ছেলেদের সরিয়ে আনে।

গুণময় একটা জগৎকে চিনছে। কোলিয়ারী এলাকায় এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের অদৃশ্য হাতটা খুবই মজবুত। কোলিয়ারী মালিকরাও তাদের কথামত চলতে বাধ্য হয়।

কিষণ আগরওয়াল তাদেরই একজন। গুণময় বিভিন্ন কোলিয়ারীতে ঘোরে। আর বেশ জেনেছে ওই লোকটিকে মালিকরা মাসিক মোটা টাকা দেয়। নাহলে তাদের কোলিয়ারীর কয়লা আর বিক্রি হবে না। মাল লুট হয়ে যাবে। নাহয় কয়লার সব স্তূপই জ্বলে উঠবে। নাহয় শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়ে যাবে।

গুণময় মটরবাইক নিয়ে ঘোরে। জুয়ার টাকার ভাগ দিতে হয় এলাকার সেই অলিখিত রাজা কিষণ আগরওয়ালকে। তার লোক এসে নিয়ে যায়।

তারপর পুলিশকেও দিতে হয়। দিতে হয় স্থানীয় নেতাদের। দিয়ে-থুয়ে যা থাকে তার পরিমাণ সামান্যই। আর ভয়ত থাকে। অন্যদল একটা গজাচ্ছে। রেলপারের বুলেটের দলও এখন কিছু জায়গায় জুয়ার ছক পাতছে।

ওদের সঙ্গে দু-একবার লড়াইও হয়েছে। গুণময়ের দল বোম মেরে তাদের হঠিয়েছে। তবে গুণময় ভাবনায় পড়ে।

বুলেট মাথা তুলছে। তার রাজ্যে ভাগীদার হতে চায়।

গুণময়ও ছাড়বে না। তবে একটা বড় আশ্রয় তার চাই। বেশ বুঝেছে এই অন্ধকার জগতে থাকতে গেলে তাকে একজন 'গডফাদার' রক্ষাকর্তা, গার্জেন খুঁজে নিতে হবে।

সে কথাটা ভাবছে গুণময়। তার জগতে তাকে টিকে থাকতেই হবে, নয় তাকে ধাপে-ধাপে আরও উপরে উঠতে হবে।

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ সুধাময়ের ব্যাপারটা বোঝেন। ওকে সাবধান করেন।
—পড়াশোনা কর। পূজা-আস্রা করছিস কর, এ নিয়ে লোক ঠকানো ব্যবসা করিসনা।

সুধাময় বলে—না, না। তোমার সুনাম বলে কথা! তেমন কাজ কিছুই করবোনা যাতে তোমার নামে কোন কলঙ্ক লাগে।

সুধাময় তবু গ্রামেই আছে তার চোখেব সামনে। ওর ছেলে দুটো নিতু আর বাদলকে কালিকান্ত স্কুলে পাঠান। বলেন—মনোযোগ দিয়ে পড়বি।

তার বংশের দুই ভাই-এর কথা আর ভাবে না কালিকান্ত।

বেশ বুঝেছে সুধাময় তার জগৎ নিয়েই আছে আর গুণময় নাকি এখন নিজেই ব্যবসা করছে আসানসোলের ওদিকে।

মাঝে-মাঝে দু-চার দিনের জন্য গ্রামে আসে। ফিটফাট পোযাকে। পকেটে টাকাও থাকে। বড় বড় কথা বলে।

—ব্যবসা জমাতে পারলে ওখানে বাড়িই করবো।

কালিকান্ত শোনে মাত্র। তবে তার কেমন ভালো ঠেকেনা। বলেন

—সামান্য যা নিজের যোগ্যতায় অর্জন করা যায়, তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকা ভালো গুণময়। বেশি লোভ ভালো নয়।

গুণময় আড়ালে বাড়িতে বৌদি্কে বলে

—বড়দা সেকেলেই রয়ে গেল। আজকের দিন বদলাচ্ছে! মানুষ যেভাবে হোক রোজকার করবে। তা নয় ওই পচা শাস্ত্র বুলি কপচাচ্ছে ঘরে বসে।

বৌ বলে

—বড়দা ঠিকই বলেন। ওর জন্যই সংসার চলছে। তোমাদের দুই ভাই শুধু বড়-বড় কথাই বলো! ব্যবসা করছো শুনি, টাকাতো দেখিনা?

গুণময় বলে

—সব টাকা এখন ব্যবসাতেই ঢালছি। একটু জমুক, তারপর দেখবে।

কালিকান্ত ওই নির্জনে পাঠ নিয়েই থাকেন। গ্রামের অনেক মানুষ আসে তাঁর কাছে। মাঝে-মাঝে অসেন প্রতাপনারায়ণও।

এদিকের জমিদার। দুর্গাপরের দিকেও তাদের বিরাট জমিদারী। বাড়ি-মন্দির। কালিকান্ত ভটচায মশায় সেদিন গ্রামে ওই গোবিন্দ ঘোষের ব্যাপারে বিধান দিয়েছেন। যে হোক ব্রাহ্মণের মেয়ে তবু তাকে ঘরের বৌ হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে হবে গোবিন্দকে।

এনিয়ে গ্রামে অনেক আলোচনাই শুরু হয়েছে। শরৎ ভটচায এই সুযোগে নিজের প্রতিষ্ঠা জাহির করতে চায়। সে বলে সতীশ চাটুয্যেকে—একি বিধান হে?

সতীশ বলে—সকলে তখন তো মেনে নিলে। ওই হরিশ মাস্টারও বললে—এটাই হওয়া উচিত। তখন তুমি কিছু বললে না। এখন বলছ! আর দেখলাম বরুণ তো মেয়েটাকে নিয়ে গেল বাড়িতে!

শরৎ এখবর জানতো না। সে অবাক হয়।

—সেকি!

সতীশ চাটুয্যে বলে

—আমে-দুধে মিশে গেল। আঠিটাই পড়ে রইল। ওসব নিয়ে আর ঘোঁট পাকিয়ো না শরৎ!

শরৎ বলে

—এত বড় অনাচাব ঘটলো, কি দিনকাল পড়লো বল দিকি? ধম্ম আর রইল না।

সতীশ চাটুয্যে বলে—কলিকাল হে। মুখ বুজে দেখে যাও।

সবচেয়ে খুশি হয়েছে ওই সুখদা ঠাকরুন। সেই ওই বাসন্তীকে ঘরে এনে তুলে সেদিন ঘোষণা করেছিল—এই গবা ঘোষকে এটা মেনে নিতেই হবে। নাহলে আমার নাম মিছে। তেজস্বী বুড়ি সেদিন নিজে গিয়ে হাজির হয়েছিল একমাইল বন পার হয়ে ওই প্রতাপনারায়ণের বাড়িতেই।

গোঁসাইপুরের এদিকে বিশাল দুমহলা বাড়ি। সামনে একটা শিবমন্দির। ওদিকে পূজামণ্ডব, কাছারি বাড়ি। সামনে বাগান। দু-চার জন গোমস্তা প্রজা পাইক বসে আছে দালানে।

সুখদা ঠাকরুন সঙ্গে নেত্যর মাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। নেত্যর মা বলে

—জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করবা কেনে গ অ ঠাকরুন?

লোকমুখে শুনেছে সে জমিদারবাবু রাশভারি লোক। আর বন্দুক নিয়ে ঘোরে। বাঘও যেমন মারে, তেমনি নাকি মানুষও মারতে পারে। তেমনি মানুষের সামনে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না নেত্যর মা।

তাই বলে সে—ঝামেলার কি দরকার গো।

সুখদা ঠাকরুন বলে'—তুই থামতো।

একজন গোমস্তাকেই বলে সুখদা।

—জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করবো, একটু খবর দাও বাবা। খুব জরুরী দরকার।

অনেকেই আসে প্রতাপের কাছে। তাই ওই সুখদা ঠাকরুনকে দেখে প্রতাপনারায়ণ

ভাবেন অসহায় বিধবা বোধ হয় কোন অর্থ সাহায্যের জন্যই এসেছে।

তাই বলে—নায়েবের কাছে যান।

বুড়ি বলে—নায়েবকে দিয়ে এ কায হবে না বাবা। তাই আপনার কাছে এসেছি।

—কি কায? অবাক হন প্রতাপনারায়ণ।

এবার সুখদা ঠাকরুন ওই বাসন্তীর কথাটা সবই বিস্তারিত ভাবে জানায়।

বলে সে—এখন মেয়েটার কি হবে বাবা? ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে? তাই বিচারের জন্য এসেছি আপনার কাছে। আপনি জমিদার—প্রজাপালক। যদি কিছু করেন—গরীব মেয়েটা বেঁচে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ দেখছেন সুখদা ঠাকরুনকে। ওই দরিদ্র বিধবা নিজের জন্য আসেনি। এসেছে একটি অসহায় মেয়ের জন্য। সমাজ যাকে ঠাঁই দেয় না। ও তাকে ঠাঁই দিয়েছে।

ওর সাহস যেন প্রতাপনারায়ণকেও অনুপ্রাণিত করে। বলে প্রতাপনারায়ণ—আমি পঞ্চগ্রামের মানুষদের ডেকে এর বিচার করাবোই। তবে এ ব্যাপারে আপনাদের গ্রামের তর্কতীর্থ মশায়কেও জানান। তিনি তো এ অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে জানি, তাকেও জানান কথাটা। তারপর আমি দেখছি মা।

সুখদা ঠাকরুন বের হয়ে আসে।

নেত্যর মা বাইরে বসেছিল। সুখদা ঠাকরুনকে বের হয়ে আসতে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয় সে।

—এলা তাহলে?

সুখদা বলে—বাড়ি চল।

ওকে এনিয়ে আর কিছুই জানায় না ঠাকরুন। সে ভাবছে এবার কথাটা কালিকান্ত কাকাকে জানাতে হবে। তার বিধানই শেষ কথা।

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ ইদানীং গীতার ব্যাখ্যারচনায় ব্যস্ত। বাইরে বিশেষ যাননা। আশ্রমেই থাকেন।

হঠাৎ সুখদা ঠাকরুনকে এসে প্রণাম করতে দেখে চাইলেন। সুখদা শুধোয়

—কেমন আছে কাকা?

গ্রাম সম্পর্কে ওকে কাকা বলেই ডাকে অনেকে।

কালিকান্ত বলেন—আর থাকা! কোনমতে আছি মা। তোমাদের খবর কি? কালিকান্ত জানেন ওই মহিলার মন্দ-ভাগ্যের কথা। অকালে সব হারিয়েছে ও। তবু সব সহ্য করে বেঁচে রয়েছে।

সুখদা বলে—চলে যাচ্ছে আপনার আশীর্বাদে। কাকা—এসেছিলাম আপনার কাছে।

চাইলেন কালিকান্ত। এবার সুখদা তাকেও বাসন্তী আর বরুণের সব ঘটনা জানায়। কালিকান্ত সব শুনে বলেন—বিয়ে করেছে ওরা?

—হ্যাঁ। বাঁকুড়ায় বিয়ে করে বরুণের চাকরিস্থলের বাসাতে তারা ছিল স্বামী-স্ত্রীর মতই। এখন গোবিন্দ ঘোষ ওই বৌকে নেবেনা। আর নরেশও তার মেয়েকে দূর করে দিয়েছে।

কালিকান্ত অবাক হন

—ওরা কেউ মেনে নিচ্ছে না?

—না। আমি প্রতাপবাবুর কাছে গেছলাম, তিনি পঞ্চগ্রামের বিচারসভা করাবেন। আপনাকেও জানাতে বললেন কথাগুলো।

আপনি কিছু না করলে মেয়েটার বাঁচার পথও থাকবে না। অবশ্য বরুণও চায় ওকে নিয়ে চলে যাবে আবার। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি কেন পাবে না ওরা?

মেয়েটার কি দোষ?

কালিকান্ত কি ভাবছেন।

মনে পড়ে গীতার কথাই।

—মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদঃ

আগমাপরিনোহ নিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।

হে কৌন্তেয় ইন্দ্রয়গণও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ, ইহাই শীত উষ্ণাদি সুখ-দুঃখজনক। সে সকলেরই উৎপত্তি ও অন্যায় আছে। অতএব তাহা অনিত্য, সুতরাং হে ভারত। সে সবকিছুই সহ্য করো।

সেই যুগের কথা।

তবু আজকের যুগেও সেই সুখ-দুঃখ রয়ে গেছে। আর মানুষকে সমাজবদ্ধজীবরূপে বাঁচার জন্যই অনেক সুখ-দুঃখ, বিপর্যয় যাকে রোধ করা যায় না তাকে মেনে নিতেই হবে।

যুগ-প্রভাবে সমাজেও নানা বিপর্যয় আসবে, তাকে রোধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি রোধ করা না যায় তখন তাকে মেনে নিতেই হবে। তাই বোধ হয় যুগধর্ম।

—কি ভাবছেন কাকা? সুখদা কালিকান্তকে ভাবতে দেখে শুধোয়।

কালিকান্ত বলেন—তোমার সব কথা শুনলাম মা। বিচার সভা বসুক, তখন আমার সিদ্ধান্ত জানাবো।

তবু শুধোয় সুখদা—মেয়েটার একটা গতি হবে তো কাকা?

কালিকান্ত দেখছে ওই অনাত্মীয় মহিলার মুখেও অসহায় মেয়েটির জন্য বেদনার ছায়া। মানুষের জন্য মানুষের মঙ্গলকামনা এই শুভচেতনাকে স্বীকৃতি তাঁকে দিতেই হবে। এর জন্য শাস্ত্রের বিধান তিনি বের করবেনই।

প্রতাপনারায়ণ সেদিন দেখেছিলেন ওই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে। পরনে একটা মোটা ধুতি, একটা উত্তরী। প্রাচীনপন্থী মানুষটির মনের উদারতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এই পরিবর্তনকে। বলেন—আরও আমূল পরিবর্তনের ঝড় আসছে। তাকে বাধা দেবার সাধ্য নেই পুরাতন জীর্ণ সমাজের। তাই তাকে মেনে নিতেই হবে।

কথাটা প্রতাপনারায়ণের মনকে স্পর্শ করেছিল। কারণ তার এতদিনের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনাগুলোতেও একটা ভাঙ্গনের ঝড় সমাগত।

সামনে আসছে কঠিন সামাজিক বিপর্যয়। এতদিন ধরে সমাজব্যবস্থা ছিল তাদের হাতে। জমিদার শ্রেণী আর উপরতলার কিছু মানুষ ধর্মের অজুহাত, শাসন দিয়ে সমাজকে চালিয়েছেন। তাদের উপর প্রভুত্ব করেছেন কিন্তু এবার সেই সমাজব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে চলেছে।

ওই ত্রিকালদর্শী মানুষটি যেন সেই ভবিষ্যৎকে প্রতক্ষ করেছেন। প্রতাপনারায়ণ-এর ছেলে প্রদীপকে নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন প্রতাপবাবু। প্রদীপ স্কুল থেকে বের হয়ে কলেজে পড়ছে, জমিদার বংশের সন্তান। সহরে একটা বাড়িও আছে প্রতাপের মামলা তো তাদের এস্টেটের লেগেই আছে। কর্তাদের সদরে যেতেও হয়।

তাই একটা বাড়ি করেছেন সেখানে। ঠাকুর-চাকর, একজন গোমস্তা সেখানে থাকে। উকিলবাবুদের সঙ্গে কাছারিতে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হয়। প্রদীপও সেখানে থেকে কলেজে পড়ছে। দু-একজন অধ্যাপকের কাছে প্রাইভেট কোচিংএর ব্যবস্থা করেছেন প্রতাপবাবু। ছেলেকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে চান, যাতে বিষয়-আশয়, জমিদারী তাদের কোলিয়ারীর ব্যবসাপত্র ছেলে সামলাতে পারে। তাই কলেজে আর্টস্ পড়তেই বলেন ছেলেকে, পরে আইন পড়ান। কিন্তু প্রদীপ তাকে না জানিয়ে কলেজে বিজ্ঞান পড়তে শুরু করে। সায়েন্স নিয়েই ভর্তি হয় নিজে।

সেটা জানতে পেরে প্রতাপবাবু ছেলেকে বলেন—এটা কি করলে? জমিদারী দেখার জন্যই আইন পড়তে হবে--তাই আর্টস পড়তে বল্লাম। প্রদীপ বলে বাবার কথায়—ঠিকই করেছি বাবা। এখন বিজ্ঞানের যুগ। তোমাদের ওই জমিদারী চিরকাল থাকবে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতিও চলবে না। সেদিন বিজ্ঞান পড়া থাকলে হয়তো কোন কারখানাতেও খেটে কিছু রোজকার করতে পারবো।

—কি বলছ তুমি? আমাদের বংশের কেউ চাকরি করেনি। প্রতাপবাবু জানান ছেলেকে। প্রদীপ বলে—এবার দিন বদলের পালায় নিজেরা যদি তৈরি না থাকি ওই বদলের ঝড়ে শূন্যে হারিয়ে যাবো। তাই নিজেদের পথ এখন থেকেই দেখতে হবে। প্রতাপবাবু নীরবে ছেলের কথাটা শোনেন ভাবনাও হয়। কানাঘুসোয় শুনছেন এবার

নতুন সরকার হবে ভোটের মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষও ভোটে দাঁড়াতে পারবে। আর ভোটেই জনগণ যাদের নির্বাচিত করবে তারাই দেশকে শাসন করবে। দেশ শাসনের আইন গড়বে। সেই আইন হবে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই। সেখানে এতদিনের সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ সুবিধা নিশ্চয়ই থাকবে না। তাই প্রতাপবাবুর ভয় হয়। জমিদারী প্রথাই হয়তো উঠে যাবে। উঠে যেতে পারে কলিয়ারীর ব্যক্তিগত মালিকানাও।

সেদিন তাদের কি বিপর্যয় আসবে ভাবতেও পারেন না তিনি। প্রদীপ সেটা বুঝতে পেরে হয়তো নিজের পথই নিয়েছে। তাই তাকেও কিছু বলতে পারেনি। তবু মনে হয় ওরা পিতা-পুত্র যেন দুই মেরুর বাসিন্দা। দুজনের মধ্যে একটা আগামী যুগ যেন দুস্তর মানসিক ব্যবধান গড়ে তুলেছে।

সেদিন প্রতাপনারায়ণ এসেছেন ওই পঞ্চতীর্থ মশায়ের কাছে। সুন্দর আশ্রমিক পরিবেশে সংসারের কোলাহল থেকে দূরে রয়েছেন বয়স্ক মানুষটি। স্কুলের তরুণ হরিশ মাস্টারও এসেছে।

সদ্য পাশ করে বাইরে থেকে এই স্কুলে এসেছে ওই শিক্ষক। এর মধ্যে এই এলাকার জনসাধারণ ওকে আপনার জন বলেই মেনে নিয়েছে। স্কুলের বোর্ডিংএর একটা ঘরে ছেলেদের সঙ্গেই থাকে। সন্ধ্যায় হোস্টেলেই বহু ছাত্রকে পড়ায়। তারজন্য কোন বেতনও নেয় না।

স্কুলকে জুনিয়ার হাই থেকে হাইস্কুলে পরিণত করেছে নিজের চেষ্টাতেই। স্থানীয় মানুষজন তাকে সাহায্য করেছে । কিন্তু তারই ঐকান্তিক চেষ্টাতেই এটা হয়েছে। হরিশবাবুও আসে ওই মানুষটির কাছে। স্কুল সম্বন্ধে নানা পারমর্শও নেয়। প্রতাপবাবুকে দেখে বলেন পঞ্চতীর্থ মশায়।

—আসুন, আসুন!

প্রতাপ প্রণাম করে বসলো। সেদিন বিচারসভায় মানুষটিকে দেখেছেন কাছ থেকে। প্রতাপ বলেন—আপনার কাছে এলাম।

কালিকান্ত বলেন—এ আমার সৌভাগ্যই, রাজদর্শন হলো। খবর দিলে আমিই যেতাম। প্রতাপ বলে—না, না। আমারই আসা উচিত ছিলে আগেই। তা হয়ে ওঠেনি। হরিশবাবু বলেন—আজ উঠি পণ্ডিতমশাই, প্রতাপবাবু। স্কুল আছে। পরে দেখা হবে।

প্রতাপ বলেন—সেদিন আপনার কাছে ওই বিধান আমি আশা করিনি! হাসেন কালিকান্ত—কেন, অবিচার করেছি নাকি? তবে কি জানেন প্রতাপবাবু আজ ওই ছেলে-মেয়েটি দুজনে এসে প্রণাম করে গেল। ওদের বাবা-মা ওদের মেনে নিয়েছেন। ভুল যদি করেও থাকি, ওদের প্রশান্তি দেখে তার জন্য দণ্ডভোগ করেও শান্তি পাবো। মনে

হলো ওদের দেখে আমি কোন অন্যায় করিনি।

প্রতাপ বলেন—না, না। আপনি ঠিকই করেছেন।

তর্কতীর্থমশায় চাইলেন ওর দিকে। বলেন তিনি

—প্রতাপ বাবু, রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন—

চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি
অগ্রদূত কাল বৈশাখীর।

কালবৈশাখীর আগে চৈত্র মাসে দেখেছেন মাঠে-প্রান্তরে দমকা বাতাস ঘূর্ণিঝড় তুলে ঝরাপাতা ধুলোকে শূন্যে নিয়ে যায়। তারপর আসে প্রকৃত কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব প্রচণ্ড রূপে। তেমনি ওই ছেলে-মেয়েটি যা করেছে তা সমাজের এই সনাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষীণ বিদ্রোহ মাত্র। ওরা উপলক্ষ্য, এমনি ছোটো-খাটো ঝড় দেয় বিরাট এক পরিবর্তনের ঝড়ের সংকেত। একটা কঠিন বিপর্যয়ই আসছে তারই পূর্বাভাস মাত্র, একে মেনে নিতে পারলে সমাজব্যবস্থার মাঝে সুষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে সমাজকে সহণশীল করতে পারলেই আগামী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারবো। নাহলে সমাজব্যবস্থা ধ্বসে পড়বে।

প্রতাপও ভেবেছেন কথাটা।

বুঝেছেন পরিবর্তন সমাগত। কিন্তু তার পরিণতি কিহবে জানেন না। তাই শুধোন তিনি

—কিন্তু তারপর কি হবে?

পঞ্চতীর্থ বলেন—তারপর? একটা বিপর্যয়, কালান্তর আসাই স্বাভাবিক। অনেক সর্বনাশই ঘটতে পারে সমাজের মধ্যে, ভারতের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক প্রাণময়তা এতই গভীর যে বাইরে অনেক কিছু ঝড় তাণ্ডবের মধ্যেও সে অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও আবার নতুন করে বাঁচার পথ সন্ধান করে নিতে পারবেই। সেখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য। তবে তার জন্য মূল্য তো দিতে হবেই।

প্রতাপবাবু নীরবে শোনেন ওই প্রাজ্ঞ মানুষটির কথা। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে উনি যেন অনাগত এক সর্বনাশের ছায়াকে স্পর্শ করেছেন। প্রতাপবাবু বলেন—একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

—অনুরোধ একটু অবাক হন পঞ্চতীর্থ মশায়।

প্রতাপবাবু বলেন—আমাদের বাড়িতে এবার মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী, তাই এবার বিশেষ পূজা, ধর্মসভার আয়োজন করা হচ্ছে। মহাপূজার ভার আপনি যদি নেন, যদি ধর্মসভায় উপস্থিত থাকেন খুবই আনন্দিত হবো।

—কবে সেই অনুষ্ঠান?

প্রতাপবাবু জানান—আগামী দীপাবলীতে।

কালিকান্ত বলেন, যাবার ইচ্ছা রইল। তবে তো দেখছেন বয়স হয়েছে! শরীরও জীর্ণ। যদি শারীরিক কোন বাধা না হয় নিশ্চয়ই যাবো। প্রতাপবাবুও খুশী হন।

হরিশবাবু ফিরছেন গোপগাঁ থেকে তার স্কুল বোর্ডিংএর দিকে। পাশাপাশি দুটো গ্রাম। মধ্যেখানে বড় দিঘি। দিঘি ঠিক বলা চলেনা, এদিকে ক্রমনিম্ন রুক্ষ মাটির স্তর দুদিক থেকে নেমে এসেছে। একদিকে দৈপুর-অন্যদিকে গোপগাঁ। মাঝে বেশ কিছু ধানজমি। উপরের দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার উপর শালবন।

ওই বনপ্রান্তর গড়িয়ে জলটা নামে, তাই ওই মাঠকে বলা হয় সোল, অর্থাৎ ভালো চাষের জমি।

তার নীচের জায়গায় একদিকে বাঁধ দিয়ে ওই জলরাশিকে আটকে নীচের জমিতে জলসেচের কাজে ব্যবহার করা হয়।

দৈপুর গ্রামটা আয়তনে বড়। বেশকিছু মানুষের বাস। গ্রামের মাঝখানে একটা দুর্গামণ্ডপ, ওর চারিদিকে রাস্তা বের হয়ে গেছে।

ওদিকে বেশ কিছু কবরেজ, দু-একজন ডাক্তারও আছে। দুর্গম পল্লীঅঞ্চল, অর্থের প্রাচুর্য এখানে নেই। তাই পাশ করা ডাক্তার তেমন কেউ নাই।

রমণ ডাক্তারই এখানের নামি ডাক্তার। সহরের কোন ডাক্তারের কাছে বেশ কয়েক বছর কম্পাউন্ডারি করেছে। ডাক্তারবাবুর কাছে নাকি ইংরাজি বই থেকেই ডাক্তারি শিখে এসেছে এখানে। আর রমণ ডাক্তার শুধু এলোপ্যাথিই করে না। যারা ইনজেকশন ওষুধের পয়সা দিতে পারেনা, তাদের জন্য সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে তার কাছে।

রমণ সকাল থেকেই ঘরের চালার একদিকে একটু উঁচু করে বেদীর মত করেছে, বলে—এটা আমার সিদ্ধ পীঠহে, এখানে বসে যাকে যা ওষুধ দেব ফল পাবেই। আমার ওষুধ কথা কয়।

সকালে কুয়ো থেকে মাজা ঝকঝকে গাড়ুতে এক গাড়ু জল নিয়ে বসে।

—এলোপ্যাথির পয়সা নাই। ঠিক আছে, নিয়ে যা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। ওতে মরা বেঁচে ওঠে রে!

বাপী বলে—আজ্ঞে লেবেনচুসের মত গুলি?

রমণ বলে ওঠে স্মিতহাস্যে—ঠিক বুঝেছিস। গুলিতে কি হয়? মানুষ যেমন মরে সেই গুলিতেই আবার মানুষ বেঁচে ওঠে। বিষে বিষক্ষয় বুঝলিনা? নে—দিনে তিনবার করে খাবি।

ওদিকে কবরেজ পাড়া।

কোনকালে এদের পূর্বপুরুষ কবরেজ ছিল বোধ হয়, এখন কবিরাজ নাহলেও গুপী কবরেজ তো নিজেকে ধন্বন্তরী বলেই জাহির করে।

তার চালাতেও দু-চার জন চাষী-বাসীর ভিড় জমে। গুপী কবরেজ বলে—এর নাম বিশল্যকরণী। হনুমান এই দিয়েই লক্ষ্মণের শক্তিশেলকে জব্দ করেছিল। তোর পায়ের তুচ্ছ্ দরদ যাবেনা এতে কি বলিস? মালিশ করবি বেটে। কালই মাঠে যেতে পারবি। দে আটগণ্ডা পয়সা। তোর জন্য দাম কমিয়েই দিলাম।

হরিশ চলেছে পথ দিয়ে। ওদিকে ভ্রমরের চা-চপএর দোকান একপাশে মুদিখানার দোকানও করে। ওদিকে শিবুর বিশ্বকর্মা ওয়ার্কস্! ছেলেটা সাইকেল লাইট এসব সারায়। করিতকর্মা ছেলে। শিবু বলে—ইস্কুলে চললেন মাষ্টারমশায়?

হরিশ বলে, হ্যাঁ। ভালো আছো তো?

শিবু বলে—আমাদের আর ভালো থাকা! টুকটাক চলছে কুনমতো।

শিবু তখন একটা হাত পুরে কলের গানএর ভিতরে কি টুকটাক সারাবার চেষ্টা করছে। ছেলেটার যন্ত্রপাতিতে মাথা আছে। সহরে কোন কারখানায় কাজ করতো।

কিন্তু সেখানের কোন সুপারভাইজারের সঙ্গে গোলমাল হতে তাকে চড়-চাপড় মেরেই চলে এসেছে গাঁয়ে। তেজী ছেলেটা বলে—মাষ্টারমশাই, গতর খাটাবো খাবো। কারও কাছে মাথা নোয়াবো না।

আর সেটা কাজ করেই দেখিয়েছে শিবু কর্মকার।

এই অঞ্চলের প্রধান কুটিরশিল্প বলতে গেলে কাঁসা-পিতলের নানা ধরণের বাসনপত্র তৈরি করা। সারা গ্রামের একটা অঞ্চলে কর্মকারদের বসতি। ওটাকে বলে কামারপাড়া।

ভোর থেকে কামারপাড়ার আকাশ ওই কাঁসার বাসন তৈরির ঠং ঠাং, ঢং ঢাং শব্দে মুখর হয়ে থাকে।

হরিশবাবু এখানে এসে দেখেছেন এই গ্রাম, আশাপাশের গোসাইপুরেও এই কাজে অনেকেই রয়েছে। এই ওদের রুজি-রোজকার। তবে অধিকাংশ লোকই শ্রমিক।

গ্রামের গোবিন্দ ঘোষ. ওদিকে কমল দাস, দৈপুরের হরষিত চট্টরাজদের মত কিছু লোকই এই ব্যবসার মূল মালিক, তারাই বাঁকুড়া রানীগঞ্জের মহাজনদের কাছ থেকে বস্তাবন্দী খুটভাঙ্গা কাঁসার বাসনপত্র, আরও কিছু পিতল, দস্তা, রাং অন্য মালপত্র আনায় আর এই কামারপাড়ার মানুষদের দিয়েই আবার ওইসব মালপত্র শালের আগুনের উত্তাপে গলিয়ে আরও মাল দিয়ে আবার নতুন থালা-বাটি, হাড়ি বালতি এবার তৈরি করিয়ে এদের বানীটুকু মাত্র দিয়ে ওইসব মাল আবার সহরের মহাজনদের আড়তে দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে।

কামারপাড়ার বাড়ির লাগোয়া শাল করে সেখানেই বদ্ধ পরিবেশে ওরা বড় বড় মুচিতে হাপরের হাওয়া দিয়ে সেই ধাতুকে গলায়। ছাঁচে ঢালে আর পিটে পিটে নরম ধাতুর চাদর থেকে নানা ধরণের বাসনপত্র তৈরি করে। হরিশ মাষ্টার দেখেছে ধোঁয়ায়

কালো হয়ে গেছে দেওয়াল, একটা ছেলে বড় হাপরের শিকলি টেনে চলেছে। এদিকে বড় উনুনের মত, তাতে আগুন ওই হাওয়ায় নীলাভ হয়ে ওঠে। মুচিতে ফুলছে তরল ধাতু, রাংএ গন্ধ ওঠে।

কাশছে, তবু ওই ধোয়া ধুলোর মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে ওরা মাল ঢালছে। অন্যদিকে দুপায়ে ঠেক দিয়ে কেউ ঘূর্ণিকল ঘোরাচ্ছে, ওখানে কুঁদে বাটি-গ্লাশ-হাঁড়ির পালিশ হচ্ছে পেটাই করার পর।

শিবু কর্মকারই হরিশবাবুকে নিয়ে গেছে ওই পাড়ায়।

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ওই কর্মকাণ্ড চলেছে। হরিশবাবু এসেছেন কেদার কর্মকারের কাছে।

এই জায়গাটা বেশ বড়সড়। সামনে একটা পুকুর। গাছগাছালিও আছে। পাড়ার গিঞ্জীভাবটা এখানে নেই। ওদিকে লম্বা টিনের চালার নীচে ঢালাই হচ্ছে! জায়গাটা খোলামেলা। ওপাশে একটা অফিস ঘরের মত।

হরিশবাবুকে দেখে বের হয়ে আসে একটি মাঝবয়সী লোক। শিবুই পরিচয় করিয়ে দেয়—আমার কাকা, কেদার কর্মকার।

কেদারও বোধহয় কোঁদাইএর কাজ করছিল। কাপড়টা কোমরে জড়ানো। ফতুয়াব উপর কাঁকরগুড়োও লেগে আছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে সেগুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে কেদার বলে—আসুন মাস্টার মশাই। দেখে যান আমাদের কাজকম্ম। একটা কয়লার মত কালো জামা পরা ছেলেকে বলে—ফকির, তিন কাপ চা বলে দে।

হরিশ বলে—আবার ওসব কেন?

কেদার বলে—এলেন প্রথম, একটু চা সেবাও করবেন না। তা কি হয়? চলুন।

কেদারের নিজের শাল তার কাছেই হরিশবাবু এখানের এই কাংসশিল্পের অনেক ঘরেই পান।

হরিশ বলে—তাহলে বাকী ওরা!

কেদার বলে—ওরা ফুরোনে কাজ নিয়ে এসে নিজেরাই ওইভাবে কাজ করে। আর মজুরি পায় মাত্র। কখনও কিছু মহাজনের মালে ভরণের ভাগ বেশি দিয়ে কমা মাল তৈরি করে, বাকী মালে নিজেরা দুচারটে বাসন বানায়।

ওসব উঞ্ছবৃত্তির কাজ পেটের দায়ে করে। ঠিকঠাক মজুরিও দেয় না এরা।

হরিশবাবু বলেন—মাত্র ওই তিনজনই এই ব্যবসা করে?

—হ্যাঁ। কমলদাস তো রাঘববোয়ালবাবু, সকলের সর্বস্বও গ্রাস করতে চায়। আর হরষিত চট্টরাজও তাই। আসলে ওর সুদ, বন্দকীর ব্যবসা। সেইসঙ্গে এটাও করে। আর গোবিন্দবাবুর সহরে মোকাম আছে। সরকারী কর্তাদের সঙ্গে ওঠাবসা। মায় দারোগাবাবুও ওকে সমীহ করে। পঞ্চায়েতের মাথা। টাকার অভাব নাই।

ওদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আমি কি কাজ করতে পারি? মাঝে-মাঝে চট্টরাজের কাছে দেনাও নিতে হয় বেশি মাল কেনার জন্য। তার সুদ দিতে লাভের কড়িই চলে যায়।

হরিশ ভাবছে কথাটা। বলে সে

—এতলোক এই কাজ করছে। আপনারা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সমবায় সমিতি কেন গড়েন না? তাতে সরকারও সাহায্য করবে আপনাদের সমিতিকে। আর সমিতিই সোজা মহাজনের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনে তাদের বিক্রি করবে।

কেদার কর্মকার ভাবছে কথাটা। বলে সে—তাহলে তো এরা দুটো পয়সা পাবে মাস্টারমশাই, ওই মাঝখানের মুনাফাখোরদের হাত থাকবে না। এতো খুব ভালো কথা। কিন্তুক মুক্ষু লোক আমরা তাই আমার ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাচ্ছি। এসব লেখাপড়ার কাজ তো জানিনা।

শিবু ম্যাটিক পাশ করে কোন কারখানায় শিক্ষানবীশি করেছে। হরিশ বলে—কেন শিবু পারবে না এসব কাজ? ওকে দেখিয়ে দিলে ওই-ই শহরে গিয়ে সরকারি মহলে যোগাযোগ করতে পারবে।

কেদার বলে—তাহলে তো খুব ভালোই হয় মাস্টারমশাই। আমি পাড়ার সবাইকে বলছি। আপনি বরং একদিন তাদের সবাইকে কথাটা একটু বঝিয়ে বলবেন। তারপর আমরা কামারপাড়ার সবাই সেইমতই কাজ করার কথাটা ভাববো। শিবু কিছুটা আঁচ করেছে ব্যপারটা। সে বলে—কাকা, এসব করলে ওই কমল দাস, চট্টরাজ, গোবিন্দবাবুরা কিন্তু ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখবে না। তোমরা ওদের লাভের কড়ি মারতে চাইছ ওরা কি চুপ করে থাকবে? থাকবে না।

কেদারও বোঝে কথাটা। তবু বলে সে—কামারপাড়ার সবাই যদি এটা চায়, তাহলে হবে। তারজন্য হ্যাঁপা সামলাতে হলে সবাই সামলাবে। ওরাও ডবল মজুরি পাবে। কেনে মাথা তুলবে না?

হরিশ বলে—বাধা তো আসবেই কেদারবাবু, তবু কিছু করতে গেলে সেই বাধাকে ভয় করলে চলবে না।

কেদারও এবার নতুন স্বপ্ন দেখে। বলে সে—ওদের সবাইকে ডাকাই একদিন।

শিবু বলে—আর মিটিং করো কাকা আমাদের ভিতর বাড়িতে রাতের বেলায়। আমরা ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে এসব কথা।

কেদার বলে—তাই হবে। আপনি সেদিন আসবেন মাস্টারমশায়। সমবায়ের ব্যাপারে সবাইকে বুঝ করাতে হবে। শালে হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে ওদের মাথাও শক্ত নিরেট হয়ে গেছে, তাই খুলে না বল্লে ওরা কিছুই বুঝবে না, উল্টোই বুঝবে।

হরিশবাবু বলে—ঠিক আছে। তাই আসবো।

হাবু ঘোষ গোয়ালাপাড়ার ওদিকেই থাকে। এককালে হাবু গোয়ালাপাড়ার একজন সঙ্গতিপন্ন লোকই ছিল। যোগ্য ছেলে মারা গেল দুদিনের সান্নিপাতিক জ্বরে। গুণী কবরেজ ঔষুধপত্র দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

ছেলেটা মারা যেতে হাবু কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। শক্ত জোয়ান মানুষটা কেমন যেন ভেঙ্গে পড়লো। বৌ বলে—এত ভেঙ্গে পড়লে চলবেক? মেয়েটা রইছে। তার মুখ চেয়ে শক্ত হতে হবেক। হাবু চুপচাপই থাকে।

এই সুযোগে তার যোগ্য ভাইপো মাণিক কাকার জমিগুলো ভাগেই চাষ করতে চাইতে হাবুও তাকে ভাগচাষ করতে দিল। হাবুর বৌ বলে—কি করছ? নিজে কি করবা?

হাবু বলে—টগরের বিয়ে দিয়ে দেবে। ব্যস! তারপর দুজন নবদ্বীপেই চলে যাবো। হাবু এমনিতে একটু নিরীহ ধরনের মানুষ। নামগান করে। বলে শরৎ ভটচাযকে নাম করে ছেলে গেল, তবু নাম ছাড়বো নাই হে। শেষঅবধি দেখবো হে ভটচায! শরৎ ভটচায ওর কাছের লোক।

শরৎ ভেবেছিল হাবুর দু-এক বিঘে জমি সস্তায় হাতাবে। সেই আশাতেই রয়েছে সে। অবশ্য শরৎ ভটচায মাঝে-মাঝে আসে হাবুর এখানে। টাটকা সফেন দুধ মাঝে-মাঝে নিয়েও যায়।

হাবুর মেয়ে টগর বলে—পেঁদো ভটচায। নেবার তালেই আছে।

মেয়েটা বেশ ঝাঁঝালো। বয়স হচ্ছে আর রূপ-যৌবনও যেন ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। হাবু বলে—বামুন, দ্যাবতা! ওসব বলতে নাই রে টগর।

টগর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলে—বামুন! থামোতো। সৌরভী লোহারের ঘরে কেনে যায় রাতদুপুরে? সৌরভীর ঘরে ওর জন্য আলাদা হুঁকো আছে কড়ি বাঁধা তা জানো?

হাবুর বৌ বলে—চুপ কর মুখপুড়ি। যা তো!

মেয়েটা সরে যায়। বাড়িতে তার বেশি সময় থাকার উপায় নাই। মেয়েটা সারা গাঁয়ে টহল দেয়, ছেলেদের সঙ্গে গাছ কোমর করে বাগানে ডাংগুলি খেলে। খেলায় গোলমাল হতে সেদিন বেনেদের কেষ্টকে ডাংএর এক ঘায়ে কপালই ফাটিয়ে দিয়ে এসেছিল।

হাবু ঘোষ দাসদের পাড়ায় গলবস্ত্র হয়ে মাপ চেয়ে আসে। হাবুর বৌ বলে—ওটাকে দূর করো এবার। যোগ্য ছেলে চলে গেল ওই দজ্জাল মেয়েকে নে কি দুঃখ ঘুচবে। সারা গাঁয়ে বদনাম এইবার দূর করো ওকে। আপদ যাক।

মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তখন খাঁচায় ধরে আনা টিয়াকে লঙ্কা খাওয়াতে মায়ের কথায় বলে—তোমার কথাতেই সব হবে বুঝি?

মাও ফুসে ওঠে—শোন কথা মেয়ের।

হাবু ঘোষের মনে পড়ে ছেলেটার কথা। ওই মেয়েটার চাহনিও যেন ঠিক তার মরা ছেলে গোপালের মতই। সেই মুখ-চোখ!

বলে হাবু—এসব কেন করিস টগর?

টগরও বলে—বুঝলে অনায্য ব্যাপার সইতে পারি না। ঠিক আছে তোমরা বলছ আর ডাংগুলি খেলব না।

তবু ঘরে মন টেকেনা টগরের। কাস্তে আর বস্তা নিয়ে মাকে শোনায়—ঘাস করে আনি।

সবুজ ঘাসের বুকে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে টগর। শিশিরের ভিজে ভাব তখনও ঘাসের বুক থেকে মুছে যায়নি। সবুজ ঘাসের বুকে তার পায়ের দাগ পড়ে, যেন লক্ষ্মীর পা।

মাঠের বুকে কাদরে তখনও হাটু জল রয়েছে, কাদরের ধারে অর্জুন, আকাশমণি চটকা গাছের জঙ্গল। এই কাঁদরটার নাম শুভঙ্করের দাঁড়া। টগর পাঠশালে কয়েক বছর গেছল। তখনই শুনেছিল বিঘেকালি, কাঠাকালির পদ্য।

কুড়োবো কুড়োবো কুড়বো লিঝ্যে।

কাঠায় কুড়োবো কাঠায় লিঝ্যে।

কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ—

ওসব হিসাব তার মাথায় ঢোকে না। সেই শুভঙ্কর পণ্ডিতই নাকি বিঘেকালির হিসাব বের করেছিল। অনেক অঙ্ক জানতো। এই খাল সেই কাটিয়েছিল জলসেচের জন্য, সামনে গিয়ে খালটা দুভাগ হয়ে একটা পলাশডাঙ্গার দিকে চলে গেছে, অন্যটা গেছে কাঁটাবাধের দিকে।

লোকে বলে ওটা নাকি ছ'আনি, দশ আনির দাঁড়া। অর্থাৎ এই কাদরের জল ওখানে একটা খাতে দশ আনা জল পাঠায়—অন্যখাতে যায় বাকী ছ'আনা পরিমাণ জল।

এতশত ভাবে না টগর। স্তব্ধ কাঁদরের ধার, গাছের ডালে একটা মাছরাঙ্গা পাখি জলের দিকে চেয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। আখক্ষেতের বুকে হাওয়ার আনাগোনা, ক্ষেতে ঝিঙে ফুলগুলো সবে দিনের আলোয় চোখ বুজেছে। ছাতার শালিখ পাখির কলরব ওঠে একটা কোকিল ডেকে চলেছে।

টগরও গলা তুলে ডাক দেয়—কু-উ

কোকিলটাও সাড়া দেয়। ওদের দুজনের ডাকাডাকির পাল্লা চলে। এই শান্ত নিভৃত সবুজে টগর নিজেকে খুঁজে পায়। দূরে দেখা যায় সাতজোড়ার শালবন, শীতশেষে বনে বনে হলুদ আভা জাগে। কাঁদরের ধরে বন কুলগাছে কুল পেকে হলুদ-সোনালী হয়ে আছে।

টগর ঘাস কাটতে থাকে। ওদিকেই পাড়টা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ওখানে মাটির রং কালো-লাল মেশানো আঠাল মাটি। হঠাৎ ওই মাটির স্তর কাটতে দেখে চন্দন কুমারকে।

টগর জানে কুমোরপাড়ার অতুল কুমোরের ছেলে চন্দনকে। টগর ওদিকেও যায়। দেখেছে অতুল কুমোরদের পাড়ার অনেকেই মাটির হাড়ি-কলসী, মালসা এসব তৈরি করে। কেমন ঘুরন্ত চাকার মাথায় স্রেফ হাতের কারিকুরিতে ওই মাটির তাল থেকে হাড়ি, কলসী, কত কি তৈরি করে।

আবার দেখেছে ওই চন্দনকে, সে ওই হাড়িকুড়ির চেয়ে আরও সুন্দর অনেক মূর্তি তৈরি করে। ঘোড়া-হাতি, মা-মনসার চালি তৈরি করে। রং দিয়ে ওই চালিকে যখন চিত্র-বিচিত্রিত করে টগর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দুচোখে তার অবাক বিস্ময়। একটা সাধারণ সরা, তাকেই রং করে চক্ষুদান করে মা দুর্গার মুখে পরিণত করে, যেন জীবন্ত মা দুর্গা। অবাক হয়ে বলে টগর—ইকি গো, যাদু জানো লাগছে।

হাসে চন্দন ওর দিকে চেয়ে। টগরের সুন্দর ভ্রূ, ওর দীঘল আয়ত চোখ, তার আঁখিপল্লব, সুন্দর ওই মিষ্টি হাসি চন্দনের শিল্পীমনকে যেন একটি কল্পনার স্বপ্নে স্বপ্নরঙিন করে তোলে। বলে সে—কেনে গো?

—মাটির সরাকেই জীবন্ত মা দুর্গা করে তুললে? না বাপু যাদুই জানো, নালে মরা মাটিকে জীবন্ত করতে পারতো না?

চন্দন জাতশিল্পী। অতুল কুমোর এতকাল ওই হাড়ি-কলসী, সরা-ঘট এসব তৈরি করে রোদে শুকিয়ে শালে পুড়িয়ে হাটে বেচতো। তার খদ্দের ছিল গায়ের মানুষই। চন্দন তার একমাত্র ছেলে। এ গ্রামের ইস্কুলে পড়েছিল সে। তখন থেকেই বাবার সঙ্গে মাটির কাজ করতো। কিন্তু তাতে ওর মন ভরতো না। সে বলে—বাবা, হাড়ি-কলসী বেচে কি পাও?

অতুল বলে—জাতব্যবসা, এই করতে হবে। তবু দিন তো চলছে বাপ।

চন্দনের মামার বাড়ি পাঁচুমুড়োতে। ছেলেবেলায় গেছে ওখানে। দেখেছে ওখানে তার মামারা মাটি থেকেই নানা কিছু তৈরি করে। গেছে বিষ্টুপুর—চন্দন দেখেছে বিষ্টুপুরের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কত নিপুণ সূক্ষ্ম শিল্পীর কাজ।

হাতি-ঘোড়া—মনসার ঝারি, সবকিছু গতিময় প্রাণময়। কত শতাব্দী পরেও আজ তাদের ঔজ্জ্বল্য—সেই সৃষ্টি মুছে যায়নি। ওর মামা বলে—নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষ এসব করেছিল। আজ আমরা ওইসব ভুলে গেছি। তবু নিজেরা ওই ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই করছি।

চন্দনও ভাবে তাকে এমনি কিছু করতে হবে। পাঁচমুড়ায় দেখেছে নানা কাজ। চন্দন বলে—মামা, কিছুদিন এখানেই থাকবো। তোমাদের কায একটু শেখাবে? মামা

বলে—ভালোই তো। তোর বাবা আবার অমত করবে না তো?

চন্দন বলে—বাবা তার নিজের পথেই চলবে। আমাকে আমার পথ দেখে নিতে হবে মামা। কুমোরের কাজই তো করছি।

অতুল কুমোর শোনে কথাটা। তাকে বাধ্য হয়েই এই সব করতে হয়। আর বছরে গ্রামের দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, সরস্বতীর মূর্তি কয়েকটা করে মাত্র। অতুল বলে—ব্যাটা আমার শিল্পী হবেক। মামাদের পাল্লায় পড়েছে। ইদিকে আমার ঘরবাড়ি, জমি-জারাত, শাল ইসব কি হবেক?

অবশ্য চন্দন বছর দুয়েক মামার বাড়িতে থাকার পর ফিরে এসে এখানেই একটা চালাঘর করেছে বাড়ির পিছনে। সেখানে সে মাটির হাতি, ঘোড়া মনসার ঝারি, যুদ্ধরত ষাঁড় এসব তৈরি করে। নিজেই গ্লেজ মিশিয়ে রং করে আলাদা শালে পোড়ায়।

তার ওই সব মাল সদরে, বিষ্টুপুরেই পাঠায়। অতুলের ব্যবসাও দেখে। বিশেষ করে দুর্গা মূর্তিও গড়ে এখন বেশ কয়েকটা গ্রামেরই। মূর্তির মুখের আদল, চোখএর বৈশিষ্ট্য-এর মধ্যেই এলাকার মানুষকে মুগ্ধ করেছে।

টগরও দেখে চন্দনের কাজ। মায়ের মূর্তি কেমন যেন ধীরে-ধীরে জীবন্ত হয়ে ওঠে। চক্ষুদানের সময় ওই চন্দন যেন অন্যমানুষ, তুলির সূক্ষ্ম টানে মুখ-চোখ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই চোখ যেন প্রাণবন্ত। টগর বলে—ধন্যি গো তুমি!

টগর হঠাৎ কাঁদরের ধারে ওই ঢিবি থেকে চন্দনকে মাটি তুলতে দেখে চাইল। গরুর গাড়িতে খড়ের ছাদলা দেওয়া, যাতে সংগৃহীত মাটিগুলো পড়ে না যায়।

একটু মুনিষ তার দেখানো জায়গায় মাটি কাটছে। চন্দন মাটিগুলো পরখ করে দেখে বলে—ওখানে নয়, এই দিকে কাট। এই মাটি।

টগর এসে হাজির হয়। রোদের ঘেমেছে মেয়েটা এলোমেলো বাতাসে ওর আঁচল ওড়ে। মাথার কোঁকড়ানো চুলের একটা লতি তার চোখে পড়েছে। হাসলে মেয়েটার নিটোল গালের দুদিকে সুন্দর টোল পড়ে। চোখের কালো তারা থেকে হাসিটা যেন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। যৌবনমদির দেহে সদ্যজাগর যৌবনের মাদকতা।

চন্দন এই নিভৃব সবুজে হঠাৎ ওকে দেখে চাইল, যেন বনদেবীকেই সামনে দেখেছে সে।

টগর বলে—ই মাটিতে কি হবেক গো? মরা মাটিতে?

চন্দন বলে—হাতের যাদুতে মরা মাটিকে জীয়ন্ত করে তুলবো টগর!

টগর বলে হাসতে হাসতে—তা তুমি পারো বাপু! তা পারো।

ওদের মাটি কাটা হয়ে গেছে। চন্দন বলে টগরকে—বাড়ি ফিরবা তো?

টগর হাসতে হাসতে বলে—কেনে গো, আমাকে নিয়ে দেশন্তরী হবা নাকি?

চন্দন চমকে ওঠে ওর কথায়। চন্দন বলে—সে বরাত কি হবে?

মেয়েটা চুপ করে যায়। চারিদিকে রোদ ঠা-ঠা করছে। তার মধ্যে এই ছায়াঘন কাঁদরের স্নিগ্ধতাটুকু ওদের মনে ক্ষণিক স্বপ্নের আভা আনে।

পাখি ডাকছে। ওই টগরকে এভাবে এত কাছ থেকে দেখেনি আগে। দেখছে চন্দন। সুপ্ত যৌবন টগরের দেহে এক বিচিত্র রূপ এনেছে। ওর অনাবৃত দুটো নিটোল হাত, বুকে সদ্য জাগর যৌবনের প্রদীপ্ত ঘোষণা যেন সোচ্চার।

টগরও ওর বিচিত্র নীরব চাহনির সামনে বিব্রত বোধ করে। অনুভব করে টগর ওই শিল্পীর চোখে কি নীরব স্বীকৃতি। মনটা কি তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

কিন্তু তার প্রকাশের ভাষা নাই। ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই বলে টগর—চলো, বেলা হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে হবেক।

গরুর গাড়িটা নিয়ে চন্দনের মজুর গাড়ি চলার লিগ্ ধরে ওদের গ্রামের দিকে চলেছে। এরা হাঁটা আলপথে ফিরেছ গ্রামের দিকে। টগর যেন আজ হঠাৎ নিজের মনের একটা নীরব ব্যাকুল তৃষ্ণাকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করে চন্দনকে ঘিরে তার মনের এক মধুর স্বপ্নকে।

হাবু ঘোষও সংসারের থেকে মুক্তি পেতে চায়। সমর্থ, যোগ্য ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই সংসার সম্বন্ধে তার একটা অনীহা এসেছে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে সেও নিষ্কৃতি পেতে চায়। ইদানীং টগরকে নিয়ে বাড়ীতে অশান্তি হচ্ছে।

মেয়েটা বড় হয়েছে। সমাজে এতবড় মেয়েকে রাখা অনুচিত। মেয়েটাও নিজের খেয়ালেই থাকে। মাঠে-বাগানে ঘোরে, ভোরের বেলায় শালবনের মাথার আকাশে আবীরের রং ছড়িয়ে সূর্য ওঠে, মেয়েটা ওই দিকেই তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে। বলে—কি সুন্দর না বাবা! সারা জগতের যেন ঘুম ভাঙ্গছে। দ্যাখো।

হাবু এতে দেখার কি আছে বোঝে না।

কোনদিন সন্ধ্যার পড়ন্ত বেলায় কাঁদরের ধারে গুম হয়ে বসে থাকে। পশ্চিম সীমান্তে সূর্য ঢলে গেছে, বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরবে, দিগন্ত সীমান্তে আঁধার ঘনায়।

তখনও তন্ময় হয়ে কি দেখছে টগর।

অনেকে বলে—হাবুর মেয়েটা পাগলীই হে। হাঁ করে এত কি দেখে?

টগর ওদের জানাতে পারে না কি দেখে সে। তার কাছে সকাল-সন্ধ্যার রূপ এক স্বপ্নজগৎ রচনা করে। পাখিদের কলরব তার মনে কি সুর আনে শাল মহুয়াবন তাকে যেন ডাক দেয় কোনরূপ জগতে। এসবের অর্থ সে ওদের বোঝাতে পারে না। টগরের ভালো লাগে চন্দনকে।

কেন জানেনা কি দুর্বার আকর্ষণে সে ওখানে যায় মাঝে-মাঝে। সবুজ বাঁশবন ঘেরা

নির্জন চালাটায় তন্ময় হয়ে কাজ করে চন্দন। এর মধ্যে সে সহরের মহাজনের কাছ থেকে কিছু পোড়ামাটির কাজ পেয়েছে।

বিষ্টুপুরের রীতিতে তৈরি হচ্ছে কিছু মাটির কাজ, ইদানীং সহর কলকাতার অনেক বাড়িতে নাকি এসব জোগাচ্ছে অনেকে। তাই ওদের এই কাজের ভালো চাহিদা হয়েছে।

আরও কিছু ডিজাইন দিয়েছে চন্দনকে ওই হরিশবাবু। হরিশ মাস্টারও চন্দনের গুণমুগ্ধ। সহজ সরল মানুষটি সেদিন হঠাৎ এদিকে এসে চন্দনের হাতের কিছু ঘোড়া-মনসার ঝারি দেখে বলে—বাঃ সুন্দর কাজ তো!

চন্দন ওকে টেরাকাট্টার কথা বলতে হরিশবাবু বলেন—আমি অনেক টেরাকাট্টার ছবিও তুলেছি। তোমাকে দেব। ওই ধরণের কাজই করার চেষ্টা করো। বিষ্ণুপুর ঘরওয়ানার কাজ, দেখবে এর দাম পাবে।

অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, বাদ্যকরের শোভাযাত্রা, হাতির দল...রামায়ণের কিছু কাহিনীর রূপ, দশাবতার নানা ধরণের পুতুলের কায দেখে চন্দন এবার ওই রীতিকেই কাজ করছে।

সেদিন টগর এসেছে। ওদিকে কাজে ব্যস্ত রয়েছে চন্দন। টগর দেখছে ওকে।

চন্দন বলে—একটা জিনিষ দেখবে চলো?

হাসে টগর—আবার কি বানালে গো? বাঁদর?

ওদিকে কাপড়ের ঢাকা খুলতে দেখা যায় একটি মেয়ের মুখ, সবে আদলটা ফুটে উঠছে। সুন্দর নিটোল হাত, যেন ঘুমন্ত এক প্রতিমা।—কি গো?

চন্দন বলে—মাটির বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি গো।

হাসে টগর—চেষ্টা করো। দ্যাখো পারো কিনা।

হাবু ঘোষ কিছুদিন ঘুরে খোঁজখবর নিয়ে একটা পাত্রের সন্ধান পেয়েছে আম্‌ঠেতে। পালটি ঘর। জমিজমা আছে, নিজেদের চাষবাষ। আর গরু-মোষও আছে কয়েকটা। বেলেতোড়ের দোকানে পাইকেরী রেটে দুধ সাপ্লাই দেয়। তবে বয়স একটু বেশি।

আগে বিয়ে করেছিল। সে স্ত্রী কয়েকবছর থাকার পর মারা যায়। কোন ছেলেপুলে নেই। ছেলেটির মা বর্তমান।

হাবু ঘোষ বলে টগরের মাকে— ছেলেটি ভালোই। একটু বয়স হয়েছে এই যা। তবে ত্যামন নয়। আগের পক্ষে ছেলেপুলেও নাই।

টগরের মা বলে—তা ভালো, সতীন থাকা বড় জ্বালার গো। যা মেয়ে ওসব থাকলে বিয়েতে হাঁ করবে না।

হাবু ঘোষ বলে—তা নাই। তবে বাপু পাঁচশো টাকা নগদ আর একটা মোষও দিতে হবেক।

টগরের মা বলে—এতো?

হাবু মনস্থির করেই ফেলেছে। বলে সে—যা আছে তা তো ওরই। শ'পাঁচেক টাকা কমল দাসের কাছে লিব। ঘরখর্চাও তো আছে। আর আমার মোষকে দেখবেক। জামাইকেই দোব। ওখানেই কথা দিচ্ছি।

টগরের মা বলে—ছেলেও মেয়ে দেখে যাক। আমিও ছেলেকে দেখি একবার।

হাবু বলে—তা ওকে আসতে বলছি। তবে মেয়েকে এসব বলো না। ছেলেও আসবে যেন আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে।

—শেষে যদি গোলমাল হয়। যা জেদী মেয়ে তোমার?

টগরের মায়ের কথায় হাবু বলে—তেমন কিছু হবেক নাই। বিয়ের দিন দেখবে ঠিক উতরে যাবে।

টগর এসবের কিছুই জানে না। সে এখনও মুক্ত বিহঙ্গের মত গোপগাঁয়ের বাগানে, নদীর ধারে, শাল-মহুয়ার বনে ঘোরে। চন্দনের এখানে আসে।

এখন সেও অবাক হয় সেই মূর্তিটা যেন ধীরে-ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে উটছে। টগর সেদিন অবাক হয়।

—ইকি করেছো গ কারিগর?

চন্দনকে সে ওই নামেই ডাকে। চন্দন বলে—কি হলো?

টগর মূর্তিটা দেখে বলে—ই যে আমি গ! দ্যাখ—শ্যাষ ম্যাষ আমাকেই গড়লা তুমি?

হাসে চন্দন। টগরের চোখে চোখ রেখে বলে চন্দন—তোমার স্বপ্নই দেখি টগর। তাই সেই স্বপ্নকে সজীব করতে মন চাইল। এ আমার নিজের মনের কথা—

টগরের হাতখানা ওর হাতে। পড়ন্ত বেলায় বাঁশবানে তালগাছে উদাস হলুদ রোদের মায়া। একটা ঘুঘু ক্লান্তস্বরে ডেকে চলেছে।

দুজনের মন ওই স্পর্শটুকুর মাঝে যেন অনেক, অনেক পাবার স্বপ্ন দেখে। চন্দন বলে—যেদিন তুমি সামনে থাকবে না, সেদিন তোমাকে পাবার জন্যই ওই ভাবে গড়ে তুলছি টগর।

টগর দেখছে ওকে। আজ তার মনেও কি বিচিত্র সুরের অনুরণন। ওই মাটির কাছাকাছি মেয়েটির মনে আজ এক নতুন সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে চন্দন। যেন মাটিকে সে প্রাণবন্তই করেছে।

টগর বলে—আমি তোমার কাছেই থাকবো কারিগর। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। কখনোও যাবো না, না।

চন্দন দেখছে ওই জেদী মেয়েটিকে। ওর ডাগর চোখের অতলে যেন হারিয়ে যায় চন্দন। ওই চোখ তাকে আঁকতে হবে। ফুটিয়ে তুলতে হবে সেই আকুতি শিল্পীর তুলিতে তাই যেন মনের অতলে ওর ছবিটাকে সে অমর অক্ষয় করে রাখতে চায়।

বাড়িতে এমন লোকজন, অর্ধপরিচিত আত্মীয়-স্বজন আসে মাঝে-মাঝে। সেদিন ও এসেছে একটি মাঝবয়সী লোক। টগরের মা বলে টগরকে—কুটুমমানুষ এসেছে, এমন বিছছিরি হয়ে ঘুরবি না।

টগর পাখিদুটোকে দানা খাওয়াচ্ছিল। পরণে একটা আধময়লা শাড়ি। মাথার চুলগুলো কোনমতে জড়ানো। মায়ের কথায় বলে টগর—তাহলে কি করতে হবেক?

মা ওকে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেবশ চুলগুলোকে আঁচড়ে একটা ভদ্রস্থ বেণী পাকিয়ে বলে—একটা ফর্সা জামা-কাপড় পর বাপু। নাহলে ভাববে মেয়েকে দেখতে পারিনা। অযত্নে রেখেছি।

মা জোর করে টগরকে শাড়ি পালটে নিতে বাধ্য করে। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখে মা। অযত্নে, অবহেলায় ঘোরে মেয়েটা। আজ সামান্য প্রসাধনে মেয়ে যেন রূপময়ী হয়ে উঠেছে। নিটোল গড়ন—পানপাতার মুখ, চোখে কাজল দিতে চোখের গভীরতার রহস্যময়তা যেন বেড়ে ওঠে। দেহে যৌবনের জাগরণী। মা মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে চুমু খায়।

অবাক হয় টগর মায়ের এই কাণ্ড দেখে। বলে—কি হল বলতো তোমার? হঠাৎ এত আদর!

মা বলে—মেয়েকে আদর করলেও দোষ! চল-ভূষণ কতদিন পর এসেছে। ওর খাবার-টাবার দিবি।

হাবু ঘোষ বাইরের ঘরের ভিতর ভূষণের সঙ্গে কথা বলছে। চাষবাষ এবার ধানের বতরের কথা হচ্ছে। ভূষণদের গ্রাম ডাঙ্গার দিকে। ওদিকে গাছগাছালি তেমন নেই।

তবে চাষের জমি বেশ উর্বরা। ভূষণ তার দুধের ব্যবসার কথাও বলছে। কিন্তু তার চোখ যেন সর্বদাই অন্য কিছুর সন্ধান করছে।

হঠাৎ ওই প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢোকে টগর। পরনে চাঁপাফুলের রংএর হলুদ একটা শাড়ি। ওর ফর্সা রং যেন আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে ওই শাড়িতে। চোখের চাহনিতে কি রহস্যময়তা। হাতে বড় কাঁসার বাটিতে দুধ চিড়ে কলা আর ঘরের তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ।

ভূষণ দেখছে টগরকে। মধ্যে যেন ঘরের আঁধার কি আলোয় ভরে গেছে। ভূষণ দেখছে ওকে। টগর বলে—মা পাঠালো, জল খেয়ে নিতে বল্লে।

হাবু বলে—ভূষণ বাবাজী, এই আমার মেয়ে টগর।

হাবু বলে টগরকে—ওসব রেখে পেন্নাম কর। গুরুজন হয়।

টগরের এক নজরেই লোকটাকে ভালো লাগেনি। কেমন মেঠো মুনিষের মত কাঠ-কাঠ চেহারা। পাদুটো খালি পায়ে চলা-ফেরা করার জন্য ফাটা-ফাটা। মুখ-চোখ কেমন

কঠিন। পরেছে লালপাড় একটা খাটো ধুতি আর জামাটা যেন হাঁড়ির মধ্যে লাটপাট করে রাখা ছিল। সাধারণত জামা-টামা পরার অভ্যাস তার নাই। বিশেষ উপলক্ষ্যে জামাটা হাড়ির ভিতর থেকে বের করে পরে এসেছে। কেমন সোঁদা-বোটকা গন্ধ ছাড়ে। টগরের গ্রামের লোকরা ভদ্রসমাজে মেশে। তাদের গ্রামে হাইস্কুল আছে, ভদ্রসমাজ আছে। তাদের পাড়ার ছেলেরাও স্কুলে যায়। তাদের পাড়ার খুদুকাকা, মিতনজ্যাঠা—ওরাও ভদ্রস্থ হয়ে থাকে। এদের গ্রাম যে একেবারে পিছিয়ে পড়া গ্রাম সেটা টগরের বুঝতে দেরি হয় না।

—পেন্নাম কর।

বাবার কথায় টগর মুখ বুজে দূরেই টিপ করে প্রণাম করতে ভূষণ খুশি হয়ে বলে—থাক, থাক।

টগর অবশ্য আর দাঁড়ায় না।

বের হতে যাবে টগর।

মা বলে—একা পারছিনা, আনাজগুলো কুটে দে। এদিকে টগরকে যেতে হবে চন্দনের ওখানে। চন্দন বলেছে তাকে যেতে। ক্রমশ সেই মূর্তিটাকে যেন টগরও ভালোবেসে ফেলেছে। দেখেছে টগর চন্দন যেন তন্ময় হয়ে ওই মূর্তিটার গায়ে হাত বোলায়। হাসে টগর—কি গো কারিগর, আসল ফেলে নকল লিয়েই মজলা?

চন্দন ওর দিকে চেয়ে বলে—টগর, তুমি তো দূরের মানুষ গো, তোমাকে ছোঁবার হক তো নাই, তাই এই নিয়েই খুশি। এতো আমার!

টগর ক্রমশ যেন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এই বয়সে তার মত জেদী বেপরোয়া মেয়ে সব বাধনকে ভাঙ্গতে যায়। চন্দনের হাতটা তুলে নিয়ে বলে—এটাকেও কি আপন করে লিতে পারে না কারিগর?

চমকে ওঠে চন্দন।

—টগর।

টগর ওর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে বলে— আমিও তোমারই গো। তুমিই আমার ঘুমন্ত মনকে জাগিয়েছো। তাকে কি আপনার করে নিতে পারো না কারিগর?

চন্দনও ভেবেছে কথাটা। অতুল কুমোর সাবেকী ধাঁচের মানুষ। সে তার ওই হাঁড়ি কুঁড়ির শাল নিয়েই থাকে। ছেলের কাজে পয়সা আছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজে তার কোন দামই নাই। এখানে ওই টেরাইকোটার থেকে ভাতের হাঁড়ি, তেষ্ঠার জন্য জলের কলসীর দরকার, বাজারও বেশি।

তাই ছেলেকে বলে—দশজনের কাজে লাগলি না। কি যে বানাস। এবার অতুল ছেলেকে সহকারী করার কথাও ভাবছে। চন্দন স্বপ্ন দেখে অন্য জনের। টগরকে সে তার মানব-আসনে বসিয়েছে। ওই মূর্তিটাকে সে যেন সাকার, সজীব করে তুলতে

চায় বাস্তবে।

টগরও স্বপ্ন দেখে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। মায়ের কথায় বলে টগর—কে এল গো যে এত খাতির করে এক অন্ন পাঁচ ব্যঞ্জন করতে হবেক।

মা ধমকায়—চুপ করে যা বলছি তাই কর। পটলগুলো কুটে দে। আলু-পটলের দম হবে। ঘরকন্নার কাজে এবার মন দে। চিরকালই কি উড়ে-উড়ে ফিরবি? তোর বয়সে নকুলকাকার মেয়ে রমা এক ছেলের মা হয়েছে। এখনও বাপ তোর বিয়ের চেষ্টাই করছে না।

টগর বলে—থামো তো। বিয়ে দিয়ে আপদ বিদেয় করতে চাও, তা বুঝি। তবে এও বলছি, সহজে তোমাদের ঘাড় থেকে নামবো না কিন্তু যাই কর না কেনে?

মা বলে—ওরে মেয়েদের নিজের ঘরে একদিন যেতেই হবে।

টগর জানায়—সে যখন যাবার হবে ঠিকই চলে যাবো।

মা মেয়ের কথায় যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত নয়। তাহলে মেয়ের মত আছে।

রাত নামে।

ভূষণ বৈকালেই চলে গেছে। অবশ্য যাবার সময় হাবুকে জানিয়ে গেছে—মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনাদের মত?

হাবু খুশি হয়। সে যেন দায়মুক্ত হতে পারলে বাঁচে। তাই বলে—আমাদের মত তো আগেই জানিয়েছি বাবা।

ভূষণ বলে—তাহলে বিয়ের দিন ধার্য করে জানবেন। তাড়াতাড়িই শুভকাজ শেষ করতে চাই।

হাবুও তাই চায়।

রাত নামে। টগর দিন-ভোর টহল দিয়ে ওদিকের ঘরে মড়ার মত পড়ে ঘুমোচ্ছে। হাবুর চোখে ঘুম নাই। এতদিন ধরে মেয়েকে মানুষ করেছে, তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছে তার অজানতে।

বিশেষ করে ছেলেটা মারা যাবার পর থেকে টগরকেই কেন্দ্র করে হাবু আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল। এবার তাকে ছেড়ে দিতে হবে। মেয়ে চলে যাবে তার নিজের সংসারে। আর এই শূন্যঘরে পড়ে থাকবেল তারা দুজনে।

টগরের মা বলে—মেয়েকে বিয়ের কথা ঠারে-ঠোরে বলেছি।

—তা মেয়ে কি বল্লেক? হাবু শুধোয়।

টগরের মা বলে—মেয়ের অমত নাই বলেই মনে হলো।

হাবু বলে—মেয়েরা এমনিই গো। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করো। তারপর সব ভুলে সে নিজের ঘরে চলে যাবে।

টগরের মা বলে—সবাই যায়। তুমি বাপু তাড়াতাড়ি দিনক্ষণ দেখে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফ্যালো।

পূজোর পর এসেছে কালীপুজো। কমল দাস এখন ব্যস্ত। সে ক্রমশ স্বপ্ন দেখছে তার দিন বদলাবে। সামান্য একটা ছোট মুদিখানার দোকান ছিল তার বাবার। গ্রামের লোকদের প্রয়োজনে কিছু জিনিষপত্র রাখতো। কোনমতে চলতো সেই দোকান।

তারপর কমল শুরু করলো ধানের ব্যবসা। ধানের সময় এদিকের কিছু ধান গস্ত করে বেচে, চালও বেচে। সহরের ধানকলে সেই ধান চালান দিতো। এইভাবেই ধানকলের মালিক গোলবদন মোদীর সাথে পরিচয় হয়। মোদী ব্যবসায়ী মানুষ। সে দেখে ছেলেটা সৎ, পরিশ্রমী। মোদীর আরও ধানের দরকার।

কমল দাস বলে—আমার তো পুঁজি তেমন নাই শেঠজী। যদি দাদন দেন—ওদিকের সব ধান আপনার কলেই এসে দোব। আমাকে মনকরা ঢলতা অর্থাৎ ওজনের কিছুটা বাদ দেবেন আর এক মণে দুআনা কমিশন দেবেন।

ক্রমশ মোদীর টাকাতেই কমলদাস এই এলাকার প্রচুর ধান, গম, আখের গুড় গস্ত করে। ওর টাকাতেই তার বাড়ির ওদিকে একটা বড় গুদামও বানায়। সেখান থেকে মালপত্র চালান দেয় ধানকলে।

ধানের ব্যবসা জমে উঠতে এবার সদরে যোগাযোগ করে এই এলাকার রেশন ডিলার হয়ে ওঠে। ছোট ভাই মদনকে বসায় রেশনের দোকানে। আর ক্রমশ সে লোহা, সিমেন্টের ব্যবসাও শুরু করে।

কমল দাস সেবার অজন্মার বছরে ভাগ্য ফিরিয়ে নিল। অবশ্য মদনও যোগ্য দাদার যোগ্য ভাই। সে রেশনের চালও ট্রাক ট্রাক রাতারাতি পাচার করে নানা জায়গায় তিন গুণ দামে। আর কমল দাসও তাক বুঝে নিজেও যে ধান রেখেছিল তাও কম নয়। সেসব তিন-চারগুণ দামে বিক্রি করতে থাকে, টাকাতেই টাকা টানে। ওইভাবে টাকা আসতে থাকে কমলের ঘরে। আর কমল এবার দেখেছে গ্রাম—আশপাশের গ্রামের জমিনির্ভর মানুষের বিপদটাকে, ফসল নাই, রোজকারও নাই।

অধিকাংশ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ জমির উপরই নির্ভরশীল। এবার তারাই বিপদে পড়ে। সংসার চালাতে হবে। তারাই আসে কমলের কাছে। বলে

—কিছু ধান-চাল দাও কমল। ধান উঠলে মায় সুদ শোধ দেব।

কমল জানে দয়া-মায়া সামাজিকতার কোন মূল্যই নাই। ধার দিলে যা সুদ পাবে ধানে তা সামান্যই। আর সেটা পাবার আশাও সুদূরপরাহত।

ধান হলে তবে পাবে, তাও ওর খামার গিয়ে তাগাদা দিয়ে আনতে হবে। গ্রামের মানসিকতা সে জানে। তাই কমল বলে—ধান তো সব মহাজনের কাকা। দিই কি

করে?

অনেকেই বিপদে পড়ে—তাহলে কি অনাহারে মরতে হবে?

কমল দাস বলে—মহাজনতো টাকা ছাড়বে না, টাকা না হয় জমিই দিতে হবে। আর ধানের দর তো জানেন।

শেষ অবধি জমি বিক্রি করেই ধান কিনতে হয় তাদের। ওদের অভাবের সুযোগ নিয়ে কমল দাস দুদিকে লাভ করে। ধান বেচার লাভ তো বটেই সেই সঙ্গে অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ টাকা দিয়ে ওদের সরেস জমি, বাগান, মিত্তিরদের পুকুর এসব কেনে। আর এর মধ্যে কমল সরকারি মহলেও দহরম মহরম গড়ে তুলেছে।

তাদের খুশি করে কমল দাস গ্রামের বাইরে শতখানেক বিঘে পতিত ডাঙ্গাও জলের দরে কিনেছে। তার পৌষমাসই এসেছে দেশের সর্বনাশে। ফলে কমলদাস ক'বছরেই এখন ফেঁপে-ফুলে উঠেছে। বাড়িতে দুজোড়া বলদ, গাইগরু। ওদিকে বহু জমিও করেছে। ছোট ভাই নকুল ওই সব এস্টেট দ্যাখে।

আর মদনও এখন ভোল বদলে ফেলেছে। আগে ধুতি পরে দু-দশ বিঘে জমির চাষ-আবাদ করতো, কোমরে কত ধানের বস্তা টেনে গাড়িতে তুলতো। এখন সে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রেশনের দোকান, লোহা-সিমেন্টের দোকান সামলায়। কিন্তু কমল তেমনিই রয়ে গেল। বরং টাকা আসতে টাকাই এখন তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছে।

ব্যবসা আরও কি ভাবে বাড়ানো যায় তাই ভাবছে সে। ওদিকে পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসাও বাড়িয়েছে। ভাবছে এবার বড় শেড করে নিজেই মাইনে করে কারিগর রেখে ওই ব্যবসা করবে। তার জন্য সদরের মহাজনদের সঙ্গেও কথা বলেছে। তারাও চায় ধনী লোক এই ব্যবসাতে আসুক। তাহলে তারাও অন্য কয়েকজন ওই গোবিন্দবাবু কেদার কর্মকারদের দাদন না দিয়ে একটা লোককেই মাল দেবে।

কমল বলে—শেঠজী তাতে আপনিই বাজার দর ঠিক করতে পারবেন। আর কোন পার্টিই থাকবে না যে দরাদরি হবে। কমল চায় ওই ব্যবসাতে তার একচেটিয়া অধিকার পেতে। সেই আশা নিয়ে কমল শেড তৈরি করা, এমন কি সাবেকী মুছিতে আর কম মাল গালাইও করবে না।

বড় ফার্নেস বসাতে পারলে এককালীন খর্চা কিছু বাড়বে কিন্তু পরে মাল গলানোর খর্চা ওদের থেকে অর্ধেকে নেমে যাবে। আর এসব কাজ হবে যন্ত্রে। ও ভেবেছে ডাইনামো বসিয়ে ইলেকট্রিক দিয়ে কুদোনো-ছিলাই-পালিশ এসবের কাজ করাবে।

মহাজন শেঠজীও হিসাব করে বলে—সাবাস কমলজী, এসব করলে লোকজন, সেবারও আধা ভি লাগবে না। প্রডাকশন খর্চা আধা হয়ে যাবে।

কমলই বলে—কিন্তু দাম ওই বাজার দরেই রাখতে হবে। অন্য মোকামের মাল তো তৈরি হবে। তাদের দরেই আমরা সস্তায় মাল বানিয়ে ডবল লাভে বেচবো।

মোদীও খুশি হয়। বলে সে—তাহলে ওসবের এন্তাজাম করো কমলজী।

কমলও ভেবেছে কথাটা। এর মধ্যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে জানিয়েছে তার কথাটা। ম্যানেজার জানে কমলের আর্থিক সঙ্গতির কথা। তার ব্যাঙ্কে কমলের হিসাব আছে। তাতে ওকে দু-তিন লাখ টাকা লোন দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য কমল নিজে ব্যবসা করে। তবে একা খায় না। সে বিষয়ে কমল উদারই। সে জানে নিরাপদে শান্তিতে ব্যবসা করে দুপয়সা রোজকার করতে হলে যথাস্থানে যার যা প্রাপ্য প্রণামী ঠিকমত দিতে হয়, আর কমল সেটা দিয়ে থাকে। তাই দারোগাবাবু, সদরের থানাবাবু, ফুডডিপার্টমেন্টের বাবুরা কমলের ব্যবসার বিজয় রথের চাকাটাকে মসৃণ ভাবে এগোতে সাহায্য করেছে। কমল জানে মাছের তেলেই সে মাছ ভাজবে।

তাই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে এক বান্ডিল নোট প্রণামী দিয়ে বলে কমল—ম্যানেজারবাবু, আপনাদের ব্যাঙ্কের ঋণের কাগজপত্র তৈরির জন্য খর্চা কিছু রাখুন, পরে যা লাগে দোব। তবে কাজটা যাতে হয় তাই দেখবেন। গরীব মানুষ, আপনাদের আশীর্বাদে কিছু করতে চাই।

ম্যানেজার জানেন তার প্রণামী দেবে কমলবাবু, তাই বলে সে—ওর জন্য ভাববেন না। আমাদের ব্যাঙ্ক তো ব্যবসার উন্নতি করতেই চায়। তাই আপনার মত বিজনেস ম্যানকে মদত দোবই কমলবাবু।

কমলা বলেই পরিচিত ছিল ছেলেটা। শীর্ণ ডিগডিগে পেট। কোনরকমে খুটে খেতো। কমলের বাবা মারা যাবার সময় কমল বছর পনেরোর ছেলে। মদন বছর দশেকের কোলে নকুল ওদের নিয়ে দাসবাড়ির বড়গিন্নী অথৈ জলে পড়ে। কিন্তু কথায় আছে, পড়বো পড়বো বড় ভয়, পড়লে পরে সবই সয়।।

বড়গিন্নীই তখন নিজে দোকানের ওদিকে থেকে কিশোর কমলকে বসায় টাটে, নিজেই দরদাম করে, মাল বেচে। কমল মাথায় করে বেলেতোড় থেকে মাল আনে কারও গাড়িতে ও মাল তুলে দেয়।

বড়গিন্নী ছেলেকে দিয়ে ব্যবসা শুরু করায় নিজে দিনরাত খেটে ধান সেদ্ধ করে. চাল বানায় মুড়ি ভাজে কলাই ভাজে। দোকানে বিক্রি করে কমল।

ক্রমশ মদনও বড় হয়ে ওঠে। ছেলেটা একটু দুরন্ত প্রকৃতির। আর বাবু ধরনের। খেতে বসে মাছ তার চাইই। কমলের জীবনে চাওয়ার কিছুই নাই। সে দেখেছে অনাহারকে। কোনদিন খেতেও জোটেনি তাদের।

মাকে দেখেছে ধান ভেনে, তবে চাল বের করতে। সেই আঁকড়া চাল সেদ্ধ করে খেয়েছে শাকপাতার সঙ্গে।

জীবনের সঙ্গে লড়াই করে সে পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। বড়গিন্নীর এখন

সাজানো সংসার।

কমলের বিয়ে দিয়েছে গরীব ঘরেই। তখন কমল তো বড়লোক হয়নি। সবে দোকান চালু করেছে। জমিজমা বলতে পৈত্রিক কয়েক বিঘে জমি, আর তার খুড়তুতো দাদার সঙ্গে দেবোত্তর কিছু আছে। বাড়িতে আগে থেকেই লক্ষ্মীপূজার প্রচলন ছিল। সেই পুজোর খর্চা বাবদ বিঘে তিনেক লক্ষ্মীর জমি আছে।

কমলের দুই কাকা। মেজকাকা আগেই মারা গেছেন। তার সন্তানও নেই। কাকীমা মারা গেছেন তার জমি কমলই কিনেছে। অবশ্য এই নিয়ে কমলের ছোট কাকার ছেলে রতন বাবুর সঙ্গে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। ছোট কাকার ছেলে রতন পড়াশোনাতে ভালো।

রতনের মামারা সহরে থাকে, সেখানেই ওদের কি সব ব্যবসাপত্র তারাই রতনকে নিয়ে যায় সহরে। রতন সেখানের স্কুলে পড়ে, ছাত্রহিসাবে ভালোই। তাই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে।

তারপর মামারাই কলেজে ভর্তি করে দেয়। রতনের বাবা তখন মারা গেছে গ্রামে। রতন আসে গ্রামের বাড়িতে। তখন কমলবাবুর ব্যবসা বেশ চলতে শুরু করেছে। ধানের আড়তদারিও শুরু করেছে।

রতন দেখে কমল তাদের খামারবাড়ির খানিকটাতে ওর গরু-বলদ রাখতে শুরু করেছে। রতনের মা বাধা দেয়।

কমল বলে—জায়গাটা পড়েই আছে খুড়িমা, তাই গরু-বলদ বাঁধছি। দখল কেন নোব। বলোতো ছেড়ে দিচ্ছি জায়গাটা। রতনের জমিজায়গার উপর আমি কেন নজর দিতে যাবো।

খুড়িমা বলে—ঠিক আছে। বাঁধছিস বাঁধ গরু-মোষ, তবে বাপু দরকারের সময় ছেড়ে দিতে হবে।

এইভাবেই চলছিল। ক্রমশ কমলের টাকা বাড়ছে। লোভও বাড়ছে। রতন এসেছে বাড়িতে। দেখে কমলের রমরমা। ওদিকে বড় গুদাম করেছে। দু-একটা ট্রাক আসে যায়।

এদিকে মদন নতুন বাড়ি করে সেখানে একদিকে বড় মুদিখানা, অন্যদিকে রেশন সপ, কেরাসিন তেলের ডিলার শিপ নিয়ে ব্যারেল ব্যারেল তেল কালোবাজারে তিনগুণ দামে বিচছে।

ওদের খামারে এবার টিনের চালাই বানিয়েছে। রতন বলে—কমল এটা কি করলে? আমার খামার—

কমল তখন ধানের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। লোকজন, ধানের বিক্রেতারাও রয়েছে। কমল বলে—তোমার জায়গা। এ্যাঁ, কি বলছ রতনদা? ওটা তো বন্টননামায় আমার

নামেই আছে। কাগজপত্র দেখাবো তোমাকে। নাহলে ওখানে পাকা পাচীল তুলতে যাবো কেন?

রতন অবাক হয়। বলে সে—মা বলছিল আমাদের খামার।

কমল শোনায়—কাকিমা জমিজায়গার কি জানবে বলো, আমার কাগজ আছে। পরে দেখাবো। এখন ব্যস্ত।

অর্থাৎ জায়গাটার দখলই কায়েম করে নিল। রতনের মা এসে হৈ চৈ করে। —ইকি কথা রে?

কমল বলে—কাগজ আমার আছে। তোমরা জানো না খুড়িমা। আমার কিছু হড়কে নেব কেন? আমার কি কম দিয়েছে ঠাকুর?

রতনের মা এবার অসহায় আর্তকণ্ঠে ফেটে পড়ে। খুব লোভ হয়েছে তোর! ধর্ম মানিস না! সকলের হরেহাম্ম নিলে ধর্মে সইবে না। ওসব ভোগ করতে হবে না। আধবেলায় যাবি আমার জমি নিলে?

রতনও বুঝেছে ব্যাপারটা। সেই বন্টননামা দেখেছে। তাতেএ খামার তারই, কমল জোর করে দখল নিতে চায়। রতন লেখাপড়া শিখেছে। সে প্রকাশ্যে গলা তুলে মেয়ের মত চীৎকার করতে পারে না।

তাই মাকে বলে রতন—সরে এসো মা!

—এই করে আমাদের ঠকাবে? ধর্মে সইবে? রতনের মা চুপ করতে চায় না।

রতন বলে—চীৎকার করলে ও জায়গা দেবে না মা। ওর জন্য অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। মদন ইদানীং নগদ টাকার মুখ দেখে একটু বেশি মস্তান হয়ে গেছে। এখন সে ধুতি ছেড়ে প্যান্ট ধরেছে। দামী টেরিলিনের প্যান্টও পরে। মদনদাদার প্রতি এমন শাসানি শুনে গর্জে লাফদিয়ে এসে রতনের গলাটা ধরে গর্জায়।

—কি করবি রে রতনা?

রতন ভাবেনি যে এভাবে মদন তাকে এসে আক্রমণ করবে। বয়সে সে মদনের কেন রতনের থেকেও বড়। এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। আর রতনের স্বাস্থ্যও অনেক ভালো। সহরে খেলা ধুলোও করে।

এভাবে মদন তাকে আক্রমণ করে ভাবেনি রতন। এবার সেও এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে মদনের গলাটা টিপে ধরে গর্জায়।

—এত বড় সাহস তোর। গলায় হাত দিস্? দুটো পয়সার মুখ দেখে খুব বেড়েছিস। জোর করে দখল নিবি? গায়ে হাত দিবি?

মদনকে একহাতে তুলে ধরে রতন। মদন এমনিতে লম্বা টিকটিকে, যত চোটপাট ওর মুখেই। রতনকে আক্রমণ করতে এসে নিজে এভাবে আক্রান্ত হবে তা ভাবেনি মদন।

এবার কমলই ছাড়ায় ওকে।

—ছেড়ে দাও রতনদা। ছেলেমানুষ। ততক্ষণ বড়গিন্নীও খবর পেয়ে এসে জুটেছে। বুড়ি এখন আর সংসার তত দেখে না। কমলের বৌ লক্ষ্মীই সংসার সামলায়। লোকজন জুটে গেছে ওদের পারিবারিক কলহের জের দেখতে।

অবশ্য কমলের দিকেই তাদের অনেকে। শরৎ ভটচাযও সন্ধ্যার মুখে এখানে আসে। শরৎ, সতীশ চাটুয্যে, নবু গোঁসাইরা আসে কমলের ওদিকে লক্ষ্মী মেলায় পাঠের আসর বসে।

শরৎরা আসে চা-তামাক বিনি পয়সায় মেলে তাই। কমলের হয়ে শরৎ বলে।

—একি কাণ্ড। এ্যাঁ! ফৌজদারী বাধাবে নাকি রতন? কই জায়গা তো দেখছি কমলের দখলেই ছিল। আজ তুমি বলছ—আমার জায়গা! তা বাবাজী দখলী স্বত্ব তো ওর।

কমলও ওদের কথায় খুশি হয়। বলে কমল বেশ বিনম্র সুরে—রতনদা ওসব জানে না তাই বলছে। শুনলে তো রতনদা, এদের কথা। গ্রামের সবাই জানে ওই জায়গা আমার। এনিয়ে গোলমাল করে লাভ কি? লোকে জানাবে—এত লেখাপড়া শিখে তোমার মত ছেলে গাঁয়ের গৌরব, সে কিনা ভাইকে মারছে। ছিঃ ছিঃ এঠিক নয়।

রতন বুঝেছে এখানে কমলের জমিই শক্ত। তাই সরে এল সে। রতনের মায়ের গলা তখন সপ্তমে উঠেছে।

—ভগবান এর বিচার করবে!

কমল হাসে মাত্র। ভাগবান সম্বন্ধে তার ধারণটা সম্পূর্ণ আলাদা।

সেদিন পর্বটা ওখানেই থেমে যায়। রাতে কমল বাড়িতে গেছে এদিকের কাজ সেরে। তখন রাত অনেক। গ্রামও শুনসান হয়ে যায়।

তখনও খুঁটিতে হেলান দিয়ে বড়গিন্নী বসে আছে। কমল জানে মা শুয়ে পড়ে অন্যদিন। বড়বৌ লক্ষ্মী খাবার এনেছে কমলের জন্য।

কমল বলে—মা এখনও শোওনি?

বড়গিন্নী এমনিতে ধর্মভীরু মহিলা। জীবনে নিঃস্বতার মধ্যে থেকে আজ সুদিনের মুখ দেখেছে। সে জানে ছেলেদের জন্য খেটেছে সে। ছেলেরাও খেটে-খুটে আজ দিন বদলেছে।

কোন অন্যায় সে করেনি। ভয় হয় বড়গিন্নীর। সে অতীতেও সুদিন দেখেছে। দেখেছে মানুষের সুখ কেমন অস্থায়ী। সব হারিয়ে গেছল। আবার পেয়েছে।

তাই ভয় হয় তার। এসবের যে কোন স্থায়িত্ব নেই। এই সুদিন যে এক লহমায় চলে যেতে পারে তা জানে সে। তাই বলে বড়গিন্নী।

—কাজটা তুই ঠিক করিসনি কমল!

কমল মায়ের কথায় চাইল। সে এখন রোজই অনেক কাজ করে যে গুলো ঠিক নয়। তাই মাকে শুধোয়।

—কোন কাজ?

—ওই ছোটগিন্নীর খামারবাড়ির দখল কেন নিলি? তোর তো জমিজায়গার অভাব নাই। ওর জায়গা ছেড়ে দে।

কমল মায়ের কথায় বলে—দেখলে রতনদার সাহস, মদনের গায়ে হাত তোলে?

বড়গিন্নী বলে—মদনই ওর গলায় হাত দিয়েছিল প্রথমে। আর অন্যায় তো তুইই করেছিস! ছোটবউএর খামার তুই কেন নিবি?

কমলের বৌ এখন ক্রমশ স্বামীর পক্ষেই চলতে শুরু করেছে। সে পেয়েছে অর্থ-প্রতিষ্ঠার স্বাদ। গ্রামের পাঁচজনে তাকে সমীহ করে। লক্ষ্মী বলে—মা, ওসবের কাগজপত্র আছে। নাহলে তোমার ছেলে ওই জমি কেন নেবে?

কমল জানে জোর যার মুলুক তার। ছলে-বলে-কৌশলে অপরের জিনিষ না নিতে পারলে কেউ বড় লোক হয় না। তাই বলে সে

—ওসব তুমি বুঝবে না মা। যাও, শোও গে। এনিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বড়গিন্নী বলে—একদিন যখন কিছুই ছিল না, সেদিন আমার ভাবার দরকার ছিল। আর যখন অনেক পেয়েছিস তখন আর আমার দরকার নাই। ঠিক আছে—যা ভালো বুঝিস কর। তবে বলে রাখছি অন্যায় করিস না। আখেরে ঠকবি। চলে যায় বড়গিন্নী।

আজ কমলের চোখে সে যেন এক কদর্য লোভী একটা মানুষের সন্ধান পেয়েছে। সেই জীবনযুদ্ধের লড়াকু সহজ-সরল জেদী ছেলেটা আজ বদলে গেছে! মায়ের চোখে সেই রূপবদলটা সহজেই ধরা পড়েছে।

কমল এসবের জন্য ভাবে না। ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে ভাবার সময় তার নাই। তার চোখের সামনে এখন কারখানা গড়ার স্বপ্ন। নামও ঠিক করেছে সে—কমল মেটালস্!

নামটা ওই সহরের উকিলবাবুই ঠিক করে দিয়েছে। ওই নামে লাইসেন্স পারমিট এসব করতে হবে। তার জন্য কাগজপত্রও তৈরি হচ্ছে সহরে। এসব কাজের জন্য যোগ্য লোকও জুটেছে কমলের।

গুণময় অনেকঘাটের জল খেয়ে কিছু দিনের জন্য গ্রামে এসেছে। ও বলে গ্রামেই এবার কিছু কারখানা বানাবে। এর মধ্যে আসানসোলের ওদিক থেকে গাড়ি হাকিয়ে দু-একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদারকেও এনেছে। তারাও ঘুরে-ঘুরে দেখে গেছে।

গুণময় রটিয়েছে ওরা এখানে ধানকল বানাতে চায়। আমারই পার্টি। আসলে গুণময় ওই কোলিয়ারী এলাকায় বেশ কিছু গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিল। বড়-বড়

লোহাকারখানার মাল ওয়াগান করে যেতো, মাল গাড়িতে আরও দামী অনেক মালপত্র যাতায়াত করে। গুণময় তার দলবল নিয়ে রাতের অন্ধাকারে হানা দিত।

ওর ছেলেরা নির্জন বনের মধ্যে মালগাড়ির ভ্যাকুয়াম ব্রেক খুলে দিত চলন্ত গাড়িতে উঠে। আর গাড়িটাও দাঁড়িয়ে যেতে ড্রাইভার-গার্ডদের ওদেরই ছেলেরা সামলে রাখতো।

অন্যরা নিমেষের মধ্যে দামী হাজার-হাজার টাকার মাল গাড়ি থেকে নামাতো, ট্রাকও সঙ্গে থাকতো তাদের। পথ আছে এমন জায়গাতেই গাড়ি থামাতো।

মালপত্র নিয়ে চলে যাবার পর আবার ওরা ব্রেক ঠিক করে গাড়ি নিয়ে যেতো। পরে কাজটাকে আরও সহজ করার জন্য গুণময় ড্রাইভারদেরও তাদের বখরা ঠিকমত দিত।

ওইসব দামী মালএর মহাজনও তৈরি থাকতো। তাদের গুদামেই মাল পৌঁছে যেতো। আর শেঠজীদের লোকও থাকতো রেল অফিসে। তারাই খবর আনতো এই মালগাড়ির এই নম্বর রেকে এইসব মাল আছে।

নিখুত কাজ করতো গুণময়ের দল। এসব কাজ অনেক উঁচু দরের কাজ। ওই জুয়ার ছক—ফিতে খেলার চেয়ে ওই লাইনে সম্মানের কাজ। চোর—অন্ধকারের কারবারীদের সমাজেও মান-ইজ্জতের ব্যাপার আছে।

গুণময় ক্রমশ প্রমোশন পেয়ে বেশ উপরেই উঠেছিল। অনেক মহাজন-শেঠজীদের সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল। শেঠ গোপীকিষণ তো ওখানের একজন দেশসেবক, নেতা। গলায় মালা পরে বৃহতী জনসভায় সে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে সারগর্ভ ভাষণ দিত, সেবার বন্যাত্রাণের মিটিংএ দেশবাসীর দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে নিজেই অশ্রুর বন্যা বইয়েছিল।

গুণময় তার দলবল নিয়ে কৌটা সাজিয়ে বন্যাত্রাণে চাঁদা তুলছিল। গুণময় শেঠজীর কান্না দেখে তা সাগরেদদের বলে—শ্যালা হারামীর বাচ্চা। এখানে নিজে কাঁদছে আর আড়ালে দিনভোর দেশের লোকদের কাঁদাচ্ছে।

হরিনাথ পালও রাতের টানা মাল নেয় গুণময়ের কাছে। তার বিরাট মোটর পার্টস-এর বিরাট ব্যবসা। তার লোক মালগাড়িতে টায়ার মটর পার্টস কি যাচ্ছে তার খবর এনে দেয়।

গুণময়ের দল সেই মত অপারেশন করে পুরো মাল পালমশাইএর গুদামে তুলে দেয়। পালমশায় দাম মিটিয়ে দেয়। অবশ্য আধাদামে মাল কিনে পালমশাই দুনোদামে বেচে আর সহরের নাগরিকদের প্রতিনিধি সে। শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োজিত প্রাণ। গার্লস স্কুল চালায়।

অন্ধকারের আরও কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবসা আছে তার। গুণময় এই উপরতলার

মানুষদের কাছ থেকে দেখেছে। তার চোখ খুলে গেছে। বেশ চলছিল তার রাজত্ব। হঠাৎ সরকার এসব থামাতে উঠে পড়ে লেগে যায়। এতদিন সরকারি পদে যারা ছিল শেঠজী, পালমশায়ের মত লোকেরা তাদের সঙ্গে একটা রফা করে চলতো।

কিন্তু সরকার প্রায়ই ওয়াগন লুট হতে দেখে এবার সেই কর্তাদের সরিয়ে নতুন কড়া অফিসারদেরই এনেছে।

সেদিন রাতে নতুন কোন পুলিশ অফিসারের স্পেশাল ডিউটি পড়েছিল ওই দিকে। গুণময়ের দল শালবনের ধারে মালগাড়িটাকে থামাতেই অন্ধকারে কয়েকটা আগুনের ঝলক দেখা যায়।

কে বলে—গুরু, গুলি চালাচ্ছে ওরা! এখবর তাদের ছিল না। অন্যসময় রেডও হয়েছে। সে খবর তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌছে গেছে। তারাও সাবধান হয়ে যায়। কখনও কিছু মাল ফেলেই পালায়। পুলিশও কর্তব্যের দৃষ্টান্ত দেখায় সেই মাল আটকে। কিন্তু গুলি এভাবে বিনা নোটিশে চালায় না। ওয়াগানের উপর থেকে কে ছিটকে পড়ে। এরাও বেগতিক দেখে বনের মধ্যে দিয়ে পালায়। ট্রাকও উধাও হয়ে যায়।

পুলিশ ওদের একজনকে গুলি করেছে। ভাগ্য ভালো ছেলেটা মরে গেছে। নাহলে পুলিশ ওর মুখ থেকেই সব খবর বের করতো। তবু পুলিশ দু-একটা ঠেকে হানা দেয়।

শেঠ গুপীনাথই বলে—ভেগে যা গুনো। হাওয়া গরম। পরে দেখা যাবে।

গুণময়কে ওদের মুন্সীই জিপে করে পৌঁছে দিয়ে যায় গ্রামে। গুণময় রটিয়ে দেয়—ধানকল করতে চায় ওরা এখানে।

কমলদাসের এমনি লোককেই দরকার। গুণময় বলতে কইতে পারে। চেহারাও ভদ্রজনোচিত। আর জীবনের অনেক পথে চলে এর মধ্যে যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাও কম নয়।

সেই গুণময়কে কমল সেদিন বলে—গুণময়, ওই বিদেশীদের সঙ্গে ধানকল করবে এখানে? মানে লাভের কড়ি তো গাঁ থেকে চলে যাবে বাইরে। তার চেয়ে এসো—আমি এখানে কারখানা করবো ভাবছি, যদি তুমি এসব দেখা-শোনা করো ভালোই হবে।

গুণময় হিসাবটা বোঝে। জানে কমলের পয়সা আছে। সে কিছু করতে চায়। আর গুণময় এখন বেকারই। ওদিকের গোলমাল বেশ জমে উঠেছে। সরকার খুব সতর্ক। এসময় অন্য কোন ধান্দা করাই নিরাপদ। তবে এত সহজে গুণময় ধরা দিতে চায় না। তাতে তার দামই কমে যাবে।

তাই বলে গুণময়—শেঠজীকে কথা দিয়েছি। ওরা এসেছিল।

কমল বলে—ওরা যা দেবে তার থেকে বেশিই দেব তোমায়। বলোতো কারখানার চারআনার পার্টনারই করবো তোমাকে।

গুণময় বুঝেছে মোচড় দিতে এবার কাজই হয়েছে। তবু বলে—ওদের একটু বলে-কয়ে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে হয় তাহলে, পুরোনো মহাজন।

কমল বলে—তাই করো। আর মেটাল কারখানা ভালো চললে, তারপর ধানকলই করবো। এইসব ডাঙ্গা ওই মহুয়া বাগান অবধি দেখছো, সব আমার। গুণময় যেন এবার পায়ের তলে মাটি পেতে চায়। ওই জুয়াড়ির জীবন থেকে যাত্রা সুরু করেছিল। দু-একবার বিপদেও পড়েছে।

সেবার বর্ধমানে মার খেয়ে হাসপাতালে পড়েছিল ক'মাস। তারপর কোলিয়ারী ফিল্ডেও অনেক বিপদের মাঝে কেটেছে তার দিন। রাতের অন্ধকারে প্রাণ হাতে নিয়ে ওয়াগন লুঠ করতে হয়।

সেবার বখরা নিয়ে কালিয়ার দলের সঙ্গে গুলির লড়াই-এ জোর বেঁচে গেছেল। নাহলে এই গুণময় কবে ঈশ্বর গুণময় হয়ে যেতো। এখানে তবু সাবধানে চলতে পারলে ওই কমলের ঘাড়ে চেপেই তার ভাগ্যও বদলে যাবে।

গুণময় বলে—দেখি ওদের বলে, তারপর তোমাকে কথা দেব কমলদা। সবদিক সামলে তবে কাজে নামলে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করা যাবে।

কমলও বলে—তাই ভালো। দ্যাখো যদি কাজে নামো, এই এলাকার মানুষের ভালো হবে। তাদের কাজ জুটবে। এলাকার উন্নতি হবে। এসব তো আমাদেরই করতে হবে।

গুণময় এসব দেশ উদ্ধারের কথা অনেক শুনেছে। অনেক দেশ-সেবকদেরও দেখেছে। তাই কমলের কথাগুলোর বিগলিত অর্থ সে সহজেই বুঝতে পারে।

তবু বলে গুণময় দরদভরা কণ্ঠে—ঠিকই বলেছ কমলদা। দেশের কথাও তো ভাবতে হবে। ওরা যুগলে এবার দেশসেবার কাজে নামার জন্য যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ গ্রামের এসব খবর শোনেন মাত্র। তিনি ওই আশ্রমেই থাকেন। এর মধ্যে গুণময় একদিন গেছল তার কাছে। প্রণাম করে গুণময়—কেমন আছেন বড়দা!

কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ দেখছেন ওকে। ওর পোষাক কথাবার্তা, চাহনিগুলো তার ভালো লাগে না। কালিকান্ত বলেন—কাজকর্ম কি করা হচ্ছে?

গুণময় বলে—এখানেই একটা ফ্যাক্টরি করার কথা ভাবছি।

—কারখানা? কারখানা করবে? অবাক হন কালিকান্ত। ভাই যে এত টাকা রোজকার করেছে তা জানত না। আরও অবাক হয় যে কি ওর বিদ্যা যা দিয়ে এত রোজকার করতে পারে. মনে হয় তাহলে বিদ্যার কি কোন প্রয়োজনই নেই এ যুগে?

যার দরকার তা হচ্ছে অবিদ্যা! সমাজের রূপটা কি এতই বদলে গেল? কালিকান্ত রীতিমত ভাবনাতে পড়েন। তার এত দিনের ধ্যান-ধারণা সব কেমন বদলে যাচ্ছে।

—প্রণাম ভটচায মশাই!

বাইরের রকে বসেছিলেন কালিকান্ত। গ্রামের মানুষ এপথে যারা যায় তারাই প্রণাম করে ওই মানুষটিকে। চাইলেন পঞ্চতীর্থ।

—কেদার না? ভালো তো?

কেদার কর্মকার যাচ্ছিল। সে বলে—আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে কোন মতে।

অতুল কুম্ভকার বলে—দেবতার আশীর্বাদ থাকলে ঠিক চলে যাবে গ।

—অতুল! পঞ্চতীর্থ মশায়ের কথায় অতুল বলে

—আজ্ঞে হ'গ। তা বাড়িতে সুধাময় কটা ঘট দিতে বলেছিল তাই দে এলাম। তর্কতীর্থ শুধোন

—ঘট। ঘট কেন হে?

অতুল বলে—আজ্ঞে কালীপুজোর দিন কি পুজো-টুজো করবেন তাই। চলে যায় অতুল। কালিকান্ত তর্কতীর্থ অবাক হন। সুধাময় কারণ-অকারণে যজ্ঞ করবে শুনে অবাক হন। ষষ্ঠীপুজো জানে না, শুদ্ধভাবে কোন মন্ত্র পড়তে পারে না সে করবে হোমযজ্ঞ। কালে-কালে সবই বদলে যাচ্ছে। তার বাড়িতেই দেখছেন গুণময় কিছু না জেনেই কারখানার স্বপ্ন দেখছে। ওদিকে সুধাময় একবর্ণ না শিখে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হয়ে উঠলো।

একালে আরও কত কি হবে তা ভাবতেই পারছেন না তিনি।

প্রতাপবাবুদের পৈত্রিক বাড়ি জমিদারী সেই দুর্গাপুরে যেতে হচ্ছে কালিকান্ত পঞ্চতীর্থকে। গরুর গাড়িতেই যেতে হবে বেশ কয়েক মাইল পথ।

সুধাময় এখন নিজেই বাড়িতে নাকি কালীপুজো করবে হোম-যজ্ঞও হবে।

গ্রাম—আশেপাশের গ্রামের সকলেই পঞ্চতীর্থ মশায়কে শ্রদ্ধা করে সমীহ করে। ওর কাছে যাওয়া যেন কঠিনই। তাছাড়া ভটচায মশায়ে রোগ-জ্বালা হলে লোককে বলেন—ওষুধ খাও। ডাক্তার-বদ্যি দেখাও। কোন দৈবী অনুগ্রহ। কবচ ইত্যাদিও দেননা। কোথাও হোম-যজ্ঞ করে বিভূতিও দেননা। মানুষের বিপদ-আপদে বলেন—দেবতাকে স্মরণ করো। সত্যপথে চল। অন্যায় করো না। ঠাকুরই সব বিপদ থেকে ত্রাণ করবেন।

মানুষ বিপদে চায় সোজাসুজি পরিত্রাণের পথ। সে পথ দখেতে চান না পঞ্চতীর্থ মশায়।

কিন্তু সুধাকর এবার প্রচার করেছে বড়দার কাছ থেকে সেইই ওই মহাশক্তির কিঞ্চিৎ পেয়েছে। আর মধ্যরাতে কঠিন তপস্যা করছে। সিদ্ধিলাভ করলে ব্যস তখন

মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আদি-ব্যাধি সে নির্মূল করে দিতে পারবে। সমাজের কল্যাণেই সে এই ব্রত নেবে। আশেপাশের মানুষ ক্রমশ সুধাময়ের দিকেই ঝুঁকছে।

সুধাময় জানে একটু চেষ্টা করলে সেই এবার এই অঞ্চলের সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে। পরণে রক্তাম্বর, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। এখন থেকেই সে ভেকও বদলে অন্য কিছু হবার চেষ্টাই করছে।

বাড়িতেই হোমযজ্ঞ হবে। আরও খুশি হয়েছে সুধাময় শুনেছে বড়দা দুর্গাপুর যাবে প্রতাপবাবুদের কালীপুজোতে। এখানে থাকবে না। সুধাময়ও নিশ্চিন্ত হয়।

দাদা এসব পছন্দ করেন না। বারবার বলেন পঞ্চতীর্থ—সুধা, ধর্মের ভেক নিয়ে মানুষকে ঠকাবি না। মহাপাপ, ঈশ্বরও কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

সুধাময় বুঝেছে এ যুগে ওই নীতি মেনে চলছে ঈশ্বরও তাকে বাঁচাতে পারবে না। যুগের সঙ্গে ধর্মও বদলায়। দাদা সেইটাই বুঝতে পারছেনা। সুধাময় নিজের পথেই চলতে চায়।

আর বড়দা না থাকলে তারও সুবিধা হবে।

সুধাকরের বৌ কাদম্বিনীর হিসাবটা অন্যরকম। বড়দা কোথাও গেলে ফেরেন বেশ ভালো প্রণামী, জিনিষপত্র, গরদের ধুতি, শাড়ি এসব নিয়ে। তার স্বামীর মুরোদ বুঝেছে কাদম্বিনী। বলে সে সুধাময়কে—এত ভণ্ডামি করে অং-বং করে লোককে ধাপ্পা দিয়ে কি পাও? দিনরাত অজবল মিছে কথা বলো। তাতেও তো পেট ভরেনা। বড়দার জমিজায়গাতেই চলে, ওকে কত মান্যি করে লোকে—

সুধাময়ের ক্ষোভ এখানেই। বলে সে—দেখবে এ'. শম্মার পায়ে কত লোক এসে পড়বে। বড়দার বুদ্ধি নাই, আরে বাবা অং-বং করলে যদি মোটা টাকা প্রণামী আসে, কর। তা নয় উনি বলেন—লোককে ঠকাবে না!

আমি লোক ঠকাই? মাকে ডেকে বলি—ওদের ভালো করো। ব্যস।

কাদম্বিনী বলে—বড়দার সঙ্গে নিতুকে পাঠাই। সেখানে তো অনেক বলি হবে, প্রণামীও পড়বে। নিতুকে পাঠাই সব গুছিয়ে আনবে।

সুধাময় আরও হিসাবী। সে বলে—দাদা তো পুজোর পরও দু-একদিন থাকবেন ওখানে। নিতু বরং দাদার সঙ্গে থেকে আসার সময় সব গোছগাছ করে আনবে। আর বাদলাকেও সঙ্গে পাটাই।

—কেন? কাদম্বিনী বলে—ওকি করবে?

সুধাময় বলে—পুজোর রাতে শুনেছি ওখানে দেদার পাঠা বলি হয়, শেষ বলি হয় মোষ, বাদলা রাত ভোরেইও পাঠার মুড়ি দুচারটে নে গামছায় বেঁধে হাঁটাপথে নদী পার হয়ে বাড়ি ফিরবে সকালেই। বেশ জমিয়ে মাংস খাওয়া যাবে।

কাদম্বিনী বলে—বড্ড লোভী তুমি।

হাসে সুধাময়—পাওনা ছাড়বো কেনে? বাদলা—

বাদলও করিতকর্মা, নিতু তবু পড়াশোনা করে। জ্যাঠার কাছে কাছে থাকে। বাদল স্কুলে যায় নামমাত্র। বাকী সময় সে নানা অকাজ কুকাজেই ব্যস্ত থাকে।

বাদলা বাবার কথা শুনে বলে—খুব পারবো। পুজোর রাত ভোরেই আঁধার থাকতে ওই বলিদানের গাদা থেকে দু-তিনটে বড় ছাগলের মাথা নে ভোরেই হাটা দিলে বেলা নটার মধ্যে নদী পার হয়ে গাঁয়ে ফিরবো সটান মাঠের পথ ধরে, ওর জন্য ভেবনা।

পঞ্চতীর্থ মশাই নিতু, বাদলকে নিয়ে গরুর গাড়িতে রওনা দিলেন দুর্গাপুরের দিকে। বেশ কয়েক ঘণ্টার পথ গরুর গাড়িতে। দামোদরে এখনও জল আছে, নৌকাজ পার হয়ে ওদিকেও প্রতাপবাবুর লোক থাকবে গাড়ি নিয়ে।

দুর্গাপুর পৌঁছতে সন্ধা হয়ে যায়। ওদিকে ঘন শালবন। স্তব্ধ-নির্জন পরিবেশে বনের বাইরে ছোট্ট স্টেশন ঘর, প্লাটফর্মের টিনের চালাটা পড়ে আছে। ওদিকে উঁচু পাহাড়, ঘনবনে ঢাকা একটা মালগাড়ি কর্কশ শব্দ তুলে পার হয়ে গেল। আবার শুনশান চারিদিক।

নিতু বলে—সাংঘাতিক বন গো! আমাদের গদারডিহির বনের চেয়েও বেশ ঘন।

গাড়োয়ান বলে—ই বনে চিতে বাঘ, হেড়োল বনশুয়োর, ভালুক সব আছে। ওদিকে চলে গেছে বন—দূরে দেখা যায় প্রতাপবাবুদের গ্রাম, মন্দির, চূড়া।

গাড়োয়ান বলে—ই বনেই সিবার প্রতাপবাবু একটা ঝিঙেফুলি চিতে মারলেন। এই ইয়া লম্বা গ। দুহাত বিস্তার করে বাঘের দৈর্ঘ্য দেখিয়ে বলে সে—ভয় নাই। এসে গেছে। হ দ্যাখো বাবুদের বাড়ি। মন্দির। ওদিকে অতিথশালা।

বনেদী জমিদার পরিবার এই প্রতাপবাবুরা। ওর প্রপিতামহ ছিলেন দুর্গাশংকর। বর্ধমানের রাজবংশের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ছিল। মানসিংএর আমল থেকে ওই বংশ।

পরে ওরা এই অঞ্চলের জঙ্গল মহাল, বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হয়ে এখানেই বসত করেন। আর পূর্বপুরুষ দুর্গাশংকরের নামেই সরকারি জরিপে মৌজার নাম হল দুর্গাপুর।

ওদিকে জমিদারদের বাড়ি। এপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মন্দির, নাটমন্দির। ওপাশে বিশাল মণ্ডবে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে। সামনে প্রাচীন বট-অশত্থ-অশোক আমলকী নানা গাছের ঘন জটলা।

এই গ্রামের রাস্তার ওদিকেই সুরু হয়েছে বনসীমা। এই গ্রামও যে এককালে ঘন বনে সমাচ্ছন্ন ছিল তা ওই বনস্পতিগুলোকে দেখলেই মনে হয়। ওপাশে অতিথিশালার ব্যবস্থাও ভালো। প্রতাপবাবু, ওদের পরিবারের আরও কিছু লোকজন এসে অভ্যর্থনা করে পঞ্চতীর্থ মশায়কে নিয়ে যান অতিথিশালার ঘরে।

নিতু, বাদলও দেখছে এদের অভ্যর্থনা। বাদলএর মধ্যে মন্দিরচত্বরটা ঘুরে এসেছে।

নিতুকে বলে—বিশাল ব্যাপার রে দাদা। মস্ত বড়লোক এরা। ইয়া কালী আমাদের ওদিকে এমন কালী একখানও নাই।

রাতে খাবার ব্যবস্থা দেখে বাদল খুশি। লুচি-আলুর দম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, চাটনী আর সন্দেশও দু-তিন রকমের। কাল পুজো। বাদলএর মধ্যে খবর নিয়েছে প্রায় পঞ্চশটা ছাগল বলি হবে। আর মোষও। রাতভোর কালযজ্ঞ চলবে।

গ্রামে গুণময় এসে এবার জুড়ে বসতে চায়। সুধাময়ের এটা মনঃপূত নয়। ছেলেটা বাইরে বাইরে ছিল ভালো ছিল। এবার গ্রামে এসে বসবে তার বিষয়ে ভাগ বসাতে। তাই বলে সুধাময়—গুণো, তোর আসানসোল, বর্ধমানের ব্যবসার কি হলো?

গুণময় বলে—ওসব চলছে, এখানেই ব্যবসা করবো।

—এখানে?

গুণময় বলে—কেন? নিজের বাড়িতে থাকতেও আপত্তি।

সুধাময় যেন ধরা পড়ে গেছে। তাই বলে—না, না। এখানে তুই থাকবি এতো ভালোই। তবে এই অজ পাড়াগাঁয়ে কি ব্যবসা চলবে? এক কোণে গাঁ—

গুণময় অনেক খবরই রাখে। সে শুনছে আসানসোলে ওই নেতাদের কাছে যে এবার দুর্গাপুরের চেহারাই বদলে দেবেন বিধান রায়। এখানেই দামোদরের বুকে ব্যারেজ হবে। দামোদরের জলকে আটকাবার জন্য ওই দামোদর। বরাকর নদীর উপর বিহারে কয়েকটা ড্যাম, বাঁধ তৈরি হচ্ছে। তেনুঘাট, তার নীচে প্যাঞ্চেৎ ড্যাম। ববাকরের উপরও গড়ে উঠছে বিহারে তিলাইয়া, তার নীচে বাংলা-বিহার সীমান্তে মাইথন ড্যাম।

গুণময় মাইথন, প্যাঞ্চেৎ ড্যামের কর্মযজ্ঞ দেখে এসেছে। বিরাট ব্যাপার চলেছে সেখানে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড়কে পাহাড় সাফ করে সেখানে যন্ত্রদানবদের দিয়ে দিনরাত কাজ চলেছে।

এরপর দুর্গাপুরে সুরু হবে ব্যারেজের কাজ। দুর্গাপুরের বিশাল বন কেটে সেখানে তৈরি হচ্ছে বিশাল লোহার কারখানা। আরও বড় বড় কারখানা। তার জন্য চাই প্রচুর জল। সে-সব জলের জন্যই দুর্গাপুরে ব্যারেজ হচ্ছে। দুদিকে তৈরি হবে বিরাট ক্যানেল। ওই ক্যানেলের জলে সারা এলাকাজ এবার জল পাবে। সোনা ফলবে এদিকে।

আর ব্যারেজ হয়ে গেলে তখন তার উপর দিয়েই ঝকঝকে রাস্তা হবে বাঁকুড়ার দিকেও। দিনরাত গাড়ি চলবে। মানুষ যাতায়াত করবে। আর গ্রীষ্মের দাবদাহে নদীতে নামতে হবে না মানুষকে। বন্যার সময় আর এই অঞ্চল সভ্যজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবে না।

এসব শুনেছে সে। হয়তো কাজেও পরিণত হবে। সেদিন ওই শান্ত গ্রামজীবনের চেহারাই আমূল বদলে যাবে।

গুণধর তাই আগে থেকেই এই সদাজাগর পরিবর্তনের মাঝে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তিত করতে চায়। তাই বলে—চিরকাল কি এসব অজ পাড়াগাঁ থাকবে দাদা?

সুধাময় বলে—এর উন্নতি কোনদিনই হবে না। তাই বলছি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে থেকে কি করবি?

গুণময় বলে—দেখা যাক।

সুধাময় বুঝেছে ভাই সহজে নড়বে না এখান থেকে। ওর মতলব সুবিধার নয়। ওর জন্য একটা ব্যবস্থাই করতে হবে।

গুণময় দাদার এক ডিগ্রি উপরে। সে বুঝেছে দাদা এখন নিজের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখছে। বিরাট যোগী-ধার্মিক পুরুষ বলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নিজেকে। আর ধর্মের বুজরুকি করে দিন চালাবে। দেখেছে গুণময় বাড়িতে পুজো-যজ্ঞটজ্ঞ হচ্ছে। সারা এলাকার মানুষ এসেছে। ওদের কাছে সুধাময় এখন মহাপুরুষ হবার চেষ্টাই করছে।

গুণময় দেখেমাত্র। সে বাইরের একটা ঘরে থাকে। বৌদি খেতে অংশ্য দেয়। গুণময় তার জন্য কিছু টাকাও দেয়।

ওদিকে মহাসমারোহে সুধাময় রক্তাম্বর পরে মন্ত্র পড়ছে। যজ্ঞের আগুনে ঘি দিচ্ছে। সমবেত জনতা ভক্তিভরে প্রণাম করে। অনেকেই বলে—যোগ্য ভাইএর ভাই হে। ব্রহ্মতেজ দেখছো? না! বিরাট পুরুষ।

গ্রামের কমল দাস আসে। এখন সে কমলবাবু। ওদিকে শরৎ ভটচায, সতীশ চাটুয্যেরা জনতার ভিড় সামলাচ্ছে। গ্রামের ছেলেরা ওদিকে প্রসাদ রান্নার কাজে ব্যস্ত। গোবিন্দ ঘোষও এসেছে।

শরৎ ভটচায ওদের আপ্যায়ন করে—এসো গোবিন্দ, কমল দ্যাখো কে এসেছেন? কমলও সম্মানিত বোধ করে—আসুন গোবিন্দবাবু।

গ্রামের অন্যতম বড় জোতদার পরিবারের কর্ত্রী হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এসেছে। পরনে গরদের থান, সঙ্গে বাড়ির সরকার বড় ডালায় করে কামিনীভোগ আতব, ফলমূল, সন্দেশ, প্রণামীর টাকাও নামিয়ে দেয়। ওদিকে সুখদা ঠাকরুনও রয়েছে।

সে দেখছে সুধাময়ের যজ্ঞ। বলে সুখদা ঠাকরুন—এ্যাঁ। পণ্ডিত যা পারেনি, তাই করছে ওর ভাই।

শরৎ ভটচায দেখেছে এখানে ম্যানেজারী করলে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগও হতে পারে। সুধাময় তো ব্যস্ত।

ওর ছেলেরাও নাই। গুণময় এসবে বিশ্বাস করে না। সে তাই নেই।

এখন শরৎ ভটচাযই নিজেই মাতব্বর সেজে বলে কাদম্বিনীকে—বৌমা। এসব

প্রণামী, জিনিষপত্র, ধুতি-শাড়ি আমি সব তুলে রাখছি। পরে বুঝিয়ে দোব।

শরৎ ভটচায জানে কি ভাবে মালপত্র সরাতে হয়। গ্রামের কোন কাযের বাড়িতে পরিবেশনের সময় সে মাছের বালতি, রসগোল্লার বালতি ঠিক নিজের বাড়িতে পাচার করে দেবেই। তার সুপুত্র ধনাই আশপাশেই থাকে।

শরৎ কামিনীভোগ আতব, দুখানা শাড়ি-গামছা কিছু মিষ্টান্ন ধনাই মারফৎ বাঁশবনের মধ্য দিয়ে পাচার করে। প্রণামীর টাকা থেকেও দু-দশ টাকা সরিয়ে রেখে আবার ব্যস্ত হয়।

ভোগের রান্নার দেরী আর কত রে বুধু? সময়ে ভোগ যেন হয়। তারপর এত লোক প্রসাদ পাবে। হাত চালা।

ওদিকে হরিশ মাষ্টার, রমন ডাক্তারকে আসতে দেখে এগিয়ে যায়। —এসো ডাক্তার। মাষ্টার যে। এ্যা! হোম-যজ্ঞি দেবতাকে মানো তাহলে?

হরিশ বলে—কেন মানবো না বলুন। তবে এই নিয়ে বুজরুকী হলে তাকে মেনে নিই কি করে?

শরৎ বলে—এসব তা নয় হে। দেখছো ব্রহ্মতেজ কাকে বলে? এসব মুনি-ঋষিদের ব্যাপার। বেদ-উপনিষদ-মহাভারত যদি সত্যি এসবও সত্যি। এতে গ্রামের কল্যাণ হবে।

কমল বলে—তা সত্যি। তাই ধর্মের ব্যাপারে আমি থাকবোই। বুঝলেন শরৎকাকা, ধর্ম নাহলে জগৎসংসার থাকবে না। তাই ধর্মকে মেনে চলতেই হবে।

শরৎ বলে—ধর্ম মেনে চল বলেই ভগবানও তোমার উপর সদয় হে। আর আমাদের সুধাময়, মহৎ কাজই করছে!

গুণময় দেখছে ওই সব চুপ করে। গুণময় তখন যজ্ঞে ঘি ঢালছে

—ওঁ ইন্দ্রায় বষট্!

ওঁ অগ্নায় স্বাহা—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা—

বাদল দুর্গাপুরের বিরাট পুজোর ব্যাপার দেখে অবাক। অরণ্যভূমির একদিকে কয়েকটা হাড়িকাঠে বলিদান চলেছে। ঢাকের বাদ্যে রাতের আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে।

রাতভোর পালা করে বলিদান দিচ্ছে হন্তারকরা। ওদিকে বড় হাড়িকাঠে মোষ বলির আয়োজন চলেছে। নিত্য বলে—কাল ভোরেই বাড়ি যাবি?

বাদল দেখছে পাঁঠাগুলোকে। একদিকে ধড়—অন্যদিকে মুণ্ডুগুলো ফেলা হচ্ছে বলিদানের পর। ওসবের হিসাব রাখারও কেউ নাই। অধিকাংশ লোক, পাইক-বরকান্দাজ কর্মচারিরা মায়ের অবারিত কারণ বারি খেয়ে টলমল হয়ে রয়েছে।

জ্যাঠামশাই গতরাত্রে ধর্মসভায় ভাষণ দিয়ে অতিথিশালায় ফিরে গেছে। ওরা দুই ভাই রাতভোর এই সব দেখছে।

ভোরের দিকে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রাতভোর মত্ততার পর। যে যেখানে পারে পড়ে ঘুমুচ্ছে। বাদলও বের হয়েছে। তাকে ভোরবেলাতেই বের হতে হবে পাঁঠার মাথা দু-তিনটে নিয়ে।

ওদিকটা অন্ধকার প্রায়। রাতে অনেক আলোই জ্বালানো হয়েছিল এখন সবই নিভে গেছে। এখান-ওখানে দু-একটা বাতি জ্বলছে। একটা অশত্থগাছের নীচে বলিদানের পর মাথাগুলো রাখা আছে। ধারে-কাছে কেউ নাই।

বাদল রেলিং টপকে গাছের নীচে এসে অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে দুটো-তিনটে বড় বড় দেখে মাথা খুঁজতে থাকে। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হয় না। তার মধ্যে দুটো বড় দেখে নিয়ে হাতে ঠেকে বেশ বড় একটা মাথা। অনেকটা মাংসই হবে।

বাদল আর দেরি না করে ওই বড় মাথাটাও গামছায় বেঁধে নিয়ে রেলিং টপকে বাইরে এসে এবার হাঁটতে শুরু করে।

তখনও পরিষ্কার হয়নি আকাশ। বনের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। বাদল একটা গাছের শুকনো ডাল পথে পড়ে থাকতে দেখে ওটাকে হাতিয়ার করে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠ ভেঙ্গে নদীর দিকে এগোয়। ভোর হচ্ছে। বিস্তীর্ণ দামোদরের বুকে বন্যার প্রকোপ তখন নাই। চরভূমিতে কাশফুলের চিহ্ন কিছু রয়েছে। ভোরের কুয়াশায় নদীর বালিচর ভিজে হয়ে রয়েছে।

বাদল চলেছে, বিস্তীর্ণ বালুচর পার হয়ে খেয়ানৌকায় উঠলো। সামান্য ঘোলা জল বইছে। খেয়া পার হয়ে আবার বালুচর পার হয়ে এপারে উঠে খোয়াঢাকা সড়ক ধরে এবার বাড়ির দিকে চলেছে বাদল খুশি মনে। নির্জন মাঠ—ওদিকে শালবনে সকালের আলো পড়েছে। চড়াই ভেঙ্গে বড়জোড়ার ডাঙ্গা থেকে এবার মাঠের পথ ধরে গ্রামের দিকে ফিরছে বাদল।

সুধাময়ের বাড়িতে গতকালের উৎসবের জের তখনও চলেছে। কিছু ভক্ত-গুণমুগ্ধ অনেকেই রয়েছে। সুধাময় অবশ্য এখন কালকের হিসাবের ব্যাপার নিয়ে বসেছে।

কাল সেও গুনেছে যজ্ঞাসনে বসে যে ধুতি-শাড়ি মিলিয়ে পনেরোখানা পড়েছে। আর বেশ কিছু ফল, প্রণামীও পড়েছে। কিন্তু তিনখানা শাড়ির হিসাব মেলে না।

শরৎ বলে—এইসব খাতায় লেখা আছে সুধাময়।

সুধাময় বলে হিসাব দেখে—কিন্তু চিনুমোড়লের দেয়া শাড়ি, গোঁসাইপুরের নবু কামার দিল শাড়ি, ধুতি এগুলো তো লেখা নাই। আর প্রণামীর টাকা থেকেও পঁচিশ টাকা পাচ্ছি না!

শরৎ অবশ্য কিঞ্চিৎ হাতসাফাই করেছে। সে ভাবেনি যে সুধাময় এমনি নিখুত

হিসাব রাখবে। এবার বুঝেছে শরৎ ভটচায যে সুধাময় দেবতার দিকে নয়, পাওনার দিকেই বেশি নজর রেখেছিল। তবু বলে সে—এইতো সব বাবাজী।

সুধাময় বলে—না খুড়ো। তুমি একটু ভেবে দ্যাখো, সব ঠিকঠাক বেরুবে। শরৎ চটে ওঠে—তাহলে বলতে চাও আমিই এর জন্য দায়ী? আর কেউ সরালে আমি কি করবো?

সুধাময় বলে—অন্যের নামে দোষ দেওয়া কি ঠিক?

—মানে? শরৎ ভটচায বলে—আমাকেই চোর সাজাতে চাও। এত খাটলাম আর শেষে কিনা এই অপবাদ।

সুখদা ঠাকরুন যাচ্ছিল এই পথ দিয়ে। সেও দেখেছে কালকের মচ্ছব। আবার আজ দেখছে আর এক কাণ্ড। সে স্পষ্টবাদী. তাই বলে সুখদা ঠাকরুন।

—যেমন পূজারী তেমনি সামালদারও। লুটছে সারা অঞ্চলের মানুষের. ও এক নম্বর ঠগ, চোর. আর ভটচায তুমি শেষে চোরের উপর বাটপাড়ি করলে?

শরৎ বলে—তুমি থামো। বুঝলি সুধা. শরৎ ভটচায দেবতুল্যি লোক। তার নামে বদনাম দিবিনা।

এমন সময় ঢুকছে বাদল। হাতের বড় পুটুলিতে বাঁধা তিনটে মাথা। কাপড়ে রক্তের দাগ। ওকে দেখে থামলো সুধাময়, শরৎ।

গুণময়ও বের হয়ে আসে ঘর থেকে। সুখদা ঠাকরুন রক্তের দাগ আর ওই পুটুলি দেখে বলে—কি আনলি রে?

সুধাময় বলে—দাদা দুর্গাপুরের জমিদারবাবুদের বাড়িতে গেছেন. বাদল সেখানের বলিদানের প্রসাদী মাথা এনেছে খুড়িমা।

শরৎ মাংসের নাম শুনে ঝগড়া ভুলে বলে—এ্যা! এযে অনেক রে। বাবুদের ব্যাপারই আলাদা। আমাদের এখানে পাঠা বলি উঠেই গেল। ব্রাহ্মণ যে একটু প্রসাদী মাংস পাবে তার উপায় রইল না। বেশ নধর পাঁঠারে!

বাদল বলে—হবে না? বেছে বেছে বড় দেখে মাথাই এনেছি। একখান মাথায় তো দুসের মাংস বেরুবে নির্য্যাস। একেবারে তেলালো মাংস। দেখবা—

উৎসাহ ভরে বাদল পুটুলির গিট খুলতে থাকে। বলে বাদল—মা. আগে পিয়াজ বাটো। মাংসের ঝোল আর ভাত। বড় মাথাটাই আগে এ বেলায় খাবো। বাকী দুটো হবেক কালকে। বেশ কষা কষা করে রেখে দেবে। বড়টা আজ। এই দ্যাখ কেমন মাংস এনেছি।

পুটুলির বাঁধন খুলতেই সুখদা ঠাকরুন চমকে ওঠে। শরৎ ভটচাযও অবাক! হাসছে গুণময়। বাদলও অবাক! সুধাময় বলে ওঠে—একি রে! একি মাথা এনেছিস?

সুখদা ঠাকরুন নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বলে—ওমা! এযে মোষের মাথা রে!

রাম-রাম! এই সব অখাদ্য খেয়ে তুই হোম-যজ্ঞি করিস সুধা। রাম-রাম-রাম।

বুড়ি শুচিবাই স্বভাবের। তাই অপবিত্র কিছু মাড়াবার ভয়ে তিড়িং-বিড়িং করে পথ চলে। বুড়ি তিড়িং-বিড়িং করে বের হয়ে গেল। এবার শরৎও তার শাড়ি-ধুতি, প্রণামী চুরির অপবাদ মোচনের জন্য একটা মস্ত পথই পেয়ে গেছে।

বলে সে—বলিদানের মাংস পবিত্রই। তবে মোষের মাংস। ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণের কাছে অখাদ্যই। এসব ঠিক নয় সুধাময়। চলি—

শরৎ ভটচায এর কথায় সুধাময় বলে—শোন শোন শরৎখুড়ো।

শরৎ বলে—স্নান করে শিবপূজো করতে হবে, চলি।

যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে সুধাময়ের। এবার সারা গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র করে দিতে ওই দুজনই যথেষ্ট। সুধাময় বাদলের কানটাই ধরে গর্জায়।

—এসব কে আনতে বলেছে তোকে? এ্যাঁ—বামুনের ছেলে হয়ে মরা মোষের মাথা আনলি ঘরে? লোকে কি বলবে এবার? এ্যাঁ—কি জবাব দিবি হতচ্ছাড়া কোথাকার!

বাদল বলে—বড় মাথা আনতে বলেছিলা। মাথার গাদার ওখানে তো অন্ধকার। ঠিক দেখতে পাইনি, হাতড়ে-হাতড়ে বড় মাথা বাছতে গিয়ে বড় দেখে এইটাই এনেছি।

গর্জে ওঠে সুধাময়—কেতাত্থ করেছো! এখন ঠ্যালা সামলাও। যত্তোসব অকালকুষমাণ্ড নিয়ে কারবার। যা, এটাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আয় চুপে-চুপে। তারপর নতুন পুকুরে চান করে আসবি।

গুণময় বলে—শুধু মোষের মাথাটা ফেললেই হবে? এ দুটোও তো ওর সঙ্গেই এসেছে। এই মাথা দুটোও খাবে?

সুধাময় ওই মাথা দুটোর দিকে চেয়ে মাংসের পরিমাণটা দেখে বিধান দেয়।

—অগ্নিপক্ক হবে ওতে আর কোন দোষই থাকবে না।

এখন ওই পবিত্র অপবিত্র মাংসের কথা সে ভাবছে না। এই পরিস্থিতিটা সামলে দেবে কি করে। তাই ভাবছে সুধাময়। এই অপবিত্র মাস তার বাড়িতে আসে এটা শুনলে তার কালকের শ্রদ্ধাভক্তির পুঁজিতে বেশ টান পড়বে এটা ভেবেই সে মুষড়ে পড়েছে।

সুখদা ঠাকরুন এখান থেকে গিয়ে হাজির হয়েছে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের ওখানে। গ্রামের ছআনার জমিদারী এই হরিপ্রিয়ার স্বামী হেমন্তবাবুদের। হেমন্তবাবু গত হয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগেই তার ছেলে তার বর্তমানেই মারা যায়। তার স্ত্রীও। রেখে গেছে একটি মাত্র নাতি বিজয়কে। হরিপ্রিয়া ঠাকরুন স্বামী, যোগ্য পুত্র, বৌমার মৃত্যু দেখেছে। এখন ওই বিজয়কে নিয়েই রয়েছে। কেষ্ট সরকার পুরোনো কর্মচারী। বিষয়-

আশয় সরকার মশায় দেখা-শোনা করলেও হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও নিজে সব দিকে নজর রাখে। বুদ্ধিমতি আর বেশ কড়া মেজাজের মহিলা। চলায়-বলায় একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

বিষয়-আশয় নিয়ে মামলাও হয় সদরে। জমিদারী থাকলেই বাকী করের মামলা হবেই। সেবার এক মামলার ব্যাপারে হরিপ্রিয়া নিজেই সরকারকে নিয়ে সদরে গেছে। তরুণ এক উকিলবাবুকে বাড়িতে ধরে আর্জি লিখিয়ে কোর্টে চলেছে পেশ করতে।

পথে উকিলবাবু প্রস্রাব করতে বসেছে। ওদিকে পথে অপেক্ষা করছে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন সঙ্গে সরকার। উকিল প্রাকৃতিক কাজ শেষ করে এদিকে এসে দেখে মহিলা মক্কেল হাঁটা দিয়েছে। উকিলবাবু মক্কেল হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

সেও পিছু-পিছু আসে।

—শোনেন। ও মা জননী, আপনার মামলার আর্জি পেশ করতে হবে কাছারিতে চলুন। হরিপ্রিয়া বলে উকিলকে—বাবা, তুমি ঠিকমত প্রাকৃতিক কাজটুকুও করার জায়গা বাছতে পারো না। সব জল তোমার প্যান্টুলেই লেগেছে। এমন বেহিসেবী লোক উকিল কি হবে বাবা। তোমার দ্বারা আমার মামলা হবে না। দুসরা উকিল দেখতে হবে চলে এসো সরকার।

এমনি জাঁদরেল মহিলা ওই হরিপ্রিয়া। আদালতে জেরার যা জবাব দেয় তা সামলাতে ঘাঘু উকিলও হিমসিম খায়। কিন্তু বিধি বাম ওই হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের একমাত্র নাতি বিজয় কেমন যেন আধপাগলা গোছের। স্কুলে যায় না। বাড়ি থেকে বের হয়ে বাগানে রাখালদের সঙ্গে কেষ্টযাত্রার গানে নকল কেষ্ট সেজে গান গায়। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটা। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে সুধাময়ই বলেছিল—হোম করবে ওর জন্যই। হরিপ্রিয়াকে মাদুলিও একটা দিয়েছে. সুধাময় কাল রাতেই। মহাসিদ্ধ কবচ। বিজয়ের হাতে পরালে নিশ্চিত ফললাভ হবে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন কাল তার জন্যই ওসব সিধে, নগদ দুশো একান্ন টাকা প্রণামীও দিয়েছে। ঠাকরুন সেই মাদুলি এনে পরিয়েছে বিজয়ের হাতে।

বিজয় কোন আপত্তিও করেনি।

ছেলেটা কোন কথাই শোনেনা। আপন খেয়ালেই চলে তাই কড়া মেজাজের হরিপ্রিয়ার সঙ্গে ওর ঝামেলাও হয়। হরিপ্রিয়া নাতিকে খুবই ভালোবাসে কিন্তু ছেলেটা মাঝে-মাঝে এমন কাণ্ড করে যে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় হরিপ্রিয়ার।

মাঝে-মাঝে দু-একঘা দিয়েও দেয়।

আবার রাগ পড়লে দুঃখই হয়। কই আধপাগল ছেলেটাই এই সংসারের বেড়ি। ওর জন্যই সংসারের জ্বালায় পড়ে আছে হরিপ্রিয়া, নাহলে তার কি দায়?

বিষয়-বিষ ঝেড়ে ফেলে কাশীবাসীই হতো সে। কিন্তু পারেনি কই বিজয়ের জন্যই।

যদি ঠাকুরের দয়ায় ছেলেটার মাথা ঠিক হয়, ওর বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করে বুড়ি নিশ্চিন্তে মরতে পারবে।

এই আশাতেই ওই সুধাময়ের কাছে যজ্ঞ করেছিল। আর মাদুলিটা বাঁহাতে দিতেও কোন আপত্তি করেনি বিজয়।

হরিপ্রিয়াকে বলেছিল সুধাকর, —মাদুলি বাঁধার তিনদিনের মধ্যে এর সুফল বুঝতে পারবে। একরাত কেটে গেছে, সুফলের আশায় রয়েছে হরিপ্রিয়া।

এমন সময় সুখদা ঠাকরুনকে গলদঘর্ম অবস্থায় ডিং পেড়ে পেড়ে পা বাড়িয়ে ওর বাড়িতে ঢুকতে দেখে চাইল হরিপ্রিয়া।

—কি খবর গো বড়বৌ? সুখদা ওদের পরিবারের বড়বৌই ছিল। তাই মেয়ে মহলে ওই নামটাতেই পরিচিত সে।

সুখদা বসে বলে

—টুকচেন খাবার জল দাও দিন।

হরিপ্রিয়াই একঘটি জল দিতে সুখদা জলটা কোঁক কোঁক করে গিলে একটু দম নিয়ে বলে—আর বলোনা দিদি। তলে তলে এইসব চলে ওই সুধার বাড়িতে। রাম রাম রাম। বামুন না রাক্ষস। ছি ছি শিউরে উঠছি গো এখনও।

হরিপ্রিয়া শুধায়—কি হলো?

—কি হতে বাকী আছে তাই বলো? নিষ্ঠেবান বামুন পণ্ডিত তাই ওই রাক্ষস ভাইদের বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ায় না, গায়ের বাইরে ঠাকুর-দেবতা আর ধম্মশাস্তর পাঠ নিয়ে পড়ে থাকে। কেনে থাকে তা এবার বুঝলাম।

হরিপ্রিয়া কৌতূহলভরে শুধায়

—কি হয়েছে বলবে তো?

সুখদা এবার সেই মোষের মাথা বাড়িতে আনার দৃশ্যটা বর্ণনা করতে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন চমকে ওঠে।

—সেকি! কি বলছ এসব যা-তা?

—যা-তা লয়। স্বচক্ষে দেখে এসেছি। বিশ্বেস না হয় শরৎ ভটচাযও দেখেছে। তাকে শুধোয়। বাড়িতে আনে মোষের মাথা? ধরা পড়তে ছেলেটা বলে—না, অন্ধকারে এনেছি ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। ন্যাকা! হরিপ্রিয়া বেশি কথা বলে না। জানাতেও পারে না যে সে কবচও এনেছে ওই অপবিত্র বামুনের কাছ থেকে। বলে হরিপ্রিয়া

—কে জানে বাবা গাঁয়ে-ঘরে দেখছি জাতধর্মও রইল না।

সুখদা বলে—যাই বেলা হয়েছে গাঁয়ের ধম্মের ব্যাপারে তোমার কাছেও সবাই আসে। হরিমন্দিরের খর্চাও দাও, তাই তোমাকেও কথাটা জানিয়ে গেলাম, ওই ভণ্ড

বামুনের গুণের কথা।

সুখদা বলে চলে যায়। হরিপ্রিয়া কি ভাবছে?

যাদের ওপর বিশ্বাস করেছিল তারা যেন সবাই তাকে ঠকাতেই চায়।

বেলা হয়ে গেছে। বিজয় এখন ও ফেরেনি।

বিজয়ের সঙ্গে রেখেছে হরিপ্রিয়া ওদের কিরষাণএর ছেলে নোটনকে। সেটারও কোন পাত্তা নাই।

ঠাকরুন ছেলেটার খোঁজে বের হয়।

বিজয় থাকে নিজের খেয়ালে। মাঝে-মাঝে বেশ ভালো থাকে। বইপত্র বের করে, ইস্কুলেও যায়। আবার হঠাৎ কি খেয়াল হয় বইপত্রে আর হাত দেয় না।

তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের বাগানে পাখির সন্ধানে ঘোরে। সঙ্গী নোটন ছেলেটাও বেশ হুঁসিয়ার, সে বলে—পাখি পুষে কি হবেক? ঘরে টিয়া আছে, শালিখ চাই। শালিখের ডিম খেলে আকাশে ওড়া যায়। বুঝলি আমিও আসমানে উঠে ওই হরিঠাকরুনের দেশ ছেড়ে পালাবো। বুড়ি যা মারে।

নোটন বলে, গিন্নীমাকে কম জ্বালাও তুমি। ইস্কুলে যাওনা—গান গেয়ে বেড়াও।

বিজয় ধমকায়—এ্যাই নোটনা, তুই একদম আমার সঙ্গে থাকবিনা। ব্যাটা হরিঠাকরুনের চামচে। ভাগ!

বিজয় চলে আসে বাগানে।

গ্রামের বাইরে বড় বাগানটা ওই বিজয়দেরই। ওপাশে ঘন আমগাছে ঘেরা বড় একটা পুকুরও আছে। এদিকে মাঠের ধারের বাগানে গ্রামের রাখাল বাগালের দল গ্রামের গৃহস্থদের গরুর পাল নিয়ে এদিকেই চরায়। এখন মাঠজুড়ে ধান রয়েছে। গরুগুলো ধানে মুখ দেবে। তাই এদিকের বাগানে বনের ধারে বিশাল প্রান্তর, মহুয়া বাগানে তারা থাকে।

দিনে গরু চরায়, মুনিবেব বাড়িতে খোরাকি, গরুপিছু কিছু পয়সা পায়, আর সন্ধ্যায় কেষ্টযাত্রার আসর বসায় তারা। গ্রামে নরু চাটুয্যে তাদের দলের মাষ্টার।

ছেলেরা মাঝে-মাঝে পালপরবে রীতিমত রাধা সেজে ওরাই মান মাথুর পালা গায়।

লক্ষীপুজোর সময় কমলদাসের লক্ষ্মী মেলাতেই দুরাত তাদের কেষ্টযাত্রা হয়ে গেল।

বিজয়ও গেছল কেষ্টযাত্রা দেখতে ঠাক্‌মা, সরকার মশায়ের সঙ্গে। মুগ্ধ হয়ে দেখে লোহারদের পচা, বাউরিপাড়ার খাঁদা অন্যরা সেজেগুজে গান গাইছে।

পচা লোহার সেজেছে কেষ্ট। মাথায় মুকুট হাতে বাঁশি। কেমন এঁকেবেঁকে দাড়িয়ে নেচে-নেচে গাইছে

—আমি বৃন্দাবনে বনে বনে
ধেনু চরাবো।
ধেনু চরাবো গো আমি
বেণু বাজাবো—

সেই কেষ্টার গানটা এখনও ভোলেনি বিজয়। আজ বাগানে পচা-খাঁদা অন্য রাখালের দেখে এগিয়ে আসে। তারাও খ্যাপা ঠাকুরকে চেনে। ওরা জানে বিজয় বেশ বড়লোকের ছেলে। পকেটে ওর পয়সা কিছু থাকেই। বিজয় বলে—গানটা নাচটা শিখিয়ে দিবি পচা? আমিই নিজের দল করে কেষ্ট সাজবো।

পচা বলে—শুধুমধু কি ইসব শিক্ষা হয় গো ঠাকুর? বিড়ি-ফিড়ি খাওয়াও তবেই শেখাবো।

খাঁদা বলে—একেবারে কিষ্ট সাজিয়ে দোব। লেচে-লেচে রাধাকে লিয়ে গাইবা।
—ঠিক তো! বিজয় কথা পাকা করতে চায়।

—হগো! তাকে পাকা কথাই দেয় ওই পচা।

এবার বিজয় পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বলে—নোটনা, এক বাণ্ডিল বিড়ি আর দিশলাই আন।

টাকা দেখে পচা বলে—তালে ভমরের দুকানের বাকী পয়সায়র তেলেভাজাই আনবি। ভালো করে লাচ শেখাবো।

বিজয় বলে—তাই আনবি।

নোটন ওই ছেলেদের চেনে। হাভেতের দল। বলে সে।

—এ্যাই পচা।

বিজয় ধমক দেয়—ব্যাটা হরি ঠাকরুনের চামচা, যা, আমি বলছি।

নোটন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যায়।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন গাঁয়ে, আটচালাতেও বিজয়কে দেখে না। বেলা হয়ে গেছে। এখনও জল গ্রহণ করেনি। ঘুরছে পাগলের সন্ধানে। মনটা কি জ্বালায় ভরে ওঠে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের। এত কিছু থেকেও তার কিছুই নাই।

ঠাকুর সব কেড়ে নিয়ে ওই একটা পাপকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। যার বোঝা টানতে টানতে সে শেষ হতে চলেছে। বিজয়ের উপর রাগটা বাড়ে ঠাকরুনের।

গাঁয়ের এদিকে বাগানের দিক থেকে সুরটা ওঠে। রাখালরা গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে গান গায়, হৈচৈ করে নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ ওদের মধ্যে বিজয়ের গলা পেয়ে ঠাকরুন অবাক হয়। তার মত ঘরের ছেলে এই ভরদুপুরে ওই রাখালদের সঙ্গে কি করছে?

রাগটা বেড়ে যায় ঠাকরুনের। ওই একটা কুলাঙ্গারের জন্য সে এত করছে, তার বিনিময়ে পেয়েছে ওর কাছ থেকে শুধু জ্বালা আর অপমান। সারা গাঁয়ের লোক হাসে।

আড়ালে বলে—পাগল হবে না ঠাকরুনের নাতি? কত গরীবের সব্বনাশ করেছে ওই চৌধুরীরা তার ঠিক আছে? এসব সেই পাপেরই শাস্তি। ওই ছেলেটার জন্য বংশের অপমান। ও যেন তাদের পরিবারের একটা দুরপনেয় কলঙ্কই।

এগিয়ে যায় ঠাকরুন।

পচা, খাঁদার দল এর মধ্যে আমপাতার মুকুট বানিয়ে বিজয়ের মাথায় পরিয়েছে। বিজয় খুব খুশি ওই মুকুট পরে। নিজেকে সেই আসরের কেষ্টই মনে করে বলে। মুকুট তো হলো। বাঁশি কইরে পচা? বাঁশি না হলে কেষ্ট মানাবে কি করে?

খাঁদা তার পাচনটাই দেয়।

—ইটাকেই বাঁশি করে নাও ঠাকুর। কইগো শালো নোটনা তো বিড়ি নিয়ে এলোনা? শালো টাকা নে সটকালে নাকি গো ঠাকুর?

বিজয় বলে—তেলেভাজা ভাজিয়ে আনছে। নে-শুরু কর। এবার বিজয়ই ওই আমপাতার মুকুট পরে পাচন বাড়িকে বাঁশির মত ধরে বলে—রাধা কইরে।

খাঁদা বলে—এই তো রইছি গো। গাও—

এবার বিজয় গান করে—আমি বেন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবো—

আর সেইসঙ্গে নাচও চলেছে। রাখালছেলেগুলো চীৎকার করে—সাবাস! ঘুরে-ফিরে ক্ষ্যাপা ঠাকুর। আরও জোরে।

বিজয় এবার মনে করে লোকভর্তি আসরেই গাইছে সে কেষ্ট সেজে। লাইট জ্বলছে, তার চারিদিকে মুগ্ধজনতা। সে চোখ বন্ধ করে বেশ জোরে চীৎকার করছে আর নাচার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। যেন বুড়ো একটা বাঁদরই লাফাচ্ছে। হাসছে ওরা। বিজয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আরও জোরে নৃত্যসম্বলিত গান চালিয়েছে।

হঠাৎ ওদের হাসি-কলরব থেমে যায়। বিজয় তখনও গেয়ে চলেছে

—নীল যমুনার জলে

কেলি করি কুতুহলে—

হঠাৎ এবার চুলের মুঠিতে টান পড়তে চাইল বিজয়। সামনে দেখে কঠিন মূর্তিতে এসেছে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন। ওর চুলের মুঠি ধরে একটানে হাতের সেই সদ্য বাঁধা মাদুলিটা খুলে নিয়ে এবার বিজয়ের হাতে ধরা বংশীরূপী পাঁচনটা নিয়েই হরিপ্রিয়া ঠাকরুন এবার বিজয়কেই মারতে থাকে।

গর্জাচ্ছে ঠাকরুন—তোর জন্য মুখ দেখাবার পথও রইলনা। এমনি করে হাড়মাস জ্বালাবি? আজ তোকেই শেষ করে বংশের পাপকে মুছে দোব।

নির্দয়ভাবে মারতে থাকে বিজয়কে ঠাকরুন। আজ তার মাথায় যেন খুন চেপেছে।

বিজয় বাধা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা করে। গরুর মত পিটছে ওকে পাচন দিয়ে, কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই ঠাকরুনের।

এমন সময় নোটন ওদের জন্য বিড়ি দেশলাই আর কাঁচা শালপাতায় ভ্রমরের দোকান থেকে গরম বেগুনি এনে ওই দৃশ্য দেখে অবাক।

—গিন্নীমা!

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন দেখে নোটনের হাতের ওই মালপত্র। গর্জে ওঠে—দানছত্র করা হচ্ছে? আপদ—

আরও কয়েক ঘা দিয়ে এবার ক্লান্ত হয়ে ঠাকরুন পাঁচনটা ফেলে দিয়ে বলে বিজয়কে—মর মর তুই। জ্বালা জুড়োয়।

হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে ঠাকরুন ওই ভটচায পাড়ার দিকে। ওই ভণ্ড অপবিত্র সুধাময়ের কবচ পরেই একদিনেই যেন ছেলেটার ঘাড়ে প্রেত ভর করেছে।

সুধাময় দুপুরে স্নান-খাওয়া আজ একটু সকালেই সেরেছে। ক'দিন খুবই ধকল গেছে। এর মধ্যে ওই মোষের মাথা নিয়ে ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য শরৎ ভটচাযের সঙ্গে রফাও হয়ে গেছে।

অবশ্য তার জন্য আরও দুখানা শাড়ি আর নগদ তিরিশ টাকা দিতে হয়েছে ওই মক্ষীচুষ শরৎ খুড়োকে।

শরৎ বলে—এনিয়ে ভেবনা বাবাজী। ছেলেমানুষ ভুল করে ফেলেছে। এনিয়ে কেউ কিছু জানতে পারবে না।

নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরেছে সুধাময়। কিছু গচ্চা গেল, কিন্তু সুনামটা বজায় থাকলে এটাকা উঠে যাবে। কমলবাবুই বলেছে ওর বাড়িতে যজ্ঞ করতে।

সুধাময় বলেছে—বৃহৎ ধনদা যজ্ঞই করবে। সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার সাতদিনের মধ্যে যজমানের বৃহৎ ধন-সম্পদ পাবার সুযোগ ঘটে।

কমল বলে—তাহলে তাই করতে হবে। একদিন এসে ফর্দ করে দেবেন। সুধাময় বেশ খুশি হয়েই বাড়ি ফিরে বাদলের আনা মাংস দিয়ে সেবা করে এবার একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছে। এমন সময় হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে তেড়েফুড়ে এই ভরি দুপুরে আসতে দেখে উঠে বসে।

—কাকিমা, আপনি! কি ব্যাপার? বলুন।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন ফুঁসে ওঠে।

—বসতে আসিনি, তোমার ভণ্ডামির জবাব দিতে এসেছি।

—মানে? অবাক হয় সুধাময়!

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন সুধাময়ের মুখের উপর লাল সুতোয় বাঁধা মাদুলিটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে—নিজে আগে সৎ, শুদ্ধাচারী হও। বাড়িতে ম্লেচ্ছর মত আচরণ করবে, অখাদ্য-কুখাদ্য ঢোকাবে। আর লোককে ঠকাবে এই ভাবে? ভণ্ড কোথাকার।

মাদুলিটা ফেলে দিয়ে চলে যায়। সুধাময়ের বউ কাদম্বিনী হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে

ওইভাবে আসতে দেখে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আসে। দেখে ততক্ষণে ঠাকরুন ওই মাদুলি ছুঁড়ে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কাদম্বিনীও শুনেছে ওর কথাগুলো। বলে সে

—তখনই বলেছিলাম, ওসব ভণ্ডামী করো না। কিছুই জানো না। যাগ-যজ্ঞি করতে যাও, এখন হল তো?

সুধাময়ও শুনেছে কথাগুলো। বলে সে

—ওই ম্লেচ্ছ বলে গেল শুনেছো? আমি অখাদ্য-অপবিত্র জিনিষ ঘরে আনি? এ ওই শরৎ ভটচাযরই কাজ।

কাদম্বিনী বলে—লোকের দোষ দেখার আগে নিজের দোষটা দ্যাখো। বড় দেখে মাথা আনবি। লোভ আর লোভ।

সুদাময়ও বুঝেছে হরিপ্রিয়ার কানেও কথাটা গেছে। আর তাই এভাবে এসে মুখের উপর এসব কথা শুনিয়ে গেল। গজরাচ্ছে সে

—শরৎখুড়ো একটা বেইমান। ওকে দেখে নোব। ঠাকরুনের নাতির কবচ ফেলে দে গেল। এত বড় হিম্মৎ। ও পাগল সারবে না কোন দিন।

বিজয় ভাবতেই পারেনি যে ঠাক্‌মা বাগানে এসে রাখালদের সামনে তাকে এই ভাবে মারবে। ওই সব কথা বলে যাবে। বিজয় দেখে রাখালরা গরু নিয়ে বনের দিকে চলে গেছে। নোটনাও সেই যে পালিয়েছে মারের ভয়ে আর এমুখো হয়নি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বিজয় কি করবে জানেনা।

ওই ছায়াঘন বাগানের চাতালেই বসে আছে। কপালটা কেটে গেছে। জামায় রক্তের দাগ। কপালে রক্তটা তখনও যেন অল্প বের হচ্ছে। ঘাটের ধারে বসে কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ছেলেটা। মনে হয় তার এত বড় পৃথিবীতে সত্যই কেউ নাই।

মা-বাবাকেও মনে পড়ে না। আজ দেখেছে ঠাকরুনের রুদ্রমূর্তি। নির্দয়ভাবে মেরেছে। বাড়িও যাবে না আর। ওই মাঠ পার হয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। বেদনা করছে, হাতে পিঠে মেরেছে।

জামার খুট দিয়ে রক্ত মোছার চেষ্টা করে। তেষ্টাও পেয়েছে। ওই পুকুরের ঘাটের দিকে চেয়ে থাকে, পচা জল—ওই জলই খাবে কি না ভাবছে। নেমেছে পুকুরে। জল খেতে যাবে।

হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল'

—ওই জল খেওনা। উঠে এসো।

বিজয় চাইল। দেখে মেয়েটিকে। মুখ চেনো। পথে-ঘাটে দেখেছে মোহিনীকে। মুখুযো পাড়ার নরেশ মুখুয্যের ছোট মেয়ে।

গ্রামের বাইরে বনকাটির দিঘিটার জল বেশ ভালো। কাকুরে মাটির বুকে বেশ বড় দিঘি। খোলামেলা। আলো-হাওয়া খেলে। এই পুকুরের জল গ্রামের এদিকের অনেকেই খায়।

বৈকালের দিকে মেয়েরা কলসী নিয়ে ওই দিঘিতে দলবেঁধে জল আনতে যায়। বৌ-ঝিদের বেড়ানোও হয়, নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়, হালকা রসিকতাও হয় আর ঘরের খাবার জলও আনা হয়।

মোহিনী জল আনতে গেছল। একাই পথ সংক্ষেপ করার জন্য বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে। হঠাৎ রক্তাক্ত অবস্থায় আহত বিজয়কে ওই পচা জল খেতে দেখে মোহিনীই বাধা দেয়।

বিজয় দেখেছে ওকে। ঘাটের চাতালে উঠে আসে।

মোহিনীও এগিয়ে আসে। দেখছে বিধ্বস্ত ছেলেটাকে। চোখে.ওর নিষ্পাপ দৃষ্টি।
—একি হয়েছে তোমার? কেউ মেরেছে?

মোহিনীর কথায় বলে বিজয়

—ঠাক্‌মা মেরেছে। বাগানে কেষ্ট সেজে গান গাইছিলাম তাই এসে পাঁচন দিয়ে মেরেছে। বলে, আমি মলে নাকি ও বাঁচবে। আর বাড়ি যাবো না। না।

মোহিনীর চোখে বেদনা ভরা চাহনি। শুধোয় সে

—তবে কোথায় যাবে?

বিজয় জানায়—যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। ক্যামন করে মেরেছে দ্যাখো! কপালের ক্ষতটা দেখে মোহিনী। বলে সে—বোস এখানে। দেখছি।

মোহিনীই এবার বাগান থেকে দুর্বাঘাস তুলে ভালো করে রগড়ে জল দিয়ে ওই ক্ষতের রক্তটা সাফ করে দুর্বা ঘাস চটকে ক্ষতে দিয়ে ওর পকেটের রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয়।

বিজয় অবাক হয়ে দেখছে মোহিনীকে। মোহিনীই তার কলসীর জল ওর আঁজলায় ঢেলে দেয়, বিজয়ের তেষ্টাও পেয়েছিল। অনেকটা জল খেয়ে এবার বলে—তুমি খুব ভালো।

হাসে মোহিনী। বলে সে—বাড়ি যাও।

—না।

মোহিনী বলে—আমি বলছি, আমার কথা শুনবে না?

চাইল বিজয়। মনে হয় এভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। তার বেদনা অনেক কমে গেছে ওই মেয়েটির ছোঁয়ায়। ভালো লাগে বিজয়ের। বলে সে—কিন্তু ঠাকমা আবার যদি মারে? ওকে চেননা।

মোহিনী বলে—ঠাক্‌মা যা বলেন শোননা কেন? তুমি ওর কথা শোননা বলেই

তো রাগ করেন। এবার থেকে ঠাকমার কথা শুনবে।

বিজয় শুধোয়—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ! শুনবে তো? মোহিনী বলে।

বিজয় কি ভাবছে। বলে সে—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ শুনেবা।

—বাড়ি যাও। মোহিনী বলে—বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, বাড়ি যাও। আমাকেও যেতে হবে।

বিজয় বলে—তুমি আর আসবে না?

হাসে মোহিনী। বলে সে—কাল বৈকালে জল নিতে আসবো, এখন যাও।

মোহিনী চলে যায়, দেখে মোহিনী বিজয়ও ফিরছে বাড়ির দিকে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনএর জেদ-রাগ একটু বেশিই। তবে মানুষ হিসাবে ভালোই। ছেলেটাকে ওইভাবে মেরে সে নিজে বাড়ি ফিরে চুপ করে বসে আছে। জলও খায়নি।

কাজের বামুনদিদি বলে—মা, কিছু মুখে দাও। দিন-ভোর না খেয়ে আছো।

হরিপ্রিয়া এবার অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছেলেটাকে আজ খুব মেরেছে, যা-তাও বলেছে। সন্ধ্যা হতে চললো এখনও ফেরেনি বিজয়।

খিদে পেলে সে থাকতে পারে না। আজ খেতেও আসেনি। ছেলেটা না খেয়ে রইল আর সে খাবে কি করে?

তাই বলে হরিপ্রিয়া—বিজে ফিরলো না। দিন-ভোর খায়নি।

বামুন মেয়ে বলে—সে ফিরে আসবেই। ওইতো এসে গেছে।

ঠাকরুন চাইল। বিজয় ফিরছে।

—এলি বিজু?

বিজয় চাইল। কিছু কড়া কথা সেও শোনাতো। কিন্তু বিজয়ের চোখের সামনে মোহিনীর মুখটা ভেসে ওঠে। তাকে কথা দিয়েছে বিজয় ঠাক্‌মাকে কিছু বলবে না।

ওর সব কথাই শুনবে। তাই চুপ করে থাকে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন ওকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বোলাতে থাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তোকে এমনি করে মেরেছি? আমরা ঘাড়ে শয়তান ভর করেছিল রে। তাই এসব করেছি। ছিঃ ছিঃ। জামা-টামা ছেড়ে ফ্যাল। হাত মুখ ধুবি চল। কপালে ঘা-টাতে ওষুধ দিবি চল।

নাতিকে টেনে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। বামুন মেয়েকে বলে—আমাদের দুজনের খাবার তৈরি করো। আমরা আসছি।

বিজয় চুপ করেই থাকে।

বিজয় সকাল থেকেই বই নিয়ে বসে। স্কুলের পড়ার দিকে একদিন তার কোন

খেয়ালই ছিল না। আজ সকালে ওকে পড়তে বসতে দেখে হরিপ্রিয়া অবাক হয়।

বিজয়ই বলে—সরকার মশাইকে বলো ঠাক্‌মা, মাষ্টার মশায়কে যেন খবর দেন।

হরিপ্রিয়া খুশি হয়। —সত্যিই তুই পড়বি তো? স্কুলে যাবি?

ঘাড় নাড়ে বিজয়।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন স্বপ্ন দেখে হয় তো বিজয় আবার সেরে উঠবে। তার সব হারানো জীবনে এইটুকু সান্তনা পেলেই সে খুশি হবে, তার আর কিছুই চাওয়া নেই।

বৈকালে মোহিনী বনকাটিতে জল নিতে চলেছে। পাড়ার বৌ মেয়েরা এই সময় বের হয় পুকুরের দিকে। মোহিনীকেও ডাকে ওরা।

মোহিনী বলে—তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি। ঘাটে গিয়ে ধরে নেব তোমাদের।

মোহিনী পথসংক্ষেপ করার জন্য ওই বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে। পড়ন্ত বেলা। বড় বড় আম-কাঠাল গাছের জটলায় বাগানটায় এখনই ছায়া অন্ধকার নেমেছে। পাখিদের কলরব শোনা যায়। হঠাৎ ঘাটের দিকে নজর পড়তে দেখে মোহিনী বিজয়কে। আজ তার পোষাকও বেশ ছিমছাম। কপালে ব্যান্ডেজ।

বিজয় বলে—জল আনতে যাচ্ছো?

মোহিনী শুধোয়—কেমন আছো?

বিজয় বলে—ভালো। বুঝলে, তোমার কথা শুনে ঠাকমাকে কিছুই বলিনি। পড়াশোনা করছি।

মোহিনী দেখছে ছেলেটাকে। বিজয় বলে—স্কুলে আবার যাবো।

বলে মোহিনী—নিশ্চয়ই যবে। মন দিয়ে পড়বে। আর ওই রাখাল-বাগালদের সঙ্গে মিশবে না।

—মিশব না?

—না। তাহলে আমিও রাগ করবো।

মোহিনীর কথায় বিজয় বলে—তাহলে মিশবো না। আমি ইস্কুল থেকে বাগানে বৈকালবেলায় আসবো। তুমি আসবে তো? রোজ কি করেছি তোমাকে বলবো। আসতে হবে কিন্তু!

মোহিনী বলে—বাঃ রে। ঘরের কাজ নাই?

বিজয় মুখ ভার করে বলে—তালে কার সঙ্গে কথা বলবো? সবাই আমাকে দেখে হাসে। তুমি হাসো না—তুমি খুব ভালো মোহিনী। তোমার জন্যেই তো কপালের ঘাটা সেরে গেছে তাড়াতাড়ি।

মোহিনী দেখছে ওই অবোধ শিশুর মত ছেলেটাকে। বলে সে—ঠিক আছে আসবো। তবে পড়াশোনা না করলে, স্কুলে না গেলে আমি আর আসবো না।

—না, না। দেখবে এবার ছব ঠিক ঠিক হবে।

মোহিনী বলে—সন্ধ্যা হয়ে আসছে আগেই বাড়ি চলে যাবে। পড়তে বসবে কিন্তু

বিজয় বলে—হ্যাঁ, তাই যাবো।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন নিজেই এস্টেটের কাজ দেখে। সরকারমশাইএর কাছে আদায়পত্রের খবর নেয়। শিব কিরষাণ পটু বাউরির কাছে খাসজমির চাষবাসের খবর নিয়ে স্নান-আহ্নিক করে দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেয়।

হরিপ্রিয়া এর মধ্যে কদিন থেকেই দেখছে বিজয়ও যেন বদলে গেছে। এখন সকালে মাস্টারমশাইএর কাছে পড়ছে, স্কুলেও যাচ্ছে আবার! হরিপ্রিয়া খুশিই হয়।

দুপুরে পাড়ার মহিলারা-বৌরা এসে হাজির হয়।

সুখদাও আসে। দত্তগিন্নী-মদনের মা আরও কয়েকজন মহিলা হরিপ্রিয়ার কাছে রামায়ণ, মহাভারত-ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এসব পড়ে।

মাঝে মাঝে মোহিনীও আসে।

হরিপ্রিয়া বলে, ভালো হোলো, ছানিপড়া চোখে আর এসব পড়তে পারিনা। তুই একটু পড় বাপু মোহিনী।

এর মধ্যে বিজয়ও দেখেছে তাকে আসতে। স্কুল থেকে ফিরে দেখে বিজয়-মোহিনী সুর করে পড়ছে এই মহাভারত।

একবার দেখে মাত্র বিজয়কে।

এর আগে ওই বাগানেই বলেছে বিজয়কে মোহিনী

—তোমাদের বাড়িতে আমার সঙ্গে একদম কথা কইবে না। ওখানে আমিও কথা বলবো না।

বিজয় বলে—বাগানে বলবে তো?

হাসে মোহিনী—হ্যাঁ, এখানেই আসবো, কথা বলবো।

বিজয় খুশি হয়ে বলে—তাহলে বাড়িতে কথা বলবো না। স্কুলে আজ ইংরাজী ট্রানশ্লেসন সব রাইট দিয়েছেন স্যার। এবার পরীক্ষায় ভালো ফল করবো।

মোহিনী বলে—এবার ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।

বিজয় বলে—তুমি খুশি হবে তো!

দুজনের নিভৃত স্বপ্ন—আলাপ গড়ে ওঠে, নিবিড়তর হয় সকলের অলক্ষ্যে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন দেখছে ছেলেটার সব পাগলামির লক্ষণই মুছে যাচ্ছে। পরীক্ষার পড়াও করছে মন দিয়ে।

এবার মনে হয় এ যেন সুধাময় ভটচাযের কবচের ফলেই হয়েছে।

মুখে কিছু বলে না, তবে মনে-মনে কথাটা মাঝে-মাঝে ভাবে।

গোবিন্দ ঘোষ পঞ্চজনের সামনে সেদিন সকলের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নরেশ মুখুয্যের মেয়েকে ঘরের বৌএর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ব্যাপারটাকে সেদিন মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধি সে এই অঞ্চলপ্রধান হয়েই সে পৈত্রিক ব্যবসাকে বাড়িয়েছে এখন ওই কামারপাড়ায় তার নিজের শাল করেছে তিরিশ-চল্লিশজন কারিগর কাজ করে।

এই ব্যবসাও বাড়ছে, আর জমিজমা সাজা-খাজনা, মধ্যস্বত্বের সম্পত্তি শালবনও কম নেই।

এবার ওই ব্যবসাতে ভালোই আমদানীও হচ্ছে, তার টাকার টান পড়েনা। অঞ্চলের নানা খাতে টাকা পড়ে থাকে অনেক টাকা ওর থেকে টাকা নিয়ে সস্তায় কাঁচামাল কিনে গুদামজাত করে আর মাল বিক্রি থেকে সেই টাকা আবার জমা করে দেয়। ঘরের টাকা ঘরেই বাড়ছে সুদে আর সরকারি টাকাজ ব্যবসা করছে।

ইদানীং বরুণই ব্যবসাপত্র দেখছে, জমিজারাত মধ্যস্বত্বের আদায়পত্র সেইই করে বন থেকেও কিছু বনের কাঠ বিক্রি করে এখন আয়ও হচ্ছে, সংসারের শ্রী বেড়েছে।

গোবিন্দিঘোষের গিন্নীও বৌকে মেনে নিয়েছে। কারণ গরীবের ঘরের মেয়ে বাসন্তী। কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত। কোনও চাহিদাও নেই। না চাইতেই যেটুকু পায় সে তাই অনেক তার কাছে। আর চাওয়ার কিছু নেই।

দিনভোর সংসারের সব ঝামেলা, রান্নার কাজ, সংসারের সব খিদমত সে করে। গোবিন্দবাবুর ঘন ঘন চায়ের অভ্যাস। চা আর তামাক হলেই খুশি।

বাসন্তী নিপুণভাবে সেটার যোগান দেয়। আর শাশুড়ীর বাতের ধাত। ঈষৎ কুঁড়ে। এতদিন সংসারের নানা ঝামেলা, কাজ নিয়ে সে ন্যাটা-ঝামটা খাচ্ছিল। এখন সব ভার তুলে নিয়েছে বাসন্তী। শাশুড়ীও তাই খুশি।

আর সংসারের আয়পয় বেড়েছে। বরুণও বাড়িতেই থেকে কাজকর্ম করছে। তাই শাশুড়ীও বৌকে মেনে নিয়েছে।

গোবিন্দ ঘোষের ছোট ছেলে অরুণও স্কুলে পড়ছে। ছেলেটা বেশ দুরন্ত। পাড়ার ছেলেদের সর্দার।

বাসন্তী তাকেও যেন শান্ত করেছে। ছেলেটার যত আবদার বৌদির কাছে। বাসন্তীই সেসব সামলায়।

অরুণদের ক্লাশেই পড়ে বিজয়। এখন বিজয় আর ওই সব পাগলামি করে না। বাসন্তীও দেখেছে বিজয়কে। সেদিন অরুণের কাছে এসেছে পড়া জানতে।

দুজনে স্কুলের কথা, পড়ার কথাই হয়।

বাসন্তী ওদের দুজনের জন্য পরোটা সন্দেশ আর চা আনে।

সেও দেখে বিজয় যেন বদলে গেছে।

বিজয় শুধোয়—ভালো আছোতো বাসন্তীদি!

বাসন্তী বলে—হ্যাঁ, তুমি কেমন আছো?

অরুণই বলে—ও এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। অঙ্কে দারুণ রেজাল্ট করেছে পরীক্ষায়।

হাসে বিজয়। বলে—তোর তুলনায় কিছুই নয়রে।

বাসন্তীরও ভালো লাগে। এতবড় ঘরের ছেলে পাগলের মত ঘুরতো। এখন সেরে উঠেছে। ভালো থাকুক সকলে, বাসন্তী তাতেই খুশি।

ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। সুধাময়ের হয়েছে তাই। এখন সেই আরও গেড়ে বসেছে কপালে সিন্দুরের ইয়া মাডুলির মত টিপ, পরনে রক্তাম্বর। গলায় মালার সংখ্যা আরও বেড়েছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে।

—জয় তারা-তারিণী মা।

সুধাময়ের মহিষপর্ব এখন লোকে ভুলেই গেছে। এখন গ্রামের লোকও দেখে বিজয়কে। সম্পূর্ণ সুস্থ। স্কুলে যাচ্ছে। সরকার মশায়ের সঙ্গে আদায়ে যাচ্ছে। হিসাবপত্র নিয়ে সেরেস্তায় বসে।

সুধাময় বলে—হবে না? আরে শাস্ত্রমতে যজ্ঞ হোম করলে গ্রহ কেন গ্রহের বাপ ঠান্ডা হতে বাধ্য।

এখন আশপাশের গ্রামের এদিকের অনেকেই আসে সুধাময়ের কাছে। সুধাময় ঘন ঘন হোম-যজ্ঞ করছে বাড়িতে।

পঞ্চতীর্থ মশায় এদিকে বড় একটা আসেন না। তার ওই আশ্রমেই থাকেন। তবে নিতু, বাদল জ্যাঠার কাছে যায়। তারাই বলে—বাবা কেবল হোমই করছে। কত লোক আসছে।

পঞ্চতীর্থ সেদিন বাড়িতে এসে দেখেন যজ্ঞশেষে মালপত্র বাঁধছে সুধাময়। প্রণামীর টাকা গুনছে। গিন্নী কাদম্বিনীকে বলে—ওই কাপড়গুলো, এদের দেওয়া ঘি সব রেখে দাও। সাপগাঁয়ের শশিমোড়লের যজ্ঞকাল। ওর কাছে টাকা ধরে নিয়েছি। ওই সব জিনিষই আবার বের করে দেবে।

কাদম্বিনী বলে ভীত কণ্ঠে—একবার উচ্ছ্বর্গ করেছো দেবতাকে। আবার সেই মাল ফের দেবতাকে দেবে?

সুধাময় বলে—আরে দেবতা কি ওসব দেখে? দেখে না—না দিলে শ'দুয়েক টাকা লস্ হয়ে যাবে। আবার কিনতে হবে কমলের দোকানে। ছাড়োতো।

পঞ্চতীর্থ মশায় শুনছেন ওদের কথা। অবাক হন তিনি সুধাময়ের কথায়। মনে

হয় তার এতদিনের অধীত বিদ্যা তাকে দুঃখ-কষ্ট সইতেই শিখিয়েছে মাত্র। এভাবে ধর্ম নিয়ে বেসাতি করতে তার বিবেকে বাধে।

তাই বলে—সুধাময়, এসব ঠিক নয়। নিজে হোম-যজ্ঞ করো। মন্ত্র-স্তব-ধ্যানমন্ত্র এসবই তো জানোনা। নিরীহ মানুষদের এসব প্রতারণা করা ঠিক নয়।

সুধাময় ইদানীং বড়দাকে এড়িয়েই চলে। আজ তাই বলে—তন্ত্রমতেই শিক্ষা কিছু করেছি বড়দা।

—তন্ত্রসাধনা! পঞ্চতীর্থ মশায় বলেন—ওতে বিদ্যার বোধহয় প্রয়োজন নাই। অবশ্য একালে দেখছি সবই স্বতন্ত্র। আমাদের অতীতের শিক্ষা—আদর্শ সব কেমন মূল্যহীন বলেই প্রতিপন্ন করতে চাও।

সুধাময় বলে—যুগ তো বদলাচ্ছে। যুগধর্মও—

পঞ্চতীর্থমশায় অবাক হন। বলেন—ধর্মকে পণ্যে পরিণত করলে সেটাকে পছন্দমত বদলাতে হবে বৈকি। কিন্তু এটা ঠিক করছনা।

পঞ্চতীর্থ বের হয়ে যান। কাদম্বিনী সবই শুনেছে। বলে সে—বড়দা কি সব বল্লেন, আমার ভালো লাগছে না বাপু। এসব তুমি বন্ধ করো। কি হতে কি হবে?

হাসে সুধাময়। সে এখন অর্থপ্রতিষ্ঠার স্বাদ পেয়েছে। তাই বলে—দাদার কথা ছাড়োতো! জীবনে ওই টুলো পণ্ডিত হয়েই রইল। জ্ঞান-বিদ্যে ওসব নিয়ে ধুয়ে খাবে। আসল এই অর্থ। বুঝলে এই পরমার্থ এই যুগে।

সেই অর্থ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে কমলবাবু। এখন সে বাড়ির ওদিকে একটা নতুন বাড়ি করেছে। সেখানে সহরের নার্শারী থেকে দামী কলমের আম, লেবু, বাতাবী লেবু, নানা ফুলের গাছ, তেজপাতার গাছও লাগিয়েছে।

বেশ সাজিয়েছে বাড়িটাকে। ওখানেই তার নতুন অফিস করেছে। আর এদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে তার গুদাম, আদি সেই দোকান। রেশন সপ, কেরাসিন তেলের ডিপো, ওদিকে আটাকল, ধানভানার হাস্কিং মেসিন এসবও চলছে।

মদনবাবু এখন এদিকের ব্যবসা দেখে। আর কমলবাবু এখন মেটাল ওয়ার্কস গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

গুণময় এখন তার খুবই কাছের লোক। সেই তোড়জোড় করে এবার কামারপাড়ার কিছু লোককেও খবর দিয়েছে। আর বরুণকেও ডেকেছে।

সন্ধ্যার পর ওই বাড়ির হলঘরে এবার মিটিং সুরু হয়। কমল দাস ওর পরিকল্পনার কথা জানাতে বরুণ বলে—মেটাল ফ্যাক্টরী করলে ভালো হয়। কিন্তু আমরাও তো ওই ব্যবসায় রয়েছি। আমাদের টাকা খাটছে—তাই আমিও চাই কোম্পানীর পার্টনার হতে।

কমল দাস শোনে সব। গুণময় বলে—ফ্যাক্টরী কমলবাবুই করবেন নিজের টাকাজ।

ওদিকে কামারপাড়ার কিছু লোকও বুঝেছে ব্যাপারটা। তারা বলে—আমাদের শালএর লগ্নী টাকার কি হবে?

গুণময় বলে—শাল করে আগুনে তেতে পুড়েও তো কাজ এর জন্য মহাজনের কাছে আসো। কারখানা হলে হপ্তায় বাঁধা মাইনে পাবে। কাজের জন্য ঘুরতে হবে না।

কমল বলে—ভেবে দ্যাখো কথাটা। এইভাবে দাদন দিয়ে আমার পোষাচ্ছে না, তাই নিজেই কারখানা করবো।

বরুণও বুঝেছে কমল দাস তাদের অংশীদার করতে চায় না। সর্বস্ব একাই খেতে চায়। কমল বলে—কথাটা ভেবে দ্যাখো। এতে তোমাদের লাভই হবে। বাঁধা মাইনে পাবে। লোকসান হলে যাবে আমারই।

এ যেন এই শান্ত পল্লীর পরিবেশে একটা ঝড়ের সংকেতই আনে। কামারপাড়ার মানুষদের মনে এবার একটা প্রশ্ন জাগে। এতদিন যেভাবে চলেছে এখন সেইভাবে চলবে না।

কামারপাড়ার কেদার কর্মকারের মত আরও অনেকে নিজেরাই খর্চা করে শাল তৈরি করে গালাই, ঢালাই-ছোলাই এসব করে। আর বেশ কিছু লোক আছে তারা ওই সব শালে কাজ করে।

এক পাড়াতেই থাকে। যে যেখানে কাজ করে সেখানে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পরস্পরের সুখে-দুঃখে এ ওকে দেখে। ওদের সমাজে কাজের মধ্য দিয়ে এইভাবে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ফলে কমল দাস দেখেছে মজুরি কমাতে গেলে এরা একযোগে বাধা দেয়। আর একযোগে চাপ দিয়ে ওরা মজুরি বাড়িয়েছে।

কমল দাস এবার ওদের সেই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চায়। যারা রোজমজুর তাদের দু-চারজনের সবদিন শালে কাজ জোটে না। গুণময় এর মধ্যে এ পাড়ার কিছু অমনি লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

তাদের বলে গুণময়—ওই দিন আনা দিন খাওয়া শালমালিক রোজ কাজই দিতে পারেনা, তাদের শালে থেকে কি করবি? তার চেয়ে চলে আয় নতুন কারখানা হলে সেখানে বাঁধা কাজ, বাঁধা মাইনে পাবি। বছরে পুজো-বোনাস।

অনেকেই শুধোয়—সি আবার কি গো?

গুণময় বলে—পুজোর সময় এক মাসের মাইনে ফাউ হিসেবে পাবি।

—মানে বারো মাস খেটে তোরো মাসের মাইনে? কে বলে ওঠে।

গুণময় ওদের মনে নানা সুন্দর ছবিই তুলে ধরে। এই নিয়ে এবার কামারপাড়াতে রীতিমত আলোচনা-তর্কাতর্কিও শুরু হয়।

এবার কামারপাড়ায় এক যেন দুর্যোগের ঝড় ঘনিয়ে আসছে। কেদার কর্মকারও শুনেছে সব কথা।

কমলদাস এতদিন গ্রামের মানুষের জমিজায়গা দখল করে এসেছে। ব্যবসার নামে লোককে ঠকিয়ে লাভ করে করে লোভ তার বেড়ে উঠেছে।

এবার সে একাই সকলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই ব্যবসার সবটাই একাই দখল করতে চায়। তার টাকার জোর আছে। আর ইদানীং এই অঞ্চলের নেতা সর্বদমনবাবুও তার বাগানবাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

তারপরই কমলবাবু এখন শিল্পপতি হবার স্বপ্নও দেখছে। তাই এই কামারপাড়ার মানুষদের সকলকেই তার গোলাম বানাতে চেষ্টা শুরু করেছে।

কেদার, অন্য বেশ কিছু শালমালিক ওই মানুষদের একটু শিক্ষা দেবার জন্যই শালের কাজ বন্ধ রেখেছে ক'দিন। এদিকে মজুরি বন্ধ, কাজও নাই। তাই কামারপাড়া কেন গ্রামের আশপাশের অনেক মানুষই এবার বিপদে পড়েছে। তারা এসেছে হরিশ মাষ্টারের কাছে।

গ্রামের বাইরে স্কুলবাড়ি। এককালে ওখানে আমবাগান ছিল। তারপর তাম্রাভ প্রান্তর —ওদিকে শুরু হয়েছে শালবন। স্কুলের ওদিকেই বোর্ডিং।

ওরই একটা ঘরে হরিশবাবু থাকে। হরিশবাবু ক্রমশ জেনেছে খবরটা। কমলবাবু নাকি মেটাল ফ্যাক্টরী করতে চায়। তার জন্য ওই ছোট-ছোট শালমালিকদের কাজ বন্ধ হবে আর এই অঞ্চলের সামান্য কিছু শ্রমিকই কারখানায় কাজ পাবে মাত্র, তাও তাদের মজুরি দেবে সে ইচ্ছামত। বাকী সব বেকারই হবে।

অনেক দক্ষ শ্রমিকই বেকার হয়ে যাবে, তারাই কাজ পাবার জন্য কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হবে।

বরুণও এসেছে, এসেছে কেদার কর্মকার, আরও অনেকে। হরিশবাবু আজ তাদের ওইসব সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলতে এবার তারাও বুঝতে পারে কমলবাবুর কারখানা তার ব্যক্তিগত লাভের অঙ্কতেই বাড়াবে মাত্র, সামগ্রিকভাবে সেটা আঘাত হানবে এই অঞ্চলের কুটিরশিল্প, কাঁসার ব্যবসাকে, শ্রমিক-শালমালিক সকলেরই বিপদ এতে বাড়বে মাত্র।

কেদার সব শুনে বলে—কি হে, বল ওই কারখানা করে কমলবাবুকেই বড়লোক বানাবে আর নিজেরা বাপ-পিতেমর বিদ্যা ছেড়ে উপোস দিবা?

বরুণও বুঝেছে ব্যাপারটা। ও বলে—এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা হরিশদা। এতো অর্থনীতির গোড়ার কথা। টাকা হলে মানুষ তখন তার প্রতিষ্ঠা আর টাকা বাড়াবার

চেষ্টা তো করবেই। কমলবাবুর দোষ কি, এটা সামাজিক বিবর্তনেরই রূপপ্রকাশ মাত্র।

কেদার বলে—প্রতাপবাবুদের প্রজাও কমলবাবুরা, ওই ডাঙ্গা-জমি যেখানে কারখানা করতে চায় সেটা প্রতাপবাবুদের জায়গা। উনি যদি না দেন—ওসব হবেনা।

হরিশবুবু বলেন—দ্যাখো বলে, তবে আমার মনে হয় তোমাদের সকলের বাঁচার পথ ওই একটাই। সমবায় যদি করতে পারো সেখানে মালিক-শ্রমিক কেউ থাকবে না। সকলেই তার সভ্য কর্মী হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের যা দাম হবে, খরচ-খর্চা বাদ দিয়ে যার যেমন শেয়ার সেই হারে লভ্যাংশ পাবে, মজুরিও পাবে। এই করলে কিছু সুরাহা হতে পারে।

শ্রমিক যারা এত দিন শালে-আগুনে পুড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শুধু রোজ পেয়েছে তারাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে।

—এইটাই ভালো বাবু, নাহলে শালে মজুরি করছিলাম, মজুরি খাটতে হবেক কমলবাবুর কারখানায়। লাভ কি হবেক তাতে?

একজন বলে—কমল দাস কি পয়সা দেবে সহজে? শালার হাত দিয়ে জল গলে না হে, পিপড়ের পোঁদ টিপে খায়।

তাই সকলে বলে—সমবায়ের কথাই ভাবো গো ম্যাষ্টার।

কেদারও বলে—তাই ভাবুন গো। আর দেখি প্রতাপবাবুকে বলে ওই জায়গা যাতে না দেন।

ওদের মিটিং চলছে। হ্যারিকেনের আলোয় ম্লান আভা পড়েছে ত্বরে। একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে ওরা।

কামার পাড়ার গতিলালও বসেছিল। সিটকে গতিলালের বেশি খাটবার সামর্থ্য নেই। এককালে তাগড়া যোয়ানই ছিল, তখন তার হাতুড়ির ঘায়ে কাঁসার চাদর থেকে নানা কিছু তৈরি হতো। ভালো কারিগর, দোষের মধ্যে দোষ গাঁজা খেতো। ওর শালমালিক গদাই কামার বলতো—আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিস, নেশা করে বুকটা আর ঝাঁঝরা করিস না গতিলাল।

গতিলালকে তখন গাঁজা কেন মদের নেশাতেও পেয়েছে। সন্ধ্যার পর কুঁচিবাগানে গিয়ে বসতো। কপিল লোহার চোলাই মদ বানায়, দুবার ওর ঠেকে এসে জোটে সন্ধ্যার পর।

গতিলালও আসতে শুরু করে, শুধু মদই নয় কপিলের বউ ভাদুরীর যৌবনমদির দেহটাও গতিলালের বুকে ঝড় তোলে। ভাদুরী মদের বোতলটা দিয়ে বলে—হাঁ করে কি দেখছো গো কারিগর?

—তোমাকে! বলে গতিলাল।

—কেনে গ? লিশা করবা নাই?

ভাদুরীর ডাগর চোখে যেন কি মত্ততার আহ্বান। বলে গতিলাল—লিশা তো তোমাকে দেখেই ধরে গেছে গ।

ভাদুরী হাসিতে ওর দেহে ঝড় তুলে বলে

—রসিক লাগর বটে গ তুমি!

গাঁজা মদ আর ভাদুরীর পিছনেই গতিলালের সব গেছে। এখন আর খাটতে পারে না। মালপত্রের দালালি করে যা পায় মদেই যায়। এখন কাপিলেরও দিন বদলেছে। কারণ কামার পাড়ার আমদানী বেড়েছে, অনেকেই এখন ধান-চালের ভালো দর পেয়ে কিছু রোজকার করছে, তাই কপিলের মালের কাটতিও বেড়েছে।

গতিলাল এখন গুণময়ের সঙ্গে ভিড়েছে। গুণময়ও রাতে আসে কপিলের এখানে। অবশ্য এখানে বসে না। ভাদুরীও খাতির করে তাকে। গুণময় কপিলকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কি সব বলে চলে যায়।

গতিলালের চোখে তখন গোলাবি নেশার আমেজ। বলে সে—এ্যাঁ। পণ্ডিতমশাই এর ভাইও ইখানে?

ভাদুরী বলে--কে এল, গেল উসবের দিকে লজর কেনে গ! ইখানের ব্যাপারই আলাদা।

গুণময়ও দেখেছে গতিলালকে। জেনেছে গতিলালের দুর্বলতার কথাটা। সেদিন বলে গুণময়

—কপিল।

কপিল বিনীতভাবে বলে—আজ্ঞে ছোটবাবু?

গতিলালকে মদ-টদ দাম না দিতে পারলেও দিবি। গতিলাল ভাবতে পারেনি গুণময়বাবু তাকে এমন প্যার করবে।

কাপিল বলে—দুর!

গুণময় বলে—গতিলাল, মাঝে মাঝে অফিসে এসো। কাজকর্ম করবে তো?

গতিলালও জানে কোথায় বেশি মধু আছে। ইদানীং কমলবাবুর দিনই ভালো চলছে। গুণময় তারই লোক। তাই বলে গতিলাল—কাজ করতে তো চাই ছোটবাবু।

—এসো। কথা হবে।

গুণময়ের ওখানে যাতায়াত শুরু করে গতিলাল। গুণময়ই বলে—গতিলাল, ওই কামারপাড়ার ওরা কে কি আলোচনা করছে, ওদের পিছনে কারা আছে, এসব খবর চাই। রাখো পঞ্চাশ টাকা।

গতিলালও খুশি হয়। কাপিলের ওখানে এক বোতল মাল পায় গুণময়ের কথাতেই। সুতরাং গতিলাল বলে—সব খবরই দেব।

গুণময় সাবধানী ছেলে। সে চায় ওদের মাঝে তার একজন লোক থাকুক। বলে গুণময়—কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। যেন ওরা কেউ জানতে না পারে।

গতিলাল সেটা জানে। তাই বললে—ও আর বলতে হবেক নাই।

আজকের মিটিংএ গতিলালও ছিল। সে কেদার—অন্যদের কাছের লোক। গতিলালই মিটিংএর জন্য লোকদের ডেকে এনেছে। মাঝে মাঝে চীৎকারও করে।

—ওই কমলদাসের দুটো পয়সা হয়েছে, তাই আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে লিবেক? ইটা কি ভেবেছে উ! ধম্মঘট করে দিব হ্যাঁ?

কেদারই বলে—চুপ কর গতি। ব্যবস্থা হবে।

সেই গতিলালই রাতের অন্ধকারে এসে হাজির হয় কমলের বাগানে।

কমল, গুণময়, কমলের সহচর দু-একজন ছিল। অন্ধকারে গতিলালকে ঢুকতে দেখে চাইল। ওরা জানে কামারপাড়ার সকলে কি জরুরী মিটিং কবছে।

সেই খবরের অপেক্ষাই ছিল। এমনসময় গতিলালকে ঢুকতে দেখে চাইল। গতিলাল বলে—হরিশ মাষ্টারের ওখানে মিটিং হলো গ। গরম গরম কতো বুলি। ওরা সমবায় না কি কর‍্‍বেক, আর

কমল অবাক হয়—সমবায় করবে? আর—

গতিলাল জানায়—ওরা প্রতাপ বাবুকেও বলে ওই ডাঙ্গা ওরাই বায়না করবেক।

—সেকি। কমল ভাবেনি যে ওইভাবেও তারা কমলরে থাবাটাকে থামাতে চায়। গুণময় বলে—দেখছি। তাহলে ওই হরিশ মাষ্টারই ওদের এইসব বুদ্ধি দিচ্ছে?

গতিলাল বলে—হ্ গো। বরুণবাবুও এসেছিল মিটিং-এ।

কমল বলে—তাহলে একটা চক্রই গড়ে উঠেছে।

গুণময় বলে—ওসব চক্র-ফক্র তছনছ করে দোব। প্রতাপবাবুকে তুমিই কথাটা বলো কমলদা। জমিদারী অবস্থাতো টলমল। যে-কোনদিন এক কলমের খোঁচায় ওসব জমিদারী ঘুচে যাবে। তাই ওরা যেখানে যত খাসজমি, বাদা আছে সব বিক্রি, বন্দোবস্থ করে দিচ্ছে। বেশি টাকা দিয়েই ওই জায়গাটা আটকাও। তারপর দেখছি কারখানা ক্যামন করে আটকাজ ওরা।

কমলও ভাবছে কথাটা। এতদিন জমিদারদের প্রাধানা বজায় ছিল সমাজে। ওদের টাকা-প্রতিষ্ঠা ছিল। আগেও দেখেছে কমল-প্রতাপবাবুদের প্রতাপ। ক্রমশ খর্চা বাড়ছে, প্রজাদের খাজনা বাড়েনি। ঠিকমত আদায়ও দেয়না। ঠাট-বাট চালাতে জমিদারদের অনেকের পুঁজিতে হাত পড়েছে, আর পুঁজি যাদের নেই তাদের ঋণ করতে হয়েছে। যত পুঁজি কমেছে প্রতিষ্ঠা, হাক-ডাকও ততই কমেছে। তাদের জীবনযাত্রায় এসেছে ভাটার টান।

আর অন্যদিকে সমাজের বুকে জোয়ার এসেছে কমলবাবুদের মত একটা শ্রেণীর জীবন গাং-এ। এতদিন তারা কোনমতে দিন চালিয়েছে, জমিদারের হুকুমও মেনেছে।

এখন টাকা রোজকার যত করেছে মনের জোরও বেড়েছে। জমিদারী চলে গেলে এই কমলবাবুদের মত ভুঁইফোড় অজ্ঞাতকুলশীলদেরই সুবিধা হবে।

জমিদারী ফোৎ হলে তারাই হবে সমাজের মাথা। বংশপরিচয়-সংস্কৃতি, রুচি, মূল্যবোধ এসবের কোন অর্থই থাকবে না। তখন বড় হবে, পুঁজিবাদের মাপকাঠি হবে টাকা।

কমলকে সেই টাকাই আরও রোজকার করতে হবে। সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠতে হবে তাদেরই।

এবার পুরোনো দিন, মূল্যবোধ সব মুছে গিয়ে আসছে তাদেরই দিন।

গোপগাঁয়ের বুকে জীবনযাত্রা আপন গতিতেই বয়ে চলেছে।

হাবু ঘোষ এবার তার মেয়ে টগরের বিয়ের আয়োজন করছে। বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে।

টগর কথাটা শুনে চমকে ওঠে। বলে সে—বিয়ে-টিয়ে করবো নাই মা।

টগরের মা অবাক হয়। বলে—কি বলছিস মুখপুড়ি? আজ বাদ কাল বিয়ে, আর ও বলে বিয়ে করবো নাই।

টগর ছুটে আসে চন্দনের কাছে।

চন্দন কয়েকদিন ছিল না। আসানসোলে কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ি হচ্ছে, বিরাট ব্যবসা তার। সেই নতুন বাড়িতে বেশ কিছু টেরাইকোটার কাজ করতে গেছল। সেখানে তার ওই পোড়ামাটির সুন্দর কাজ দেখে আরও কিছু শেঠও তাকে অর্ডার দিয়েছে ওই ধরণের কাজ করতে হবে। তার কাজ দেখতেও অনেকে এসেছিল চেলিডাঙ্গা, আপকার গার্ডেন, মুর্গাসোল থেকে। কোন মন্দির-ট্রাস্ট তাকে বিশেষ কিছু মূর্তি—ঘটনার উপর আরও টেরাইকোটা তৈরি করার অর্ডারও দিয়েছে। আগাম টাকাও দিয়েছে চন্দন খুশি মনেই ফিরছে। যা অর্ডার পেয়েছে তাতে তার দুবছরের কাজ তো হবেই, আর ভালো টাকাই পাবে।

স্বপ্ন দেখে চন্দন। ফিরেছিল অনেক আশা নিয়ে। টগরকে বৈকালে আসতে দেখে চাইল চন্দন। ওর জন্যে একটা ভালো সিল্কের শাড়ি এনেছে কচি কলাপাতা রংএর।

শাড়িটা দিয়ে বলে চন্দন—এটা পরবে।

টগর এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অবাক হয় চন্দন।

—কি হলো?

টগর বলে—বাবা-মা আমাকে বলি দিছে গো।

—মানে? চন্দনের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

টগর খবরটা জানায়। বলে—অমি বিয়ে করতে চাই না, ওরা জোর করে বিয়ে. দিবেক। একটা ভূতের মত চেহারার লোককে মেনে লিতে হবেক? জানো—কোন মাঠান গাঁ আমঠে, সিখানে বিয়ে দিবেক।

চন্দন কি ভাবছে। সেও অনেক স্বপ্ন দেখেছিল টগরকে ঘিরে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে কিছু দিন লাগবে তার। তারপর গ্রাম ছেড়ে আসানসোল সহরেই চলে যাবে সে, সেখানে টগরকে নিয়ে বাসা বাঁধবে।

কিন্তু হঠাৎ এমনি করে টগর চলে যাবে তার জীবন থেকে তা ভাবতে পারেনি চন্দন। টগর বলে

—কিছু করতে পারবা নাই কারিগর? আমাকে বাঁচাতে পারবা নাইগ?

চন্দন বলে কথাটা—একটু সময় লাগবে টগর। ক'টা বছর বাইরে কাজ করতে হবে। তারপর ভেবেছিলাম বাইরে চলে যাবো তোমাকে নিয়ে। কিন্তু এখন কি করে কি হবে?

টগরের চোখে জল। বলে সে—আজ কিছু করতে পারবা নাই? চলো—যেখানে বলবা চলে যাবো তুমার সাথে। ওই খানের ওই লোকটাকে মেনে নিতে পারবো না।

চন্দন বলে—ক'টা মাস সময় চাই টগর।

টগর কি ভাবছে। মনে হয় একটা পথ তাকেই নিতে হবে।

চন্দন বলে—তোমার জন্য আমিও ভাবি টগর। কিছু করতে পারতাম একটু সময় পেলে।

টগর চুপ করে দেখছে সেই মূর্তিটা। মাটির টগর ওখানে এখনও কাপড় ঢাকাই পড়ে আছে। মূর্তিটাকে শেষ করতে পারেনি চন্দন। টগর বলে—কত ভালোবাসো তা জানা হয়ে গেছে। যা করার নিজেকেই করতে হবেক। আর ওই মূর্তিটাকে রেখোনি। ওর কোন দামই তো নাই তুমার কাছে, তবে আর উটাকে রেখো না। ভেঙ্গেই ফ্যালবা উটাকে। জানবা টগর নাই—সে মরেই গেছে।

কান্নায় অভিমানে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে তার। বের হয়ে যায় টগর। দেখছে ওকে চন্দন, এ যেন অন্য এক মেয়ে, যাকে চন্দন চেনে না।

বেশ ধূমধাম করেই বিয়ে দিল মেয়ের হাবু ঘোষ। কাটাবাঁধ থেকে ঢোল-সানাই এনেছিল। আত্মীয়-কুটুম্বদেরও বামুন কায়েতদের বাড়ির মতই পাকা ভোজ দিয়েছে।

ওদের সমাজে দিনে ভাত আর রাতে চিড়ে, দই, ক্ষীর, মিষ্টি—এসব দিয়ে জমাটি ফলারই দেওয়া যায়। কিন্তু হাবু ঘোষ ওসব করেনি। লুচি আলুর দম, ডাল-চাটনি দই রসগোল্লা এসবেরই আয়োজন করেছিল। একমাত্র মেয়ে, কোন ত্রুটিই রাখেনি

সে। গহনাও দিয়েছে। টগর চুপচাপ সব কিছুকেই মেনে নিয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে সে একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ ওই বয়স্ক ভূষণের পাশে থেকেছে একটা কাঠের পুতুল।

মাও খুশি হয়। যা জেদী মেয়ে কখন কি করে বসে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। তবু ভালোয় ভালোয় বিয়ে হয়ে যেতে সেও নিশ্চিন্ত হয়। সকালেই বর-কনে বিদায় হলো। এতদিন যে মাটিতে মানুষ হয়েছে টগর, সেখানে যে আর কোন ঠাঁই তার নাই তাই মনে হল।

সানাইএর করুণ সুর ওঠে। টগরের চোখে জল নামে। ওই বাগান, ডাঙ্গা-শালবন ঘেরা গ্রাম, ওই মানুষগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভেবেছিল চন্দনও আসবে, কিন্তু চন্দন আসেনি। টগর পাল্কীতে চেপে চলেছে। কুমোর পাড়ার ওদিকে এক নজর দেখে চন্দনকে। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। টগর কোনমতে নিজেকে সামলে নেয়।

গ্রামসীমা পিছনে ফেলে সে চলেছে নতুন জগতে। টগর এসেছে সবুজ পরিবেশ ছেড়ে শুকনো প্রান্তরের বুকে একটা ছোট্ট বসতিতে। একটা ছায়াতরুও নেই এখানে। নিঃস্বতার মাঝে কয়েকটা ঘর নিয়ে গ্রাম। তাদের সম্প্রদায়ের কিছু খেটে খাওয়া মানুষের বসত।

কাঁচা মাটির রাস্তা—জলে-কাদায় আর গরু-মোষের গোবর আর নোংরা জলে ভর্তি সেই পথ।

মানুষগুলোও কেমন কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে। চারিপাশে ভিড় করেছে আধ-ন্যাংটো ছেলে-মেয়েরা। কে একজন বলে ওঠে—ওমা, অ-ভূষণা, ই কি বৌ আনলি র‍্যা? ইয়ে আগুনের খাপ্‌রা?

কথাটা শোনে টগরও। তার রূপ এদের তুলনায় অনেক। তাই ওরা যেন তাকে সহ্য করতে পারে না।

অন্য একজন মন্তব্য করে—ইযে দু ছেইসার মা গ।

টগর চাইল সেই মহিলার দিকে বেশ কঠিন চাহনিতে। সেটা দেখে মহিলা বলে—নতুন বৌএর কি লাজ-সরমও নাই রে, ভূষণা? ক্যামন কট-মট করে চাইছে দ্যাখ, যেন গিলে ফেলাবেক।

মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে।

একটা মাটির ঘরে এনে তুলেছে তাকে। ওদিকে গোয়াল, খিচ গোবরের তীব্র গন্ধ ওঠে। টগরদের বাড়িতেও, তাদের গ্রামের অনেকের বাড়িতে গরু-মোষ আছে, কিন্তু এমন নোংরার মধ্যে তারা থাকে না।

এরা ভিতরে বাইরে যেন নোংরা আবর্জনার স্তূপকে সযত্নে ঢেকে রেখেছে। চারিদিকে তাই পূতিগন্ধই।

একজন শীর্ণকায় রুক্ষ মেজাজের মহিলা তার শাশুড়ী। একজন ননদও আছে। সেইই বলে টগরকে—পটের বিবি সেজে থাকলে চলবে? সংসারী মানুষ আমরা। এবার ঘর সংসারের কাজ বুঝে নাও বাপু। কাল থেকে গোয়াল কাড়তে হবেক, রান্নাবান্না জানো না তাও শেখোনি?

শাশুড়ী বলে ওঠে—বাপ মা কিছুই শেখায় নি দেখছি। শুধু সাজগোজই শিখেছো?

ননদ বলে—দুদিনে ঝেঁটিয়ে ওসব বিদ্যেধরীপনা ছুটিয়ে দোব। দ্যাখো না।

টগর চুপ করেই থাকে।

আজ কালরাত্রি, এরাও সেটা মানে। কাল এদের বৌভাত। ভূষণের বাড়িতেও আয়োজন চলছে। হাবু ঘোষ টাকাকড়িও দিয়েছে মন্দ নয়।

ভূষণ দেখেছে নতুন বৌকে নিয়ে ওরা কি করছে। সে আড়ালে মাকে বলে—সবে এসেছে মেয়েটা, এখন থেকেই ওকে ধমকালে চলে? একটু বুঝিয়ে বলো, ক্রমশ ঠিক হয়ে যাবেক।

মা চটে ওঠে—ওমা। এর মধ্যে ওই বিদ্যেধরী তুকে যাদু করেছে রে ভূষণা। এ্যাঁ বৌএর হয়ে কথা বলছিস?

ননদও ফোড়ন কাটে। —কাটবে না? এমন বৌ। মরণ দশা। বুড়ো বয়সে ভীমরতি হল নাকি তুর? টগর শোনে কথাগুলো।

সে তার কর্তব্য স্থির করেই নিয়েছে। মনে পড়ে তার গ্রামের কথা। বেশ কয়েকখানা গ্রাম পার হয়ে এসেছে। তবু পথটা তার চোখের সামনে ছবির মতই ফুটে ওঠে। তাদরে গাঁয়ের দিঘির পাড় ধরে দই গাঁয়ের এপারে এসে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে জগন্নাথপুরের দিকে।

ওদিকে হাটতলা শিবমন্দির বাঁয়ে রেখে গ্রাম ছাড়িয়ে মেঠো সরাণ, গোঁসাইদের শালবন, পথটা ওই বনের বুক চিরে মাঠে এসে পড়েছে। বেশ কিছুটা মাঠ পার হয়ে শালীনদী।

নদীপার হয়ে মেঠো সরাণ ধরে আরও এগিয়ে এসেছে পথটা। তারপর বাঁদিকে আলপথ ধরে বেশ কিছুটা এলে এই গ্রাম। আজ মনে হয় টগরের সে যেন এক শত্রুপুবীতে এসে পড়েছে।

আত্মীয়-স্বজনও এসেছে বাড়িতে। এর মধ্যে নতুন বৌকে নিয়ে বেশ রসাল আলোচনাও শুরু হয়েছে। মা-ছেলে-বোনের মধ্যেও বার কয়েক বচসাও হয়ে গেল। আর শাশুডী এসে বৌকে শাসায়।

—ঘর ভাঙ্গার মতলব। ছেলেকে একদিনেই পর করে দিবি? ঝাঁটা মারবো তাহলে।

টগর চুপ করেই থাকে।

সন্ধ্যা নামে। রাতে গ্রামের চেহারাটা বদলে যায়। সন্ধ্যার পর থেকেই কেমন

চুপচাপ। টগরের মনে পড়ে তাদের গ্রামের কথা। আটচালায় বেন্দা বোষ্টম কীর্তন করে, কোনদিন ভাগবত পাঠ হয়। সন্ধ্যার পর মন্দিরে আরতি হয়। এখানে সেসব কিছুই নাই। গুরু মোষ দুইয়ে গোয়াল ঘরে মশার জন্য নিশিন্দে পাতার সাজাল দিয়েছে সবাই। বাতাসে পাতা পোড়ার কড়া গন্ধ ওঠে আর মশাগুলো গোয়ল ছেড়ে এসে মানুষদের ঘরে হানা দেয়। মশার কামড়ে ওদের কিছুই হয় না।

ভূষণকে এবার দেখেছে কাছ থেকে টগর। লোকটা ঠেটি ধুতি পরে গামছা জড়িয়ে গরু-মোষ দুইছে। ওই দুধ ভোরেই নিয়ে যাবে সোনামুখীব মহাজনদের ঘরে।

টগরকে দেখে একবার হাসার চেষ্টাও করে।

টগর সরে আসে। ওই লোকটা জেনে-শুনেই তাকে এই নরকে এনে ফেলেছে। এদের কাউকেই মেনে নিতে পারবে না টগর।

রাত কত জানে না টগর। তার ঘুম আসেনি। ওদের বারান্দা—ওদিকের ঘরে শুয়েছিল টগর। দেখে বাড়ির সবাই ঘুমে অচেতন।

টগর উঠে বসলো। এদিক-ওদিক চায়। কেউ নাই। এই সুযোগ। টগর নেমে এল দাওয়া থেকে উঠানে। সদর দরজার বালাই নাই। খোলা আঙ্গিনা-পায়ে পায়ে বের হয়ে এল রাস্তায়। গভীর রাত্রি, কেউ জেগে নাই।

টগর এবার চুপিসাড়ে একটু এগিয়ে আসে, গাঁয়ের সীমানা শেষ এবার মেয়েটা দৌড়াতে থাকে পথ দিয়ে।

তার চোখের সামনে ম্লান চাঁদের আলোমাখা মাঠ, মাটির পথ। দিগন্তরেখা দেখা যায় না। আকাশে ঝকমক করছে তারাগুলো। মেয়েটা কি মুক্তির আনন্দে দৌড়াচ্ছে। পথটা এসে সরাণে ওঠে। তার মনে পড়ে বাঁদিকে তাদের গ্রামের রাস্তা—আর ডানদিকে চলে গেছে সোনামুখী।

সে গাঁয়ের দিকেই চলেছে। নদীটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়। ছোট্ট নদী। কিছুটা বালুচর, মাঝে পায়ের পাতা ডোবা জল তির তির করে বয়ে চলেছে। তেষ্টাও পেয়েছে। ওই কাঁচধার স্বচ্ছ জল আঁজলা-আঁজলা করে খেয়ে মুখে-চোখে দিয়ে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে পিছনের দিকে চাইল।

জনহীন প্রান্তর। কেউ কোথাও নাই। ওরা জানতেও পারেনি, এখন ঘুমুচ্ছে ওরা। ঘুমুক। মেয়েটা চলেছে এবার গ্রামের দিকে—এই নরকে সে থাকতে পারবে না। ওদের ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাবে সে এই ভাবেই।

শিশিরভেজা বনের পথ দিয়ে ফিরছে মেয়েটা। শালবনের পাতা থেকে টুপ-টাপ শব্দে শিশিরজমা জল পড়ছে। বাতাসে কুর্চি ফুলের সুবাস। গোসাইবন পার হয়েছে মেয়েটা ওই রাতে একা। সামনের দিগন্তে দেখা যায় ঘুমনামা জগন্নাথপুরের গ্রামসীমা। অনেকটা চেনা জগৎ—কি যেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে মেয়েটা তার গ্রামের

দিকে।

হাবু ঘোষ এতদিন ধরে যা বহুকষ্টে জমিয়েছিল তাই দিয়েই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। একবিঘে জমিও বিক্রি করতে হয়েছে কমলবাবুকে। শরীরও ভালো নাই, বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। রমণ ডাক্তারকেও দেখিয়েছে।

রমণ ওষুধ দিয়ে বলে—একটু সাবধানে থেকে হাবু, ওষুধপত্র খাও। তোমার বুকের তো গোলমাল দেখছি।

হাবু বলে—শরীরও ভালো নাই, মেয়েটার বিয়ে চুকিয়ে দিতে চাই। হাবু মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্তই হয়েছে। তবু একটা মেয়ে সে সুখে থাকুক। তাতেই খুশি থাকবে সে।

বিয়ের পরই বুকে বেদনা জানিয়েছিল। রমণ ডাক্তার এসে দেখে গেছে। বলে—চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে।

টগরের মাও ভাবনায় পড়ে মানুষটার জন্য। মেয়েও নাই। ঘর এখন শূন্য। তবু মেয়েটা থাকতে কিছুটা ভরসা ছিল। সে তার ঘরে চলে গেছে।

হাবুর রাতে ঘুম আসে না। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছে। টগরের মায়ের ঘুম ভাঙ্গে ভোরেই। দেখে হাবু ঘুমুচ্ছে। ওকে আর ডাকে না। নিজেই উঠে এবার ছড়া-ঝাট দেবে। গরু দুইতে হবে। ভোর হচ্ছে।

পাখিদের কলরব শুরু হয়েছে। হঠাৎ সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে চাইল টগরের মা। এত ভোরে কে আসবে? তবু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে দেখে ঘরে ঢোকে টগর। পরনে একটা সাধারণ শাড়ি গাছ কোমর করা।

এতটা পথ একদমে এসে হাঁপাচ্ছে। মুখের উপর এসে পড়েছে কয়েক গাছি চুল।

—মা! টগর এগিয়ে আসে। টগরের মা মেয়েকে এসময় এভাবে ফিরতে দেখে চমকে ওঠে।

—তুই! এই ভোরে?

টগর বলে—ওখানে থাকা যাবে না মা। থাকতে পারবো না। তাই পালিয়ে এসেছি।

আর্তনাদ করে ওঠে টগরের মা।

—একি সব্বোনাশ করেছিস টগর? না বলে না কয়ে রাত দুপুরে বিয়ের কনে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস?

—এ্যাঁ! টগরের মা দাওয়ার দিকে চেয়ে দেখে হাবুরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে ওদের কথার শব্দে। সেও বের হয়ে এসে দেখছে টগরকে।

এত খর্চা করে সর্বস্ব হারিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে আর সেই বিয়ের কনে শ্বশুরবাড়ি থেকে রাত দুপুরে পালিয়ে এসেছে।

হাবু আর্তনাদ করে—একি করলি টগর। নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে শেষ করলি? আর ওরা তোকে ঘরে নেবে? কি হবে তোর? একি সর্বনাশ করলি কালামুখী, গাঁয়ের লোককে কি জবাব দোব? কি করে মুখ দেখাবো? হাঁপাচ্ছে হাবু।

বুকের ব্যথাটা এখন তীব্রতর হয়ে ওঠে। টগরের মা ছুটে এসে ওকে ধরে, —ওগো, থামো। শান্ত হও।

হাবু আর্তনাদ করে—এখনও শান্ত হবো? ওই সর্বনাশী কুলমজানি মেয়ের মুখ দেখতে হবে?

এর বিয়ে—হঠাৎ হাবু কি বলতে গিয়ে পারে না। কথা বন্ধ হয়ে যায়। শূন্যে হাতটা তুলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে।

টগরের মা আর্তকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—একি সব্বোনাশ হল গো। ওগো কি হলো আমার?

টগর স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখে বাবার প্রাণহীন দেহটাকে। এ সে কল্পনাও করেনি যে তার একটা ভুলের জন্য এই সর্বনাশ ঘটবে। তার ভবিষ্যৎ নিজেই পা দিয়ে মাড়িয়ে এসেছে টগর। কিন্তু তার জন্য বাবা-মারা যাবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

গ্রামের লোকজনও জুটে যায়। আজ যেন গোপগায়ের মানুষ কি এক চরম দুঃসংবাদ শুনেই জেগে ওঠে। হাবু ঘোষ আর নাই। তার মেয়েটার কীর্তির কথাও সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

টগর চুপ করে শোনে, তার দুচোখ বেয়ে নামে এবার অশ্রুধারা। আজ মনে হয় বিদ্রোহ করতেই চেয়েছিল সে। আর তাই যেন এই শাস্তি। সে এটাকে মুখবুজে মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু আপাততঃ করার কিছুই নাই।

প্রতাপবাবুও বুঝেছেন সংসারে অনেক কিছুই ঘটে যার বিরুদ্ধে করার কিছুই নাই। মেনে নিতেই হয়।

এতদিন ধরে পুরুষানুক্রমে জমিদার ছিল তারা। সেই এই বংশের শেষ জমিদার। খবরটা কানাঘুসায় শুনছিলেন তিনি, এবার তার ছেলে প্রদীপই সহর থেকে সরকারি গেজেট এসেছে।

প্রদীপ এবার বি-এ দিয়েছে। প্রতাপবাবুর মত সুগৌরবর্ণ, যেন তরুণ প্রতাপই।

আজ প্রতাপবাবু বলেন,

—তাহলে জমিদারী শেষ। এখন নিজেদের বংশ-গৌরব কি করে বজায় থাকবে সেইটাই ভাবতে হবে প্রদীপ।

প্রদীপ কলেজে পড়ে, সেখানে সে আজকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে দেখেছে পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্র মুছে গেছে। সেখানে

অবহেলিত অত্যাচারী মানুষরাই সেই রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করে সেখানে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছে।

প্রদীপ বলে—বাবা, এই পরিবর্তন তো নতুন নয়? প্রতাপ চাইলেন ছেলের দিকে। প্রদীপ বলে—ফ্রান্স, রাশিয়াতেও এমন পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে দেশশাসন করতে। তারা রাষ্ট্রকে গড়েছে ফর দি পিপল, অব দি পিপল, বাই দি পিপল। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারাই গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমাদের দেশে এতদিন ইংরেজ সরকার ছিল বলেই তা হয়নি। এবার হতে চলেছে। তাই এক জন ইংরেজ সামন্তের গড়া জমিদারী প্রথাকে তুলে দিয়ে ভালোই করেছে।

প্রতাপনারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। এতদিনের প্রতিষ্ঠা তাদের চলে গেল তার জন্য যেন ওই প্রদীপের কোন দুঃখও নাই।

প্রদীপ বলে—এই পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হবে বাবা। প্রতাপ ছেলের এই মতবাদকে এত সহজে মেনে নিতে পারেন না। তিনি দেখেছেন এর মধ্যে সমাজের বুকে মাথা তুলেছে এমন একটা শ্রেণী যাদের শিক্ষা-দীক্ষা সাংস্কৃতিক চেতনা তেমন কিছুই নাই। সৎ-অসৎ উপায়ে কিছু টাকা রোজকার করে তারা সমাজের বুকে তাদের শাসন-শোষণই কায়েম করতে চায়।

প্রতাপবাবু বলেন—যদি এতে দেশের-দশের মঙ্গল হয় তাহলে মেনে নেব। কিন্তু জনগণের রাষ্ট্র বলছো। সেই জনগণ তো হতদরিদ্র, অশিক্ষিত—বঞ্চিত। তাদের কথা সামগ্রিক ভাবে নানা ভেবে শুধু একটা মত, দলকে অবলম্বন করে, যদি শাসনপ্রণালী গড়ে ওঠে সেই শাসনব্যবস্থা মুষ্টিমেয় একটা স্বার্থান্ধ সমাজের উন্নতিই করবে, সামগ্রিকভাবে দেশের কোন কল্যাণ তাতে হবে না। তাই উচিত ছিল দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-প্রত্যেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে তারপর জনগণ সচেতন হবে তখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

প্রদীপ বলে—সেগুলো করার জন্যই নতুন করে চেষ্টা করা হচ্ছে। আর সরকার গড়ে উঠবে সাধারণ মানুষের ভোটে। প্রতাপবাবুও ভেবেছেন কথাটা।

তিনি বলেন—ওই যে বললে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। ওই করা হবে শুধু এই আশ্বাস দিয়েই তারা যদি দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখান। সেটাই হবে হয়তো। কাজ কিছুই হবে না।

—তখন ভোট দিয়ে সেই সরকারকে হটিয়ে দেবে জনতা?

প্রদীপের কথায় প্রতাপ বলেন—একবার হাতে যে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা পাবে, সে যদি কূট-কৌশলী হয় তখন ওই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতির ব্যবস্থাকে নিজের হাতে নিয়ে প্রথমেই দেশের গরীব মানুষদের শুধু পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়েই তাদের ভোট আদায় করবে। আর ভালো কথায় ভোট না দিলে জনসাধারণকে ভোটের কেন্দ্রের

দিকে আসতেই দেবেনা। তারা তখন শক্তিমান। নিজেরাই ভোট কিনবে। না হয় জোর করে ভোট ছিনিয়ে নিয়েই গদিতে বসে থেকে শাসন শোষণ চালাবে অপ্রতিহত গতিতে।

প্রদীপ বলে—এ হতে পারে না। অন্যদেশে তা হয়নি এখনও। তারা সুখেই আছে বলে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের মানুষও রাশিয়ার চিঠিতে সেই আভাসই দিয়েছেন।

প্রতাপবাবু বলেন—ভালো হলেই ভালো। কিন্তু ওই মতবাদ এখনও যুগ. কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। যুগ. কালের সঙ্গে মানুষ বদলায়। ক্রমশ ক্ষমতার স্বাদ তাদের অন্ধ করে তোলে। সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার পর দেখা যাবে এই মতবাদের সাফল্য কতখানি।

এই মতবাদকে আমিও সমর্থন করি। কিন্তু এখানে সবটাই নির্ভর করছে এই মতবাদ নেতারা সার্থকভাবে মেনে চলতে পারবেন কিনা। এ ক্ষুরধার নিশিত পথ। একটু বিভ্রান্তি ঘটলে এর এক ভয়ঙ্কর রূপই ফুটে উঠতে পারে।

প্রদীপ বলে—না। দেশের সাধারণ মানুষ সেদিন তাদের সেই ভুল ধরিয়ে দেবে নিজেদের মঙ্গলের জন্যই।

প্রতাপবাবু বলেন—তুমি তরুণ, আশার স্বপ্ন দ্যাখো। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখেছি এই যুগের মানুষও বদলে যাচ্ছে, আরও বদলে যাবে। দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য এদের মনে কোন শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম, মায়া-মমতা নেই। মানুষ তার ঐতিহ্যকে ভুলে আজ শুধুমাত্র স্বার্থ আর অর্থের দিকে ছুটেছে। এদের মত মানুষ তো আসবে রাষ্ট্র পরিচালনায়, একদিন হয়তো তুমিও আসতে পারো। সেদিন মূল্যবোধ, আদর্শকে কতটুকু মানবে তাই নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। সেদিন আমি থাকবো না। এই জমিদাররাও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যে সমাজ গড়ে উঠবে সেটা কি রূপ নেবে জানিনা।

প্রদীপ বাবার এই হতাশাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়। এতকাল সমাজের বুকে শাসন-শোষণ করেছেন এরাই। এবার সমাজের রূপ বদলাচ্ছে। তাকে মেনে নিতেই হবে।

প্রদীপও মনে করে সমাজের জীর্ণ ব্যবস্থাটাকে ভেঙ্গে একালে নতুনভাবে সমাজ, দেশকে গড়ে তুলতে হবে। এই বিবর্তনবাদে সে বিশ্বাস করে।

প্রতাপবাবু ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে আর তর্ক করেন না। বেশ বুঝেছেন আজকের দিনে বিদেশের আমদানী নীতিকেই আঁকড়ে ধরতে চায় দেশের মঙ্গলের জন্য।

দেশের নেতারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে ব্যাকুলভাবে স্বাধীনতার নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যই দেশকে দুটুকরো করতেও দ্বিধা করেনি। সেই দিন থেকেই তারাই দেশের ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্রের

দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের আদর্শকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন আগামী প্রজন্মের সামনে।

এতদিন দেশের যুবসমাজের মনে আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন হলে তাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটবে। গড়ে উঠবে সুখী ভারত।

কিন্তু এখনও তেমন কিছু দেখা যায়নি দেশ স্বাধীন হবার পাঁচ-সাত বছর পরও।

তাই যুবসমাজ আজ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। এতদিন তাদের সামনে ছিল দেশ স্বাধীন করার ব্রত। সেটা তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন ওই নেতারা।

তাই এবার যুব সমাজ ভাবছে বিদেশের ওই শাসনব্যবস্থা দিয়েই হয়তো আমাদেরও সব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাই ওরা সেই দিকেই ঝুকেছে। সমাজব্যবস্থাকে তাই তারা নতুন করে গড়তে চায়।

এতে কি হবে জানেন না প্রতাপবাবু। তবে তাদের দিন শেষ হয়ে গেল এটা নিশ্চিত।

গ্রামে—আশপাশের গ্রামের জমিদাররা এবার পিছনের তারিখ দিয়েই খাস জমি, পুকুর বাগান বিক্রি করে দিচ্ছে। বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। যা পায় তাই লাভ।

তারজন্য অনেকেই কাছারিতে আসছে। ভাগাড়ে মরা গরুকে ঘিরে যেন শকুন জুটেছে। নেতার আগে শেষ বারের মত প্রদীপ জ্বলে উঠছে।

এই অঞ্চলের কাংস্যশিল্পীদেব কাজ বন্ধ। ওরাও এবার সমবেত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু শ্রমিক এসে জমায়েত হয়েছে। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানের অর্থনীতি, এর সঙ্গে বহু পরিবারের রুজি-রুটির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এবার তারাই সমবেত হয়ে হাটতলায় মিটিং করে সারা এলাকা তাদের গ্রামও পরিক্রমা করবে। হরিশবাবুও এদের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছেন। কেদার নবনীরাও এখন সমবেত হয়েছে। বরুণও চায় সমবায়ই গড়ে তুলতে।

কমলবাবুর একনায়কত্বের বাধা দিতেই হবে। এসেছে প্রদীপও। বরুণই পরিচয় করিয়ে দেয় হরিশবাবুর সঙ্গে।

—প্রতাপবাবুর ছেলে প্রদীপ।

হরিশবাবু ওকে এখানে দেখে অবাক হন।

—তুমি এখানে? এই জনতার সঙ্গে?

প্রদীপ দেখে হরিশবাবু, কেদারদের চোখে বিস্ময়ই। কারণ প্রতাপবাবু এদের সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখেই চলেন। তার চালচলন কথায় পোষাক-আশাকে একটা আভিজাত্য ফুটে ওঠে। নীলরক্তের পরিচয় তার ওই দূরত্বেই প্রকট। সেই বাড়ির ছেলে এসেছে এই খেটেখাওয়া জনতার অভাব-অভিযোগের সমর্থন করতে এটা যেন তারা ঠিক বিশ্বাসই করতে পারে না।

প্রদীপ বলে—মাষ্টারমশাই, জমিদারী তো আর নেই। সেই অতীতের খোলসটার আর দাম কি? তাই ওসব ছেড়ে এবার সাধারণ মানুষের একজন হয়েই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আজ ওই জমিদারী হারিয়ে একটা কঠিন সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।

আজ আর ওদের সঙ্গে আমারও কোন ফারাক নেই মাষ্টারমশায়।

কেদার অবাক হয়ে শুনছে কথাটা।

নবনী বলে—প্রদীপবাবুর সঙ্গে ওর বাবার তাই বনেনা।

এবার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে ওই কয়েকশো শ্রমিক তারা কমলবাবু, চট্টরাজদের মত মালিকদের জুলুম সইবে না। তারা নিজেরাই এবার সমবায় গড়ার চেষ্টা করবে, ওদের কেনা গোলামে পরিণত হবে না।

হরিশবাবুও তাদের সমর্থন করেন। তার প্রদীপও হাটতলার ওই প্রকাশ্য সভায় জানায় আজকের সমাজের বুকে সমাগত পরিবর্তনের কথা। এবার এই অঞ্চলও নতুন করে জেগে উঠবে। দুর্গাপুরে গড়ে উঠছে ভারতের অন্যতম বড় শিল্পাঞ্চল, আর দামোদর আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। নদীর বুকে গড়ে উঠছে ব্যারেজ, গাড়ি-বাস চলবে। আধঘণ্টার মধ্যে দুর্গাপুরের ওই শিল্পাঞ্চলে পৌঁছে যাবে মানুষ।

লোকে অবাক হয়ে শুনছে সেই আগামী পরিবর্তনের কথা। কেউ-কেউ দেখেছে দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ বনভূমিকে কেটে সেখানে গড়ে উঠছে বড় বড় কারখানা।

দামোদরের বুকে বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে দিনরাত। একটা যেন ঝড় আসছে। সেই ঝড় এতদিনের বন্ধ এই শান্তিপূর্ণ অঞ্চলেরও ঘুম ভাঙ্গাতে চলেছে।

এ যেন তারই সূচনা। হাজারো মানুষ এর আগে কখনও একত্রিত হয়ে এভাবে তাদের দাবীর লড়াইও শুরু করেনি।

প্রদীপ বলে—এবার শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের দাবীও এবার মানতে হবে ওই ছোট ছোট প্রভুদের। মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতেই হবে।

জনতা ওর কথায় হাততালি দিয়ে সমর্থন করে। বৈকাল হয়ে গেছে। জনতা তখন উদ্বেল। ওদের পরিক্রমা শুরু হয়। দোঁা পার হয়ে ওরা আসছে গোপগাঁয়ের দিকে তখন সন্ধ্যা নামছে। তবু তাদের ক্লান্তি নাই।

কমলবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল গিয়ে শেষ হবে গোঁসাইপুরের কামার

পাড়ার মাঠে।

কমলদাস সব খবরই রাখে। গুণময় জানে কমলবাবুকে কাজে নামাতে হবে। সেইই চেষ্টা-চরিত্র করে কমলবাবুকে এদিকে শেড তৈরির কাজে নামিয়েছে।

সদরেও আসা-যাওয়া করে সেখানের মহাজনদেরও টাকা দিয়ে আর কাউকে কাঁচামাল দেওয়া বন্ধ করে নিজেরাই লাখখানেক টাকার মালও তুলেছে।

গুণময় বলে—ওদের লম্ফ-ঝম্প দুদিনে। দেখুন না সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। কদিন কাজ নাই, মজুরিও নাই। ব্যাটারা এবার সুড় সুড় করে বাপের সুপুত্রের মত কাজের জন্য ঘুর ঘুর করবে।

কমলবাবুও স্বপ্ন দেখে সব ব্যবসা আসবে তার হাতেই। তাই টাকাও ঢেলেছে সে অনেক।

হঠাৎ এমনি দিনে ওদের মিটিংএর খবরটা আনে গতিলাল। সেইই বলে —হাটতলায় মিটিং করে বিরাট মিছিল বের হয়েছে। কমলবাবুর বাড়ির সামনে দে যাবে।

কমল অবাক হয়—সেকি!

—হ্যা! হরিশমাষ্টার ওদের লীডর। আর নতুন একজনও জুটেছেন।

গুণময় শুধোয়—সেটা আবার কে?

গতিলাল জানায়—ওই প্রতাপবাবুর ছেলে। কলেজে পড়ে বিগড়ে গেছে। প্রদীপকেও দেখলাম খুব জোর-জোর ভাষণ দিচ্ছে।

কমল অবাক হয়—সেকি! ওরা এদিকে আসছে?

গুণময় কি ভাবছে। বলে—এদিকে আসতেই দেবে না ওদের। সে ব্যবস্থা করছি।

গুণময় কোলিয়ারী অঞ্চলে এসব কাজ অনেক করেছে। এতদিন এখানে চুপচাপ থেকে সেইসব বিদ্যাগুলো ভুলতে বসেছিল। এখানেও কমলবাবুর কারখানাকে ঘিরে গুণময় তার কিছু চ্যালাকে তৈরি করেছে।

আজ তাদের এলেমই দেখবে গুণময়।

কমল বলে—কোন গোলমাল করবে নাকি বাড়িতে এসে?

গুণময় বলে—সে সাহসই হবে না ওদের। আমার ওপর ভরসা রাখুন কমলবাবু।

আজ গুণময়ই কমলের রক্ষাকর্তা সেজেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জনতা আসছে। বাঁধএর পাড় থেকে ওরা সেই বাগানে ঢুকেছে। ওদের শ্লোগান আরও জোরদার হয়ে ওঠে

আমবাগানে অন্ধকার নেমেছে। হঠাৎ ওই অন্ধকারের মধ্যেই কয়েকটা আলোর ঝলক ওঠে—তারপরই ওঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। স্তব্ধ দিগন্ত কেঁপে ওঠে ওই

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। শাখাশ্রয়ী পাখিরাও কলরব করে ওঠে। আবার বিস্ফোরণ।

জনতা থমকে দাঁড়িয়েছে ক্ষণিকের জন্য। আবার বিস্ফোরণ। এবার ওই ভীতত্রস্ত জনতা আমবাগানের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে-যেদিকে পারে দৌড়তে থাকে।

হরিশবাবু, কেদার, প্রদীপরাও হতভম্ব হয়ে যায়। হঠাৎ এভাবে অন্ধকারে বোমাবৃষ্টি হবে কল্পনাও করেনি তারা।

এখানে এসব কোনকালে হয়নি। হরিশবাবু জনতাকে থামাবার চেষ্টা করেন। —থামো। থামো তোমরা।

কে কার কথা শোনে। আবার ওদিকে একটা বোম ফাটে।

ওরা হরিশবাবুকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে। একটা গাছের মরা ডালে লেগে হরিশবাবুর কপালই কাটে।

ভীত জনতা নিমেষের ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাগানে তখন আর্তনাদ। কলরব ওঠে। কেউ ছিটকে পড়েছে। কেউ দৌড়চ্ছে প্রাণভয়ে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মিছিল উধাও।

কেদার হরিশবাবুকে তোলে। কপালে রক্ত ঝরছে। প্রদীপ দেখছে ব্যাপারটা। বেশ বুঝেছে সে কেউ ইচ্ছা করেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য বোম চার্জ করেছে।

সেই রাতেই কমলবাবু জিপ নিয়ে থানায় হাজির হয়। মাইল পাঁচেক দূরে থানা। বড়বাবুও তার পরিচিত। কমলবাবুকে দেখে শুধোয়।

—কি ব্যাপার কমলবাবু?

কমলের সঙ্গে এসেছে সরকার, গুণময় থানাতে যায়নি। ওদিকে চায়ের দোকানে বসে থাকে। তবে বুদ্ধিটা তারই। একেবারে পাকা বুদ্ধি। কমলবাবুও বুঝেছে ওই বুদ্ধিমত চালটা ঠিক দিতে পারলে নির্ঘাত কিস্তিমাৎ হবে।

কমলবাবু বলে—খুব বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি স্যার। আজ আমার বাড়িতে ডাকাতিই হয়ে যেতো।

—সেকি!

কমলবাবু বলে—সন্ধ্যা আটটা নাগাদ এসেছিল দলবেধে ডাকাতের দল। বোমা মেরেছে কত তার ঠিক-ঠিকানা নাই। একেবারে যাকে বলে বোমাবৃষ্টি। তবে বাড়ি ঢুকতে পারেনি। গ্রামের মানুষও হৈ-চৈ করতে তারা পালায়। একটা বিহিত করুন স্যার। নাহলে বেঘোরে মারা পড়বো কোনদিন।

দারোগাবাবুও জানে কমলবাবু তার শাঁসালো পার্টি। তাকে রক্ষা করতে পারলে তারই লাভ। এ হাঁস সোনার ডিম পাড়ে। মাসে মাসে খাম পাঠায়।

তাই বলে—সেকি কথা। কাউকে সন্দেহ হয়?

কমলবাবু বলে—সেটা কি করে বলি বলুন। তবে ওই ফ্যাক্টরী নিয়ে গোলমাল

তো ছিলই। তারা কেউ কিছু করেছে কিনা জানিনা স্যার। তবে এনকোয়ারি করলে আপনি ঠিক দোষীদের খুঁজে বের করতে পারবেন। আপনার মত বিজ্ঞ অফিসার সব পারেন ইচ্ছা করলে।

বড়বাবু নিজেই ডাইরি করে বলে—কালই এনকোয়ারিতে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কমলবাবু। আমার এলাকাজ এসব কোন গোলমাল আমি বরদাস্ত করবো না।

কমল ফেরার পথে চায়ের দোকান থেকে গুণময়কে তুলে নেয়। গুণময়ের একটু পানাভ্যাসও হয়েছে। আসানসোল ফিল্ডে থাকার সময়ই ওটা ধরেছিল। এখানেও ছাড়তে পারেনি।

আর ইদানীং গুণময় এই কুটিরশিল্পে নিজেই নেমে পড়েছে। কাপিল বেশ ওস্তাদ কারিগর।

নিশাদল কারবাইড ইত্যাদি দিয়ে ভালো চুল্লু বানায়। তার খদ্দেরও বেশি। ইদানীং ওই ব্যবসা বেশ চালু করেছে গুণময়। আর এ-ছাড়াও কাপিল মহুয়া বাখর গুড় ইত্যাদি দিয়ে বাঁশের চোঙ্গ লাগানো হাড়িতে বিশুদ্ধ পাতন পদ্ধতিতে বেশ ভালো মদ তৈরি করতে পারে, সেটার দাম বেশি।

ওর খদ্দেরও ইদানীং ভালোই জুটছে। ওই ব্যবসাতে এখন গুণময়ের দিয়ে থুয়েও মন্দ থাকে না। আর নিজের জন্যও সরেশ মদ ফাউ হিসেবেই পায়

তাই গুণময় একটা বোতল সঙ্গেই রাখে। চায়ের দোকানে বসে গুণময়এর মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে।

কমলের জিপে উঠে বলে—সব ঠিকঠাক বলেছেন তো কমলদা?

কমল সবই বলেছে। গুণময় বলে—এবার পয়লা চোটে ওই শালা উড়ে এসে জুড়ে বসা মাস্টারকেই হঠাও। ব্যাটা লীডার হতে চায় এখানে? গায়ে মানে না আপনি মোড়ল! ওই ব্যাটাই কামারদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। ওটাকে হঠাও।

কমলবাবু চুপ করেই থাকে। সে কি করবে তা মনেমনেই ঠিক করে নেয়। তাই গুণময়ের কথায় কান দেয় না। কমল দাস একটা কথা বিশ্বাস করে—কাউকেই বিশ্বাস করোনা। যাকে যতটুকু দরকার ততটুকুই কাজে লাগাবে তারপর আর গুরুত্ব দেবে না। তবে কমলও বুঝেছে ওই হরিশ মাস্টারই এসবের মূলে।

পরদিন পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে গ্রামে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। গোবিন্দ ঘোষ অঞ্চলপ্রধান। সরকারের স্বীকৃত মানুষ। গ্রামে সরকারি লোকজন, পুলিশ এলে প্রথমে গোবিন্দবাবুর অফিসেই যায়। কিন্তু আজ পুলিশের দারোগা তার কাছে আসে না। খবরটা দেয় পঞ্চায়েতের কেরানি হরিপদ

—আজ্ঞে দারোগাবাবুকে দেখলাম কমলবাবুর বাগান বাড়িতে যেতে।

—কি ব্যাপার? গোবিন্দবাবুর প্রশ্নে হরিপদ বলে—কাল কিসব গোলমাল হয়েছে,

বোম-টোম পড়েছে তারই জন্য এসেছে মনে হলো।

বরুণও বসেছিল অফিসে। সে বলে—ঘটনা ঘটেছে বাগানে, কমলের এলাকাতেও নয়। বোমবাজী করেছে কারা তা সবাই জানে। মিছিলের উপর বোমা মারতে চেয়েছিল। তার তদন্ত করতে ওর কাছে কেন?

হরিপদ বোর্ডের কেরানি। এই অঞ্চলের অনেক খবরই রাখে সে। তাই বলে—কাল রাত্রে শুনলাম কমলবাবু ওই সব ঘটনার পরে থানায় গেছল ফিরেছে অনেক রাতে।

গোবিন্দবাবুও বুঝেছেন তিনি অঞ্চলপ্রধান হলেও কমলবাবু ইদানীং বেশ হিম্মৎই রাখছে! ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে শুরু করেছে সে।

বরুণ বলে—ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না?

হরিপদ বলে—দেখুন কি হয়।

আর কাণ্ডটা যে শেষঅবধি এই হবে তা ভাবেনি বরুণ। এর মধ্যে বরুণই বাড়ির কাজের ছেলেটাকে সাইকেল নিয়ে প্রদীপের ওখানে পাঠায়। বরুণ বুঝেছে কমল নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র করেছে ওই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। তাই আলোচনার জন্য প্রদীপকে নিয়ে হরিশবাবুর ওখানেই যাবে এখুনি বরুণ

প্রতাপনারায়ণ ছেলের কালকের কাজটাকে সমর্থন করেননি। কাল সন্ধ্যায় ওইসব ঘটনার পর প্রদীপ বাড়ি ফিরতে দেখে বাবা তখনও বসে আছেন। প্রতাপবাবুএর মধ্যে প্রদীপ যে ওই শ্রমিকদের মিছিলে গেছে এ খবর পেয়েছেন।

তিনি প্রথমে ভাবতেই পানেরনি যে প্রদীপ ওদের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলাবে। পথে-পথে ঘুরবে। এ যেন পথের মানুষদেরই একজন হয়ে গেছে সে। একথাটা ভাবতেও পারেন না প্রতাপবাবু।

এ তার অপমানই। ছেলের কথাবার্তাও তার ভালো লাগেনি। আজকের এই কাজটাকে কোনমতেই তিনি সমর্থন করতে পারেননা কোন যুক্তি দিয়েই। তাই একটা বোঝাপড়াই করতে চান। প্রদীপকে দেখে বলেন প্রতাপবাবু।

—তাহলে দেশোদ্ধারের কাজেই নামলে? ওই মানুষদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরতে পারলে?

প্রদীপ বাবার কথায় বলে—কোন অন্যায়তো করিনি। ওদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করবে ওই মালিকসাজা লোকটা, তারই প্রতিবাদ করছি মাত্র।

—তাই বলে মান-সম্মানও ধুলোয় লুটিয়ে দেবে? কোন বংশের ছেলে তুমি জানো না?

প্রতাপবাবুর কথায় প্রদীপ বলে—জমিদারী তো চলে গেছে বাবা। এখনও ওই

ভুয়ো মানমর্যাদা, বংশপরিচয়ের, গৌরবের দাম কি?

প্রতাপবাবু ছেলের কথায় বলেন—এর মূল্য তোমরা বুঝবে না।

—কিন্তু কি তার দাম? জমিদারের পরিচয় দিয়ে লাভ কি? এবার সমাজে নতুন এক শ্রেণীই গড়ে উঠবে বাবা। তারাই সমাজ, দেশকে চালাবে।

প্রতাপবাবু দেখেছেন এই গ্রামগুলোর মধ্যেই এখন জমিদারদের সেই দাপট আর নেই। সেখানে মাথা তুলেছে কমল দাস, নতুন গ্রামের হারুদত্তের মত ব্যবসাদাররাই।

তাই বলেন তিনি—ওই ব্যবসায়ী শ্রেণী?

প্রদীপ সহরে এতদিন কলেজে পড়েছে, সেখানেই পণ্ডিতদের কাছে রাজনীতির পাঠ নিয়েছে। কলকাতার দলের দু'একজন নেতার সঙ্গেও পরিচিত।

রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও তাদের মূল্যবান আলোচনা সে শুনেছে। নিজের ভাবনা-চিন্তা দিয়েও প্রদীপ ভেবে দেখেছে ব্যাপারটা।

বলে প্রদীপ—না বাবা। তারা চাইবে তাদের ব্যবসা আরও বাড়াতে। টাকা রোজকার করতে। কিন্তু সমাজ, দেশকে শাসন করবে একটা শ্রেণী, যাদের মদত দেবে ওই ব্যবসায়ীরাই নিজেদের স্বার্থে। সেই নতুন শাসকরাই আজকের জমিদারদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে।

—তারাই হবে সব? কি তাদের পরিচয়? প্রতাপবাবু প্রশ্ন করেন।

প্রদীপ বলে—রাজনীতি করে মাত্র এই হবে তাদের পরিচয়। অবশ্য এত সহজে সমাজের মাথায় কারো পক্ষেই ওঠা সম্ভব নয়। বেশ কিছু সংঘাত হবে ওই ধ্বসে পড়া জমিদারদের সঙ্গে। নীলরক্ত বনাম লালরক্তের সংঘাত, তারপর আসবে সেই রাজত্বি করার দিন।

প্রতাপনারায়ণ দেখছেন ছেলেকে। ও যেন সেই দিনের স্বপ্ন দেখছে। একটা হীন-লোভী সত্তা—যে দেশেব লোককে ঠকিয়ে নিজের আখের গড়তে চায়।

প্রতাপবাবুর এই কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে। বলেন তিনি—ওই স্বার্থ নিয়েই কি রাজনীতি করতে চাও? এত লোভী তুমি? দেশের মানুষকে ধাপ্পা দিতে চাও?

প্রদীপ বলে—আজ যাকে তুমি যাকে ধাপ্পা বলছো, কিছু দিনেব মধ্যেই সমাজের বুকে মূল্যাবোধের সংজ্ঞা যখন বদলে যাবে সেদিন ওইটাই হবে যোগ্যতার মাপকাঠি। আর বেঁচে থাকতে গেলে যোগ্যতার প্রয়োজন।

প্রতাপবাবু আগামী দিনের আদর্শবাদী দেশসেবকের সংজ্ঞা শুনে বলেন—সেদিন যেন বেঁচে না থাকি। তাই শেষ কথা বলছি—ওই ধারণা নিয়ে রাজনীতি করো না। মানুষকে ধাপ্পা দিও না, বরং খেটে খাবার চেষ্ট করো সামান্য নিয়েই খুশি হয়ো। তাতেই তৃপ্তি পাবে, শান্তি পাবে।

—কিন্তু বাবা। প্রদীপ কি বলতে চায়!

প্রতাপবাবু বলেন—এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোন তর্ক করতে চাই না। আমার বক্তব্য তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি যেতে পারো। হ্যা—

চাইল প্রদীপ। প্রতাপবাবু বলেন—কাল মিছিলে বোম পড়েছিল?

—হ্যাঁ। বলিলি—ওই আন্দোলনকে কিছু স্বার্থপর মানুষ থামাতে চাইবেই। তাই সংঘাত হবেই। আর তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে।

প্রদীপ তার সেই চ্যালেঞ্জের কথাটা যেন বাবাকেও জানাতে চায়। প্রতাপবাবু দেখছেন একটা যেন ঝড়ই আসছে এবার। ঘনিয়ে আসছে সংঘাত, তাই পিতাপুত্রের মাঝেও একটা যেন দেওয়ালের ব্যবধান গড়ে উঠছে।

সকালেই প্রদীপ বরুণের লোকের কাছে খবরটা পেয়ে বরুণের কাছে এসেছে। পথে সেও দেখেছে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কমলের বাগানবাড়ির সামনে।

বরুণ ওকে দেখে বলে—এসো প্রদীপ। বাসন্তীও ছিল বরুণের ঘরে। বাসন্তীও প্রদীপকে চেনে।

প্রদীপ বলে—কাল রাতে বাবা অনেক কথাই শোনালেন।

বাসন্তী বলে—শোনাবেনই তো।

—মানে? বরুণ স্ত্রীর দিকে চাইল।

বাসন্তী বলে—ওই লোকজনদের নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে মিছিল করছো, তারপর কাল ওই বোম যদি ঘাড়ে পড়তো কি হতো?

প্রদীপ বলে—ওরা তো থামাবার চেষ্টা করবেই। ওদের স্বার্থে ঘা লাগবে তবু আমরা থামবো না।

বাসন্তী বলে—জমিদারীর কাজ, আদায়পত্র গেছে। এবার অন্য কাজকর্ম করে রোজকারের চেষ্টা করো। তা নয় ওই সব করে কি হবে? বাবা ঠিকই বলেছেন।

বরুণ বলে—তুমিও দেখছি বাবার মতই কথা বলছ বাসন্তী।

প্রদীপ বলে—আমরা কাজকর্ম করে রোজকার করতে তো চাই। তাই ওদের সঙ্গে বাধবেই। বৌঠান, ক্রমশ দেখবে আমাদের অভাবের জ্বালাটা এসে অন্তঃপুরেও লাগবে। সেদিন যে মেয়েরা ঘরের বৌ হয়ে সংসারকে ধরে রেখেছে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেও তাদের সংসার ছেড়ে পথে নামতে হবে রোজকারের জন্য। আমাদের অন্তঃপুরের শুচিতাও ওই লোভী ব্যবসাদারদের কাছে বিকিয়ে দিতে হবে।

বাসন্তী অবাক হয়—কি বলছ প্রদীপদা?

বরুণও বলে—আজ না হোক এভাবে চললে কিছুদিন পর ওই অবস্থাই আসবে। সেই সর্বনাশকে আটকাবার চেষ্টাই করতে হবে বাসন্তী।

বাসন্তী এবার কথাটা ভাবছে। এ যেন মেয়েদের কাছেও একটা নতুন প্রশ্ন হয়ে

উঠেছে। এবার মেয়েদেরও ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকলে চলবে না। তাদেরও কিছু করার কথা ভাবতে হবে।

হরিশবাবু স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। কালকের মিটিং-মিছিলের কথা সবাই জেনেছে। দইগাঁয়ের শ্রমিকরাও ছিল কালকের মিছিলে।

ওই বোম পড়ার কথাই তখন সকলের মুখে মুখে ঘুরছে। দইগাঁ—গোঁসাইপুর—গোপগাঁয়ের লোকজনও বলে—যার স্বার্থে ঘা লেগেছে সেই বোম মারিয়েছে হে। নাহলে সারা পথে কিছু হল না, গোলমাল হলো কমলবাবুদের গাঁয়ের বাগানে।

অনেকেই এসেছে সকালে হরিশবাবুর কাছে। দু-একজনের সামান্য চোটও হয়েছে। এলাকার মানুষও বুঝেছে এ কাদের কাজ।

বদি কবরেজ বলে—কুনকালে যা হয়নি এখানে তাই শুরু হলো? বোমবাজীও। বুঝলে এসব ওই গুণময়ের কীর্তি। শুনেছি আসানসোলে ওইসবই করতো।

রমণ ডাক্তার বলে—কোন বংশের ছেলে কি হলো? এখন এই এলাকাজ মদের কারখানাও বসিয়েছে। সেদিন ন্যাবা বাউরী ওই মদ খেয়ে মরতে মরতে বাঁচলো। বোমা, মদের ঠেক জাহান্নামে পাঠাবে দেশটাকে।

কালু ভটচায বলে—আর ম্যাড়া লড়ে খুটোর জোরে। ওর খুটো ওই কমলদাস।

হরিশবাবু বলে—সমাজের এই বদল তো ঘটবেই। ওরা চাইবে সমাজ, দেশকে শেষ করে নিজেদের আখের গোছাতে, তাই সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এই সর্বনাশকে ঠেকাবার জন্যই।

হঠাৎ এমনসময় পুলিশের জিপটাকে আসতে দেখে ওরা অবাক হয়। জিপ থেকে মোটা পিপের মত দারোগাবাবু চারজন বন্দুকধারী সিপাইকে নিয়ে নেমে হরিশবাবুর দিকেই এগিয়ে আসে।

হরিশবাবু কাল বাগানে ছিটকে পড়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন। রমণই ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। দারোগাবাবু ওর দিকে চেয়ে বলে—আপনিই হরিশ সরকার?

হরিশবাবু জানান—হ্যাঁ। কেন?

দারোগাবাবু ওকে আপাদমস্তক জরিপ করে শুধোয়—কপালে চোট পেলেন কি করে?

হরিশবাবু কারণটা বলতে এবার দারোগা গর্জে ওঠে—মিথ্যে কথা। লায়ার—মিথ্যাবাদী।

এসে পড়েছে বরুণ, প্রদীপও। তারাও এখানে পুলিশ দেখে একটু অবাক হয়। আর দারোগাকে হরিশবাবুকে ওইভাবে শাসাতে দেখে বলে প্রদীপ—কাকে কি বলছেন? উনি এখানে হেডমাষ্টার, মানী লোক।

দারোগা বলে ওঠে—থামুন তো! মানী লোক! কাল রাতে দলবল নিয়ে কমলবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করার মতলবে গেছলো, বোম চার্জ করেছে—

হরিশবাবু অবাক হন।

—কি বলছেন এসব?

বরুণ বলে—শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর ওরাই বোমা মেরে লোকজনকে চোট করেছে। দোষ করলো ওই কমলবাবুর দল আর এসেছেন হরিশবাবুকে ধরতে ডাকাতির চার্জে?

জনতাও এবার বাড়ছে। তারাই বলে—ওরাই দায়ী। মাষ্টারবাবু কেন বোম মারতে যাবেন?

—কোন প্রমাণ আছে? দারোগা হুঙ্কার ছাড়ে।

দেখছে সে গ্রামের লোকজন মায় দু-চারজন মহিলাও এসে পড়ে। সুখদা ঠাকরুন ভিড় ঠেলে এসে বলে—দোষ করলো একজন আর ধরতে এসেছো আর একজনকে? ভালো বিচার তো।

প্রদীপ বলে—সকলেই কি বলছে শুনুন!

দারোগা জানে কাজ উদ্ধার করে যেতে হবে তাকে। কমলবাবুর বেশ কিছু টাকা তখন তার পকেটে। তাই বলে—যা বলার আদালতে বলবেন। আমার কাছে রিপোর্ট আছে উনিই দোষী। ওকে থানায় যেতে হবে। চলুন—

জনতাও এবার রুখে ওঠে—এ হতে দেব না। এ অন্যায়!

দারোগা বলে—সরকারি কাজে বাধা দিলে তার ফল ভালো হবে না। গুলি চালাতে বাধ্য হবো।

সুখদা ঠাকরুন বলে—একজন বোমা বৃষ্টি করলো। এবার তুমি গুলিবিষ্টি করো। তোমাদেরই রাজত্বি তো।

জনতাও সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোবিন্দবাবুও এসেছেন। এসেছেন শরৎ ভটচায।

হরিশবাবু বলেন জনতাকে—আপনারা কেউ কিছু করবেন না। আমি নির্দোষ—ওরা ছেড়ে দিতে পথ পাবে না। আমি থানায় যাচ্ছি, আপনারা শান্ত থাকুন।

হরিশবাবু নিজেই গিয়ে জিপে উঠলেন। জনতা এগিয়ে আসে। এসে জুটেছে এর মধ্যে অনেক শ্রমিকরাও। পুলিশ হরিশবাবুকে নিয়ে চলে গেল।

এই অঞ্চলে একজনকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেল যিনি এখানের কেউ নন, তবু এখানের মানুষের সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যই।

প্রদীপ বলে—বরুণ, আমি সদরে যাচ্ছি দুপুরের বাসেই। মাষ্টারমশায়ের জামিন করাতে হবে।

বরুণ হবে—তাই যাও।

জনতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ বলে—ভাইসব এবার কে বন্ধু কে আপনাদের শত্রুতা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সামনে কঠিন লড়াই—তার জন্যই তৈরি থাকুন।

ওরা বলে—মাষ্টারমশাইকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। তারপর এর জবাব দেব আমরা। আমরাও চুপ করে থাকবো না।

প্রদীপ বলে—তাকে ছাড়িয়ে আনি, তারপর এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

স্কুলের ছেলেরাও এসে পড়েছে। অরুণ—অন্যরাও দেখছে ব্যাপারটা। বিজয় এখন স্কুলে আসছে ঠিকমত। সেও অবাক হয়। শুধোয় অরুণকে—মাষ্টারমশাইকে ধরে নে গেল?

অরুণ বলে—ওসব মিথ্যে কথা বলেছে কমলদাস।

রামনিধি বাবু স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। দেগাঁয়ের মানুষ এর আগে বর্দ্ধমানের কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতো। তাদের গ্রামের স্কুলকে হরিশবাবু এসে নতুন করে গড়েছেন। ক্লাশ এইট থেকে ধাপে ধাপে ক্লাশ বাড়িয়ে এখন হাইস্কুলে পরিণত করেছেন। কলকাতা—সদর সহরে শিক্ষ বিভাগের কর্তাদের ধরে করে স্কুলের অনুমোদনও আনিয়েছেন।

অবশ্য আশেপাশের গ্রামের লোক—গোবিন্দবাবু, মায় ওই হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিলেন।

তখন থেকে মেয়েরাও স্কুলে পড়ছে। ক্রমশঃ আশপাশের গ্রামের মেয়েরাও আসছে স্কুলে। স্কুলের অনুমোদন পেতে এবার কমলদাসও কিছু টাকা দেয় আর রামনিধিবাবুরও গ্রামের স্কুলেই চাকরী হয়।

রামনিধিবাবুর বাসনা হেডমাষ্টার হবে, কমলদাসও কথাটা বলেছিল স্কুল কমিটির মিটিংএ।

কিন্তু প্রতাপবাবুই বলে—হরিশবাবুর চেষ্টাতেই স্কুল অনুমোদন পেয়েছে। তার যোগ্যতারও কম নেই। তিনিই হেডমাষ্টার থাকবেন।

রামনিধিবাবু সহকারি হেডমাষ্টার হয়েই রইল। কিন্তু সেই আশাটাকে মন থেকে দূর করতে পারেনি রামনিধি বাবু। আজ হরিশবাবুর অবর্তমানে সেইই যে হেডমাষ্টারি এটা জানাতে চায়।

তাই ছেলেদের বলে—স্কুলে চলো সকলে। ক্লাশ শুরু হবে। এখানে কি করছ?

রামনিধি এবার খুশিই হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে কে বলে—অন্যায় করে হেডস্যারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, আমরা তার প্রতিবাদে স্কুল আজ যাবোনা।

সকলেই বলে ওঠে—আজ স্কুল হবে না।

রামনিধিবাবু কি বলতে চায়। ওদিকে কোন ছেলে ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টাই বাজিয়ে

দিয়েছে। কলরব করছে ছেলের দল। রামনিধির চোখের সামনে আজ তারা যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

রামনিধি গজগজ করে।

—অবাধ্য ছেলেব দল তোদের এবাব আমিই সিধে করে দোব।

রামনিধি বাড়ুয্যে জানে কোন দেবতাকে ফুল দিলে আশু ফললাভ হবে। ইদানীং বামনিধি স্থানীয় আর দুতিনজন শিক্ষককে নিয়ে একটা দলও গড়েছিল। তার মধ্যে হেডপন্ডিত বিশু চক্রবর্তী অন্যতম। বিশু চক্রবর্তী কোন টোলে কিছুদিন পড়ে নাকি আদা-মধ্য-উপাধি পবীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে পুরুলিয়ার দিকে কোন ইস্কুলে হেডপণ্ডিত ছিল। সেও মাঝে মাঝে গ্রামে আসতো।

কারণ যে মাইনে পেত ওই স্কুলে তা দিয়ে সেখানে পরিবারবর্গকে রেখে ভরণ-পোষণ করা যেতো না। আর সেই অঞ্চল ছিল মূলত আদিবাসীদের অধ্যুষিত অঞ্চল। সেখানে যজমান বৃত্তিও ছিলনা। তাই গ্রামেই পরিবারবর্গ থাকতো। বিশু চক্রবর্তীর ছেলে অভয় দেশের বাড়িতে থেকে গ্রামের বেশ কিছু শিবমন্দিরের সেবাপূজা করতো আর ছেলেবেলাতেই বিশু অভয়কে গলায সুতো ঝুলিয়ে দুচাবটে মন্তর পড়ে নিজেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করেছিল।

অভয় সেই শিক্ষার পুঁজি নিয়েই গ্রামে শনি সত্যনারায়ণ. লক্ষ্মীপুজো ষষ্ঠীপুজো করেও কিঞ্চিৎ আমদানী করতো। কমল দাসদেব পরিবারেও পুজো-টুডো কবতো। সেই সুবাদেই কমলের মা বড় গিন্নীর সংস্পর্শে আসে।

বুড়ি খুব ভক্তিমতী। সে ওই অভয়কে কমল দাসের দোকানে কাজ দিয়েছিল। অভয় ক্রমশ কমল দাসকে বলে-কযেই তাব পিতৃদেবকে এখানেব স্কুলেব সংস্কৃত শিক্ষকের চাকরিতে বহাল করে দেয়। বিশু চক্রবর্তী এখানে এসে দু পাঁচখানা গ্রামের নিত্যপুজো ধরে নেয়। সকাল থেকে বের হয় পুজো করতে, গ্রামে, মাঠের ধারে কোথায় শিবমন্দির, কার ব্রতের পুজো এস᠁ সেরে স্কুলে যেতে প্রায় বারোটা বাজে।

রোজই এই ব্যাপার দেখে হরিশবাবুই আপত্তি করতে থাকেন—এত দেরি হলে চলবে না পণ্ডিতমশাই। নিজে শিক্ষক হয়ে আইন-শৃঙ্খলা না মানলে ছেলেদের শাসন করবেন কি করে?

বিশু চক্রবর্তী বলে—ছেলেরা মানবে না কেন?

হরিশ বলেন—আপনি না মানলে তারাও আপনার শাসন মানবে না। তাই দেরি করবেন না।

এই নিয়েই ঝামেলা শুরু হয়। বিশুব যোগ্যপুত্র অভয় ইদানীং গুণময়েব অনুরক্ত হয়ে পডেছে। লড়াকু মনোভাবটা তার কাছেই পেয়েছে। অভয় বাবার কাছে স্কুলে

হাজিরার ঝামেলার কথা শুনে বলে—দোব একদিন ব্যাটাকে পেঁদিয়ে? ম্যাষ্টারি ঘুচিয়ে দোব।

বিশু বলে—ওসব করার দরকার নাই। দেখি অন্যপথে কিছু করা যায় কিনা। তুই বরং পুজো কয়েকটা কর।

অভয় এখন অন্যপথের পথিক। সে দেখেছে আড়তে থাকলে ট্রাকে মাল তোলা, ধান ওজন এসব করলে যা উপরি আসে তা কম নয়। ওই চাদর জড়িয়ে মন্দিরে শিবের মাথায় আতপ চাল ফুল ফেলে বেড়ানোতে সে নেই। তাছাড়া গুণময়দার প্রসাদ দু-এক গ্লাশ খায় রাতে। মদ খেয়ে শিব, বিষ্ণু পুজো না করাই ভালো। তাই বলে সে

—আমারও তো আড়তে গুদামে কাজ থাকে বাবা।

বিশু, রামনিধিরা তাই হরিশমাষ্টারকে মেনে নিতে পারেনি। আজ আবার স্কুল থেকে হরিশবাবুকে ডাকাতির আসামী করে ধরে নিয়ে যেতে তারাও খুব খুশি হয়েই কমলবাবুর গদিতে আসে সুখবরটা দিতে।

রামনিধিদের দেখে কমল কোন কিছু না জানার ভান করেই শুধোয়—কি ব্যাপার মাষ্টার মশাই? ইস্কুল নাই?

রামনিধি বলে—তুমি কি জানো না? এত বড় একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল।

—কি হয়েছে?

এবার রামনিধি, বিশু চক্রবর্তী দুজনেই হড়বড় করে ঘটনাটা রং চড়িয়ে বর্ণনা করে বলে—ছেলেদের স্কুলে যেতে বল্লাম, ওই গোবিন্দবাবুর ছেলে অরুণ, আরও সবাই বলে—স্যারকে অন্যায় করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাই ধর্মঘট।

বিশু বলে—কি হল বাবাজী! মিটিং, মিছিল ধর্মঘট এ্যা দেশপাড়া গায়ে এসব পাপ ঢুকলো?

কমল বলে—তাই দেখছি।

রামনিধি বলে—আরও কত কি দেখবে। ওই প্রতাপবাবুর ছেলে প্রদীপ, বরুণরাও পুলিশের দারোগাকে কথা শুনিয়ে দিল। প্রদীপ তো সদরেই চলে গেল হরিশবাবুর জামিনের জন্য।

কমল দাস এই খবরটা শুনে এবার সচকিত হয়। এই শেষ খবরটাতে সে বিচলিতও হয়। প্রদীপদের সহরে নাম-ডাক প্রতিষ্ঠা আছে। সে অনেক কিছুই করতে পারবে।

কমল দাস ভেবেছিল হরিশ মাষ্টার বিদেশী লোক। এখানে তার আপনজনও কেউ না। একবার ডাকাতির কেসে জড়িয়ে দিতে পারলে সহজে বের হতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ এর মধ্যে প্রদীপবাবুকে এসে পড়তে দেখে কমল দাস ভাবনায় পড়ে।

রামনিধি বলে—স্কুলের বদনাম। হেডমাষ্টারের নামে ডাকাতির চার্জ। ডি-আই অফিস জানলে কি হবে বলো? স্কুলের এডই না বন্ধ করে দেয়। তখন কি হবে?

কমল ওদের আপাতত এড়াবার জন্যই বলে—পুলিশ কি করেদেখুন। তারপর ওসব ভাবা যাবে।

রামনিধির দল এবার যেন একটা সুযোগ পেয়েছে ওই হরিশকে তাড়াবার জন্য।

কমল এবার কথাটা গভীরভাবেই ভাবছে।

শ্রাবণ মাস। বর্ষার ধারা তখনও চলেছে মাঝে মাঝে অবশ্য মেঘমুক্ত সূর্যের আলো ক্রমনিম্ন সবুজ দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে তোলে। শালবনে সতেজ সবুজের প্লাবন, তাম্রাভ প্রান্তরে সবুজের ছোয়া। এবার বর্ষা ভালোই হয়েছে।

গ্রামের মানুষও খুশি। চাষও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বলদগুলোকেও আর বৃষ্টিতে লাঙল টানতে হচ্ছেনা। গ্রামের আটচালাতে আজ ওই ডাকাতির ব্যাপার নিয়েই কথা হচ্ছে। এই অঞ্চলের মানুষ ক্রমশঃ যেন দুটো দলেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

শরৎ ভটচায এর মধ্যে তার মনস্থির করে ফেলেছে। সে অবিভাবকদের মধ্য থেকে স্কুল কমিটিতে আছে। গ্রামের মাতব্বর। পাশার ছক আজ পড়েনি।

ওই আলোচনাই হচ্ছে। শরৎ ভটচায বলে।

—কে জানে কি ব্যাপার। অন্যত্র ডাকাতির কেসে জড়িত কিনা কে জানে ওই মাষ্টার? মিটিং ডাকাত হবেক হে!

এমনসময় ঢোল জয়ঢাক আর শিঙার শব্দে আর মানুষের কলরবে যেন গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সকলেই বের হয়। দেখা যায় গোঁসাইপুরের দিক থেকে আবার মিছিলই আসছে ওই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে।

দেগাঁয়ের মানুষজনও জুটেছে। শোনা যায়—হরিশমাষ্টার কি—জয়!

হরিশমাষ্টার—জিন্দাবাদ। শ্রমিক সংঘ—জিন্দাবাদ!

দেখা যায় হরিশবাবু ফিরছেন, গলায় মালা। তিন-চারখানা গ্রামের মানুষ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে তাকে অভ্যর্থনা করে আসছে। এ যেন সেই জনতারই জয়ধ্বনি। সঙ্গে রয়েছে প্রদীপ, বরুণ-কেদার কর্মকার আরও অনেকে। আজ সারা এলাকার খেটে খাওয়া মানুষ জমায়েত হয়েছে এই বিজয় মিছিলে।

কেস দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু হরিশবাবুর ছাত্রই ওই বিচারক, আর প্রদীপও সহরের বেশ কিছু গন্যমান্য ব্যক্তিকে হাজির করেছিল আদালতে, বড় উকিলও দিয়েছিল।

পুলিশের তরফে কোন সাক্ষ প্রমানই ছিলনা।

বিচারক হরিশবাবুকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে দারোগার বিরুদ্ধেই জেলাপ্রশাসনের কাছে ব্যক্তিগত স্বর্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য কড়া মন্তব্য করেছেন।

বরুণ কেদারদাও সারা অঞ্চলের মানুষকে একত্রিত করেও সুসংবাদ দিতে তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে।

গতিলাল বানের আগে খড়কুটোর মত দৌড়ে আসে কমলবাবুর কাছে, কমলও ছাদ থেকে দেখেছে এই বিজয় মিছিল। তারা সদর্পে আজ গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

সুখদা ঠাকরুনও বের হয়ে আসে। বুড়িও খুশি হয়।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের বাড়িতে রামায়ন পাঠ হচ্ছিল। মহিলারা পাঠ বন্ধ করে বেরিয়ে আসে।

গ্রামের ছাত্ররাও খুশি। অরুণ, বিজয়রাও দেখে স্যারকে।

ছাত্ররাও প্রণাম করে। ওরাই জয়ধ্বনি দেয়।

—হরিশ স্যার জিন্দাবাদ।

সুখদা ঠাকরুন বলে হরিপ্রিয়াকে — কি দিদি, বলিনি ধম্মের জয় হবেকই। ওই কমলা বেনে দুটো পয়সা করে চোর সাজাবে ওই মহাশয় মানুষটাকে। ধম্মো নাই?

কমল দাস চুপ করে ওই শোভাযাত্রা দেখে।

গুণময় বলে—ব্যাটা দারোগা কেসটা সাজাতেই পারেনি। একটা রেপ কেস টেসে জড়িয়ে দিলেই হতো।

কমল চুপ করে শোনে। সে এবার ভাবছে অন্য কথা।

দেখছে সে কেসটাকে এক ফুঁয়ে কাটিয়ে দিয়েছে প্রদীপই। তাই এবার কমলাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে।

এমনি দিনে কাণ্ডটা বেধে যায়। খুবই সাধারণ ব্যাপার। পাড়ায়, গ্রামে এই নিয়েই জল অনেক দূর অবধি গড়ালো।

পূর্ণিমার তিথিতে গ্রামে নষ্টচন্দ্র পালন করে ছেলেরা। এই বিজয় মিছিলেই সেদিন বেশ খুশিতে ডগমগ হয়ে অরুণ বলে

—আজ নষ্টচন্দ্র। বুঝলি নষ্টচন্দ্রের রাতে চাঁদ দেখে কিছু চুরি না করলে হরিশ স্যারের মত মিথ্যা বদনাম পেতে হবে।

বিজয় বলে — ধ্যাৎ! চুরি করলেই বদনাম হয়, না করলে বদনাম কেন হবে?

অরুণ বলে— মিথ্যা বদনাম নিশ্চয়ই হবে তোর বিজে।

বিজয় কি ভাবছে। সে এখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। বৈকালে বাগানে যায়, মোহিনীও জল নেবার পথে ঘাটের ধারে বসে। সেদিন বাড়ি থেকে তালের বড়া করে এনেছিল বিজয়রে জন্য।

বিজয়ও কি যেন দুর্বার আকর্ষণে ওখানে যায়। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, ওরা ঘরে ফেরে। মধুর স্বপ্নের রেশ জাগে ওদের মনে।

দুপুরেও ছুটির দিনে মোহিনী আসে তাদের বাড়িতে। রামায়ণ, মহাভারত পড়ে ঠাকুমাদের আসরে, ফেরার সময় ওর দিকে চেয়ে থাকে। বিজয়ের সারা মনে কি সুর

বাজে।

বিজয়ের মনে হয় মোহিনী যদি হারিয়ে যায় তাই কোন ঠাকুর দেবতাকেই সে চটাতে চায় না। নষ্টচন্দ্র দেবতাকেও ও হাতে রাখা উচিত। তবু বলে বিজয়— চুরি করতে হবে?

কেষ্টা বলে—আরে কারোও সোনাদানা, টাকাকড়ি কেন চুরি করতে হবে।

—তবে?

অরুণ বলে—এর বাড়ির কলার কাঁদি, ওর চালকুমড়া, কার শশা, কার পুইশাক এইসব চুরি করে কাটা হবে।

কেসটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় দেখে বিজয় বলে।

—ঠিক আছে।

অরুণই দলনেতা। ওদের তখুনিই কোথায় কার কি নেওয়া হবে ঠিক হয়ে যায়। অরুণ বলে

—ঠিক রাত একটার সময় কালীমেলায় সবাই আসবি। তারপর অপারেশন শুরু হবে।

কেষ্টা বলে—এত রাতে কালীমেলায় কেন হরির তলাতেই আয়। রাত দুপুরে মা কালীর থানে না যাওয়াই ভালো। ডাকিনী-যোগিনীরা থাকতে পারে। হরি ঠাকুরের ওসব চ্যালা-চামুণ্ডা নাই।

সেইমত পরিকল্পনাও হয়।

নিত্য সুখদা ঠাকরুনের বাইরের রকে শুয়ে থাকে।

সেদিন নেত্যর একটু মদ্যপানের মাত্রা বেশিই হয়ে গেছে, ছোঁড়াটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে সেই ফাকে ছেলের দল এসে সুখদা ঠাকরুনে সাধের পুইমাচায় হানা দেয়।

সুখদা ঠাকরুনে বাগানের আম-পেয়ারা-কুল গাছে প্রায়ই হানা পড়ে।

কিন্তু সুখদা ঠাকরুনের বাক্যবাণের তীক্ষ্ণতায় ছেলের দল উধাও হয়ে যায়। কেমন যুৎ করতে পারে না।

ওদের সেই আক্রোশটা এবার ওই পুইমাচার উপরই পড়ে।

সুখদা ঠাকরুন খুব যত্ন করতো ওই পুইগাছের। মাটিতে সার গোবর দিত আর তার ফলে পুইমাচা লকলকে সবুজ পুইএ ভরে গেছে। ও প্রাণধরে কাউকে সেই পুই শাক দিতে চাইত না।

বুড়ি নিজেও খেতো না, শুধু দেখেই তার আনন্দ। যেন ওর মত নিঃস্ব শূন্য নয়, পুইমাচা ছিল তার কাছে পূর্ণতার প্রতীক, প্রাণের স্পন্দন। বুড়ির সেই পুইমাচা ওরা কেটে সাফ করে পুইশাকের বোঝা বুড়ির বাড়ির সামনে গাদা করে রেখে গেছে।

সকালে সুখদা ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর নাম করে মুখেচোখে জল দিয়ে বাইরে এসে

দেখে নিত্য বাউরি ষাটপাট দিয়ে তখনও মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। বুড়ি গজ গজ করে

—ছোড়ার যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম।

সদর দরজা নিজেই খুলেছে গোবরছড়া দেবার জন্য, খুলেই সামনে দেখে পুঁই শাকের বেশ কিছু অংশ সেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেখেই চমকে ওঠে।

তার মাচার পুই, ইয়া লকলকে পাতা। এবার বাড়িতে ঢুকে উঠানের ওদিকে মাচার দিকে চেয়ে দেখে সেই নধর সবুজের চিহ্নমাত্র নাই, মাচার বাখারিগুলোই বের হয়ে আছে। মুড়িয়ে কারা সব শাক কেটে ফেলেছে।

বুড়ি আর্তনাদ করে ওঠে—আমার এমন সব্বোনাশ কে করলে র‍্যা—ওরে মুখপোড়া নেতো—এই আটকুড়ির ব্যাটা, এর জন্য তোকে পাহারাদারের ধান দিই? পড়ে পড়ে ঘুমোবি নেশা করে আর চোরের দল এসে গেরস্থের সব্বোনাশ করে দেবে?

নিত্য ধড়মড় করে ওঠে। সুখদা ঠাকরুন ফুঁসছে।

—দ্যাখ কি করেছে চোরে, দ্যাখ! ওমা আমার একি সব্বোনাশ হল গা।

ওই চীৎকার আর বুকফাটা আর্তনাদে পাড়ার লোকজন জেগে ওঠে। অনেকেই আসে সুখদা ঠাকরুনের বাড়িতে।

এর মধ্যে অন্য গৃহস্থেরও নজর যায় তাদের শশামাচার দিকে, অনেক শশা উধাও, কার চালকুমড়ো সাফ, আধখানা করে কাটা অবস্থায় গড়াচ্ছে।

গ্রামের লোকরাও জানে নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে।

ওরাও বলে—এ ওই বাঁদরগুলোরই কীর্তি। নষ্টচাঁদা করে গেছে। এমন কুমড়োটাকে কেটে দিয়েছে!

তাদেরই দু-চারজন এসে দেখে সুখদা ঠাকরুনে পুইমাচার অবস্থা। সুখদা ঠাকরুন তখন বাইরের দাওয়ায় দোক্তাগালে পুরে জম্পেশ হয়ে বসে তালে তালে মাটিতে হাত চাপড়ে বেশ ছন্দে গালাগাল বর্ষণ করে চলেছে।

—কাঁচা বাঁশে যাবি রে, ধড়ফড়িয়ে যাবি, আমার পুই মাচায় যারা হাত দিয়েছিস তাদের হাতে গলিত কুষ্ঠ হবে।

আবার দমনিয়ে সুরু করে—ওলাওঠায় যাবি।

দত্ত গিন্নী বলে—দিদি, ছেলেরা নষ্টচাঁদার রাতে এমন এক-আধটু করে তাই বলে গালাগাল দিয়ে কি হবে?

এবার সুখদা ঠাকরুন ফুঁসে ওঠে

—গালাগাল দোব না? মায়ের কোল খালি করে যাবি, ধড়ফড়িয়ে মরবি। অবলা বিধবার সব্বোনাশ করা—হে যমরাজ তুমি নে যাও পাজীদের।

এই গালাগাল বর্ষণ চলতে থাকে অক্লান্তভাবে। তার ছন্দবদ্ধ গালাগালে সারা পাড়া মুখর হয়ে ওঠে।

অন্য বাড়ির কে বলে—থামো বুড়িমা, নিজের ছেলেপুলে নাই, অপরের ছেলেদের অকল্যাণ আর করো না।

যেন আগুনে ঘি পড়েছে। সুখদার হারানো স্বামী ছেলের শোক এবার উথলে ওঠে। সে তার স্বরে হাক পাড়ে।

—ওগো কোথায় গেলে গো, দেখে যাও পড়শীদের কি জ্বালা সইছি গো। ওরে শম্ভু তোর কাছেই পাঠাবো ওই যমভরা দের! এবার গালাগালি শাপান্ত শুরু হয় নতুন উদ্যমে।

গোবিন্দবাবুর স্ত্রীও জানে তার ছোট ছেলের দলেরই কীর্তি। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও শুনেছে ওই কণ্ঠস্বর! সে ত বুঝেছে বিজয় ছিল দলে।

তরুণের মা ছেলেকে বলে—শোন! ওই সব শাপমণ্যি।

বাসন্তী বলে—শকুনির শাপে গরু মরে না মা। ছেলেমানুষ একটা কাজ করেছে।

গিন্নীমা বলে—তুমি আর ওই বাঁদরকে আস্কারা দিও না মা। কত্তা আসুক দেখছি। খবরদার ওই বুড়ির বাড়ির সামনে দে যাবি না।

অনেক ছেলেকেই বাড়িতে এ নিয়ে কথা শুনতে হয়। কেষ্টর মা কেষ্টকে বেশ চড়-চাপড় কসেই বলে—ওমুখো হলে ঝেটিয়ে দূর করে দেবো বাঁদরকে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও শুনেছে ওই শাপমণ্যি। বিজয় পড়ছে, হরিপ্রিয়া বলে।

—কাল তুইও ছিলি দলে?

বিজয় চুপ করে থাকে। হরিপ্রিয়া জানে সুখদার স্বভাব। ওর জিবে যেন গরল আছে। এখনও গালি-গালাজপর্ব সমানে চলছে।

হরিপ্রিয়া বলে—আর ওই বাঁদরদের সঙ্গে মিশবি না। এসব কেন করতে গেছলি?

বিজয় তার কারণটা বলতে পারছেনা। চুপ করেই থাকে। বলে হরিপ্রিয়া —ওই পথে আর যবিনা।

সুখদা ঠাকরুন ভেবেছিল পাড়ার অনেকেই প্রতিবাদ করতে আসবে আর সে সমানে বাক্যবান বর্ষণ করে যাবে, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতেও আসেনি।

একা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু এখানে থামতে চায় না ঠাকরুন, এর একটা হেস্ত-নেস্ত সে করবেই। তাই বেলা হতে সুখদা ঠাকরুন এবার অঞ্চলপ্রধানের অফিসের দিকে হাঁটা দেয়।

আইনগতভাবেই এর প্রতিবিধান করবে সে।

গোবিন্দবাবু অঞ্চল অফিসের কাজ সেরে বের হতে যাবে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে তিড়িং-বিড়িং করে পা ফেলে শীর্ণদেহী সুখদা ঠাকরুনকে আসতে দেখে চাইল।

পিছনে নেত্য চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওর কোন ব্যাপারেই এসেছে।

তাই গোবিন্দবাবু শুধোন। —কি ব্যাপার কাকিমা?

সুখদা ঠাকরুন ফুঁসে ওঠে।

—ব্যাপার কি জানোনা? সারা পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক জানলো আর অঞ্চলপ্রধান হয়ে তুমি জানোনা? এই হাকিমী করো? ভোটের সময় কত কথা, এখন কি না ছেঁড়া কাঁথা। খবরই নাও না।

গোবিন্দবাবু ব্যাপারটা সঠিগ জানেনা। সকাল থেকে সে অফিসেই রয়েছে। তাই বলে

—কি হয়েছে?

—অবলা বিধবার সবই লুটপাট করে তছনছ করেছে রাতের অন্ধকারে।

—মানে? অবাক হন্ গোবিন্দবাবু। কি হয়েছে?

সুখদা ঠাকরুন বলে

—আমার লকলকে পুইমাচা কেটে সাফ করেছে ওই চোরের দল। যমভরারা যমের মুখে নিমপাতা গুঁজে দে এসেছে, যমও নেয় না ওদের। আমার পুইশাক

গোবিন্দবাবু এবার ব্যাপারটা বুঝে বলে।

—তাই বলো, কাল তোমার পুইশাক গেছে, আমার বাগানে দু-কাঁদি মর্তমান কলা কেটে সাফ করেছে। নষ্টচন্দ্রের রাতে এই সব করেছে। কি আর করা যাবে।

সুখদা বলে—তোমার অনেক আছে দু-কাঁদি কেটেছে আমার একটা পুইমাচা তাও নির্মুল করেছে এর প্রতিকার হবে না? সরকারি খাতায় কেস লেখো— আইন নাই দেশে? ধর ওদের—চালান করে দাও।

গোবিন্দবাবুর এমন কোন অধিকারই নাই। আর থাকলেও এসব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করাও যায় না। তাই বলেন,

—তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ঠিক আছে দেখছি কারা ছিল, তাদের ডেকে শাসন করছি। আপনি বাড়ি যান বেলা হয়েছে। সুখদা ঠাকরুন বুঝেছে এখানে সুবিচার সে পাপে না। সে আশাও নাই। তাই বলে

—থাক, আর উপদেশ দিয়ে কাজ নাই। তোমার মুরোদ বোঝা গেছে। পাড়ায় ঘরে ডাকাতের দল তৈরি হচ্ছে তুমি দেখো বসে বসে। চল নেত্য—

বুড়ি গট গট করে লাফ দিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। নেত্য বাউরীও মালকিনের পিছু পিছু চলেছে নীরবে।

বেলা দুপুর প্রায়, সকাল থেকে অবিরাম গালি-গালাজ দিয়েছে, বুড়ি জল স্পর্শও করেনি। নেত্য বাউরী বুড়িকে বাড়ির পথ না ধরে দইগাঁয়ের বাঁধের পথ ধরতে দেখে বলে,

—কুথাকে যাবা গো ঠাক্মা? বিয়েন বেলা থেকে মুখে জল দাওনি। খিদে-তেষ্টা

ও কি নাই তুমার? ভন্নি দুপুরে কুথাকে চল্লে হন্‌হনিয়ে?

সুখদা ঠাকরুন চলতে চলতেই শোনায়।

—চুপ করে চল। তোর জন্যেই সব্বোনাশ হলো এখন ও কথা? আয়—

নেত্য ওর পিছনে চলতে থাকে মুখ বুজে। জানে কথা বললে এবার কোপটা তার ঘাড়েই পড়বে।

হরিশবাবু সদরে গেছেন কিছু জরুরী কাজে। সেদিন স্কুলের চার্জে রয়েছে রামনিধি বাড়ুয্যে। হেডমাস্টারের ঘরে হেডমাস্টারের চেয়ার আলো করে বসে আছে সে।

স্কুল চলছে, হঠাৎ রামনিধি জানলা দিয়ে দেখে ওই গ্রামের পথ দিয়ে সুখদা ঠাকরুন হনহনিয়ে আসছে। পিছনে নেত্য বাউরী। বোধ হয় কোন কাজে চলেছে। না হয় ওদিকে জগন্নাথপুরে বাবা রতনেশ্বর শিবের পুজো দিতেই চলেছে। রামানিধি আবার কালকের বাসি খবরেব কাগজটাতে মন দেয।

হঠাৎ খ্যানখেনে গলার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে রামনিধি।

---এ্যাই যে নিধে, এ্যাঁ, চেয়ার আলো করে বসে বিদ্যে ফলানো হচ্ছে? রামনিধি মুখের সামনে থেকে সচকিত হয়ে কাগজটা সরিয়ে সামনে সুখদা ঠাকরুনকে দেখে বলে—কাকিমা, আপনি?

--চিনতে পেরেছিস তালে? সুখদা ঠাকরুন নিজেই বেঞ্চে বসে ফাটা পদযুগল বেঞ্চে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে।—ইস্কুলে কি শেকাস? এ্যাঁ---চুরিবিদ্যে! তা শেকাবিনা ক্যানে? তুর বাপ্ যদু ঠাকুরতো ঠাকুরের নৈবিদ্যি চুরি করতো। বাপকো বেটা তুইও যেমন তেমনি তোর ইস্কুলের ছাত্ররা। এক-একটা চোর, ডাকাত তৈরি করছিস।

বুড়ির ওই গালবাদ্য শুনে আর রামনিধি বাবুর কুষ্ঠি-ঠিকুজী শুনে অনেকেই এসে পড়ে।

রামনিধি বলে---কি হয়েছে কাকিমা?

সুখদা ঠাকরুন বলে ওঠে—তোর ইস্কুলের ছাত্ররা, ওই অরুণ, বিজে. কেষ্টা এগুলো কাল আমার সর্বনাশ করেছে। অবলা বিধবা আমি এর পিতিবিধান করতেই হবেক। ডাকাতের দল

রামনিধি অবাক হয়—সেকি, এরা তো ভালো ছেলে! এরা কোন খারাপ কাজ। না, এবার চমকে ওঠে সুখদা ঠাকরুন।

—বুঝেছি, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—আর চোরের সাক্ষী 'গাটকাটা'। তুইও তাই-রে নিধে!

রামনিধি শুধোয়—কি করেছে ওরা

বুড়ি বলে—তবে আর বলছি কি! আমার পুইমাচা—লকলকে পুইমাচা সাফ

করেছে কাল রাতে। ওরে আমার পুইশাকরে—আমার একি সব্বোনাশ হল রে! ধড়ফড়িয়ে যাবি—ওলাওঠায় যাবি।

ওই আর্তনাদ স্কুলের সর্বত্র পৌঁছে যায়।

অরুণরা দেখেছে বুড়িকে এখানে আসতে আর এখানে এসে যে পুইমাচার শোকে তাদের উদ্ধার করবে তা ভাবেনি।

অরুণ বলে—বুড়ি ইস্কুল অবধি ঠেলে এসেছে দেখছি। বিজয় নিরীহ ধাতের। সে বলে—তখনই বলেছিলাম ওর শাক কাটিস না। এখন বোঝ ঠ্যালা।

কেষ্ট বলে—বাড়িতে মা যা মেরেছে তবু বুড়ি পিছু ছাড়েনি। কি হয় দ্যাখ!

রামনিধি সব শুনে বলে—কাকিমা, নষ্টচন্দ্রের রাতে এমন এক-আধটু হয়। ছেলেরা করেছে ওদের বলে দোব।

—ব্যস! ওতেই শেষ! বুড়ি গর্জে ওঠে—বুঝেছি তুইও ওই লকলকে পুইশাকের ভাগ পেয়েছিস। তোর মাগও দ্যাখগে পা ছড়িয়ে বসে সুখদাঠাকরুণের বুকের হাড় পাঁজরা চুষছে। মুয়ে মারি ঝ্যাটা এমন মাষ্টারের। নিধে, চোরের সর্দার হয়েছিস। এখানে কিছু হবেনা। চল নেতা—

তড়াক করে উঠে বুড়ি ডিঙ্গি মোর মেরে বের হয়ে গেল। নেতা পিছুপিছু চলেছে।

বুড়ি ওদিকে বের হয়েই গদাই লোহারের ভ্যান রিক্সাটা দেখে বলে—এই গদা, চল বাস ইস্ট্যাণ্ডে।

তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। নেতা বলে—সেখানে কুথাকে যাবে গো?

বুড়ি তৎক্ষণে ভ্যান রিক্সায় উঠে আসন পিঁড়ি করে বসে বলে—মুখ বুজে থাকবি ছোঁড়া। তোর জন্যেই এত কিক্কৎ, নাক ডাকিয়ে না ঘুমুলে হতো এসব? উঃ বিচার চাই! চল সিধে থানায়!

নেতোর ওই থানা পুলিশকে খুবই ভয়। কদিন আগেই দেখেছে ইয়া জালার মত পেটওয়ালা দারোগাবাবু এসে হরিশবাবুকে ধরে নিয়ে গেল! ওরা সব পারে।

নেতা ঢোক গিলে বলে—আবার সেখানে কেনে গো ঠাকরুন?

বুড়ি বলে—ও তুই বুঝবিনা। এই গদা, হাঁ করে দেখছিস কি। চালা ভ্যান, তুফান চালা মুখপোড়া।

গদাইও বুঝেছে কড়া প্যাসেঞ্জারের পাল্লায় পড়েছে। সে এবার জোরে জোরে প্যাডেল করে মোরামঢালা বনের পথে ভ্যান নিয়ে চলেছে।

ভজহরিবাবু বড়জোড়া থানায কবছর হল পোস্টিং পেয়ে এসেছে। জেলার শেষ প্রান্তের থানা। শালবনের বাইরে বিশাল প্রান্তর নীচু হয়ে ধানক্ষেতের দিকে নেমে

গেছে। ওই চড়াইএর গা বয়ে দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে নির্জন প্রান্তরের বুক চিরে। একদিকে ঘন শালবন, অন্যদিকে চড়াইএর নীচে কিছু ধান জমি সেটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে দূরে দামোদরের দিকে।

নির্জন প্রান্তরের বুকে থানাটা। এই লাল কাকুরে মাটিতে গাছপালও তেমন হয় না। গ্রামের বাইরে নির্জন প্রান্তরে এই দুই রাস্তার ধারে থানাটা যেন ঝিমিয়ে থাকে।

সহরের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে দু-একখানা বাস। বর্ষায় এই দামোদর তখন দুর্গম হয়ে ওঠে। ওপারে অরণ্য সমাবৃত দুর্গাপুরও যেন মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায়।

এই থানায় এসে ভজহরিবাবু হাঁপিয়ে পড়েছে যেন বনবাসেই এসেছে সে। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিকে ঘোরে আর থানায় বসে ছোট শন্না দিয়ে মাথার পাকা চুল তোলে।

তবে এবার নদীর ওপারে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। দামোদরের বুকেও বড় বড় ক্রেন, বুলডোজার নামিয়ে বালি খোড়া হচ্ছে। বড় বড় ডাম্পারও এসেছে।

তবে সেসব কর্মকাণ্ড চলেছে নদীর পারে।

ছোটবাবু বলে—এবার এদিকেও কাজ শুরু হবে বর্ষার পরেই। ওই ব্যারেজ ওদিকে কারখানা। পথঘাট করতে পাথরের দরকার। এদিকে সাতজোড়া মালিয়াড়া, ফুলবনীর দিকে প্রচুর পাথর আছে। সেইসব পাথরই ক্রাশার বসিয়ে ভেঙ্গে নিয়ে যাবে ওদিকে।

ভজহরিবাবু বলে—বসে, নিশ্চিন্তে ছিলাম ওসব শুরু হয়ে এদিকে ঝামেলাই বাড়বে।

ছোটবাবু বলে—তাতো বাড়বেই। কিন্তু ওদিকে বিরাট শিল্পনগবী হলে এদিকেরও উন্নতি হবে। দেখবেন এইসব বাতিল এলাকাই তখন অন্যরূপ নেবে।

ভজহরি বলে—তোমার কি হে তাতে? এ্যাঁ। চাকরি করতে এসেছি, রয়েছি বনবাসে, রাজধানী হলে এখানের মানুষই আমলা ফয়লা হবে। আমরা তো থাকবো না। বদলি হয়ে যাবো। এদের উন্নতিতে আমাদের কি হবে? কচু!

তরুণ ছোটবাবু বলে—আমাদের কিছু না হোক, এই হতদরিদ্র অঞ্চলের মানুষদের তো আর্থিক উন্নতি হবে। এদিকে ছোট-খাটো শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে। তাদের তো ভালো হবে। দেশের মানুষের ভালো হবে।

বড়বাবু বলে—এক নম্বর আহাম্মুক হে। তাই দেশের কথা ভাবছো। আরে বাবা নিজের কথাই ভাবো।

বড়বাবু ফাইলপত্র নিয়ে আজ সদরে যাবে। ওদিকের বাস এসে থানায় ওকে তুলে নিয়ে যাবে। বড়বাবু তৈরি হচ্ছে। এমনসময় এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে শশব্যস্ত হয়ে ঢুকতে দেখে চাইল।

বুড়ি ভজহরিকে দেখে চিনেছে। ক'দিন আগেই সুখদা ঠাকরুন তাকে তাদের গ্রামে দেখেছে ওই হরিশমাষ্টারকে এ্যারেস্ট করে এনেছিল। তাই ওকে দেখে সুখদা ঠাকরুন বলে—তোমার কাছেই এসেছি বাবা।

দারোগাবাবু দেখছে সুখদা ঠাকরুনকে। শুধোয় সে।

—কেন?

সুখদা ঠাকরুন এদিকের বেঞ্চে ধূলিধূসর ফাটা পা তুলে বসে বলে—বিধবা অনাথা বাবা আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে।

কালরাতে মুখপোড়া ডাকাতের দল আমার সর্বস্ব শেষ করে গেছে। ওদের ধরো বাবা। এই অনাথা বিধবাকে বাঁচাও।

ওদিকে বাসের সময়ে হয়ে গেছে। বড়বাবু বলে—ছোটবাবুএর একটা জেনারেল ডাইরি করে কেসটার তদন্ত করুণ।

ছোটবাবু মোটা ডাইরির খাতা বের করে এবার শুধোয়।

—কি কি চুরি হয়েছে বলুন! টাকা-কড়ি-গহনাপত্র—

সুখদা ঠাকরুন বলে—ওসব কিছু নয় বাবা ওসব চুরি হয়নি!

—তবে? অবাক হয় ছোটবাবু—তবে কি চুরি হয়েছে? গরু বলদ---

—না! আমার পুইমাচা। লকলকে ডাটো পুরু পুই! মাচাকে মাচার পুই কেটে সাফ করেছে চোরের দল। সব কেটে ছিটিয়ে ফেলে রেখে গেছে। ওদের ধরো বাবা।

--এ্যাঁ! ছোটবাবু অবাক হয়। সশব্দে ডাইরিব খাতা বন্ধ করে বলে।

—-পুইশাক কেটেছে তাইতে পাঁচমাইল পথ উজিয়ে থানায় এসেছেন? ডাইরি করতে?

বড়বাবু বলে—যান, বাড়ি যান। এ নিয়ে থানা-পুলিশ হয়না।

এবার সুখদা বুড়ি গর্জে ওঠে

---হয়না? কমলবেনে এসে মিথ্যে নালিশ করে গেল নামী লোকের নামে সেদিন ওই জালা পেট নে দৌড়ে গেলে তাকে এ্যারেস্ট করতে খামোকাই, এখন গরীব বেওরা এসেছে চুরি কেশ লেখাতে বলে কিনা হয়না, ওরে আমার লকলকে পুইরে। ওই চোরগুলো দারোগার বাড়িতেও তোদের দিয়ে গেছেরে, সেই পুইডাঁটা গিলে আজ বেইমানী করছে। সব চোরের দল—

ছোটবাবু বলে—সামান্য এসব ব্যাপার, গাঁয়ে-ঘরেই মিটিয়ে নিন না।

দারোগার বাস আসচে। দারোগা বলে—এই বুড়িমা, যাও থানায় গোলমাল করোনা অকারণে। বাড়ি যাও।

—তাহলে বিচার হবেনা?

দারোগা ওর কথায় বলে—ফাজলামী করোনা তো। যাও। আমাকে সদরে ডি-

এম সাহেবের কাছে যেতে হবে।

বড়বাবু বাসের ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলো।

সুখদা ঠাকরুন কি ভেবে গর্জে ওঠে—নেত্য!

নেত্য ওদিকে এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। গিন্নীমার ডাকে সামনে আসে। ঠাকরুন বলে—পেটমোটা দারোগা ওদেরই দলে রে। ইখানেও বিচার হবেক নাই।

চল, ওই ড্যাম সাহেবের কাছেই যাবো সদরে। দেখি এই চোরের দলকে শায়েস্তা করতে পারি কিনা! ওঠ বাসে।

নেত্য ইতিউতি করে

—আবার সদরে যাবো?

– ওঠ তো। একদম কথা বলবিনা। চুপ করে থাকবি। বুড়িও নেত্যকে নিয়ে সদরগামী বাসেই উঠলো। এই অন্যায়ের সে শেষ অবধিই দেখবে।

গ্রামের লোকজনও অবাক হয়। দুপুর থেকে সুখদা ঠাকরুনের কোন পাত্তাই নেই। বাড়িটা শুনশুন। নেত্যর মা বুড়িই গরু-বাছুরগুলোকে খেতে দেয় আর গজগজ করে।

- কুথাকে গেল ঠাকরুন।

কুচিল খুড়ো বলে'—তাইতো গো, ভোর থেকে পাড়া মাথায় করে ছেলে গুলোর বাপ চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ঠাকরুন গেল কোথায়?

পদ মুখুয্যে বলে—বিবাগীই হয়ে যায়নি তো?

নেত্যর মা বলে—যা হয় হোক ঠাকরুন,আমার ছেলেটাকে সাথে নে গেল যে! ওমা। আমার কি হবেক গো?

গ্রামে অনেক জল্পনা-কল্পনাই হয়। গোবিন্দ ঘোষও এসেছে। দেখে বাড়িতে কেউ নাই। ঘোষ মশায়ই বলে নেত্যর মাকে।

—কিছু বলে যায়নি?

কুচিল বলে—ইস্কুলে গেছলো, ছেলেদের নামে নালিশ করতে তারপর সেখান থেকে কতি গেল জানিনা।

ছেলেরাও দূর থেকে দেখে স্তব্ধ বাড়িটাকে। গ্রামে যেন ভাবনার ছায়া নামে। তাদেরই একজন হাজার হোক, এভাবে সংসার ত্যাগের জন্য তারাই দায়ী।

ঘোষমশায় বলে—নেত্যর মা, রাতে তুই বাড়িতে থাক। যদি ফেরে খুড়িমা।

রাতেও ফেরেনা।

রোজ আরতির সময় হরি প্রিয়া ঠাকরুনের মন্দিরে যায় বুড়ি, আজ যায়না। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও ভাবনায় পড়ে, কে জানে মনের দুঃখে বুড়ি বিবাগীই না হয়ে যায়।

জীবনে বুড়ি পেয়েছে শুধু দুঃখ আর অপমান, বঞ্চনা, ভাগ্যও তার সঙ্গে নিষ্ঠুর

পরিহাস করেছে। সেই জ্বালা বুকে নিয়েই তবু বেঁচেছিল। সামান্য অন্যায় সহ্য করতে পারতো না বুড়ি।

মুখের ওপর কঠিন সত্যকথাই বলতো তাই এই সংসার তাকে মেনে নিতে পারেনি। সেই অবিমানেই বুড়ি সব ছেড়ে চলে গেল কোন অজানা পথে।

গোপগাঁয়ের জীবনপ্রবাহ নিজের ছন্দে বয়ে চলেছে। রাত্রির পর সকাল হয়। গরু-বাছুরগুলো নিয়ে রাখাল ছেলের দল বনের দিকে চলেছে। পঞ্চতীর্থ মশায় প্রাত্যহিক হোম করছেন আশ্রমে।

ওদিকে কমলদাস এখনও আশা নিয়ে ফ্যাক্টরীর শেড তুলছে। গুণময় তদারক করছে। অঞ্চল অফিসের কেরানি হরিপদ কৃষিঋণ, বলদঋণ—ওদিকে বাড়িতে দুধের ব্যবসার জন্য গরু কেনার ঋণেও কাগজপত্র গোছগাছ করছে।

এর মধ্যে লোকজনরাও নানা প্রয়োজনে অঞ্চল অফিসের সামনে হাজির হয়েছে। ওদিকেই ভ্রমরের দোকানে চায়ের খদ্দেররা ভিড় করেছে। গোবিন্দবাবুও হাজির হয়েছেন অফিসে।

গতিলাল ওদিকে কমলের চামচাগিরি করলেও অঞ্চল অফিসের আশপাশে ঘুর-ঘুর করে। কারণ নানা ফর্ম পূরণ করা, লোনের দরখাস্ত লেখা এসব কাজও করে সে।

হরিপদ কেরানির সঙ্গে আড়ালে ওদের আলাপ-আলোচনা হয়। বিভিন্ন পার্টির হয়ে ঋণের তদারকও করে গতিলাল, তার বেশ আমদানী হয়। হরিপদও কিঞ্চিৎ বখরা পায়।

তবে হরিপদকে এসব কাজ করতে হয় গোপনে, কারণ গোবিন্দবাবু সৎ মানুষ। তিনি ঠিকাদার নটবরবাবু, নন্দকিশোরদের কাজ দিলেও নিজে তদারক করেন, কৃষিলোন দিয়ে নিজে মাঠে যান ঠিকমত চাষী সেই টাকা কাজে লাগাচ্ছে কিনা দ্যাখেন। তিনি হরিপদের উপরও কড়া নজর রাখেন। বলেন। সব কাগজপত্র আমাকে দেখাবে হরি, ঠিকাদারদের বিলও।

ওভারসিয়ারদের উপরও নজর রাখেন যাতে অল্প কাজ করিয়ে পুরোটাকার বিল না পাশ করে তারা। ফলে এই মহলে গোবিন্দবাবু সুনাম মোটেই নাই।

সরকারি টাকার ষোলআনা সঠিক হিসাব রাখা যেন বোকামীর কাজই এইটাই ওরা ভাবে। তাই ওরা বলে

—গোবিন্দবাবু কি অঞ্চলপ্রধান হে। নিজেও খাবে না, কাউকে খেতেও দেবেনা।

নটবরবাবু, নন্দকিশোরদের মত ঠিকাদাররাও বলে আড়ালে,

—সামনের ভোটে ওকে হঠাতেই হবে। নাহলে আমাদের কারবার চৌপট করে দেবে ওই গোবিন্দবাবুই।

ইদানীং গুণময়ই এখন এই অঞ্চলে ওই নন্দকিশোর নটবরদের পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দবাবু ওসব দিকে নজর দেননা। দেশের মানুষের কাজই করেন নিঃস্বার্থভাবে তাই তার পিছনেও এলাকার অনেকেই আছেন। গোবিন্দবাবু বলেন

—দেশের মানুষ চাইলে থাকবো চেয়ারে, না চায় থাকবো না। তারা যাকে পছন্দ করবে তাদেরই বসাবে। সেখানে বলার কিছুই নাই।

গোবিন্দবাবু অফিসে কাগজপত্র দেখছেন, এমনসময় জিপের শব্দ শুনে চাইলেন। জানলা দিয়ে দূরে আমবাগান অবধি দেখা যায়। দেখেন পথে লাল ধুলো উড়িয়ে সরকারি একটা জিপ আসছে।

গ্রামের লোকও অসময়ে সরকারি গাড়ি আসতে দেখে চাইল। পেছনে ছেলের দলও দৌড়চ্ছে, যেন জিপের সঙ্গে তারা দৌড়ের পাল্লা দিয়ে তাদের শক্তি পরীক্ষা করতে চায়।

জিপটা এসে থামে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। তার থেকে নামছে ভজহরি দারোগা আর একজন অফিসার। আরও অবাক হয়, গোবিন্দবাবু ওই জিপ থেকে নামছে সুখদা ঠাকরুন পিছনে নেত্য। সুখদা ঠাকরুন নামছে বিজয়িনীর মত ভঙ্গীতে।

ওরা এসে ঢোকে গোবিন্দবাবুর অফিসে।

গোবিন্দবাবু শুধোন সুখদা ঠাকরুনকে

—কি ব্যাপার কাকিমা?

এবার দারোগাবাবুই বলেন তরুণ অফিসারকে দেখিয়ে।

—ইনি নতুন এস-পি সাহেব।

অবাক হয় গোবিন্দবাবু—বসুন স্যার। নমস্কার।

সুখদা ঠাকরুন ততক্ষণে ওদিকের বেঞ্চে বসে বলে

—দ্যাখো গোবিন্দ, বাপেরও বাপ আছে, বিচের হবে না? বলো বাবা—তোমাদের ড্যাম সাহেব কি বলেছে! বেশ দু-কথা শুনিয়ে দাও—যেন ফের অবলা বেওরাব ওপর অত্যাচার না করে। চল নেত্য—

বুড়ি বেশ কড়া স্বরেই কথাগুলো বলে একেবারে ঝান্সীর রাণীর মত রণং দেহি ভঙ্গীতে বের হয়ে গেল।

ততক্ষণে চা-টা এসেছে। এস-ডি-ও ভদ্রলোক বলেন।

—খুব ডেঞ্জারাস মহিলা মশাই। সটান ডি-এম সাহেবের বাংলোয় গিয়ে মেমসাহেবকেই ধরেছে। সামান্য পুইশাক নিয়ে একেবারে ডি-এম-সাহেবকে য়া শুনিয়েছে—

দারোগাবাবু বলে—ওকে ঘাঁটাবেন না গোবিন্দবাবু। থানাতে আমাকেও ডেটে সিধে

সদরে চলে গেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয়। সাহেব তো আমাকে ডাকিয়ে দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। বলেন-ট্যাক্টলেস আপনি, একজন মহিলাকে ট্যাকল করতে পারেন না।

এস-পিও বলেন,

—তাই ওকে পৌঁছে দিয়ে আপনাকে কথাটা জানাতে বললেন। উনাকে একটু সমঝে চলবেন, ছেলেদের বলে দেবেন আর যেন কিছু না করে।

দারোগাবাবু জানান,

—ফের কিছু করলে বাধ্য হয়ে আমাকে কড়া স্টেপ নিতে হবে।

গোবিন্দবাবু বলেন—ঠিক আছে, আমি ছেলেদের বলে দোব।

এস-ডি-ও সাহেব বলেন

—তাহলে চলি। উঃ কি তেজী মহিলা। চলুন দারোগাবাবু আপনাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে ফিরবো।

সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। অরুণ-বিজয়রাও দেখেছে খোদ জেলার কর্তার কাছেই তাদের নামে রিপোর্ট করে এসেছে সুখদা ঠাকরুন। থানার ওই জাঁদরেল দারোগার জারিজুরিও ওর দাবড়ানিতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অরুণ বলে—ওই হাকিমের বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কেউ যাবিনা।

বিজয় বলে —হাকিম! হাকিম কে রে?

অরুণ বলে—ওই সুখদা ঠাকরুন, এ তো হাকিমেরও বাড়া।

কেষ্টও বলে—তা সত্যি।

সেই থেকে সুখদা সুন্দরীর নামটাই বদলে গেল। হাকিম নামেই পরিচিত হয়ে উঠলো ছেলে, গাঁয়ের বৌ-ঝি মহলে।

সুখদা ঠাকরুন বিজয়িনীর মত গ্রামে ফিরেছে। এবার বীরদর্পে ঘোষণা করে।

—ফের এদিকে এলে জেলে পুরে দোব সব কটাকে! ড্যাম সাহেবকে বলে এসেছি।

পুকুরে স্নান করতে গেছে সুখদা ঠাকরুন। কাল থেকে ধকল গেছে। পুকুরে ছেলেরাও এই সময় স্নান করতে নামে দল বেঁধে, দুম দাম করে জলে লাফ দেয়। জল ছিটোয় আর সুখদা ঠাকরুনকে দেখে তাদের লাফানিও বাড়ে। জল ছিটোয় সুখদা ঠাকরুন আবার শুচি হবার জন্য স্নান করে আর গালাগাল দেয় ছেলেদের উদ্দেশ্যে।

আজ সুখদা ঠাকরুন অবাক হয়।

স্নানের ঘাটে ছেলের দল রয়েছে। অরুণও হাজির। কিন্তু সুখদা ঠাকরুন অবাক হয় ওকে দেখে আজ ছেলেদের লম্ফ-ঝম্ফ থেমে যায়। কেউ জলও ছিটোয় না।

নীরবে তারা উঠে গেল, সুখদা সুন্দরী ঘাটে বিনা বাধায় আজ স্নান করে। কেউ তাকে বিব্রত, বিরক্ত করেনা। ছেলের দল যেন তাকে চেনেই না।

সুখদাসুন্দরী একটু অবাক হয়। স্নান সেরে ফিরে আসে ঘরে।

দুপুরে খাওয়ার পর সে যায় হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের বাড়িতে। দুপুর সেখানে ঘোষগিন্নী, দত্তগিন্নী—আরও মহিলারা যায়, মোহিনী মহাভারত রামায়ণ পাঠ করে। ওদের পাঠ চলছে। হঠাৎ সুখদা সুন্দরীকে দেখে মহিলারা চাইল। সুখদাও অবাক হয়। ওদের চাহনিতে আগেকার সেই উষ্ণ অভ্যর্থনার চিহ্নও নাই। ওরা সকলে অন্যদিন অর্ভথনা করে ওকে—এসো কাকিমা। সরে বসার জায়গাও করে দেয়। আজ ওরা যেন দেখেও দেখেনা সুখদাকে। হরিপ্রিয়া শুকনো গলায় বলে।

–এসো।•

ওই পর্যন্তই। সুখদা বুঝেছে এখানে তার আসাটা আজ ওরা কেউ পছন্দ করে না। মোহিনীও একবার মুখ তুলে চাইল না। সে পড়েই চলেছে।

সুখদার মনে পড়ে পুকুরঘাটের কথা। যে ছেলের দল এতদিন বুড়ির সঙ্গে সহজভাবে মিশেছে, আবদার করেছে, উত্যক্ত করেছে আজ তারা বুড়িকে সযত্নে পরিহার করে গেছে। যেন চেনেনা তাকে।

ওদের সেই বর্জনটাকে তখন এত মনে বাজেনি সুখদার। এখানে এসে দেখেছে তাদের মা-কাকিমাদের।

আজ তারাও সুখদার সান্নিধ্য যেন এড়াতে চায়।

মনে হয় সুখদার ওই পুঁই মাচা নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে সে। নষ্টচন্দ্রের দিন গ্রামের অনেকেই অনেক ফল-ফসল বরবাদ করেছে ছেলেরা। তারা তো দু-চারবার চেঁচামেচি করে থেমে গেছে।

কিন্তু সুখদা পুইমাচার মামলাকে একেবারে সদরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হাজির করেছে। আর এস-ডি-ও সাহেব নিজে এসে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টকেই সাবধান করে গেছে।

সুখদা বুঝেছে গালাগাল আর শাসান দুই দিয়ে ওদের মনে আঘাতই দিয়েছে সে।

পাঠ চলছে। সুখদা বুড়ি উঠে পড়ে।

চলেছে সে। দত্তগিন্নীর কথাটা কানে আসে।

—ছেলেগুলোকে এত শাপশাপান্ত করেও খুশি হয়নি। জেলাসদরে গেছলো জেলে পোরার জন্যে। আবার এসেছে হরিকথা শুনতে?

ঘোষগিন্নী বলে,

—ছেলেদের অমঙ্গল যেন না হয় ঠাকুর। জিব দিয়ে এত গরল ছড়ালো বাছাদের জন্যই সেদিন। মেয়েতো নয় সাক্ষাৎ চামুণ্ডা।

কেষ্টোর মা বলে

—চামুণ্ডা নয়—ডাইনী। সব খেয়েছে তাই এত জ্বালা।

সুখদা ঠাকরুন খড় পালুইএর আড়াল থেকে ওদের কথাগুলো শোনে। হঠাৎ অনুভব করে তার চোখ দুটো জলে ভিজে ওঠে। একদিন স্বামী-ছেলে সবই ছিল, সাজানো সংসার ছিল তার। কোন অভিশাপে সব তার হারিয়ে গেল। তবে সেকি সত্যিই চামুণ্ডা—ডাইনী! তার নজরে বিষ, জিবে গরল!

কি দুঃসহ যন্ত্রণায় বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

এতদিন সকলের মধ্যে সেও ছিল একজন। তার চারিদিকে ছিল অনেকে। পাড়ার-গ্রামের সবাই।

আজ সকলেই যেন তাকে পরিত্যাগ করে গেছে। এত বড় সংসারে এত শোক-তাপ যন্ত্রণার মাঝে পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ নির্জন একটি মানুষ। সে আজ একা।

একাকীত্বের একটা আতঙ্ক যেন সুখদা ঠাকরুনের মনকে গ্রাস করে।

বাড়ি ফেরে। গাছে কুল, পেয়ারা এসেছে। ওদিকে শশা গাছে লম্বা লম্বা শশা ঝুলছে। নির্জন বাগানে অন্যসময় ছেলেদের কেউ কোন মতলবে ঘোরে, বুড়ি গলা তুলে চীৎকার করে।

—কোন মুখপোড়ারে!

ছেলেরাও এদিকে-ওদিকে উধাও হয়। তাদের হাসির শব্দ নির্জন বাগানকে মুখর করে তোলে। সুখদাও গলা তুলে হাক পাড়ে।

—আয় ঝেঁটিয়ে দূর করবো বাঁদরের দল।

আজ চারিদিক নিস্তব্ধ। কোন ছেলের দলকেও দেখা যায়না। নির্জন বাগানে একটা ঘুঘু উদাস সুরে ডেকে চলেছে। বুড়ি এই নির্জনতার মাঝে আজ যেন হারিয়ে গেছে। সব কেমন শূন্য মনে হয়।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন এতদিন নিজেই নিজের বিষয়-আশয় দেখেছেন সরকার অবশ্য সাহায্য করছে তাকে। এবার জমিদারী চলে যাবার নোটিশ এসেছে। বিজয় এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। ছেলেটা এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সরকারের কাছে কাগজপত্র দেখে।

এবার মধ্যস্বত্বের খাজনা, ধান আদায়, জমিদারীর মহালের রাজস্ব আদায়ের সব স্টেটমেন্ট, হিসাব পত্র নির্দিষ্ট ফরমে সরকারের ঘরে জমা দিতে হবে।

সব হিসাব ঠিক মত না দিলে পরে ক্ষতিপূরণ ও পাওয়া যাবেনা। বিজয়ও এসবের তেমন কিছু জানেনা তাই ঠাকরুন সরকার আর বিজয়কে নিয়ে সদরে উকিলবাবুর কাছে গেছে।

উকিলবাবু এদের এস্টেটের ব্যাপার সব জানে। বিজয়কেও নজরে পড়ে তার। উকিলবাবু বলে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে,

—এসব অনেক ঝামেলার ব্যাপার। নানা ফর্ম জমা দিতে হবে আর জানেন তো সরকারি ব্যাপার। বহু দরখাস্ত পড়ছে, এসব কেসের তদ্বির-তদারক না করলে পেনসনের টাকাও পাবেননা।

হরিপ্রিয়া ভাবনায় পড়ে। বলে

—এ টাকাই তো ভরসা উকিলবাবু, বছরের আমদানী তো চলে যাবে। হাতে থাকবে খাসচাষের জমি কিছু বাগান, পুকুর। তাতে ঠাট-বাট চলবে কি করে?

উকিলবাবু বলে—এই তো সমস্যা মা। জমিদারদের শেষ করার জন্যই সরকার এসব করেছে।

—তারা কি দোষ করলে?

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কথায় উকিলবাবু বলে,

—এখন ভোট চাই সরকারের। একজন জমিদারের চেয়ে দশজন চাষীর ভোট তার কাছে বেশি দামী। তাই এসব করতেই হবে। তবে ভাববেন না। আপনার ক্ষতিপূরণ যাতে ঠিকমত পান আমি দেখবো। চলুন—

এরপরই উকিলবাবুর বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায় ওদের। উকিলের স্ত্রী আর মেয়েও প্রণাম করে ঠাকরুনকে, উকিলবাবুর বাড়িতেই রাতে থাকাব ব্যবস্থা হয়েছে।

হরিপ্রিয়া দেখে মা-মেয়েকে। মেয়েটি সুন্দরীই স্কুলে পড়ছে, আর এর মধ্যে হরিপ্রিয়ার সেবাও করে নিষ্ঠার সঙ্গে।

উকিলবাবুই বলে—মা, যদি অভয় দেন তো একটা আর্জি করি।

—করো! এত কুণ্ঠা কেন? হরিপ্রিয়ার কথায় ভরসা পেয়ে উকিলবাবু বলে।

—আমার মেয়েকে দেখলেন, আপনার নাতির সঙ্গে মানাবে ভালো। বিজয়ও এবার কলেজে পড়ুক। এখান থেকেই পড়বে। যদি আমার মেয়েকে নাতবৌ করে নেন দয়া করে আমিও কৃতার্থ হবো। আপনাদের ঘরে মেয়ে দেবার সামর্থ আমার নেই। যদি দয়াকরে মেয়েটাকে চরণে ঠাঁই দেন!

হরিপ্রিয়া কথাটা ভাবছে,

বিজয়ের একজন গার্জেন দরকার। সহরে থেকে কলেজে পড়বে বিজয়, মানুষ হবে। চাইকি ওকালতিও পড়তে পারবে। উকিলবাবুও এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে পারবে আর ক্ষতিপূরণের টাকাও ঠিক ঠাক আসবে।

হরিপ্রিয়াব মনে হয় সে আর কদিন। তার কবে কি হয় বলা যায়না। তবু এখানে বিয়ে হলে বিজয়ের একজন জাঁদরেল অভিভাবক থাকবে, বিজয়ও বিপদে পড়বেনা।

হরিপ্রিয়া বলে—কথাটা একটু ভাবতে দেন উকিলবাবু, আমি পরে খবর দোব।

একদিন আপনিও আসুন আমাদের বাড়িতে, কোথায় মেয়েকে দিচ্ছেন সেটাও দেখে আসবেন, আর অন্যকথাও হবে।

উকিলবাবুও খুশি হয়। বলে

—তাই হবে মা। আপনি ভেবেচিন্তে জানালেই আমি চলে যাবো। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার মনের যে কি অবস্থা তা আর কি বলবো। এখন সবই আপনার দয়া।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন ভাবছে কথাটা। সেসবই ভেবে-চিন্তে করে আর কথাও কম বলে। কোন স্বীকৃতি সহজে দিতে চায় না।

তাই বলে—আমি গিয়ে জানাচ্ছি উকিলবাবু। তাহলে কাগজপত্র সব কাছারিতে জমা করে দিন।

উকিলবাবু অভয় দেয়।

—ওর জন্য ভাববেন না। সব আমি ঠিক-ঠাক জমা করে সময়মত তদ্বির-তদারকও করে যাবো মা।

বিজয় এসবের কিছুই জানেনা।

সে সেই সন্ধ্যায় সহরের সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখছে। আর সিনেমাটা যেন তার মত একটি ছেলেকে নিয়েই। ছেলেটি অবহেলিত, কিন্তু একটি মেয়েই তাকে নতুন করে গড়ে তোলে। ছেলেটির মনে নতুন আশার আলো আনে।

সেই গ্রামীণ পাখিডাকা পরিবেশ গাঁয়ের মোড়ল চায় ছেলেটির সর্বস্ব দখল করে পথে বের করে দিতে। মেয়েটিই রুখে দাঁড়ায়। মোড়লের অত্যাচার থেকে ছেলেটিকে রক্ষা করে। তন্ময় হয়ে ছবি দেখে বিজয় আর বার বার মোহিনীর কথাই মনে পড়ে।

মোহিনীই তাকে নতুন করে মানুষ হবার পথ দেখিয়েছে, রোজ বৈকালে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখেছে ওকে বিজয়।

মোহিনীও বলে—কি এত দেখছ?

এ যেন নতুন এক মোহিনী।

ডাগর কালো চোখে আকাশের তারার ঝিকিমিকি। ওর চুলের মিষ্টি সুবাস বিজয়কে যেন আনমনা করে তোলে। বাগানে ছায়া ঘনিয়ে আধার নামছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব মুখরিত আকাশ।

বিজয় মোহিনীকে কাছে টেনে নেয। অস্ফুট কণ্ঠে মৃদু আপত্তি করে মোহিনী। সে আপত্তি তত সোচ্চার নয়। তারও মন যেন এমনি নিবিড় স্পর্শই পেতে চায় বিজয়ের।

এ তার বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত।

বিজয় ওকে তার বাহুবন্ধনে বেঁধেছে, সারা দেহ-মনে এক অভূতপূর্ব চেতনার উন্মেষ, নারীদেহের নরম উষ্ণ স্পর্শে বিজয়ের সদ্যজাগর যৌবন আজ মাতাল হয়ে ওঠে।

ওর ঠোটের স্পর্শে সারা দেহে কি ভাঙ্গনের ঝড় ওঠে। দুটি মন আজ সেই আবেশ-বিবশতায় যেন হারিয়ে যায় কোন তমসায়।

মোহিনীই নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়—ছাড়ো।

বিজয়ের চোখের সেই মত্ততা যেন সলজ্জ অপরাধের ভাবনাই আনে।

চলে গেল মোহিনী।

বিজয় স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে একা ওই ছায়া অন্ধকার নামা বাগানে। মনে হয় একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছে।

বিজয়ের সারাটা দিন কি ভাবনায় কাটে। দুপুরে ঠাকমার আসরে রামায়ণ পাঠ শুরু হয়েছে। দূর থেকে দেখে বিজয় মোহিনী এসেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় সে।

বৈকালের আগে পাঠ শেষ হতে বিজয়ও খামারের ওদিকে যায়। মোহিনী ফিরছে সঙ্গে ঘোষকাকিমা, দত্তগিন্নী আরও অনেকে। সুখদা ঠাকরুন কয়েকদিন আর আসেনা দুপুরে ওই পাঠ শুনতে। বিজয় দেখে মোহিনী ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেল। যেন ওকে চেনেই না।

বিজয় চুপ করে দেখে মাত্র।

তবু বৈকালে বাগানে আসে বিজয়।

তার মনে একটা ভয় জাগে। যদি মোহিনী আর না আসে। কথাটা ভাবতেই পারে না সে। মোহিনীই তার মনে এসেছে বাঁচার আশ্বাস, নতুন জীবনের স্বপ্ন।

তাকে হারাতে পারবেনা সে। এই তার নিঃস্ব জীবনের একমাত্র অবলম্বন। একাই বসে আছে বিজয়। মোহিনীর দেখা নাই। বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দেখে গ্রামের বৌ-ঝিরা জল নিয়ে ফিরছে।

মোহিনীর দেখা নাই। তবে কি আর আসবেনা? হঠাৎ পিছনে ঝরাপাতায় কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল বিজয়।

অন্ধকারে আলোর ঝলকের মত মোহিনী আসছে।

—এত দেরি?

মোহিনী কাছে এসে বলে—তখন হ্যাংলার মত চেয়েছিলে কেন?

ওদের সামনে আমি তোমাকে তেমন চিনিনা, বুঝলে?

—মানে? বিজয় শুধোয়।

মোহিনী বলে—ওরা কেউ জানুক আমাদের দুজনের কথা—এটা চাই না।

বিজয় কি স্বপ্ন দেখে। সে বলে—একদিন তো জানাতেই হবে মোহিনী।

—কেন? মোহিনী অবাক হয়!

বিজয় বলে—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না মোহিনী। সারাজীবন তুমি আমার কাছেই থাকবে। তাই ঠাকমাকেও জানাতে হবে কথাটা।

মোহিনী চমকে ওঠে। সে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে ভালোই চেনে। মুখে মিষ্টি কথা অবশ্য বলে, মোহিনী জানে ওটা তার অভিনয় মাত্র।

বড়লোকের বড়মানুষী। মনে মনে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন অহংকারী, জেদী, কঠিন একটি মহিলা। তার ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকেই মাতা নুইয়ে চলে। তেকাল দাপটের সঙ্গে জমিদারী চালিয়েছে, এখন জমিদারী চলে গেলেও সেই দাপট ঠিকই রয়ে গেছে।

বংশমর্যাদার বড়াই তার আছে। মোহিনীর বাবা খুবই সাধারণ মানুষ গোসাইগঞ্জের কোন দোকানে খাতাপত্র সেরে কিছু পায় আর দু-দশ বিঘের জমির আয় যা হয় তাতে কোনমতে সংসার চলে। তাও মাঝে-মাঝে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের সরকারের কাছ থেকে দু-পাঁচ মাপ ধানও ধার নিতে হয়। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের খাতেক সে।

সেই গীরবের ঘরের মেয়েকে তার বংশের নাতবৌ করে আনতে নিশ্চয়ই রাজী হবেনা। তাই মোহিনী বলে ভীত কণ্ঠে বিজয়কে।

—এসব কাউকে বলোনা, তাহলে সর্বনাশ হবে। বিজয় চাইল মোহিনীর দিকে। মোহিনী বলে—যা দেখা হচ্ছে তাও হবে না। তুমি কি তাই চাও বিজুদা?

বিজয় তা নিশ্চয়ই চায়না। তাই চুপ করে ভাবছে কথাটা।

আজ সিনেমা দেখেছে।

এমনি সমস্যাতেই পড়ে তারা। আর সেদিন ছেলেটিই জানায় তাদের কথা। তারপরই সংঘাত শুরু হয়। মেয়েটির বাবা গ্রামের মাতব্বর, সে এবার অসহায় ছেলেটিকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়। ছেলেটির জীবনমরণ প্রশ্ন।

মেয়েটিই সব সমস্যার সমাধান করে। ওরা জীবনে সুখী হয়। বিজয় ছবি দেখে ভাবে মোহিনী সঙ্গে থাকলে সে খুশি হতো। না থাকুক ছবির গল্পটা সে মনে গেঁথে নিয়েছে। মোহিনীকে জানাবে সব কিছু।

গ্রামে ফেরে বিজয়। আর সেই দিন বৈকালেই বাগানের নির্জন ঘাটের ধারে বসে মোহিনীকে গল্পটা শোনায়।

মোহিনী বলে—ওসব সিনেমাতেই হয়।

হাসে বিজয়—না না, সত্যিই হয়।

মোহিনী কি ভাবছে। তার কুমারী মনও অজান্তে বিজয়কে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু জানে সে গরীবের ঘরের মেয়ে। নেহাৎ গোবিন্দবাবু কিছুটা উদার প্রকৃতির লোক তাই তার দিদি বাসন্তীকে ঘরের বৌ করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু হরিপ্রিয়া ঠাকরুন অন্য ধাতুতে গড়া।

সেখানে এধরনের বিবেচনা-দয়া এসবের প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তাই অজানা ভয়ে মেয়েটার বুক কাঁপে।

হরিশবাবু প্রদীপ বরুণ কেদারদের নিয়ে সদরে এসেছেন। প্রদীপেরও এখানে চেনা-জানা আছে সরকারি মহলে। সহরের দু-একজন নেতাও প্রদীপকে স্নেহ করেন।

হরিশবাবু জেলার অন্যতম নেতা ভূধরবাবুর সঙ্গে ওই অঞ্চলের কাংস্যশিল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তার সামনে ওই শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থার কথাও জানান।

ভূধরবাবু সব শুনে বলেন—এইভাবে ওদের ঠকানো হচ্ছে ঠিক জানতাম না। এত শ্রমিকের রুজি-রুটির ব্যাপার।

হরিশবাবু বলেন—শ্রমিকরা কো-অপারেটিভ করে কাজ করতে চায়। সরকার যদি ওদের কাঁচামাল যোগানের জন্য কিছু টাকা ধার দেয়, তাহলেই ওরা কাজ শুরু করতে পারে। ওই কমলবাবুদের মত মালিকের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

ভূধরবাবু এক দলের নীতিতে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের কথাই ভাবেন তাঁরা, প্রদীপ বলে।

—কিছু করতেই হবে ভূধরদা।

ভূধরবাবুও ভেবে-চিন্তে এদের সমর্থন করার কথাই ভাবেন। ওই অঞ্চলে এখনও জমিদারী চলে গেলেও জমিদার-জোতদারদেরই প্রতিষ্ঠা বজায় রয়েছে। কৃষিপ্রধান এলাকা।

তাই জমিদার-জোতদারদের কাছে চাষীরা কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য। ধান-টাকা ওদের কাছ থেকেই কর্জ নিতে হয়। এখন ওই বাসন শিল্পের কয়েকশো শ্রমিকের বিপদে ভূধরবাবুরা যদি সাহায্য করতে পারে তাহলে তাদের দলের প্রতি ওই মানুষগুলোর বিশ্বাস বাড়বে।

ভূধরবাবুর দল আরও খবর রাখে যে দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে তার হাওয়া দামোদরের এপারে ওই পিছিয়ে পড়ে থাকা অঞ্চলেও এসে লাগবে।

তারা জানেন যে দুর্গাপুরের নদীর উপর ব্যারেজের কাজ আগে শেষ করতে চায় সরকার, যাতে এই দিকের প্রচুর পাথরের স্তরকে ফাটিয়ে তারা রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, কারখানা গড়ার কাজে লাগাতে পারে। তাই এদিকের বনজঙ্গল ঘেরা আদিম রূপটাই বদলে যাবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলালে রুজির যোগাড় করা মানুষদের মানসিক পরিবর্তনও আসতে বাধ্য।

তাই ভূধরবাবুরা প্ল্যান করে ওই সব জায়গাতে নিজেদের শিবির গড়তে চায়। অবশ্য বাধা আসবেই।

কারণ সহরেই তাদের বিরুদ্ধ দলের প্রতিষ্ঠাই বেশি। এদিকে শিল্প, কারখানা বলতে তেমন কিছুই নাই। সারা জেলা কৃষিনির্ভর, অজন্মা আভাব এখানের চাষীদের নিত্যসঙ্গী। সামন্ততান্ত্রিক রীতিই প্রচলিত। তাই ওই বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠাই এখানে বেশি।

ওই দলের থেকে বাধা আসবেই। এযেন যাদের অনেক আছে আর যাদের কিছুই

নাই—এই দুই দলের মধ্যে বাঁচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ভূধরবাবু জানেন এদের মদত দিতেই হবে তার দলের প্রতিষ্ঠার জন্যই। তাই বলেন—প্রদীপ, সহরের পথে একদিন শ্রমিকদের এনে মিছিল করাও, আমিও সোনামুখী, খাতড়া অন্য অঞ্চলের কয়েকশ বাসনশিল্পীদের এনে সেই মিটিং-মিছিলে হাজির করবো। এসমস্যা তাদেরও। এখন একক লড়াই করে কোন কাজ হবে না। সংগঠন করে সুষ্ঠনীতিতে আন্দোলন করে দাবী আদায় করতে হবে। আর সহরে মিছিল আন্দোলন হলে কলকাতার কাগজেও ছবি খবর বের হবে। সরকারকে তাতে চাপ দেওয়া সহজ হবে।

কথাটা ভাবছে হরিশবাবুও, কেদারই বলে—তাই হবে। সকলকে খবর দিয়ে সেই দিনই আসবো। তাহলে দিন ঠিক করুন।

প্রদীপও ভেবেছে কথাটা। সে বলে,—একা আমরাই নাই, সারা জেলার শিল্পীদের চাপ পড়বে কুটিরশিল্প বিভাগের উপর। তাদের কিছু কাজ করাতেই হবে।

হরিশবাবু বলে,—এর মধ্যে শ্রমিকদের সইকরা দাবী সরকারকে দিই। কমলবাবুর ফ্যাক্টরীর লাইসেন্স, পারমিট এবার যেন না বের হয় এই আন্দোলনের সময়।

ভূধরবাবু বলেন—ওটা করার দরকার, ওটার চেষ্টা করছি। আর এর মধ্যে তিনিও দলের কিছু লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সমবেত মিটিং-মিছিল আর জেলাব্যাপী ওই দিন বাসনশিল্পের কাজ বন্ধ রাখার প্রোগ্রামও নেন।

এই নিয়ে প্যাম্পলেট হ্যান্ডবিল, পোস্টারও ছাপা হয়ে গেল।

আর অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে সেই পোষ্টার কয়েকটা কমলদাসের নির্মায়মান কারখানার গেটে, দেওয়ালে এমনকি কমলের গদিঘরেও দেওয়ালেও সেঁটে দেওয়া হলো।

ওদিকে সারা জেলা জুড়ে ওই পোস্টার-হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে পড়েছে। জেলার কাঁসা-শিল্পীরা এতদিন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে-যেখানে যা পয়সা পেয়েছে তার জন্যই ভোর থেকে রাত অবধি আগুনে পুড়ে তাতানো কাঁসা থেকে বাসনপত্র তৈরি করেছে।

অনেক শহর, গ্রামের অন্ত-প্রত্যন্ত ছোটবড় শালে তারা কালিঝুলি মেখে কাজ করে যা পেয়েছে তাই নিয়েছে। এবার সারা শ্রমিক সমাজ টের পেয়েছে এতদিন ধরে তাদের ঠকানো হয়েছে। নায্য পাওনা তাদের দেয়নি মালিক, মহাজনদের কেউই।

সমবেতভাবে তাদের ঠকিয়েছে। তাই এবার তারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দল বাঁধছে এবং প্রতিবাদের জন্য ওদের মনে আজ একটা নতুন চেতনা এসেছে, তারা একা নয়। সারা জেলার শ্রমিকরা তাই জোট বেঁধে আন্দোলনে নামছে। তার সূত্রপাত হয়েছে এই শালবন ঢাকা নির্জন অখ্যাত পল্লী অঞ্চলে।

সাড়া পড়ে গেছে জেলায়। কমলবাবুও ভাবেনি এখানের ওদের আন্দোলন দাবানলের মত এভাবে ছড়িয়ে পড়বে সারা জেলায়। তাই নিয়ে মিটিং হয় অনেক জায়গাতে। সেই মিটিং-এ মালিকরা যে পুলিশ লাগিয়ে আন্দোলনের নেতাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছিল সেই কথাটাও ঘোষণা করা হয়।

গুণময় সদরে এসেছে। এখানে ক্রমশ তার দু-চারজন চেনা-জানা ছেলেও বের হয়। কেউ বর্ধমানে কেউ আসানসোল অঞ্চলে তার সঙ্গে কাজ ও করেছে। তাদের দু-চারজন তাড়া খেয়ে এখানে এসে বসেছে। আর সহরের অন্যতম নেতা অবিনাশ সেনও এখন গুপী, ন্যাপার মত কর্মীদের দলে ঠাই দিয়েছে।

কারণ দরকার হলে ওরা টুকটাক অপারেশনও করতে পারে। এলাকাজ ভীতির সঞ্চার করতে পারে।

গুণময় সেদিন সকালে কমলবাবুর দেওয়ালেই ওইসব পোস্টার দেখে অবাক হয়।

কমলও দেখেছে ওগুলো। বলে সে—ও গুণময়, এ যে ছুঁচোর গু, পর্বতে তুললেক ব্যাটারা? এ্যাঁ—সারা জেলাতে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেক। সহরে মিটিং-মিছিল করলে তো ব্যাপারটা গড়াবে অনেক দূর হে।

গুণময়ও ভাবছে কথাটা। কমলবাবুর কাছে গতিলালই খবর আনে— ওই প্রদীপবাবু হরিশমাস্টার, কেদাবদেব নে গেছে বরুণবাবুও গেছল জেলার নেতাদের কাছে, তারপর এইসব কাণ্ড হয়েছে। কমলবাবুরও এ যেন সম্মানে লাগে। তাই কমলবাবু বলে- – গুণময় ওবা যদি এদিকের নেতাদের কাছে গেছে আমরাও অবিনাশবাবুদের কাছে যাবো। ওদের আন্দোলন যাতে ভেস্তে যায় সেই চেষ্টাই কবতে হবে।

গুণময় জানে এই পয়সাওয়ালা ''ক্কেলদের কি ভাবে চরাতে হয়। তাই বলে সে— তাতো করা যেতে পারে।

কমল বলে—যেতে পারে নয়। করতেই হবে। বুঝলে এবার দিন বদলাচ্ছে এখন। ওই নীচের তলার মানুষ যাদের কোন যোগ্যতাই নাই তারাই ঠেলে উঠতে চায়। এ হতে দিলে আমাদের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রথম থেকেই ওদের ঘা মারতে হবে। তার জন্য সুবিধা যে দল দেবে আমাদের তাদের কাছেই যাবো।

গুণময় বলে —কিছু খরচ-খর্চা আছে।

—তার জন্য ভেবোনা। কমলবাবু আজ বুঝেছে এবার তাকেও সাবধানে পা ফেলতে হবে।

গুণময় চলে গেল সহরে ওই আন্দোলনের জবাবে কিছু করা যায় কিনা তারই আলোচনা করতে অবিনাশ বাবুর কাছে। অবিনাশের বিশ্বস্ত কর্মীর দলই নিয়ে যায় গুণময়কে। বলে—আমার গুরু অবিনাশ দা। গোপগাঁয়ে থাকে।

অবিনাশবাবুও আন্দোলনের খবর জানেন। তাকে অন্যদলের গতি-প্রকৃতি তাদের কর্মপন্থার দিকেও নজর রাখতে হয়। তাই ভূধরবাবুরা যে এবার বিরাট শ্রমিক আন্দোলন গড়তে চলেছে তা জানে। আর সেটাও উদ্ভব হয়েছে গোপগাঁ, দৈপুর, গোসাইপুরের দিক থেকেই। সেই আন্দোলনের বিরোধী পক্ষদের একজনকে তাই কাছে পেয়ে অবিনাশবাবুও মনে মনে খুশি হয়। বলে—এসো এসো। তোমাদের ওদিকের খবর কি হে?

গুণময়ের জন্যে চাও আসে। অবিনাশবাবুদের দল এতদিন ধরে এই জেলাতে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ওই গোসাইপুর অঞ্চলেও তাদের দলেই প্রতিষ্ঠা রয়েছে এখনও।

কিন্তু হঠাৎ ওই অরণ্যভূমির অতল থেকে যেন নতুন একটা শ্রেণী সতেজ শালচারার মত মাটি ফুঁড়ে উঠে এবার আকাশে মাথা তুলতে চায়। শাখা-প্রশাখ' মেলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে চায়।

অবিনাশবাবু সহরের নামী ব্যবসায়ী। অনেক কিছুর হোলসেল ডিলার, সিমেন্ট, লোহালক্কড়ের বড় গুদাম, ওদিকে সহরের বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের ধানকল।

জমিদারী ছিল সেসব চলে যাবার আগে থেকেই জমিদারীর পয়সা ব্যবসাতে লাগিয়েছে। আর জেলার নেতা সে। মন্ত্রীদের অনেকেই তার হাতে। তাই পারমিট, লাইসেন্স এসব বের করতেও অসুবিধা হয় না।

সেইসব পারমিট, লাইসেন্স তার দলের বশংবদ লোকদের পাইয়ে দিয়েও প্রচুর রোজগার করে।

তেলামাথায় তেল যতই পড়ুক কেউ সন্দেহ করে না। তাই অবিনাশ বাবুর শ্রীবৃদ্ধি চলেছে বিনা বাধায়। ইদানীং ঠিকেদারির কাজও করছে। সরকার বড় বড় রাস্তা বাঁধের কাজেই টেণ্ডার দেয়। আর তার টেন্ডারই গৃহীত হয়।

সেই অবিনাশবাবু জানে দলকে ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। তার উপরই তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তাই সারা জেলায় তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতেই হবে।

ইদানীং হঠাৎ এই সীমান্তে এক নতুন আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখে তাই অবিনাশ বাবুরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছেন। আরও আশঙ্কা তাদের দুর্গাপুরে শিল্পায়ণ হলে তার ঢেউ এই শান্ত পরিবেশটাকে তছনছ করে দেবে তাই তারাও সাবধান হতে চায়।

গুণময়দের মুখে সব শুনে বলে অবিনাশবাবু।

—ওদের পিছনে তাহলে ভূধরবাবুই রয়েছে। সমবায় গড়তে চায় ওরা। গড়ুক মাল আমরা নিবনা।

গুণময় বলে—ওরা কলকাতার মহাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তাছাড়া সরকারও ওদের যদি সাহায্য করে তখন তো কিছু করা যাবেনা।

অবিনাশবাবুরা ওই অঞ্চলে কমলবাবুদের মত লোকদের স্বার্থ দেখতেই চায়। তাই বলে—দেখি চেষ্টা করে সরকার থেকে সমবায়টাকে যদি আটকানো যায়।

ওরা মিটিং-মিছিল করবে সহরে? গুণময় যেন এইটাই করতে দিতে চায় না। সে গ্রামেও তার মিছিলের উপর বোমাবৃষ্টি করেছিল। তাতেই কাজ হয়েছিল।

ন্যাপাও বলে—বলেন তাহলে দিই মাল টপকে ওই মিটিংএ।

গুণময়ও সেটা সমর্থন করতে অবিনাশবাবু বলেন—গ্রামে রাতের অন্ধকারে যা করেছো সেটা দিন-দুপুরে সহরে করা যাবে না। তাতে আমাদেরই বদনাম হবে। ওদের মিটিং করতে দাও। পথে পথে চীৎকার করে চলে যাবে। লোকেও ভুলে যাবে ওদের কথা। বাধা দিলে বরং ওরা গুরুত্ব পেয়ে যাবে। ওদের বাধা দিতে হবে অন্যভাবে।

কমলও অন্যপথের কথাই ভাবছে। তাকে আরও টাকা রোজগার করতে হবে। আর কদিন দুর্গাপুর অঞ্চলে সে ঘুরে এসেছে এর মধ্যে।

ছেলেবেলা থেকেই নদীপার হয়ে সে দুর্গাপুর গেছে। গরুর গাড়িতে করে ধান বিক্রি করে সেখান থেকে দোকানের মালপত্র নিয়ে ফিরেছে।

দুর্গাপুরের পরই শুরু হয়েছে গভীর অরণ্যভূমি।

মানুষজনও যেত না ওদিকে। বনশুয়োর চিতে নেকড়ে আর সাপের রাজত্ব। ওই গভীর বনের বুক চিরে চলে গেছে জি-টি রোড, প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল অরণ্যের বুক চিরে গেছে রাস্তাটা। ওই পথেই কিছু গাড়ি যাতায়াত করে আর এদিকে ট্রেন লাইনটা গেছে।

এখন গিয়ে দেখে বড় বড় বুলডোজার চলছে শাল জঙ্গলের মধ্যে। যন্ত্রের বিশাল চাপে শালগাছগুলো দাঁতন কাঠির মত ভেঙে পড়ছে। সেই মাটিকে এবার যন্ত্রদানবের ধারালো ফলা দিয়ে গভীর করে কেটে বনের গাছ-গাছালির শিকড় সমতে তুলে সমতল করা হচ্ছে।

যন্ত্রের মুখে কত গোখরো-চন্দ্রবোরা সাপ দলে দলে পিষে চলেছে। বনশুয়োরের দলও মারা পড়ছে আদিবাসী শ্রমিকদের তীর-বল্লমের খোঁচায়।

বিস্তীর্ণ বনভূমি সাফ সমতল হয়ে গেছে। আরও এগিয়ে চলেছে ওই যন্ত্রদানবের দল বিকট গর্জনে আরণ্যক স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেছে।

ওদিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ক্রেন কাজ করছে, বড় বড় ট্রাক থেকে মালপত্র নামছে। ইস্পাতের কাঠামো তৈরি হচ্ছে বিশাল জায়গা নিয়ে কোথাও বড় বড় ফার্নেস বসানোর কাজ চলছে। ক্রেনগুলো বড় বড় যন্ত্রপাতি নিয়ে শূন্যে উঠে সেই নির্মায়মান যন্ত্রের উপর বসাচ্ছে সেগুলো

চারিদিকে ওয়েলডিংএর কাজ চলছে। নীলাভ আগুনের শিখা বের হয়। বিকট

শব্দে ওদিকে পাইলিং হচ্ছে।

বনের চিহ্ন আর নেই। বিশাল এলাকা জুড়ে বড় বড় বাড়ি উঠছে, কর্মচারীদের থাকার কোজার্টার তৈরি হচ্ছে।

শুধু একটা ইস্পাত কারখানাই নয় আরও অনেক কারখানা তৈরি হতে চলছে সাফ করা বিস্তীর্ণ জঙ্গলের এদিকে ওদিকে। কোনটা হবে বয়লার কোম্পানী। একটা বিশাল কারখানা তৈরি হচ্ছে জি. টি. রোডের এদিকে। ওতে নাকি দুনিয়ার কোলিয়ারী এলাকাজ যত যন্ত্রপাতি লাগে তাই তৈরি হবে। তার এলাকাও বিরাট। পথের এদিকে গভীর জঙ্গল কেটে সেখানে গড়ে উঠছে স্টাফ কলোনী। তারও এদিকে তৈরি হচ্ছে বিশাল এলাকা নিয়ে সারের কারখানা। উঁচু উঁচু টাওয়ার কনভেয়ার লাইন আকাশ-ছোঁয়া চিমনি গড়ে উঠছে।

যেন একটা পরিবর্তনের ঝড়ই আসছে।

কমলবাবুও ঘুরে ঘুরে সব দেখে এবার মনস্থির করে সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতেই হবে।

এতকাল গ্রামের মধ্যে ব্যবসা করেছে, সেখানে ধান অন্য কিছু ফসল ছাড়া আর কিছুই হয়না। ওই থেকেই নানা কৌশল করে কমল দাস এখন ভালোই রোজগার করছে। তাকে এবার এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে আসতে হবে। এখানে আকাশে টাকা উড়বে এইসব কারখানা চালু হলে সেই টাকার কিছু তাকে ধরতেই হবে।

তাই কমল দাস ওখানেই দুর্গাপুর বাজারের বাইরে বনের ধারে আট-দশ বিঘে ডাঙ্গাই কেনার মনস্থ করে।

তখনও ওদিককার গরীব বাসিন্দারা ভাবেনি যে এর রূপ কি হবে। গরীব চাষীবাসী মানুষ তারা, ওই পতিত ডাঙ্গাতে ঘাসও হয় না। তখনও সন্ধ্যার পর ওই সব জায়গায় বনশূয়োর শিয়াল হুড়ারের দল হানা দেয়। গ্রামের লোক ওদিকে যায় না।

কমলবাবুকে ওই জায়গা কিনতে রাজী হতে দেখে তারাও খুশি হয়। হাজার টাকা বিঘে দরে কমল ওই ডাঙ্গাই কিনেছে বিঘে দশেক। কথাটা গোপনই রাখে।

কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে।

দেখে তখন দামোদরের মরা বালুচরে সন্ধ্যার পর অনেক আলো জ্বলছে। বড় বড় ক্রেনগুলো আকাশে দৈত্যের মত হাত বাড়িয়ে মালপত্র নামাচ্ছে। বড় বড় কনক্রিট মিশ্চারগুলোর গর্জন ওঠে। টাব টাব কনক্রিট ওই পাতালে ঢালছে ওরা—বালির পঞ্চাশ-ষাট ফিট নীচে থেকে ভিত গড়ছে ওর উপর তৈরি হচ্ছে ব্যারেজের বিরাট পিলারগুলো। মত্ত দামোদরের মত্ততাকে ওরা এবার থামিয়ে দেবে। ওর উপর রাস্তা হবে—গাড়ি চলবে।

এখনই আর দামোদরের বালি ভাঙ্গতে হয় না। নদীর বুকে পাথর মাটি মোরাম

ফেলে ঝকঝকে রাস্তা করেছে। নদীর বারোমাস প্রবাহিত জলধারার বুকে বড় বড় ব্যারেল ফেলে জল যাবার পথকরে উপরে রাস্তা বানিয়েছে।

কমল দাস ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়। ওই রাস্তা দিয়েই তাদের দিক থেকে ট্রাক-ট্রাক পাথরকুচি আনা হচ্ছে ওই ড্যামের জন্য, অনেক পাথরকুচি বোঝাই ট্রাক চলে যাচ্ছে ওই সব বিভিন্ন কারখানা, কোজাটার তৈরির সাইডে।

চারিদিকে সুরু হয়েছে এক নতুন কর্মকাণ্ড। বনঘেরা ঘুমনামা ভীত ত্রস্ত দুর্গাপুর নতুন সাজে সাজাতে চলেছে। চলেছে এত কর্মযজ্ঞ, যা এই পিছিয়ে পড়া অবহেলিত অঞ্চলকে শতাব্দীর নবপরিচয়ে পরিচিত করবে। আসবে এদিকে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনই। কমল জমি কিনেছে ওখানে।

এবার ভাবছে আর একটা কথা। আর সেটার সম্ভাবনা যে অনেক তাও জেনেছে কমল। তাকেও এবার এই তালে পা ফেলতে হবে।

প্রতাপনারায়ণও কথাটা ভাবছেন, তার জমিদারী চলে গেছে, তবু নামে-বেনামে এদিকে এখনও বেশ কিছু জঙ্গল, খাস ধানি জমি, বাগান, পতিত ডাঙ্গা রয়ে গেছে। তবু এখানের জমিদারীর বার্ষিক আয় বন্ধ হয়ে গেল।

এবার এখানের পাট তুলে তাদের পৈত্রিক আবাস দুর্গাপুরেই ফিরে গিয়ে কোন ব্যববসাপত্র করার কথা ভাবছেন। আবার হতাশও হন একমাত্র সন্তান প্রদীপ এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখায় না। সে এর মধ্যে আন্দোলন, সংগঠন, দেশসেবা নিয়ে মেতেছে। অথচ পায়ের তল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে সে কথা ভাবার অবকাশও তার নাই। প্রতাপবাবু ভাবছেন এখানের সবকিছু হস্তান্তর করে ফিরে যাবেন দুর্গাপুরই। এখানে জমিদারী চলে যাবার পর মুকুটহীন সাধারণ প্রজা হিসেবে এখানে এদের সঙ্গে বাস করতে তার নীল রক্তের ধারায় কোথায় বাধছে বারবার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কাছারিতে লোকজন আর বিশেষ আসেনা। আগে সন্ধ্যার পরও সেরেস্তার কাজকর্ম হতো, লোকজনের যাতায়াত থাকতো। মাঝে মাঝে পাঁচগাঁ থেকে নিধুমুখুয্যেও আসতো দলবল নিয়ে। ধ্রুপদ-ধামার শুরু হতো, পাখোয়াজের গুরু গুরু শব্দে ভরে উঠত চারিদিকে। কখনও কোন বাউলের দল জয়দেব-কেন্দুলি থেকে সোনামুখীর মনোহর দাস বাবার আখড়ায় যাবার পথে এখানের নাটমন্দিরেই রাত্রিবাস করতো। প্রতাপবাবু এস্টেট থেকে তাদের আহার্যের ব্যবস্থা করতেন সেই বাউলের দলও সন্ধ্যার পর থেকে নাচ-গানের আসর বসাতো। জায়গাটা লোকের ভিড়ে ভরে থাকতো।

এখন সেই সুর আর ওঠেনা। তারাও জেনেছে জমিদারীই নাই যখন, তখন আর ওসব পাটও থাকবেনা। তাই তারাও আসে না।

প্রতাপবাবু বসে ভাবছেন কথাগুলো।

একটা যুগ যেন শেষ হয়ে গেল। তাদের যুগ। এবার আসছে নতুন এক যুগ সেই যুগের সমাজে দেশে কর্তৃত্ব করবে নতুন এক শ্রেণী।

বৈশ্য না আর কোন শ্রেণী তাই নিয়ে এখন থেকেই গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। তারা সমাজকে কোন পথে নিয়ে যাবে কি রূপান্তর ঘটবে সমাজের, দেশের মানুষের মানসিকতায় তার আভাস এখনই যা পেয়েছেন প্রতাববাবু তাতে আশার কোন আলোই দেখেননি।

যেন এক অন্ধকার যুগই ঘনিয়ে আসবে। যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই বদলে যাবে।

—বড়বাবু আছেন নাকি!

কার কণ্ঠস্বর আর টর্চের আলো দেখে চাইল প্রতাপবাবু।

—কে?

হ্যারিকেনের আলোয় দেখে প্রতাপবাবু কমল দাসকে, বলেন তিনি,

—কমল এসো। বসো।

এগিয়ে এসে নমস্কার করে তার ওদিকে রাখা খালি চেয়ারেই বসলো কমল দাস সহজভাবেই। প্রতাপবাবু একটু অবাকই হয়। এর আগে থেকেই কমল সেরেস্তায় এসেছে তার কাছে জমিজায়গার ব্যাপার নিয়ে। তখন এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মেজেতে পাতা সতরঞ্চিতেই সঙ্কুচিত হয়ে বসতো। এখন ওকে আর প্রণামও করতে দেখেনা প্রতাপবাবু আর সহজেই এসে তার সামনে চেয়ারেও বসেছে।

ক'বছরেই টাকার মহিমা তাকেও বদলে দিয়েছে। এরাই আগামী দিনের মানুষ। তাদের মূল্যবোধ টাকার মাপকাঠিতেই। আজ জমিদার আর নন প্রতাপবাবু। সেই পদমর্যাদা হারিয়ে প্রতাপবাবুও তার কাছে আজ যেন মূল্যহীন হয়ে পড়েছেন।

প্রতাপবাবু চুপ করে দেখেন মাত্র।

কমলই বলে—ফুলপুরের জঙ্গলের ওখানের ডাঙ্গাটা পড়েই আছে আপনার, প্রায় শ-পাঁচেক বিঘে জঙ্গল আর দেড়শো বিঘের ডাঙ্গা। ওখানে চাষ বাড়ি করবো ভাবছি। যদি দয়া করে জমি আর জঙ্গলটা দেন।

কমলের কথায় চাইলেন প্রতাপবাবু।

—ওতে ব্রহ্মডাঙ্গা, আর জঙ্গলও তেমন নেই। ঝাঁটিবন। কমল দাস বলে

—ওই জমি কেটেই চাষ-আবাদের চেষ্টা করতে হবে। দেখছেন তো এদিকে ধানি জমি আর নাই। পেটও বাড়ছে। অন্নতো চাই। ওই ডাঙ্গা কেটেই জমি বের করতে হবে।

প্রতাপনারায়ণ ওই এলাকায় ঘুরেছেন। দেখেছেন ওখানে কিছুই হবেনা। এখানের

পাট তুলেই দিতে চান। তাই ওই বন্ধ্যা প্রান্তর ঝুপি বন কেনার কথায় খুশিই হন তিনি।

কমল বলে—মোট সাড়ে ছ'শ বিঘে পতিত ডাঙ্গা ধরুন ত্রিশ হাজার অবধি দিতে পারি।

প্রতাপনারায়ণও আশা করেননি ওই এলাকা কেউ কেনার জন্য আসবে। তবু তিনি বলেন।

—পঞ্চাশহাজার হলে ভাবতে পারি।

কমল এর মধ্যে ওই জায়গাটা গিয়ে দেখে এসেছে। গোপনে খুঁড়িয়েছে বনের মধ্যে, দেখেছে কঠিন কালো গ্রানাইট পাথরের স্তর রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। শেষপ্রান্তে বনের দিক থেকে বের হয়েছে একটা বনগড়ানি জলধারা গভীর গিরিখাদের মধ্য দিয়ে।

দুপাশে খাড়া পাহাড়। পাথরের স্তর এসে শেষ হয়েছে ওখানে। সে স্তরের প্রস্থও কম নয়। ওই বিশাল এলাকার পাথরের দামও কয়েক লক্ষ টাকা।

তবু কমল বলে —অনেক বেশি বলছেন বড়বাবু। আপনার খাতিরে চল্লিশ হাজার অবধি দিতেপারি। তারপর জমি করার খরচটাও ধরুন. এত পাবো কোথায়? প্রতাপবাবুরও টাকার দরকার।

তবু বলেন—পঞ্চাশের কমে হবে না কমল?

কমল শেষ অবধি ওতেই রাজী হয়ে বায়নাপত্র করিয়ে দশহাজার টাকা আগামও দেয়। আর উল্লেখ থাকে যে মাসখানেকের মধ্যেই ওই জমি বাকী টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবে।

কমল এবার অন্য স্বপ্ন দেখছে। তার এখানে ফ্যাক্টরী তৈরি করার কাজটা এখন তার সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে শ্রমিকদের কাছে ওই কামারপাড়ার মানুষদের কাছে বরুণদের কাছে হেরে যাওয়াটা তার কাছে চরম অপমানেরই।

এটা হাতে দেবে না কমলদাস। দরকার হয় সে এবার আন্দোলনের মূল নেতা হরিশবাবুকেই উচিত শিক্ষা দেবে। সে বুঝেছে হরিশবাবু, বরুণ আর প্রদীপবাবুই এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই হরিশবাবুকে আঘাত দেবার পর তারপর বরুণকেই দেখবে।

তারজন্য দরকার হয় বরুণের বাবা গোবিন্দ ঘোষকে ঘা দিতে ছাড়বেনা। ওকে অঞ্চলপ্রধানের পদ থেকেই সরাতে হবে। আর জানে প্রতাপবাবু এখানের জমিজায়গা বিক্রি হয়ে গেলে দুর্গাপুরেই চলে যাবে, বাবা না থাকলে প্রদীপের পায়ের তলা থেকেও মাটি সরে যাবে।

এক এক করে ওই তিনজনকেই খতম করে কমলদাস এখানেই তার রাজত্ব কায়েম করবে। আপাতত কাংস্য শিল্পীদের আটকাতেই হবে।

সহরের বুকে ওই জেলার বিভিন্ন কোন থেকে এসে হাজির হয়েছে বাসন শিল্পীর দল দু-দিন ধরে সারা জেলায় তারা কাজ বন্ধ করেছে। সহরের ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে ভূধরবাবুর দল মদত দেয়। মঞ্চে তিনি ভাষণ দিয়ে জনতার সামনে খবরের কাগজের লোকদের সামনে এই শিল্পের শ্রমিকদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। আরও জানান এর থেকে মুক্তির পথ এদের দিয়ে সমবায় করিয়ে মাল বিক্রির সাহায্য করা। সরকারই তা করতে পারে। এ তাদেরই কর্তব্য। নাহলে জনসাধারণ ভাববে সরকার মালিকদের স্বার্থই দেখছে। জনসাধারণ, শ্রমিকদের স্বার্থ নয়।

হাততালি পড়ে। হরিশবাবুও জানান তাদের অঞ্চলে মালিকের ষড়যন্ত্র, স্বৈরাচারিতার কথা।

এরপর শুরু হয় মিছিল করে ডি-এমের কাছে গণদরখাস্ত দিয়ে সারা শহর পরিক্রমা করা। সহরের মানুষও জানতে পারে শ্রমিকদের প্রতি কত বড় বঞ্চনা করা হচ্ছে। সরকারও নীরব রয়েছে। সেই খবরটা ফলাও করে পরদিনই ছবি সমেত কলকাতার নামী-দামী কাগজে ছাপা হয়। হরিশবাবুর কথা গুলোও ছেপেছে তারা।

সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

তাই সরকারের ক্ষুদ্র শিল্পদপ্তর সমবায় বিভাগও এবার হরিশবাবু বরুণ, কেদারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করতে বাধ্য হয়।

পরদিনই ডি-এম সাহেবও রয়েছেন মিটিংএ। এর মধ্যে কেদার ওই অঞ্চলের বহু শ্রমিকের সই, টিপছাপ দেওয়া দরখাস্তও জমা দিয়েছে।

কুটিরশিল্প আধিকারিক বলেন—এদের দাবী যুক্তিসঙ্গত। শ্রমিকদের সমবায় গড়তে সাহায্য করা হলে সবদিক থেকেই ভালো হবে।

ভূধরবাবুও রয়েছেন তিনিও চান সরকার এটা করলে তাদের দলেরই নাম হবে। তারাও ওদিকের ভোট কিছু টানতে পারবে। তাই বলেন— এসব তো করা দরকার।

বিরোধী দলনেতা অবিনাশবাবুও এর মধ্যে গুণময়ের কাছে কিছু টাকাও নিয়েছে দলের জন্য। অবশ্য সবটা জমা পড়েনি। তার থেকে কিছুটা গেছে অবিনাশবাবুর ফাণ্ডে।

সেও দেখেছে উভয় সঙ্কট।

এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে জেলার বহুসাধারণ মানুষ। এই সমবায়এর চেষ্টা বন্ধ করলে তারাও ক্ষেপে যাবে তার দলের বিরুদ্ধে। এদিকে গুণময় বলে

—একটা কিছু করুন অবিনাশদা, কি জবাব দেব কমলদাকে?

অবিনাশবাবু বলে—জলস্রোতকে আটকালে বাঁধ ভেঙ্গে যাবে গুণময়।

—তাহলে ওরা নাকের উপর সমবায় করবে?

গুণময়ের কথায় অবিনাশবাবু বলে—করতে দাও। আর তার মধ্যে তোমরা ঢুকে

পড়ো। তারপর শুরু হবে আসল খেলা। নিজেরাই মাল কড়ি সরিয়ে নাও তলে তলে, আর পরে চোর সাজাবে ওই নেতাদের। তখন সমূলে শেষ হবে ওরা। এখন বাধা দিলে উল্‌টো ফল হবে। যে রোগের যা ওষুধ তাই দিতে হবে, কথাটা কমলবাবুকে জানাবে।

গুণময় চুপ করে থাকে। মনে হয় তার সে যেন হেরেই গেছে। তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে অবিনাশবাবু ইংরেজদেরও যুদ্ধে পিছু হটতে হয়েছিল। যুদ্ধে পিছু হঠারও দরকার আছে। বিরোধী পক্ষকে কঠিন আঘাত দেবার জন্য মাঝে মাঝে পিছু হঠারও দরকার। ওদের সেই ভাবেই চরম আঘাত দিতে হবে।

গুণময়ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে বুঝেছে ব্যাপারটা।

তাদের অন্ধকারের রাজ্যেও এমন লড়াই প্রায়ই হয়। আর কখনও সে লড়াইএ পিছু হঠতেও হয়।

তাই আপাতত এই যুক্তিকে সেও মেনে নিতে চায়।

ন্যাপা বলে—গুরু, বলোতো ওই নেতাদের ফুটিয়ে দিই।

কমলবাবু ইদানীং খবরের কাগজও পড়ছে। আগে এসবের দরকার হতোনা। ধান চালের আড়ত, মাল চালান এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। শান্তিতে বসার সময় থাকতো না।

এখন কমলবাবু হবার পর থেকে সে খবরের কাগজ পড়ে। দুর্গাপুরে কি হচ্ছে সেসব খবরও থাকে। বাজারের দর ছাড়াও এখন সে দেশের হালচাল রাজনীতির কথাও পড়ে।

সেদিন কাগজে সহরের ওই মিছিলের ছবি, আর নেতাদের বক্তব্য শুনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়। বেশ বুঝেছে কমল ওই হরিশ বরুণ প্রদীপের দল তাকে এবার বিপদেই ফেলেছে। সারা দেশের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে দাবী জানাতে এবার সরকার ও তাদের সমবায়ের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গে লড়াইএ হারই হয়েছে তার।

এমনসময় গুণময়কে ফিরতে দেখে চাইল কমল।

বলে সে—কি হলো গুণময়, ওদের ঠেকাতে পারলেনা? ওরা সমবায়ই করলো?

এবার গুণময় অবিনাশবাবুর কথাটাই ওকে বিশদভাবে শোনায়। বলে—ওদের আরও কঠিন আঘাত দেবার জন্যই এই করতে হবে। আমরাও ওদের সঙ্গে হবো, আপাতত সূঁচ হয়েই ঢুকবে ওখানে তারপর ফাল হয়ে ওদের সমবায়কে তছনছ করে দোব। ওদেরই চোর সাজাবো। গোলমাল করলে লাভ হবে না।

কমল ব্যবসায়ী লোক। সেও বোঝে কথাটা।

গুণময়েরও ইদানীং একটা ভালো ব্যবসাই চলছে। সে কাপিল—তার বৌ বেশ

কিছু ছেলে-মেয়েকে যোগাড় করে ঢালাও চোলাই মদ তৈরি করে জেরিক্যান, ব্লাডারে ভরে এখন দুর্গাপুরে চালান করছে।

দুর্গাপুরে এখন বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। সেখানে বিভিন্ন সাইডে ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি গড়ে হাজার হাজার মজুর কাজ করছে। সন্ধ্যার পর তাদের মদ চাইই।

মায় নদীতে বালুচরে ব্যারেজের কয়েকশ লেবার রয়েছে। সেখানে মদ পড়তে পায় না। গুণময় এখন দারুণ ব্যবসা চালু করেছে। ওদিকে বাগানে ছোট বাঁধের ধারে তার দু-তিনটে ভাঁটি চলছে গুণময় নিজের জিপও করেছে।

সে স্বপ্ন দেখে আরও মাল কামাতে হবে। তাই এখন শুক্‌নো গোলমালে সেও জড়াতে চায় না।

কমলও স্বপ্ন দেখছে এবার সে ওই পাথরের কোজারী ক্রশিং প্ল্যাণ্ট বসিয়ে দুর্গাপুরে সাপ্লাই দেবে। হাজার নয় লাখ লাখ টাকারই স্বপ্ন দেখে সে, তাই গোলমাল করে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। তবে ঠাণ্ডামাথায় কঠিন আঘাত হানার কথাই ভাবছে সে। ওই হরিশবাবু বরুণদের দেখতে হবে এবার।

কালীকান্ত পঞ্চতীর্থ মহাশয় সেদিন আশ্রমে ভোরে উঠে বাগানে ঘুরছেন, গ্রামের শেষপ্রান্তে আশ্রমটা। গ্রামের কোলাহল সংসারের নানা ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই কালীকান্ত নিজে বিবাহ করেননি। তবু সৎ ভাই সুধাময় গুণময়কে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেখছেন প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকা যেমন স্বাভাবিক পণ্ডিতের পরিবারেই যেন তেমনি স্বাভাবিক নিয়মে পরের প্রজন্ম তমসাচ্ছন্ন হয়েই থাকে।

সুধাময় গুণময় দুজন চলেছে তার নিজের পথে।

সুধাময় সামান্য শিখেই এখন ব্যবসা শুরু করেছে। নানা ভড়ং করে চালু করতে চায় তার শান্তি-স্বয়াস্তনের ব্যবসা। নবগ্রহকে যেন হাতের মুঠোতেই বন্দী করে সব ভবিতব্যকে সে খণ্ডাবার চেষ্টা করে যজমানদের।

আর গুণময় কমলবাবুর সঙ্গে কি সব ব্যবসা করে সঠিক জানা নেই কালীকান্তর। কিন্তু তার হাবভাব সুবিধার ঠেকেনা। হতাশই হয়েছেন পঞ্চতীর্থ। তবু ভরসা হয় সুধাময়ের বড় ছেলে নিতুকে দেখে। সুধাময়ের দুই ছেলে নিতু আর বাদল।

বাদলএর মধ্যে দুবছর করে ক্লাসে গড়ান দেয় আর পাড়ায় মস্তানি করে বেড়ায়। তার তুলনায় নিতু অনেক শান্ত, মেধাবী।

ছেলেটা স্কুলে ফার্স্ট হয়। পঞ্চতীর্থ মশায়ের আশ্রমেই থাকে সে। বলে নিতু,

—বাড়িতে পড়াশোনা ঠিকমত হয়না জ্যাঠা। বাবা দিনরাত বলে এটা আ, যজ্ঞিডুমুরের ডাল, পঞ্চগব্য আন। এসব শেখ। ওই বিটকেলি আমার ভালো লাগেনা।

তার চেয়ে পড়াশোনাই ভালো। এখানেই থাকবো।

নিতু এখানের একটা ঘরে থাকে।

স্কুলের পড়ার পর পঞ্চতীর্থ তাকে কাব্য-ব্যাকরণ এসব পড়ান। স্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আদ্য-মধ্য পরীক্ষাতেও বসতে চায়। পঞ্চতীর্থ মশায় বলেন—নিতু, এসব শাস্ত্র, বেদ-উপনিষদই এই জাতির সম্পদ। দেশের সম্পদ। এরা এসবের মর্ম, মূল্য কিছুই বুঝলনা। পরমার্থ ছেড়ে অর্থের দিকেই দৌড়চ্ছে। ত্যাগের কথাও ভাবেনা। ভাবে ভোগের কথা। সেই ভোগের জন্য সব ন্যায়নীতিকেই বিসর্জন দিতে চায়। তুই কি করবি ভেবে দ্যাখ।

নিতু এত গভীরভাবে ভাবতেও পারেনা।

তবে দেখেছে সে বাড়ির পরিবেশ, ওই ভণ্ডামি, কাকার বড় বড় কথা ওসব বাদলই শোনে। নিতু ওসব ভালো লাগেনা।

সে বলে—এখানেই এইভাবেই বেশ আছি জ্যাঠা।

ভোরে উঠে নিতুও জ্যাঠার সঙ্গে হোম করে, মন্ত্র পড়ে।

ওই মন্ত্রধ্বনি ব্রাহ্মমুহূর্তে ফুলের সুবাসমাখা আশ্রমের আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত হয়।

—বিদ্যে-বেদান্তগীতে শ্রুতি পরিপটিতে

মোক্ষদে মুক্তি মার্গে

মার্গাতীত প্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে।।

নিতুদেবী প্রণাম করে পাঠ শুরু করে।

সেদিনও ভোরে উঠেছেন পঞ্চতীর্থ। ঘরের বাইরে আসতে নাকে এক তীব্র কদর্য পূতিগন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। আশ্রমের সুগন্ধকে ওই বিশ্রী গন্ধটা কলুষিত করেছে। পঞ্চতীর্থ গন্ধের তীব্রতায় বিব্রত হয়ে আশ্রমের বাইরে এসে ওই কদর্য গন্ধের উৎপত্তি স্থল খুঁজতে বের হন।

গ্রামের শেষপ্রান্ত। গাছগাছালি ঘেরা আশ্রম, তার ওদিকেই বন গড়ানি জলস্রোত বয়ে চলেছে, তার পরেই বন। এখনও এদিকে ঘন শালগাছ কিছু আছে। কমল দাসের কেনা ওই বন তাই গাছে কেউ হাত দেয় না, ফলে বনভূমি সবুজ হয়ে আছে আর ওখানে ছোট নদীর খাতটা কিছু গভীর। তাই কিছুটা এলাকা জুড়ে ওখানে গ্রীষ্মেও কোমর ভোর কাঁচধার জল থাকে।

ঐদিক থেকেই তীব্র-কদর্য গন্ধটা আসছে। পঞ্চতীর্থ মশায় বিরক্তি বোধ করেও এগিয়ে চলেন।

ইদানীং চোলাই মদের ব্যবসা বেশ জমিয়েছে গুণময়।

সে থানাকেও হাত করেছে। সুতরাং মাল নিরাপদেই পাচার করে। এই কাজে

কপিল এখন মাষ্টার, গুণময়ের প্রডাকশন ম্যানেজ্যার। কপিলের বউটা এতদিন এসব করতো। তখন অল্প মাল তৈরি হতো।

এখন প্রডাকশন বেড়েছে তাই কপিল তার শালী মাতনকেও এনেছে। আর বাউরী লোহার পাড়ার বেশ কিছু ছেলে-মেয়েকেও পাচারকারীর কাজে, মাল তৈরিতে সাহায্যকারীর কাজেও লাগিয়েছে। মাতনও রয়েছে।

গুণময়ের সেদিন বড় অর্ডার রয়েছে। বনের মধ্যেই এখন লম্বা চালা করে সেখানে উনুনে বড় বড় হাঁড়িতে পাইপ লাগিয়ে চোলাই করে মাল। মাতনও যেন গুণময়কে চিনেছে।

মেয়েটার দেহে অফুরাণ যৌবন। দুচোখে মদির লাস্য। রঙ্গীন সাড়ি পরে টাইট জামায় উদ্ধত যৌবনের প্রাচুর্যের সন্ধান দিয়ে সে গুণময়কেও যেন ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ করে।

গুণময় বলে—তোর নামটা সার্থক রে!

মাতন ডাগর চোখে লহর তুলে শুধোয়

—কেনে গ?

গুণময় ওর যৌবনমদির দেহটাকে কাছে টেনে নেয়। মেয়েটা উছল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলে—ইকি গো মালিক!

গুণময় বলে—তোকে দেখলেই সারামনে মাতন জাগে রে।

—ওমা গো! মেয়েটা যেন ধরা দেবার জন্যই জাল পেতে রেখেছে আর গুণময়ও সেই জালেই ধরা দেয়। মাতনও জানে মালিককে খুশি রাখতেই হবে। গুণময় মাঝে-মাঝে রাতে চলে আসে এখানে।

ওদিকে একটা নিজস্ব অস্থায়ী ঘরও তুলেছে গুণময়। বলে—অফিস ঘর। ওখানে রাত কাটাবার ব্যবস্থাও আছে।

গুণময় ওখানেই মাতনের সঙ্গে রাত্রিবাসও করে আর প্রডাকশন, চালান এসবও দেখে।

সেদিন রাতে রয়েছে গুণময় ওখানে, নেশাটা জোর হয়ে গেছল।

তাই আর বাড়ি যায়নি। এখানেই ছিল

মাতনের ঘুম ভেঙ্গেছে ভোরেই। তখনও ঘুমুচ্ছে গুণময়।

মাতন তার কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করছে। গুণময়ও চোখ মেলে।

—ইস্ ফরসা হয়ে গেছে। মালপত্র ঠিকমত পাচার হল কিনা কে জানে?

কপিল লোহার বাউরী পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে রাশ রাশ ব্লাডার, কয়েকটা জেরিক্যানে মাল পুরছে। তখন চোলাই এর পচা মালের বিশ্রী উদগ্র গন্ধ উঠছে।

হঠাৎ বনের মধ্য থেকে পঞ্চতীর্থ মশায়কে আসতে দেখে কপিল বিব্রত বোধ

করে। কালীকান্ত পঞ্চতীর্থ দেখছেন ওই ভাঁটিখানা, মদের প্রচুর ক্যান, ব্লাডার দেখে চমকে ওঠেন তিনি। বলেন,

—এইসব নোংরা বিষ তৈরির ব্যবসা করিস তোরা? ছিঃ ছিঃ কপিল চুপ করে থাকে।

এবার ওদিক থেকে মাতনের কাঁধে ভর দিয়ে নেশায় টলমল অবস্থায় গুণময় গাছের আড়াল থেকেই শুধোয়।

—কপিলে, কোন বাবা শুকদেব গোঁসাই এখানে এল র‍্যা। এ্যাঁ—শালা আবগারী পুলিশের খোচর লয় তে র‍্যা? কোথায় সেটা? আমার ভাঁটিতে কেন বাবা?

এগিয়ে এসে সামনে পঞ্চতীর্থ মশায়কে দেখে চমকে ওঠে গুণময় অস্ফুটকণ্ঠে বলে—যাঃ শালা—

পঞ্চতীর্থ তার ছোট ভাইকে এখানে এই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠেন। ওই অর্দ্ধনগ্ন মেয়েটার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে গুণময়।

নেশায় কণ্ঠস্বর জড়িত, পা টলছে! গুণময়ই এই ব্যবসার মালিক সেটাও বুঝেছেন। কালীকান্ত পঞ্চতীর্থ। আর ওই মেয়েটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সেটাও বুঝেছেন। তারই ভাই যে এত উন্নতি করেছে তা কল্পনাও করেননি পঞ্চতীর্থমশায়।

বলেন তিনি—গুণময় ভাবিনি এমনি অধঃপাতে নিয়ে যাবে নিজেকে পয়সার জন্য। এনিয়ে আর বলার কিছুই নাই। শুধু একটা অনুরোধই করবো-এই আশ্রমের পরিবেশকে তোমার ওই কদর্য ব্যাবসার বিষে বিষাক্ত করো না। এই জায়গা থেকে সরে গেলে ভালো করবে।

পঞ্চতীর্থ মশায় কথাটা বলে আর দাঁড়ান না, হন হন করে ফিরে চলে যান বনের পথ ধরে। কপিল—তার বৌও ওদিকে চুপ করে শুনছিল পঞ্চতীর্থের কথাগুলো। এবার গুণময় বলে

—এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে? ওঃ, বাবার জায়গা? ফটানি আছে, শাসাবে আমাকে?

কপিলই বলে—ভটচায, পণ্ডিতমশায়রে কথা মেনে চলোগো।

সাধু-সন্ন্যাসী লুক, ওদের কথা অমান্যি করতে পারবো নি।

কাপিলের বৌও বলে—তাই ভালো গে, বনের উদিকেই কাঁদরের চেক জল পাবো সিখানেই ভাঁটি করবো। ইখানে আর লয় গো।

গুণময় বলে—কেন পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে শাপ দিয়ে? দুপাতা সংস্কৃত পড়ে ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে। সাধু! ভারি আমার সাধু রে! দুটো পয়সা রোজগারের মুরোদ নাই, সাধুগিরি নে ধুয়ে জল খাবে?

তারপর জড়িয়ে ধরা মাতনকে বলে

—এ্যাই মাতন, সাত সকালে ওই সাধু এসে নেশাটা চটকে দে গেল, একটা ছোট খোকা দে, খোয়াড়ি ভাঙ্গতে হবে, অনেক কাজ আছে। ওই সাধুবাবার মত বসে থাকলে চলবে?

পঞ্চতীর্থ ফিরছেন বনের দিক থেকে। আজ নিজের চোখে তারই সৎভাই-এর যে পরিচয় দেখেছে তাতে শিউরে উঠেছে। ওই মদের ভাটিখানা খুলে সে বেআইনী চোলাই মদ বানায় আর ওখানে ওইসব মেয়ের সঙ্গে মেশে।

তার পিতৃদেবকে মৃত্যুকাল কথা দিয়েছিলেন কালীকান্ত পঞ্চতীর্থ ভাইদের মানুষ করবেন। আজ সেই কৃতকর্মের নমুনা দেখে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

আশ্রমে ফিরছেন পঞ্চতীর্থ।

ওদিকে চত্বরে বসে গীতা পাঠ করছে নিত্য। ব্রহ্মচারী, তেজদৃপ্ত বালক'

পাঠ করছে—নাস্তি বুদ্ধির যুক্তস্য ন চা যুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।

পঞ্চতীর্থ মশায় শুনছেন শ্লোকটা।

অযুক্ত অর্থাৎ যোগশূন্য যে মানুষ তার বুদ্ধি নাই। তার মঙ্গল-অমঙ্গল বোধও নাই। যার ভাবনা, বোধ নাই তার শান্তি নাই।

জীবনে যার শান্তিই নাই প্রকৃত সুখের স্পর্শও তার থাকেনা।

আজ গুণময়কে দেখে এই শাশ্বত বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। এক মোহ অবিদ্যা আর সর্বনাশের পথেই সে পা বাড়িয়েছে। তার জ্ঞানবুদ্ধি সব যেন তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

আজকের সমাজের মানুষের এই স্বাভাবিক প্রগতি। সব বিচার-বিবেচনা কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। স্থির হয়ে বসেন তিনি আশ্রমের ঘনসবুজ একটা হরিতকী গাছের নীচে। নিতু দেখছে ওকে। কি ভাবছেন পঞ্চতীর্থ মশায়। নিতু শুধোয়—জ্যাঠা, তোমার শরীর খারাপ করছে?

—না তো। তুই পড় নিতু!

নিতু পড়ছে—বিহায় কামান যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরাহঙ্কারঃ স শান্তিম বিগচ্ছতি।।

পঞ্চতীর্থের মনে হয় গীতাতেই তার জীবনের পথনির্দেশ রয়েছে। সর্ব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে আজ তিনি সংসারে নিরাসক্ত। তাকে মমতাশূন্য-অহংবোধ ত্যাগীই হতে হবে শান্তি পাবার জন্য। সেই নিরাসক্ত জীবনচর্যাকেই তিনি অবলম্বন করেছেন। তিনি নির্মম।

ওই গুণময়কে ফেরানো সম্ভব নয়। সে তার কর্মফলের জন্য একদিন দায়ী হবেই।

এনিয়ে তিনি ভেবেও কিছু করতে পারবেন না। তার কথা ভুলে যাবার চেষ্টাই করেন।

কিন্তু মানুষ তবু আসে তার কাছে প্রশ্ন-সমস্যা নিয়ে, সংসারী জীব তিনি, তাদের অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

সুখদা ঠাকরুনকে ঢুকতে দেখে চাইলেন। সুখদা ঠাকরুন এখন যেন নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত জীবনই যাপন করছে। গ্রামের ছেলেরা ভুলেও ওর বাগানের দিকে যায় না। দাওয়ায় বসে থাকে বুড়ি পথের দিকে চেয়ে কেউ তার দিকেও চায় না।

পুকুরঘাটে যায় স্নান করতে, সবাই সরে দাঁড়ায়। যেন সে অস্পৃশ্য কোন জীব। নীরবে স্নান সেরে ফেরে বুড়ি।

দুপুরে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের ওখানে পাঠ শুনতে যেতো পানদোক্তা আসতো। পাঠও হতো। মাঝে মাঝে গ্রামে এর তার ঘরের সরস আলোচনাও চলতো। হাসি-ঠাট্টাও হতো।

কিন্তু সেখানেও আর যাবার পথ নাই। হরিপ্রিয়া ঠাকরুন কেমন কথাও বলে না। অরুণের মা, কেষ্টার মারাও তাকে এড়িয়ে চলে।

বুড়ি যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। নিজের মনেই বকে। কত আর বকবে। আপনা থেকেই থেমে যায়। তাই মাঝে মাঝে এই আশ্রমে চলে আসে।

—এসো দিদি। কেমন আছো? পঞ্চতীর্থ শুধান ওকে।

সুখদা বলে—আর থাকা। আছি কোনমতো, মনে হয় এবার যেতে পারলেই বাঁচি ভাই।

পঞ্চতীর্থ দেখছে ওই মহিলাকে। একদিন ওর অনেক সমৃদ্ধি দেখেছিল। আজ সে নিঃস্ব-রিক্ত। জীবন একদিন দেয় অনেক, আবার একদিন সব নিয়ে নেয়। তখন সে রিক্ত! তবু বেঁচে থাকতে হয় মানু কে এই উত্থান-পতনের মাঝে ও প্রতীক্ষা করতে হয় জীবনের শেষ লগ্নের জন্য।

পঞ্চতীর্থ বলেন—কাল সমাপ্ত না হলে তো যাবার দিন আসে না। যতদিন বাঁচো সব কিছুকে মেনে নাও। মেনে নিতে হবে। সব কিছুতেই উদাসীন, নিরাসক্ত, অহঙ্কার-বোধশূন্য হয়েই জীবনের সবকিছুকে মেনে নিতে হবে দিদি।

সুখদা ঠাকরুন ভাবছে কথাটা। আজ মনে হয় সে সংসারে সব হারিয়েও এখনও তুচ্ছ বস্তুর মায়ায় ঘোরতর আসক্ত। কিছুই নাই, সব গেছে তবু অহঙ্কার তার বিন্দুমাত্র যায়নি। তাই সে সামান্য পুইশাকের জন্য জেলা সদর অবধি দৌড়ছে, শাপমণ্যি করছে। ভাবছে কথাটা সুখদা ঠাকরুন।

পঞ্চতীর্থ বলে—মানুষকে ভালোবাসাই সব চেয়ে বড় ধর্ম। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা। কদিনের জীবন, কর্ম তবু করতেই হবে আর কর্ম হিসাবেই তার ফলও লাভ হয়।

সুখদা ঠাকরুনের মনে হয় এই নির্বাসন, নির্জনতা তারই কর্মফল।

নিজের কথাই ভেবেছিল, ওই ছেলেদের কথা একবারও ভাবেনি। ভাবেনি তাদের মায়েদের মনেও কত আঘাত সে দিয়েছিল সেদিন ওই সব শাপশাপান্ত করে।

ক্রমশ নিজের ভুলটাই বুঝতে পারে সুখদা। কিন্তু ওদের কাছে জানাতে পারেনি প্রকৃত কথাটা। এই গালিগালাজই তার সব আবেগ প্রকাশের ভাষা মাত্র। আজ নিজের ভুলটাই বুঝেছে সুখদা এখানে এসে। আশ্রমের শান্ত পরিবেশ তার মনের জ্বালাকে প্রশমিত করে। বুড়ি ফিরছে গ্রামের দিকে।

দেখে একটা মটর গাড়ি লাল ধুলো উড়িয়ে বনের বুক চিরে বের হয়ে তাদের গ্রামের দিকেই আসছে। কে জানে হয়তো কমলবাবুর কারখানা অফিসের দিকেই আসছে। এখন তো অনেকেই আসে। বুড়ি নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

অতুল কামার এখনও তার হাঁড়ি-কলসীর ব্যবসা নিয়েই আছে। ওদিকে চন্দন এখন খুবই ব্যস্ত। তার টেরাইকোট্টার কাজের এখন খুবই চাহিদা। সে বেশকিছু দিন আসানসোল এলাগাতে কাজ করতে গেছল। গ্রামে তার মন টেকে না। টগবের বিয়ের আগেই সেসব জেনে চলে যায় গ্রাম থেকে। টগরও জানতে পারেনি যে চন্দন চলে গেছে।

সেদিন টগর ভোরে বাড়ি ফিরে আসার পরই হাবুর ওই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। লোকটা মারা গেল হঠাৎ কি নিদারুণ দুঃখ-হতাশা নিয়ে। টগর ভাবতই পারেনি এইভাবে বাবা চলে যাবে।

টগরের মাও বিপদে পড়ে। গরু-বাছুর দুধের ব্যবসা, জমিজমা যা আছে তার চাষবাস দেখাশোনা করে [illegible] চালাতো হাবু ঘোষ। একা কোনদিকে সামলাবে জানে না টগবের মা।

তবু টগরের মা আশা করেছিল তাদের জামাই ভূষণ নিশ্চয়ই এই বিপদের কথা শুনে আসবে। তখন জামাইকে ধরে করে টগরকে নিজের ঘরেই পাঠাবে।

টগরের মাও বলে টগরকে—জামাই এলে তুই আর অমত করিস না, যা করেছিস তা মোটেই ঠিক কাজ করিস নি লা! এ্যাঁ—বিয়ের পরই নতুন বৌ হয়ে পাইলে এলি! এখন ওর সঙ্গেই যাবি।

টগরের মনে সায় দেয় না। বারবার সেই দজ্জাল শাশুড়ী আর ননদের মুখ, তাদের কথাগুলো মনে পড়ে। তাই বলে টগর

—ওই শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করতে পারবো নাই। আর তেমনি তার মেয়েটা। একেবারে ডাকিনী-যোগিনীর দল। ওখানে যেতে বলোনা মা।

টগরের মা বলে—তবু মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়রে। তুইও যাবি। ভূষণ

এলে আমিই বলবো।

সে যেন তার মা-বোনকে বুঝিয়ে বলে।

টগর বলে—চোবা না মানে ধরম কাহিনী। কাদের বলবে? ওরা তাতে আরও বাড়বে মা। এদিকে তুমি একা—তোমাকে ফেলে যাবো না।

মা বলে—আমার জন্যে ভাবিস না রে। তুই ওখানেই যাবি।

কিন্তু ভূষণ আর আসেনি। টগরের কোন খবরও নেয়নি। অবশ্য ভূষণ নিতে চেয়েছিল। সেও শুনছিল তার শ্বশুর মারা গেছে। সেও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মা-বোনের ধমকে আর আসার সাহস হয়নি। মা-বোন দুজনেই সদর্পে ঘোষণা করেছিল—ওই ঘরপালানো নষ্টা মেয়েটার জন্য আত্মীয়-কুটম মহলে তাদের মুখ পুড়েছে। ওই মুখপুড়িকে আর তারা ঘরে আনবে না। আর এসব জেনেও ভূষণ যদি ওই মেয়েকে ঘরে আনে তাহলে তারা বিষ খেয়েই মরবে দুজনে।

ভূষণ মা-বোন দুজনের এতবড় শাসানিকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। অবশ্য মা নতুন বৌএর গহনাগুলো আগেই হাতিয়েছিল। নগদ টাকা তো হাবু ঘোষ আগেই দিয়েছে, মায় একটা দুধেল মোষ অবধি।

প্রাপ্য সবই পেয়েছে, মেয়েটা তো গেছে। মা বলে ভূষণকে—তোর আবার বিয়া দিব বাপ্! হামিরহাটিতে ভালো সচ্চরিত্তির সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পেয়েছি।

বোনও বলে—দেবে থোবেও ভালো। জমি—নগদ টাকা। ভূষণ চুপ করেই থাকে। তার মনে একটা অপরাধবোধই হয়। টগর একটা ভুল করেছে। তাই বলে এভাবে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে এটা ভাবতে তার খারাপই লাগে।

কিন্তু মা-বোনকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই চুপ করেই থাকে ভূষণ।

মা-বোন আবার ভূষণের জন্য নতুন বৌ এর সন্ধান করছে।

ভূষণ আর আসেনি।

টগরই বলে—বলিনি মা ওরা শুধু পাওনার লোভেই বিয়ে দিয়েছিল। সেসব পেয়ে গেছে আর টগরের কোন খোঁজও নেয়নি তারা।

মাও হতাশ হয়। সে আশা করেছিল ওরা কেউ আসবে। কিন্তু আসেনি কোন খোঁজ-খবর নিতে। মাই বলে—তুই একবার যা টগর। নাহয় চল আমিই তোর সঙ্গে গে বেয়ানকে বুঝিয়ে বলবো।

টগর বলে—না। আমিও যাবো না মা। তুমিও ওখানে যাবার নামও করবে না।

—তাহলে কি করে দিন চলবে তোর? কি হবে? মায়ের ভাবনা যায় না।

টগর বলে—যেভাবে হোক আমাদের দিন ঠিকই চলে যাবে মা। যাদের কেউ নাই তাদের ভগবান আছে।

সেই থেকে টগরই সংসারের ভার তুলে নেয়।

কদিন খুবই ব্যস্ত ছিল টগর বাড়ির কাজকর্ম নিয়ে। ভেবেছিল চন্দনের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু ওই কুমোরপাড়ার দিকে যাবার সময়ও পায়নি।

তবু সব কাজের ফাঁকে টগরের মনে পড়ে চন্দনের কথা। তাকে দেখে সে খুশিতে ঝলমল করে, উঠবে।

তবু অভিমানও হয় তার বাবা-মারা যাবার খবর শুনেও একবার আসেনি সে। দেখা হলে এর জন্য কথাও শোনাবে তাকে টগর।

কদিন পর একটু কাজের চাপ কমতে টগর বের হয়েছে কুমোরপাড়ার দিকে। ওদের পাড়াটা গ্রামের অন্যদিকে। এক প্রান্তেই বলা যেতে পারে। এদিকে এখনও বড়বড় অশ্বত্থ তেঁতুল গাছের জটলা রয়েছে।

ওদের শালটা বাড়ির ওদিকে। গাছগাছালি ঘেরা ঠাঁইটা।

এদিকে বুড়ো অতুল কামার চাক ঘুরিয়ে কলসী বানিয়ে রোদে রাখছে, সার সার কাঁচামাটির কলসী। পরে শালে পোড়ানো হবে।

টগর ওর পাশ দিয়ে চলে গেল পিছনে চন্দনের শাল ওর চালাঘরের দিকে। ওই বড় চালাটায় বসে চন্দন কাজ করে। কয়েকজন সহকারী ছেলেও আছে তার।

তার মধ্যে ছোট্ট ছেলে বাচ্চুও আছে।

ছেলেটা মাটি ছানে হাফপ্যান্ট পরে। নধর চেহারা। গোলগাল মুখ। সব সময়ই হাসি লেগে আছে।

টগর চালায় চন্দনকে দেখতে পায় না। এদিক ওদিকেও নাই। দু-একটা ছেলে ছাঁচে টেরাইকোট্টার ছক করে রোদে রাখছে। শুকিয়ে গেলে পোড় খাওয়াবে। চন্দন ওখানে নাই দেখে টগর শুধোয় বাচ্চুকে।

—তোর কারিগর কই রে? তাকে তো দেখছি না?

বাচ্চুই বলে ওঠে—তাকে দেখবা কি করে। সি তো ইখানে নাই।

টগর যেন হতাশই হয়। শুধোয়—কোথায় আছে? কখন গেল?

বাচ্চু খানিকটা মাথা চুলকে স্মৃতি শক্তিকে উজ্জীবিত করে বলে

—সি পেরায় মাসটেক হলো গ। গেছে আসানসোল। সিখানে এখন অনেক অর্ডার। দুটো লোক নে গেছে। ইখানেও আমরা দিন ভোর কাজ করে মাল পাঠাচ্ছি।

টগর শোনে কথাটা। শুধোয়—কবে ফিরবে রে?

ওদিক থেকে অন্য একজন কারিগর এসে বলে—এখনও দিন পনেরো দেরী হবেক।

টগর বের হয়ে আসে। বের হবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় টগর। ওপাশে চন্দনের থাকার ঘর। জানলাটা খোলা। টগরের নজর পড়ে একটা কাঠের শো কেসের দিকে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টগর। তারই সেই মাটির মূর্তিটা এখন পূর্ণরূপ পেয়েছে। তারই মুখ ডাগর চোখ—পানপাতার মুখ। মাটির ওই মূর্তিটা যেন টগরের দিকে চেয়ে হাসে।

বাইরের টগর আজ চন্দনের দৃষ্টিতে এক নতুন রূপ নিয়ে ওই কাঠের শো কেসে বন্দিনী হয়ে চেয়ে দেখছে মুক্ত এই টগরকে, টগরের মনে হয় সে আজও বেঁচে আছে চন্দনের মনে, তার দৃষ্টিতে। তার কিছুই হারায় নি। মনটা কি আনন্দে ভরে ওঠে।

টগর ক্রমশ ভাঙ্গা সংসারটাকে আবার কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে নিয়ে চালু রেখেছে। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন কেউ দিশাহারা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আবার কেউ সেই বিপদের সময় নিজের অন্তর মন থেকে সুপ্ত শক্তিকে আহরণ করে একত্রিত করে সেই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে।

জেদী টগরও সেই অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বল করেই সব দায়-দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। গরুগুলোর দেখাশোনা করার জন্য একটা রাখালছেলে আছে। হাবু ঘোষ নিজেই জমি ক'বিঘে চাষ করতো।

এবার টগর ওই জমিগুলো তারই খুড়তুতো দাদা সতু ঘোষকে চাষ করতে দিয়েছে।

সতুরও লাভ হয়েছে। ছেলেটা সৎ।

দু-দশ বিঘে জমি আছে। একজোড়া বলদ ছিল একটা গতবার চাষের পর মারা গেল। তবু চাষ হয়ে গেছল তাই রক্ষে।

এবার একটা বলদের দরকার। ভালো বলদ কিনতে নিদেন তিন হাজার টাকা লাগবে। কোথায় পাবে? শেষ অবধি সুখদা ঠাকরুনের একটা এড়ে গরু ছিল, ঠাকরুন এঁড়েটাকে বেচেনি পাইকেরদের কাছে। ওরা তাকে বলদ করে চড়া দামে বিক্রি করে দেবে।

তাই বামুনের ঘরে এঁড়েটা খেয়ে দেয়ে বেশ তাগড়া হয়েই উঠেছিল। কোন কাজেই লাগে না, বসে বসে খায় আর মস্তানি করে। তাই সতু ঘোষ একদিন বলদ কেনার জন্য ঋণের কথা বলতে গতিলাল বলে—বলদ ঋণ পাবে। আমি করিয়ে দোব ঘোষ মশায়কে বলে।

সতু বলে—ঋণ তো শোধ দিতে হবে।

গতিলাল গলার স্বর নামিয়ে গোপন কথাটা জানায়—তারজন্য ভাবতে হবেক নাই। ঋণ শোধ দিতে হবেক নাই। কিছু খর্চা করলেই ব্যস!

সতু বলে—ওসব তঞ্চকতা করতে পারবো না ঠাকুর। দেনা লিব নাই।

গতিলাল হাসে বলে—তোর দ্বারা কিছুই হবেক নাই।

একটা বলদের দরকার। সুখদা ঠাকরুনও ওই বামুনের এঁড়ে গরুকে নিয়ে বিপদে পড়েছে। দিনরাত অশান্তির সৃষ্টি করে। আজ এর ফসলে মুখ দেয়, কাল ওর

আখবাড়িতে হানা দিচ্ছে। পরশু কাকে তাড়া করেছিল অল্পের জন্য শিংএর গুঁতো থেকে বেঁচেছে। নানা অভিযোগ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঠাকরুন।

লোকে বলে—য্যামন ঝগড়ুটে ঠাকরুন তেমনি মারকুটে তার এঁড়ে গরু।

এহেন সময় সতু ঘোষকে বলদ খুঁজতে দেখে সুখদা ঠাকরুন বলে—তুই ওই এঁড়েটাকে নিয়ে যা, দিনকতক লাঙলে যুতে দে। ব্যাটা সিধে হয়ে লাঙল টানবে। তোরও কাজ হবে।

সতুও কথাটা ভেবেছে। দু-এক জায়গায় দেখেছে সে এঁড়ে গরুকে দিয়ে লাঙল টানাতে। আসুড়ের মতি বাউরীই একজোড়া এঁড়ে দিয়ে চাষ করায়। সতু শুধোয়। —কত টাকা দিতে হবে খুড়িমা?

সুখদা ঠাকরুন বলে—ঘরের গরুর বাচ্চা। এঁড়েটাকে বলদ করে দেবে বলে বেচিনি, টাকা নিয়ে এঁড়ে গরু বিচব না। তুই এমনিই নিয়ে যা। খেতে-টেতে ঠিকমত দিবি।

সতু বিনাপয়সায় চাষের যন্ত্র পেয়ে খুশিই হয়। এঁড়েটাকে এনে নিজের গোয়ালে বাঁধে। খেতে-টেতেও দেয় ঠিকমত।

এরপর ওকে লাঙলে বশ করার জন্য লাঙলে জোড়ে। ওদিকে বিস্তীর্ণ বন গড়ানি বালুচর। বালির আস্তরণে ঢাকা জমিতে সতু ঘোষ এঁড়েটাকে প্রথম লাঙল টানার কাজে রপ্ত করাতে নিয়ে গেছে।

এঁড়েটা এতদিন ধরে বসে খেয়েছে আর মস্তানি করেছে। লাঙল টানতে সে মোটেই রাজী নয়। তাই ধপ ধপ করেই বালিতে শুয়ে পড়ে। দুবার ঘা পাচন খেয়েও ওঠে না সহজে। যদিও বা ওঠে হাতখানেক লাঙল টেনে আবার ধরাশায়ী হয়।

দু-চারজন চাষীও দেখেছে ব্যাপারটা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর এঁড়ে গরু। তেজী শক্তিমান। তবু খাটবে না। মোহিত মুচি বলে সতুকে—ভাইপো, শালা এঁড়ে গরু মহা খচ্চর। ওর পেটের তলা জুড়ে গুড়ম বেগুনের কাঁটা জম্পেশ করে বেঁধে দে। পড়লেই প্যাটে কাঁটা বিঁধবেক, শালা এঁড়ে আর পড়বেক নাই।

সতু ঘোষও বিরক্ত হয়েছে। সেও জেদ করে এঁড়ের কাছে সে হার মানবে না। অনেকেই হাসে।

—ওকে পারবিনা সতু। মহা ত্যাঁদড় এঁড়ে।

সতুও তাই মাঠ থেকে শুকনো গুড়ম বেগুনের কাঁটা তুলে এনে এঁড়ের পেটে লেপটে বেঁধে দিয়ে লাঙল চালাতে থাকে, আবার পড়েছে এঁড়েটা।

কিন্তু পড়ামাত্রই তলপেটের নরম জায়গায় ওই কাঁটালতাগুলো বিঁধতে বাধ্য হয়ে ওঠে। আর সতুও এবার লাঙ্গলের মুঠ টিপে ধরে গর্জায়—চল ব্যাটা।

দুবার পাচনের বাড়ি খেয়ে এঁড়ে গরুটা বাধ্য হয়ে লাঙল টানতে থাকে। সতু উপস্থিত দর্শকদের বলে—লাঙল টানবে না? ওর ঘাড় টানবে। সতুও খুশি হয়।

এঁড়েটার দম আছে। এবার পথে এসেছে। লাঙল ঠিক-ঠাকই টানবে।

দুপুরের আগে অবধি লাঙল টানিয়ে এনেছে এঁড়েটাকে। সতু এবার ওদের খেতে দিয়ে নিজে স্নান-খাওয়া করেছে।

তার ভাবনাটা দূর হয়। এঁড়ে গরু দিয়েই চাষ তুলবে এবার। বলদ কিনতে হবেনা আর।

বৈকালে সতু খামারে খড়গুলো গুছিয়ে রাখছে, হঠাৎ ফোঁস শব্দে চাইল। দেখে সেই এঁড়ে গরুটা তাকে দেখে এবার মারমুখী হয়ে একটানে গোঁজ উপড়ে ফেলে তার দিকে ধেয়ে আসছে।

চোখ দুটো লাল, তার ওবেলার অপমানটা সে ভোলেনি। খায়ও নি এঁড়েটা। এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার সুযোগ পেতেই গোঁজ উপড়ে সিধে এসে সতু ঘোষকে দুই শিং-এর মধ্যে পুরে আসমানে তুলে এবার ঝাঁকাতে থাকে।

সতুও শূন্যপথে শিং-এর ফাঁকে আটকে আর্তনাদ করে—ওরে বাপরে। মেরে ফেললো রে।

সতুর মা—অনেকেই আর্তনাদ শুনে বের হয়ে আসে। তারাও চীৎকার করছে।

এঁড়ে গরুটা বার দুই ঝটকা মেরে এবার সতুকে নিক্ষেপ করে, সবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সতু ঘোষ বরাতজোরে খামারের পাশে পানাবোঝাই ডোবাতেই পড়ে সশব্দে আর ডোবার ঘন পানার ভিড়ে তলিয়ে যায়। সতুর মা চীৎকার করে।

—ওগো, কে কোথায় আসো এসো গো—সতুকে মেরে ফেলালেক গো।

এঁড়েটা ডোবার ধারে শিং উচিয়ে তখনও প্রতিপক্ষকে খুঁজছে। সতুও দেখছে পানার ফাঁক দিয়ে। পাড়ে উঠলে আবার গুঁতোবে তাকে।

পাড়ার লোকজন এসে লাঠি-বাঁশ দিয়ে পিটতে এঁড়েটা দু চার ঘা খেয়ে ধীর মন্থর গতিতে চলে আসা বামুন পাড়ার ঠাকরুনের গোয়ালের দিকে।

সুখদার মাহিন্দার নেত্যও জানে এঁড়ের ইতিহাস। ইতিপূর্বে ও দু-জায়গায় তাকে দান করেছিল সুখদা সুন্দরী, এঁড়েটা প্রতিস্থানেই যোগ্য প্রতিদান দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হয় না।

সতু ঘোষকে তুলে এনে ওর মা তখন চুনে-হলুদে লাগাচ্ছে। গজগজ করে—আর এঁড়েতে দরকার নাই রে। শ্যাষ করে দিয়েছিল ওই হারামজাদা। কার এঁড়ে দেখতে হবে তো। ওর এঁড়ে ফিরিয়ে নে যাক।

সতুর মা এসেছে সুখদা ঠাকরুণের কাছে। বলে—আর এঁড়েতে দরকার নাই ঠাকরুন, আমার ছেলেকে শ্যাষ করে দিতো। নে যাও তোমার এঁড়ে।

নেত্য বলে—আনতে হবে না গো। শ্যালা লিজে থেকে এসেই হাজির হয়েছে গোয়ালে।

সতু আবার ভাবনায় পড়ে বলদের জন্য।

এমনি দিনে টগরই বলে—সতুদা, বলদের জন্য ভেবনা। আমাদের বলদ দুটো নিয়েই চাষ করবে, আমাদের জমিও ভাগে করো। পরে ধান উঠলে বলদের দাম না হয় দিয়ো। তোমারও চাষ হোক—আমাদেরও চাষটা করো সেইসঙ্গে।

সতুর পক্ষে এটা লাভজনকই। জমিও বেশি চাষ করতে পারবে। হাবুকাকারও উপকার হবে। লোকটা তার জন্য তো অনেক করেছিল। আজ তার পরিবারের জন্য কিছু করতে পারলে সতুও খুশি হবে। তাই সতু বলে

---খুড়িমাকে বলেছিস তো কথাটা? নাহলে সে ভাববে ঠকিয়েছি।

টগর বলে---হ্যা গো। বলেছি। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সতু বলে—তাহলে তোদের চাষও করবো।

টগর একটা সমস্যার সৃষ্ঠ সমাধান করে এবার নিজেই দুধের ব্যবসার দিকটা দেখতে থাকে। তাদের তিন-চারটে গরু-মোষের দুধ হয়। আগে গাঁয়ে দুধের চাহিদা তেমন ছিল না। স্থানীয় লোকদের অনেকেরই ঘরে নিজের গরু আছে। দুধ হয়।

আশপাশের গ্রামে কিছু দুধ বিক্রি হতো।

এখন দেখেছে টগর দুর্গাপুরের কাজ শুরু হবার পর এদিকেও পথঘাট হচ্ছে।

অনেক পাথরের কোয়ারী, ক্রাশিং মেশিন বসছে। ওদিকে বড়জোড়ার ডাঙ্গাতেও ক্যাম্প করে নানা কাজ শুরু হয়েছে। দোকান-পশারও হয়েছে।

তাদের অনেকে সকালে সাইকেল নিয়ে আসছে গ্রামের দুধ বড় ক্যানে কিনে নিয়ে যাচ্ছে নগদ দামে। ফলে টগর এখন দুধের ব্যবসাতেও পয়সার মুখ দেখছে যেটা হাবু ঘোষ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সতু ঘোষই খবর আনে বড়জোড়ার বি-ডি-ও অফিস থেকে জারসী গরুও দিবার ব্যবস্থা হয়েছে। দারুণ গাই। একটানে দশ সের দুধ দেয়।

টগর বলে---তাহলে চল সতুদা। দেখেই আসি সেই গরু।

সতু বলে---সি অনেক দামী গাই রে।

টগর বলে—একটানে দশসের দুধ দেবে—ভালো বাছুর দেবে, দাম হবেক নাই? চলোতো।

কঠিন জীবন সংগ্রাম, বাঁচার তাগিদ টগরকে এখন অনেক সতেজ আর সহজ করে তুলেছে। ওই ভূষণকে মেনে নিতে পারেনি। একটা ভুল করেছিল, কিন্তু সে আর কোন খবরও নেয়নি তার। ওই লোকটাকেও আর চেনে না টগর।

এখন সে বড়জোড়ায় এসে দেখছে একটা পরিবর্তন।

আগেও দেখেছে এই বনের ধারে বিশাল প্রান্তর পড়েছিল। ওদিকে থাকার ঘরবাড়ি, বাকী সব শূন্য। কাঁকরফেলা রাস্তাটা দামোদরের দিকে চলে গেছে।

এখন সেই শূন্য প্রান্তরে গড়ে উঠছে অনেক বাড়ি, মাঠের মধ্যে বড় লম্বা চালা করে সেখানে লেদ অন্য মেসিন বসিয়ে কাজ চলছে।

খোয়ার রাস্তায় কালো মসৃণ পিচের প্রলেপ পড়ছে। বনের দিক থেকে বড় বড় পেল্লাই লরীতে পাথর বোঝাই হয়ে চলেছে নদীর ব্যারেজের দিকে। সেখানেও বিশাল কর্মযজ্ঞ চলেছে।

সতু বলে—ইসব কি হচ্ছে রে?

টগরও দেখছে। সেই নির্জন প্রান্তর, পরিত্যক্ত ডাঙ্গা সব যেন কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। আরও কিসব যন্ত্রপাতি বসছে। এসে গেছে বিরাট পোলের মাথায় বিজলির তার।

ব্লক অফিসও গড়ে উঠেছে ওই প্রান্তরের অনেকখানি জুড়ে।

সেখানেও অনেক অফিস বসছে। ওদিকে গোশালায় জারসী গাইও দেখে। বকনা-বাছুর সমেত একটা গরু চোখে পড়ে তার। টগর বুঝেছে এসবের জন্যই এবার দুধের ব্যবসা ভালো চলবে। গরুটা কেনে টগর তার শেষ সম্বল পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে। এক বিয়েনী জারসী গাই সঙ্গে বকনা বাছুর। সেটা বড় হলেও দুধ দেবে। সতু বলে—হ্যারে লোকসান হবেক নাই তো?

টগর বলে—বরাতে লুকসান থাকলে হবেক। তবে হিসাব ঠিক থাকলে এক বছরে ও টাকা তুলে লিব।

টগরের এত কাজের মধ্যে মনে পড়ে চন্দনের কথা। মাঝে মাঝে কুমোরপাড়ায় যায়। অতুলের বয়স হয়েছে! চোখেও কম দেখছে। তবু জাত ব্যবসা ছাড়েনি। সেইই গজগজ করে—ছেলেটা সহুরে হয়ে যাবেক। কারিগর হইছে। মরবেক শালো ইবার সহরের লিশায়। বিহা-সাদিও করলেক নাই। সহুরে বিবিদের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরবেক।

বুড়োর কথাগুলো শোনে টগরও। তারও মনে কেমন একটা নীরব আতঙ্ক জাগে। চন্দনও কি তাকে ভুলে গেছে। দেখে টগর ঘরের মধ্যে শো কেসে তার মূর্তিটাকে। ও যেন অজানাতেই ওই স্মৃতির কারাগারে বন্দী হয়ে গেছে।

সেদিন গাড়িটাকে গ্রামে ঢুকতে দেখে অনেকেই অবাক হয়। গাড়িটা এসে কুমোর পাড়ায় থামলো। নামছে দু-তিনজন লালমুখো সাহেব মেম, সঙ্গে চন্দন।

লালমুখো সাহেব মেমদের এ-গ্রামের অনেকেই দেখেনি। তারা বিদেশীদের গল্পই

শুনেছে। সাত সমুদ্র পারে তারা বরফের দেশে থাকে। সেই বিচিত্র দেশের মানুষদের তাদের গ্রামে এই কুমোরপাড়ার মাটির ঘরে আসতে দেখে গ্রামের অনেকেই আসে।

চন্দন ওই বিদেশীদের সঙ্গে কথা কইছে। ওরা গ্রামের পুরোনো শিবমন্দিরের ছবি তোলে। জীর্ণ মন্দিরটাকে ঘুরে ফিরে দেখছে। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

চন্দনের কাজ করার জায়গায় যায়। মাটি মাখছে বিচ্চু। তারা সেই কাদামাটি হাতে নিয়ে টিপে টিপে দেখছে। দেখে পোড়ামাটির পুতুলের ছবি, তৈরির নানা প্রক্রিয়া। শালে পোড়ানও দেখে।

আর অনেক টেরাইকোট্টা—বেশ কিছু মনসার ঝারি, হাতি ঘোড়াও কেনে। টাকার বাণ্ডিল এগিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামটা দেখতে বের হয়।

পিছনে জনতার ভিড়। কমলবাবুও বের হয়ে আসে বিদেশীদের দেখে, সঙ্গে রয়েছে গুণময়।

গুণময়ই কমলের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়—বিগ ম্যান অব দিস্ ভিলেজ।

---বিগ্ ম্যান। একজন বিদেশী ছোটখাটো কমলকে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

কমলবাবু বলে— ছোটখাটো ব্যবসা করি স্যার।

---বেওসা। হোয়াট?

চন্দনই বলে---বিজনেস।

ওই সাহেবের দল আর ফিরেও চাইল না। কমল বলে—একটু বসুন স্যার।

গুণময় বলে—কাম স্যার, সিট—সিট্।

হাসে ওরা। চলে যায়। গুণময় বলে—ব্যাটারা হিপির দল। গাঁজা ড্রাগ খায়, এসবের মম্ম কি বুঝবে।

ওরা গ্রামের বাইরে সবুজ ছায়াস্নিগ্ধ ওই আশ্রম দেখে দাঁড়ালো। হোম করছে পঞ্চতীর্থ। নিতু, আরও কিছু লোকজন রয়েছে। —ওঁ অগ্নয়ে স্বাহাঃ—ও প্রাণায় স্বাহা—

হবন কুণ্ডে আগুন জ্বলছে। পূত-পবিত্র পরিবেশ। ছোট চালাঘরে দেবীমূর্তি। ওই বিদেশীদের দল জুতা খুলে সম্ভ্রম ভরে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে ওই পূর্ণাহুতি। মন্ত্রধ্বনি ওঠে। বাতাসে ঘি, ফুলের মেশা মিষ্টি সুবাস। কোথায় বনের আড়ালে দু-একটা পাখী ডাকছে।

বিদেশীর দল যেন এই সবুজ আরণ্যক পরিবেশে ওই মন্ত্রধ্বনির মধ্যেই প্রাচীন ভারতের এক শাশ্বত চিরন্তন রূপকেই প্রত্যক্ষ করে। ওদেরই একজন ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে থাকে।

পঞ্চতীর্থমশায় উঠে আসেন ওদের দেখে।

সাহেবরাও মাথা নীচু করে নমস্কার করে তাকে। চন্দনই পরিচয় করিয়ে দেয়।

পঞ্চতীর্থ বলেন—অতিথি, আমাদের ধর্ম অতিথিসৎকার করা। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না তোমরা। ওদের বসতে বলো চন্দন। বিদেশীরাও বসে।

তারাও মুগ্ধ-বিস্ময়ে ওদিকে অতিথিসৎকার দেখছে।

পঞ্চতীর্থমশায় গুরুপূর্ণিমার দিন এসব আয়োজন করেন। অনেক ভক্তরাও আসে। টগরও নতুন গরুর দুধ এনেছে দেবতার জন্য। ঘোষমশায়ও এসেছেন। এসেছে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন।

টগর দেখছে দূর থেকে চন্দনকে। চন্দন ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে টগরকে দেখেনি। সে জানে টগর আর এখানে নেই। সেও চলে গেছল বাইরে। আসানসোল থেকে গেছল কলকাতার এক শিল্প মেলায়, সেখানেই এই সাহেবদের সঙ্গে তার দেখা হয়।

চন্দনের হাতের কাজ, মূর্তির নির্মাণশৈলী দেখে ওরাও খোঁজ পায় বিষ্ণুপুর শিল্পের, তাই ওকে নিয়েই বিষ্ণুপুর ঘুরে এখানে এসেছে। বিদেশীরাও পঞ্চতীর্থের কাছে বসেছেন।

তাদেরই কেউ প্রশ্ন করে—জীবনে চাওয়ার শেষ কোথায়? পঞ্চতীর্থ বলেন—আজকের সভ্যতা মানুষের লোভ-লালসাকেই বৃদ্ধি করেছে। ভাবে সব কিছুই তার প্রয়োজন, সর্বস্বই তার। তাই লালসার আগুনেই জ্বলে-মরে সে। পরম শান্তির আধার, ঈশ্বরের কথাও বিস্মৃত হয় সে। তাই উপনিষদ বলেন

—ওঁম্ ঈশাবাসাং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং॥

চতুর্দশ ভুবনে যাহা কিছু পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে সে সমস্তই অন্তর্যামী ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুই নাই। তখন চিত্তে ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন কামনার উদয় হয় না। সেই ঈশ্বর অনুভূতিই মানুষকে স্বধন, পরধনস্পৃহা থেকে মুক্ত করে। পরম আনন্দ—শান্তির স্পর্শ তখনই পেতে পারে সে। সেই ঈশ্বরকেই ভুলিয়ে দিয়েছে আজকের সভ্যতা। তাই মেকি ঐশ্বর্যের পিছনেই সে দৌড়ে চলেছে মরুভূমিতে মানুষ যেমন মরীচিকার পিছনে ধায় ঠিক তেমনিই। তৃষ্ণাও মেটে না—প্রাণই যায়।

স্তব্ধ হয়ে শুনছে তারা ওই কথাগুলো। সেই ঈশ্বর সন্ধানেই যেন ব্যস্ত—এই সংসারবিরক্ত মানুষটি।

আহারাদির পর বিদেশীরা ফিরে যায়।

চন্দন ফিরে গেছে শূন্য ঘরে। ক'টা মাস কেটেছে তার ঝড়ের মধ্যে।

এবার ঘরে ফিরে চন্দনের মনটা কি শূন্যতায় ভরে ওঠে। বিদেশীরা তার কাজের ভিডিও ছবি নিয়ে গেছে, তার অনেক টাকার মালও নিয়ে গেছে। বিদেশের টিভিতে তার ছবি দেখানো হবে। এখন টাকার অভাবও তার নেই।

এবার স্টুডিওই গড়বে সে। এখন কলকাতার কোন এক সংস্থা তাকে বহু টাকার কাজ দিয়েছে। কাজ, কাজ আর কাজ। মাঝে-মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে চন্দন। জীবনে আর কোন আশা-স্বপ্ন তার নাই।

একজনের সঙ্গে তার আশা-স্বপ্নও ফুরিয়ে গেছে।

বৈকালের ম্লান হলুদ রোদ নামছে।

বর্ষার শেষ। রুক্ষমাটিতে সবুজ স্নিগ্ধতা জাগে। পাখিদের কলরব ওই শান্ত বনভূমিকে যেন সজীব করে তুলেছে। সবুজ গাছে সাদা থোকা ফুলে ভ্রমরের আনাগোনা।

সারা প্রকৃতিতে কি প্রশান্তি, প্রকৃতিস্পর্শহারা মানুষের মনেই অশান্তির স্পর্শ। ওই মৃত্তিকার বুকে তৃপ্তির সার্থকতার অনুভব আজ তার অনুভূতিতে নাই।

নিজের মনের জ্বালাই তাকে মাটির কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। মাটিতে আর শিকড় তার নাই, তাই মৃত্তিকার গভীরের অফুরান প্রাণরস আহরণের শক্তিটুকুও তার নাই। তাই সে সদাই পীড়িত, দুঃখ-জর্জরিত।

হঠাৎ কাকে দেখে চমকে ওঠে চন্দন। সবুজ গাছের ফাঁকে দেখা যায় টগরকে। এগিয়ে আসছে সে। চমকে ওঠে চন্দন।

—তুমি। এখানে?

টগরও অনেক আশা নিয়েই এসেছে। দেখছে সে চন্দনকে।

ক'মাসেই সহরের জলহাওয়ায় এই মাটির রুক্ষতা তার দেহ থেকে মুছে গিয়ে সহরের পালিশ ফুটে ওঠে।

বলে টগর—এ্যাঁ। ভূত দেখছ নাকি গো কারিগর যে চমকে উঠলা। ভূত-পেত্নী আমি লই গো, টগরই।

—এসো মিতিন। এসো। চন্দন ওকে বসতে মোড়াটা এগিয়ে দেয়।

টগর বসে। চন্দন বলে—শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলে? এখন তো পরগাঁয়ের লোক তুমি।

টগর হাসে, ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বলে সে।

—ওসব পাট চুকিয়ে গায়েই ফিরেছি কারিগর।

চমকে ওঠে চন্দন। দেখছে ওকে। পরনে রঙ্গীন শাড়ি, হাতে চুড়িও রয়েছে।

—মানে!

টগর বলে—যা ভাবছ তা লয় গো। পতিদেবতা বহাল তবিয়তে অন্য জায়গায়

বিয়ে করে ঘরে বৌ এনে শান্তিতেই আছে। আমিই আর সেখানে যাইনি কারিগর। ওখানে থাকতে পারা যায় না—তাই যাইনি আর।

চন্দন দেখছে ওকে।

ওর মত মেয়েরও ঘরের ঠিকানা হল না। বলে চন্দন—এ অন্যায় মিতেন। এইভাবে তোমার ওপর অবিচার হবে। সেই মানুষটা। বলে ওঠে টগর।

—তার কুন দোষ নাই গ। আমিই তাকে, তাদের মেনে নিতে পারিনি। তাই নিজেই সব ছেড়ে নিজের এই পথই বেছে লিয়েছি। এর জন্য দায়ী কাউকেই করবো না কারিগর। সব দায়, দোষ আমার—আমারই। আমি যে মনে মনে অনেক কিছু চেয়েছিলম গো। আমিই পাপী—লুভী! মহালুভী। আমিই—

কথাটা বলতেও পারেনা। কি বেদনায় ওর কণ্ঠস্বর বুজে আসে অশ্রুভারে। চলে গেল সে।

ওর কথাগুলো চন্দনের মনের অতলে ঝড় তোলে। আজ টগর নিজেই স্বীকার করে গেছে তার আশা—স্বপ্ন—পাওয়ার কথা। তার জন্য সে তার ঘরও ছেড়ে বের হয়ে এসেছে।

সেই কথাটাই যেন টগরের অব্যক্ত বেদনায়—অশ্রুধারায় আজ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

চন্দন ভাবছে কথাটা। কখন দিনশেষ হয়ে সন্ধ্যা নামে সে খেয়ালও সে করেনি।

বাচ্চুর ডাকে চাইল—তখন থেকে চুপ মেরে বসে এত কি ভাবছো গো কারিগর। মশাতে যে ছিঁড়ে ফ্যালাবেক সি খেয়াল নাই? উঠো—

খেয়াল হয় চন্দনের। বারবার কেন জানে না টগরের অশ্রুসজল চোখ দুটোর কথাই মনে পড়ে। মনে হয় ওই চোখের জল সেইই মোছাতে পারে। চন্দন আজ এক নতুন টগরকে দেখেছে।

সুখদা বুড়ি হাঁপিয়ে উঠেছে। পাড়ার দামাল ছেলেগুলো আর কেউ তার পেয়ারা গাছে হানা দেয়না। কুলগাছে সবুজ পাতা ছেয়ে লাল হলুদ কুলগুলো পাকছে। দু-চারটে শালিখ, টুনটুনি পাখিই গাছে এসে বসে, ঠোকরায় আবার চলে যায়।

একা কত কুল, পেয়ারা খাবে সুখদা ঠাকরুন।

পাড়ার আশপাশের কেউ আর তার সঙ্গে কথাও বলেনা। সকালে দাওয়ায় বসে থাকে, ছেলের দল মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কেউ সাড়াও করেনা। সে যেন একটা মানুষই নয়।

একা এই শূন্য সংসারে সে যেন বসে আছে শেষ খেয়ার আশায়। একটা নীরব নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, হতাশা তার মনকে ভরে তোলে। পঞ্চতীর্থের আশ্রমে যায় মাঝে

মাঝে। কিন্তু বাকী সময় তার কাটে না। পঞ্চতীর্থের কথাগুলো মনে পড়ে।

নিজের অহঙ্কার ভুলে যাও দিদি, বসুধৈব কুটুম্বকম। সারা সংসারকে তোমার আত্মীয়, আপন করে ভাবো।

হঠাৎ এমনি দিনে গোবিন্দ ঘোষের ছোট ছেলে অরুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাত জেগে দাস্ত বমি শুরু হয়। প্রথমে ভেবেছিল সামান্য পেট খারাপই হয়েছে।

দাদা বরুণ বলে—কি যা তা খেয়েছে। দিনরাত টো-টো করে ঘোরে, হবে না?

বাসন্তীই সেবা-যত্ন করে। কি ওষুধও খায়।

কিন্তু সকাল থেকে অসুখ বেড়েই চলে। গোবিন্দবাবু রমণকে খবর দেন।

রমণই এই এলাকার দু-চারজন যারা চিকিৎসা করে তাদের মধ্যে ভালো।

রমণ এসে দেখে-শুনে বলে—কেসটা ভালো বুঝছি না কাকা। সিরিয়াস টাইপের ডায়ারিয়া। সহরে এম-বি কালিবাবুকে খবর দেন।

সহরে ওর খুবই নামডাক। বরুণই সকালেই সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি মাইল পথ। বনচড়াই এর পথ। তবু ওইভাবেই যেতে হবে।

ফেরার সময় ডাক্তারবাবু গাড়িতেই সাইকেল পিছনে বেঁধে ফিরবে।

গ্রামের শরৎ ভটচায, সতীশ চাটুয্যে, হরিপ্রিয়া ঠাকরুন ও আসে। বাসন্তীর বাবা নরেশবাবুও এসেছে জামাইএর ভাইএর অসুখের কথা শুনে।

রমন ডাক্তার স্যালাইন দিয়েছে, ওষুধ ইনজেকশনও চলছে। সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে গেছে।

দত্তগিন্নীও এসেছে। বলে সে—ছেলেটাকে ভালো করে দাও মা সুবচনী। এ ওই ডাইনীর গালাগালেই হয়েছে। গাছের পুঁইশাক কেটেছে দু ডাল, তাই বলে শাপ শাপান্ত, গালমন্দ কি কম করেছে। ওর শাপেই এই হয়েছে।

কেষ্টার মা বলে—তা হতে পারে দিদি। ওই জিভ তো নয়। সবখেকো জিভ। ওর গরলে ওর সাজানো সংসার, স্বামী-পুত্র সব গেছে। ছেলেটাকে ভালো করে দাও মা কালী।

মেয়েদের কথাগুলো হাওয়ায় ওড়ে।

সুখদা ঠাকরুন অন্যদিনের মত দাওয়ায় বসে আছে। দেখে গ্রামের বৌঝিরা—লোকজন ঘোষবাড়ির দিকে যাচ্ছে। কেউ ব্যস্ত হয়ে ফিরছে। এর মধ্যে নরেশ মুখুয্যে, বাসন্তীর মাও গেছে। ফিরে এসেছে নরেশ। বাসন্তীর বোন মোহিনীও ফিরে আসছে।

সুখদা দু-একজনকে ডেকেছে। শুধিয়েছে—কি ব্যাপার গো।

কিন্তু কেউ জবাবই দেয়নি ওর ডাকে। দু-একজন দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছে ওকে। বোনেদের খুদি বলে—ও মা, তাড়াতাড়ি চলে এসো—ডাইনীর ছামু থেকে।

ওরাও পালিয়েছে যেন তার সামনে থেকে। ওই কথাটা চকিতের জন্য কানে আসে

সুখদা ঠাকরুনের—ডাইনী।

অন্যদিন হলে সেও সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতো। আজ কথাটা শোনে মাত্র। কি যেন একটা কিছু হয়েছে গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে।

দেখেছে বুড়ি বরুণ সকালেই সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেছে। ডাক্তারও আসা-যাওয়া করছে ও বাড়িতে।

রমণ ডাক্তার ফিরছে, একটা ওষুধ আনতে হবে তাই বাড়িতে যাবে, সুখদা ঠাকরুনের ডাক শুনে চাইল। বুড়ি পথে নেমে এসে রমণকে শুধোয়।

—কার কি হয়েছে গো রমণ, এমন সবাই ছুটোছুটি করছে ঘোষ বাড়িতে?

রমণ বলে—ভোর থেকে অরুণের খুব দাস্ত বমি হচ্ছে।

—সেকি! বুড়ি চমকে ওঠে। রমণ বলে—সহরে ডাক্তার আনতে গেছে বরুণ। যাই একটা 'ফাজ' নিয়ে আসতে হবে! তরতাজা ছেলেটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

—ভালো হবে তো বাবা অরুণ, ও রমণ? বুড়ির কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর।

রমণ বলে- —চেষ্টা তো করছি খুড়িমা। সব ভগবানের হাত। চলি। রমণ সাইকেলে চেপে চলে যায় ওষুধ আনতে।

বুড়ি স্তব্ধ হয়ে দাওয়ায় বসে থাকে। মনে পড়ে সেদিন অবিরাম শাপ দিয়েছিল ওলাওঠায় যাবি, ধড়ফড়িয়ে যাবি। জীবনে কোন আশীর্বাদই তার ফলেনি। পোড়া জিভের শাপটা কি ঠিক বলবে এবার। ওই বেনেদের খুদির কথা মনে পড়ে—ডাইনী।

তাহলে ডাইনী সে। তার নজরে আছে বিষ! না! বুড়ির অন্তরমন হাহাকারে ভরে ওঠে।

দেখে মোহিনীকে ওদিক থেকে আসছে।

বুড়িই ডাকে মোহিনীকে—শোন।

মোহিনী বুড়িকে এখনও ছেড়ে যেতে পারেনি। মা-বাবাকে লুকিয়ে মাঝে-মাঝে আসে। বুড়ির কাছে এসে শুধোয়।

—কি!

বুড়ি শুধোয়—অরুণ ক্যামন আছে রে?

মোহিনী বলে ওঠে—আর ওসব কথা শুধিয়ে কি হবে? তুমি জানো না ক্যামন আছে?

বুড়ি অবাক হয় মেয়েটার কথায়।

—কি বলছিস লা?

মোহিনী বলে—সবাই বলছে তোমার শাপেই ওর এমন অসুখ হয়েছে। হবে না? গালমন্দ কম দিলে সেদিন? ওলাওঠায় যা। এখন শুধোচ্ছো ক্যামন আছে; ও গেলেই তো আপদ যায় তোমার। কি সব্বনেশে লোক গো তুমি।

ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলে মেয়েটা চলে যায়।

বুড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না।

এবার বুঝেছে সুখদা ঠাকরুন সে আজ নিজের সর্বনাশ নিজেই করেছে। আর তার জন্যই চরম সর্বনাশ হতে চলেছে অরুণের। তরতাজা প্রাণবন্ত ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে।

মোহিনীও আজ তাকে ছেড়ে কথা বলেনি।

সে মহাপাপী।

সকাল থেকে জলগ্রহণও করেনি। দুপুর হয়ে আসছে। সুখদা ঠাকরুন মা শ্মশান কালীর মন্দিরে গিয়ে ধরনা দিয়েছে। মাথা ঠুকছে সে—মা, মন থেকে কারো ক্ষতি চাইনি মা। ওদের তো ভালোই চাই। তুমি তো অন্তর্যামী—তুমি দয়া করো মা। ছেলেটাকে ভালো করে দাও মা—

আজ বুড়ির চোখের জলে মন্দিরের মেজে ভিজে যায়। জীবনে তার অনেক কিছুই গেছে। কিন্তু এভাবে কিছু পাবার জন্য প্রার্থনা করেনি। আজ সে ব্যাকুল হয়েই স্মরণ নিয়েছে এখানে—অরুণকে ভালো করে দাও মা।

পুরোহিতও শুনছে বুড়ির কান্না।

সে বলে—শান্ত হও মা।

সুখদার ব্যাকুলতা থামে না। আজ সে এখানেই পড়ে থাকবে দিনরাত্রি। এর শেষই দেখবে সে। তার তো কোন দোষ নাই—তবে কেন অন্তর্যামী দেবতা তাকে ক্ষমা করবে না?

সদর থেকে বড় ডাক্তার এসে গেছে।

গ্রামের লোকও বাইরে অপেক্ষা করছে। ডাক্তারবাবু রমণের পরিচিত।

তিনিও দেখে-শুনে বলেন—না। এখন অনেকটা ভালো আছে। রমণ—তুমি ঠিক ওষুধই দিয়েছো। আর ডি হাইড্রেসনের জন্য স্যালাইন দিয়েই ছেলেটাকে সুস্থ করে তুলেছো। ওই ওষুধই চলুক-—আর এটাও দুটো করে খাওয়াবে।

ডাক্তারবাবুই বলেন গোবিন্দবাবুকে—কোন ভয় নাই। কেসটা খুবই বিপজ্জনক হয়েছিল। যাক্ ঈশ্বরের কৃপায় এখন আর ভয়ের কিছুই নাই। তবে দু-চারদিন সাবধানে রাখবেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন। বাড়ির সবাই কিছুটা নিশ্চিন্ত।

ঢুকছে শ্মশানকালীর পুরোহিতমশাই সঙ্গে সুখদা ঠাকরুন। গোবিন্দবাবু চাইলেন। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। গোবিন্দবাবু বসেন। —পুরোহিতমশাই। মায়ের প্রসাদী পুষ্প চরণামৃত এনেছেন?

পুরোহিত বলে—গোবিন্দ, সকাল থেকে এই মা-মায়ের মন্দিরে পড়ে চোখের

জলে বুক ভিজিয়ে মাকে ডেকেছে—অরুণের জন্যে। এখনও মুখে জলও দেয়নি। ওকে দিয়েই পুষ্প চরণামৃত এনেছি মা, ওর কান্নাতেই পাষাণী মায়ের বুকও গলেছে, দেখবে, অরুণ ভালো হয়ে উঠবে এবার। নিশ্চয়ই ভালো হবে। ওর কান্না বৃথা যাবে না মা।

অবাক হয়ে দেখছেন গোবিন্দবাবু সুখদাকে।

আজ যেন ওই সর্বহারা রিক্তা মহিলার মধ্যে ব্যাকুল এক চিরন্তন কল্যাণী মাতৃমূর্তির প্রকাশই ঘটেছে।

দেখছে গোবিন্দবাবু স্ত্রী, হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও।

গোবিন্দবাবুই এগিয়ে আসেন—ওগো, খুড়িমাকে নিয়ে যাও অরুণের কাছে। প্রসাদী পুষ্প এনেছে।

সুখদা ঠাকরুন দেখছে ওদের। আর্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে গোবিন্দর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে, বলে—মা আজ মুখ রেখেছেন রে। মা যে অন্তর্যামী। ওরে গালমন্দ মুখে দিতাম, ও মুখের কথাই। মনের কথা তো তোদের বোঝাতে পারিনি কুনদিন। আমার আর কেউ নাই রে। ওরাই—তোরাই আমার সব। তোদের নিয়ে জীবনের বাকী দিন কটা সুখে-দুঃখে কাটিয়ে দিতে চাই।

পোড়া মুখের কথাতেই তোদের মনে দুঃখ দিয়েছি। মন থেকে তোদের সব্বাইকে আশীর্বাদ করি রে। দেবতাকে বলি ওদের ভালোয় তুলোয় রাখো। বাদ সাধে ওই পোড়া মুখ। কই, কইরে অরুণ, ভালো হয়ে যাবি এবার। জয় মা।

বুড়ি প্রসাদী পুষ্পের সঙ্গে ওর কল্যাণ স্পর্শ অরুণের সর্বাঙ্গে বুলোতে থাকে।

বুড়ির দুচোখ আনন্দের অশ্রু। আবার যেন হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছে সে।

সারা গ্রামের বৌঝিরাও এসেছে। কেষ্টোর মা বলে

—কেঁদোনা দিদি। অরুণ ভালো হয়ে যাবে।

সুখদা বলে—তোরা সবাই ভালো থাক বৌ। ভালো থাক।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও দেখছে এক নতুন সুখদা ঠাকরুনকে। এর মধ্যে বাসন্তী সরবৎ আর মিষ্টি এনেছে। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী বলে—খুড়িমা এখনও জলস্পর্শ করোনি। দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে সরবৎ টুকু খাও।

সুখদাও দেখে এ যেন আয়নায় মুখ দেখা। আজ তার মনের গ্লানি চোখের জলে ধুয়ে-মুছে গেছে। মনে পড়ে পঞ্চতীর্থের কথা—মনকে মালিন্যমুক্ত করো দিদি। দেখবে সংসার তোমার আপনার জান-ভরে যাবে।

এক নতুন অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছে সুখদা ঠাকরুন।

অহং বোধ পরিত্যাগ করে অনেক পেয়েছে সুখদা ঠাকরুন। ওদিকে এত ধর্মগ্রন্থ

পড়েও হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের মানসিক কাঠামোর কোন পরিবর্তনই ঘটেনি।

বিজয় এখন সুস্থই। এবার ম্যাট্রিক দিয়ে নিজেই এখন সেরেস্তার হিসাবপত্র দেখছে সরকার মশায়ের সঙ্গে। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও তাই এখন বিয়ে-থা দিয়ে ছেলেটাকে থিতু করতে চায়।

কথাবার্তা বলাই ছিল।

সেইমত এবার উকিলবাবুকেও আসতে বলেছে হরিপ্রিয়া বিয়ের সম্বন্ধ পাকা কথা বলতে।

অবশ্য হরিপ্রিয়া ঠাকরুন নিজের মতেই চলে। সহসা নিজের মনের কথা কাউকে আগে থেকে জানায় না। তাই বিজয়ের বিয়ের কথাটা বিজয়কে কেন গ্রামেও কাউকে জানায়নি।

ঘরে কয়েকজন সম্মানীত অতিথি আসছেন সহর থেকে। তাই বাড়িতে বিশেষ আয়োজন চলছে।

সরকার ভ্রমরকে বলে বেশ কিছু বড় রসগোল্লা—ছানাবড়া—কিছু রকমারি সন্দেশও বানিয়েছে। ওদিকে সকাল বেলাতেই কালু জেলে বাড়ির লাগোয়া পুকুরে জাল ফেলছে।

ঠাকরুন বলে—বড় দেখে একটা রুই তোল কেলে। বাড়িতে লোকজন আসছেন। সের পাঁচেক সাইজের মাছ চাই।

ঠাকরুনের বাড়ির লাগোয়া পুকুরে মাছের অভাব নাই। সেখানে ভালো সাইজের মাছও অনেক। বিজয় বলে—এত মাছে কি হবে ঠাক্‌মা?

ঠাকরুন বলে—লোকজন আসছে। তারাও দেখবে পুকুরের মাছ।

এ যেন সামাজিক পরিচয়ই। গ্রামের মানুষের সামাজিক পরিচয় বলতে যেন ওই পুকুরের বড় মাছ। গোয়ালের বনেদী গরু বলদ, ধানের মরাই। এই গ্রামীণ সম্পদও যেন সেই নবাগত লোকদের সামনে প্রকাশ করতে চায় ঠাকরুন।

ওদিকে বড় বড় খাগড়াই বগি থালা-বাটি-গেলাসের সেট বের হয়েছে।

রুপোর আলবোলা, পানদানগুলোকেও মেজে ঝকঝকে করা হচ্ছে। বৈঠকখানার বড় তক্তপোষে কার্পেট পাতা হয়েছে। ভেলভেটের তাকিয়াও বের করা হয়েছে।

জমিদারী চলে গেলেও জমিদারী ঠাঁট-বাঁটটা বজায় রেখেই চলার চেষ্টা চলছে। বিজয়ও অবাক হয়।

—এসব কি হচ্ছে ঠাক্‌মা? কোন রাজা-মহারাজা আসবে নাকি? আসছেন তো—সদরের উকিলবাবু। তাদের জন্যে এত কাণ্ড?

হরিপ্রিয়া বলেন—মানী লোকরা আসছেন বাড়িতে। তুই কিন্তু এসব কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলে ঘরে তাকে জামা-কাপড় রেখেছি তাই পরবি।

বিজয় বলে—ওই বাহারের ধুতি-পাঞ্জাবি ঘরে পরতে হবে?

—তাই পরবি।

ওদের গাড়ি এসে গেছে। উকিলবাবুর সঙ্গে ওর দু-একজন আত্মীয়ও এসেছেন। সরকার, বিজয় গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে আনে। উকিলবাবুকে খামারবাড়ি হয়েই আনার নির্দেশ দিয়েছেন ঠাকরুন। কারণ খামারবাড়িতেই কয়েকটা বড় বড় ধানের গোলা আছে।

ওদিকে গোয়াল—উঠানে বাঁধা থাকে বিশাল দুজোড়া বলদ। গৃহস্থের স্ত্রী-সমৃদ্ধির প্রতীক তারা। কয়েকটা জারসী গাইও রোমন্থন করছে। আর সেই সময়েই কালু জেলেও বেশ নধর লালচে রুইমাছটা এনে উঠানে ফেলে বলে—মা ঠান, একটা ধরেছি। তা সাত সেরটাক হবেক। আর খ্যাপলা মারবো?

উকিলবাবু দেখছেন তাজা সদ্যধরা মাছটা তখনও উঠানে দাপাচ্ছে। চারিদিকে শ্রী-সমৃদ্ধি প্রাচুর্য্যের লক্ষণই।

তার মেয়ে এই বাড়ির ভবিষ্যৎ কর্ত্রী হয়ে আসবে।

পাকাদালান। বসার ঘরেও বনেদী আনার পরিচয়। হরিপ্রিয়া বলে কালুকে।

—ওইটাই কেটে কুটে দে কালু।

বিজয়ের বাহন নোটনেরও সময় নাই। এখন কিছুদিন থেকে তার কাজটা কমেছে। বিজয় বদলে যাবার আগে কখন কোথায় থাকতো তার ঠিক-ঠিকানা থাকতো না।

কখনও মাঠে, কখনও বাগানে, কখনও শালবনে, কখনও মাঠের কাঁদরের ধারে ঘুরতো আপনমনে। নোটনকেও ওর পিছনে পিছনে পাহারাদার হয়ে ঘুরতে হতো। কখন মনিব গাছে উঠবে। নোটন ওকে ধরতো—গাছে ওঠনি গো। পড়ে যাবে।

বিজয় চড়-চাপড়ও মারতো—ছেড়ে দে। আমি গাছ থেকে শালিখ পাখির মত উড়বো। কেমন উড়বো দেখবি। ঠাকরুনের ঘর ছেড়ে ফুরুৎ ধা—

নোটনকে ধরে আটকাতে হতো তাকে। তার জন্য তার বরাতে প্রহারও জুটতো। এখন বিজয়বাবু বদলে গেছে।

তাই নোটন এখন অনেক সুখেই আছে। টুকটাক ফাই-ফরমাস খাটে বিজয়ের। বিজয় বলে—বাড়িতে এত কিসের ধূম পড়লো বলদিবি নোটনা?

নোটনার মাথা মাঝে মাঝে খুব ভালো কাজ করে। সে দেখেছে গ্রামে কোন বিয়ের ব্যাপারে কাউকে দেখতে এলে, বিয়ের পাকা কথা হলে সেদিন গ্রামের বাড়িতে এমনি উৎসব হয়। ভালো ভালো জিনিষ বের হয়। ভালো খাবার-দাবার, বড় মাছ, দই-সন্দেশ আসে। নোটন তখন থেকেই এমনি কিছু সন্দেহ করেছিল।

বিজয় তার ঘরে রয়েছে।

নোটন কান পেতে আছে এদিকে। উকিলবাবু অন্যদের রুপোর থালায় নানাপদের

মিষ্টি, কলা-ফল দিয়ে জল খেতে দেবার পর হরিপ্রিয়া ঠাকরুন সরকারমশাই ওদের সঙ্গে কথা বলছে।

বিয়ের কথাই। চমকে ওঠে নোটন। শুনছে সে ওদের কথাগুলো।

তার ধারণাই ঠিক। বিজয়বাবুর বিয়ের কথাই বলাবলি করছে ওরা।

উকিলবাবুই জানায়।

—মা আপনাদের গ্রাম্য কুলমর্য্যাদা দেবার সাধ্য আমার নাই। দয়া করে যদি আমার মেয়েকে আপনার পায়ে ঠাঁই দেন তবে আমার পরম ভাগ্য।

ঠাকরুন তবুও জানতে চায়—আপনার মেয়েকে যা দেবেন তাতে আমি হাত দেব না। ওসব আপনার মেয়েরই থাকবে। আমার ঘর-বাড়ি তো দেখলেন। আর অবস্থাও জানেন, তার যোগ্য কিছু তো দেবেন মেয়েকে?

অর্থাৎ বিয়ের পাওনা-গণ্ডা নিয়েই কথা হচ্ছে।

নোটন বাইরে থেকে শুনছে সব কথা। মনে হয় তার দরদস্তুর ঠিক হয়েই গেছে। তাই এবার পঞ্জিকা নিয়ে বসেছে একজন।

উকিলবাবুর কাকাই পঞ্জিকা দেখে একটা দিনও স্থির করে।

হরিপ্রিয়া বলে—সরকারমশাই, ওই তারিখ বিয়ের সব ব্যবস্থা করা যাবে তো? আমার তো সাধ্য আপনি জানেন। যা কাজকর্ম করার আপনাকেই করতে হবে।

দিন স্থিরও হয়ে যায়।

বৈকালে অতিথিরা আহারাদির পর পরিতৃপ্ত হয়ে সব কথাবার্তা পাকা করে দিন স্থির করে এবার বিদায় নিল। গাড়িতে ওঠার সময়ও বিজয় এসেছে।

তারা ঠাকমাকে প্রণাম করে। হরিপ্রিয়া বলে বিজয়কে

—ওদের প্রণাম করো বিজয়।

বিজয় প্রণাম করে তাদের। তারা বলে—তাহলে আজ চলি। পরে দেখা হবে। সরকারমশায়। সামনের সপ্তাহেই সদরে আসুন।

হরিপ্রিয়া বলে—হ্যাঁ। তাই যাবে।

ওরা চলে গেল। হরিপ্রিয়া ঠাকরুন সরকার মশাই ভিতরে চলে যেতে বিজয় বলে—আপদ গেল। উঃ এদের জন্য দিনভোর বাড়িতে ঝড় বয়ে গেল।

নোটন বলে—আপদ বলছ কেনে গো মুনিব?

—বলব না? কি কাণ্ড করল ঠাক্‌মা। যেন গুরু গোসাঁই এসেছিল।

বিজয়ের কথায় নোটন বলে ওঠে

—গুরু গোসাঁই এর চেয়েও বড় গো ওরা। ওই উকিলবাবু যে তোমার শ্বশুর হবেন গো।

চমকে ওঠে বিজয়—মানে?

নোটন বলে—মানে বুঝলে না মুনিব? ওরা ল সমুদে এসেছিল। তুমার বিয়ে হবেক। ওই উকিলবাবুর মেয়ের সঙ্গে সামনের মাসে বাইশ তারিখ বিয়ের দিন ধরা হয়েছে গ। যা ধূমধাম হবেক। আমিও বাসে চড়ে সহরে বরযাত্রী যাবো কিন্তু তুমার বিয়েতে।

হঠাৎ চেয়ে দেখে নোটন বিজয় সামনে নাই।

বোধহয় বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে ভিতরে চলে গেছে। হাসে নোটন। কল্পনার চোখে দেখে সেও চলেছে সহরে বিয়ের বরযাত্রী হয়ে।

বিজয় কথাটা শুনে চমকে ওঠে।

সহরের সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারে ঠাক্‌মা কেন সেইরাতে ওদের বাড়িতে ছিল। আজও ঠাক্‌মা ওদের আদর-আপ্যায়নের জন্য এত সমারোহ করেছে ওই বিয়ের জন্যই।

বিজয়ের মনে পড়ে মোহিনীর কথা। কালো ডাগর চোখের চাহনিতে কি মাদকতার নেশা। ওই মেয়েটা অজানতেই তার মনের গভীরে নিজের আসন পেতেছে। তার জন্য অনেক, অনেক করেছে মোহিনী।

আজ বিজয়কে সেই নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। তাকে সে তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না।

বৈকাল গড়িয়ে গেছে।

এর মধ্যে গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। সহর থেকে কোন উকিলবাবু এসেছে দলবল নিয়ে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের বাড়িতে বিজয়ের বিয়ের কথা পাকা করতে।

কনে নাকি আগেই সহরে গিয়ে হরিপ্রিয়া ঠাকরুন দেখে এসেছে। পছন্দও করেছে। গতিলালই হরির তলার চাতালে বসে বলে—দেখতে-থোবেও ভালো।

শরৎ ভটচায বলে—আরে ঠাকরুন দেনা-পাওনার হিসাব ঠিকঠাক করেই ফেলেছে। শ্যায়না পার্টি। সারা এলাকার লোকের টিকি বেঁধে রেখেছে ধান, টাকা দিয়ে। বেয়াইকেও এবার দেনদার করে ছাড়বে হে।

কে বলে—যাক। পাগলা ভালো হলো—বিয়ে হবেক। ঠাকরুণের বরাতজোর।

বাগানে বৈকালের ছায়া ঘনতর হয়ে আসছে।

পাখিদের কলরব ওঠে। মোহিনীও কথাটা শুনেছে। বিজয়ের বিয়ের নাকি সবই ঠিক হয়ে গেছে। অথচ কথাটা বিজয় তাকে কোনদিনই জানায়নি।

আজ তার চোখে জল নামে।

অজানতে মেয়েটাও অনেক স্বপ্ন দেখেছে বিজয়কে নিয়ে। আর সেই বিজয় এত

সহজে তার সব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেবে এটা সে কল্পনাও করেনি।

মোহিনী বসে আছে এই নির্জন বাগানে বিজয়ের প্রতীক্ষাতেই।

অন্যদিন এতক্ষণে বিজয় চলে আসে, তার পথের দিকে চেয়ে থাকে ব্যাকুল ভাবে মোহিনী। কিন্তু আজ বিজয়ের দেখা নাই।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে। তখনও বিজয় আসে না।

মোহিনীর মনে জাগে শূন্যতার হাহাকার। মনে হয় বিজয় তাকে ভুলেই গেছে। তাকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে আজ নতুন কোন মেয়ের স্বপ্ন দেখে।

ফিরে আসছে মোহিনী। তার সবই হারিয়ে গেল। ওই বিজয় ধনীর ছেলে, বড়লোকের ছেলের খেয়ালেই ক'দিন তার সঙ্গে মিশেছিল। আজ মোহিনীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই তাকে সরিয়ে দিতেও বাধেনি বিজয়ের।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল মোহিনী।

ছায়ান্ধকারে এগিয়ে আসছে বিজয়। মোহিনী বলে—আবার কেন এসেছো এখানে?

বিজয় এগিয়ে আসে—মোহিনী! শোনো। মোহিনী এতক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিল, এবার অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বিজয় এগিয়ে আসে। ওকে কাছে টেনে নিতে চায়। মোহিনী বলে—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমায়। যেদিন দরকার ছিল সেদিন এসেছিলে আজ আর কি দরকার আমাকে?

—কি বলছ মোহিনী?

মোহিনী বলে—ঠিকই বলছি। বড়লোকের ছেলের খেয়াল। এতদিন আমাকে নিয়ে পুতুল খেলেছো, নেশা ছুটে যেতেই লাথি মেরে ফেলে দিলে গরীবের মেয়েকে। এখন বড়লোকের টাকা-সোনাদানার পিছনেই ছুটেছো। তোমাদের চিনতে পারিনি। তাই আজ ঠকেই গেলাম। ঠকেই গেলাম। তুমি জোচ্চোর—ঠগ।

মোহিনী চলে যায়, বাগানের অন্ধকারে আর তাকে দেখা যায় না।

বিজয় কি ভাবছে।

মোহিনীর ওই হাহাকার তার মনে নাড়া দিয়েছে। মনে হয় বিজয়ের মোহিনী ঠিকই বলেছে। আজ বিজয় ওই বিয়েতে মত দিলে সে অন্যায়ই করবে। মনে পড়ে বিজয়ের সেই হতাশা ভরা অন্ধকার দিনের কথা। সেদিন ওই মোহিনীই তাকে সেবা-যত্ন করেছিল। মনে এনেছিল আশার আলো। আজ সেই মোহিনীকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিতে পারবে না তার জীবন থেকে।

তার তো কোন অভাব নেই। তবে ঠাকুমার ওই পাত্রীকে টাকার জন্য বিয়ে করার কথাও সে ভাববে না।

বিজয় আজ মনস্থির করে।

রাত নামছে। রাতের আকাশে তারা ফুটে ওঠে। তার অন্ধকার জীবনে মোহিনী

যেন ওই তারার মতই একটি উজ্জ্বল অস্তিত্ব। তাকে হারাতে পারবে না বিজয়।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন তখন মনে মনে জমা-খরচের হিসাবই করছে। জীবনে সে কি পেয়েছে আর কি পায়নি তার হিসাব আর মেলায় না। এখন বিজয়ের কথাই ভাবছে।

ওখানে বিয়ে হলে টাকা-সোনাদানা প্রতিষ্ঠা পাবে বিজয়। সহরে থেকে কলেজে পড়বে। জমিদারীর দিন ফুরিয়ে গেছে। এবার সকলকে খেটে খেতে হবে। কলসীর জল গড়াতে গেলে আর কতক্ষণ থাকবে।

তাই কাজের চেষ্টাই করতে হবে। আর উকিল শ্বশুরের কাছে ওকালতি পাশ করে সহজেই কোর্টে ওকালতির সুযোগও পাবে বিজয়।

হরিপ্রিয়ার অবর্তমানে বিজয়েরও একজন জাঁদরেল অভিভাবক থাকবে। সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে চায় হরিপ্রিয়া।

বিয়ের আয়োজন শুরু করেছে। কানাই স্বর্ণকার এ বাড়ির গহনাপত্র করে। হরিপ্রিয়ার সাবেকী ওজনদার পুরোনো ডিজাইনের গহনা কিছু ভাঙ্গিয়ে নতুন নাতবৌ-এর জন্য গহনাপত্র করাতে হবে। তাই কানাই স্বর্ণকার ও নিক্তি, কষ্টিপাথর সব এনে হাজির হয়েছে গিন্নীমার দরবারে।

ওদিকে সরকারমশায় মিস্ত্রী লাগিয়ে বাড়িটাকে মেরামত, রং করাচ্ছে। বাড়িতে সাজসাজ রব পড়েছে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন আজ নাতির বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবে।

বিজয়ও অবাক হয়। বাড়িতে এত কাণ্ড চলেছে কিন্তু তাকে কেউ কোন কথাই জানায়নি। সরকার মশাইও কিছু বলেনি। হরিপ্রিয়া সেদিন দুপুরে কাপড়চোপড় কেনার ফর্দ করছে। বিজয়কে দেখে চাইল।

বিজয় শুধোয়—বাড়িতে কিছুদিন ধরেই দেখছি নানা কাণ্ড চলেছে।

উকিলবাবু এসেছিল সদর থেকে, এদিকে তুমিও সারা বাড়িতে ঝড় তুলেছো। ব্যাপারটা কি বলোতো?

হরিপ্রিয়া এতদিন কথাটা বলেনি, আজ বিজয়ের কথায় বলে

—বোস। সব বলছি।

বিজয় এই প্রথম ঠাক্‌মার মুখে তার বিয়ের কথা শোনে। হরিপ্রিয়া বলে —সবদিক ভেবেই এই বিয়েতে কথা দিয়েছি উকিলবাবুকে। তোরও মাথার ওপর একজন গার্জেন থাকবে। আমি আর কতদিন। তাছাড়া উকিলবাবু মেয়েকে দেবে-থোবে ভালো। তোকেও একটা মটর বাইক দেবেন বলেছেন। তাছাড়া ওর মেয়েটিও বেশ সুশ্রী, সুলক্ষণা। আমি তাই ওখানেই তোর বিয়ের ঠিক করেছি। সামনের মাসেই শুভকাজ সেরে ফেলতে চাই।

বিজয় কথাটা আগেই নোটনের কাছে শুনেছিল।

আরও আশ্চর্য হয়েছিল সেদিন বাগানে মোহিনীর মুখে ওই বিয়ের কথা শুনে।

সারা গাঁয়ের লোক জেনেছে তার বিয়ের কথা। অথচ ঠাকমা যার বিয়ে হবে তাকেই কথাটা জানাবারও দরকার বোধ করেনি।

বিজয় বলে—আমাকেই জানাওনি কথাটা, একেবারে ওদের পাকা কথা দিয়ে দিলে?

হরিপ্রিয়া বিজয়ের কণ্ঠস্বরে অবাক হয় বলে—তোকে আর কি জানাবো আগে থেকে। বিয়ে তো দিতেই হবে।

বিজয় বলে—বিয়ের ব্যাপারটা আমার উপরই তাহলে ছেড়ে দাও। এ নিয়ে তুমি এত ভেবোনা। আমার বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করে নোব।

হরিপ্রিয়া অবাক হয়। —কি বলছিস তুই।

—হ্যাঁ বিয়ে আমি করবো। আর পাত্রী আমার ঠিক হয়েই আছে।

হরিপ্রিয়ার মাথায় রক্ত ওঠে বিজয়ের কথায়।

দেখছে বিজয়কে। এতদিনের শান্ত নম্র ছেলেটা আজ হঠাৎ কেমন বদলে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে-চাহনিতে একটা পরিবর্তন এসেছে যেটা হরিপ্রিয়ারও নজর এড়ায়না।

হরিপ্রিয়া বলে বিস্মিত কণ্ঠে—কি বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি।

হরিপ্রিয়া বলেন—উকিলবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবেই, কথা দিয়েছি।

বিজয় বলে ওঠে কঠিন স্বরে।

—না। ওখানে বিয়ে হবে না। হতে পারে না।

—কেন? হরিপ্রিয়া বিরক্তিভরে প্রশ্ন করতে বিজয় বলে।

—আমি মোহিনীকে কথা দিয়েছি। তাকে বিয়ে করবো। মোহিনী ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবো না।

চমকে ওঠে হরিপ্রিয়া। তার চোখের সামনে সেই হতদরিদ্র শান্ত অসহায় নিরাভরণ মোহিনীর মুখটা ভেসে ওঠে। সেই মেয়েটা যে বিজয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এটা ভাবতেই পারে না হরিপ্রিয়া।

মোহিনীর বাবা নরেশ মুখুয্যেও হুসিয়ার লোক। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কাছে আসে দায়ে-অদায়ে। যখন-তখন টাকা, ধানও ধার করে নিয়ে যায়। হরিপ্রিয়া গরীব ব্রাহ্মণকে ফেরাতো না। ছাপোষা সংসারী মানুষ, চাপে পড়েছে। তাই সাধ্যমত সাহায্যও করতো কিন্তু এখন মনে হয় ওই নরেশ মুখুয্যেও এই ষড়যন্ত্রের মূলে। সেইই এইভাবে বড় মেয়েকে দিয়ে গোবিন্দবাবুর ছেলে বরুণকেও ফাঁসিয়েছিল। তাই নিয়ে পঞ্চগ্রামের মিটিংও হয়। নরেশই কায়দা করে বড় মেয়েকে বরুণের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য করিয়েছিল গোবিন্দবাবুকে।

এবার আবার সেই এক খেলাই খেলেছে নরেশ তার ছোট মেয়েকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে। মোহিনী এখানেও আসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতে, কিন্তু তলে তলে এই বাড়িতেই যে কুরুক্ষেত্র বাধাবার আয়োজন করে গেছে সেটা আজ বুঝছে হরিপ্রিয়া।

ওই ষড়যন্ত্রের শিকার কোনদিনই হবে না হরিপ্রিয়া। এত সহজে নরেশের কাছে ওই মেয়েটার কাছে কোনমতেই হার স্বীকার করবে না হরিপ্রিয়া।

তাই বলে বিজয়কে—ওই বিটলে শয়তান নরেশের হতচ্ছাড়া মেয়েটাকে বিয়ে করবি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ওই শয়তানদের পাল্লায় পড়লি কি করে?

বিজয় বলে—ওরা কেউ শয়তান নয়। গরীব হতে পারে কিন্তু শয়তান কখনই নয়। আর মোহিনী আমার জন্য যা করেছে তা কেউ করেনি। ওকে বিয়ে করে সেই উপকারের মর্য্যাদা আমাকে দিতেই হবে। তুমি উকিলবাবুকে জানিয়ে দাও, ওখানে বিয়ে হবে না।

বিজয় কথাটা কঠিন স্বরে জানিয়ে দিয়ে চলে যায়।

হরিপ্রিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। সে ভেবেছিল এবার তার জীবনের শেষ কাজ সে সমারোহের সঙ্গে করবে। বিজয়কে থিতু করে কিছুদিনের জন্য তীর্থ করতে যাবে।

কিন্তু সব পরিকল্পনা তার ব্যর্থ হয়ে গেল।

এবার হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের জেদও বেড়ে ওঠে।

তার মনের সুপ্ত সেই জমিদারী মেজাজটা এবার জেগে ওঠে। সে জানে সোজা কথায় কাজ না হলে অন্য পথই নিতে হবে। আর সেই পথই নেবার প্রস্তুতি করছে সে।

হরিপ্রিয়া সরকারকে তখুনিই ডাকিয়ে এসে শুধোয়—ওই নরেশ মুখুয্যের কত টাকা—কত ধান দেনা আছে আমাদের কাছে দেখে বলুন।

সরকার মশায় একটু অবাক হয়। বলে সে—অসময়ে ধান টাকার তাগাদা দেবেন মা? ধান উঠুক তারপর।

হরিপ্রিয়া গর্জে ওঠে—তোমার কাছে ওসব কথা শুনতে চাইনি। কত তার দেনা সেইটাই জানতে চাইছি। তুমি হঠাৎ নরেশের হয়ে ওকালতি শুরু করলে যে?

হরিপ্রিয়ার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে বিজয়ের ওই কথা শোনার পর। তার বিরুদ্ধে এ বাড়িতে যেন একটা ষড়যন্ত্রই চলেছে। সরকারও যেন বিজয়ের মতই নরেশকে আড়াল করতে চায়।

সরকার কথাটা সাধারণ ভাবেই বলেছিল। এত সাতপাঁচ ভেবে সে বলেনি।

গিন্নীমার কথায় তাই বলে—দেখছি মা।

সরকার জাবেদা খাতাপত্র বের করে এবার হিসাব দেখতে থাকে।

নরেশ মুখুয্যে সংসারের বোঝা টানতেই হিমসিম খেয়ে যায়। তবু এত চেষ্টা করেও কোনমতে দুই প্রান্ত মেলাতে পারেনা। দিনভোর গোসাইপুরের দত্তদের দোকানে কাজ করে, এখন দত্তদের ব্যবসাও মন্দা চলেছে। শুধু কাপড়ের দোকানই চলছে।

বাসনের কারবারে এখন শ্রমিক আন্দোলনের জন্য মন্দা এসেছে। তাই নরেশের ভাবনা হয় কোনদিন এই চাকরিও না চলে যায়। চাকরির পরও দু'একটা টুইশানিও করে। কিন্তু তাতেও তেমন কিছু আমদানী হয়না?

অথচ সংসারের চাহিদা তো রয়েছেই।

মোহিনীও বড় হয়েছে। বিয়ে-থা দিতে পারেনি এখনও। দু-একটা ছেলে অবশ্য দেখেছে। কিন্তু ছেলের বাবা-মা যা টাকা চান তা দেবার সাধ্য নরেশের নাই।

এদিকে বাড়িতে গিন্নীও ধমকায়।

—মেয়ের বিয়ে আর কবে দেবে? সারা গাঁয়ের মেয়েদের বিয়ে হয় ঠিকই। আর তোমার মেয়ের বিয়েই হয়না। আমার মেয়ে কি ফ্যালনা? রূপ গুণ কি নেই? পড়াশোনাও জানে।

নরেশ বলে—ওসবের কোন দামই নাই বড়বৌ পাত্রের বাবা মায়ের কাছে। তাদের কাছে বড় গুণ পাত্রীর বাপের টাকাই। সেই টাকা যে বাপ দিতে পারে না তার মেয়ের সবগুণ থাকলেও বিয়ে তার হবেনা।

গিন্নী বলে—তবু চেষ্টাতো করতে হবে। আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে তো হবে মেয়ের। নালে লোকে বলবে কি?

নরেশও ভাবছে কথাটা।

আগের দিনে সমাজে অসহায় মেয়ের আইবুড়ো নাম খণ্ডাবার জন্যই তখন বুড়ো-হাবড়া ঘাটের মড়াকে ধরে এনে সিন্দুর দান করে দেওয়া হতো। সেই বুড়োও কিছু টাকার বিনিময়ে সিন্দুর দেগে অসহায় মেয়ের কুমারীত্ব ঘুচিয়ে চলে যেতো অন্যত্র আর ওই সিন্দুর দাগাত। বুড়োও মরতো, বালবিধবা হয়ে আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করতো অনেক মেয়েরা।

সেই বিদ্যাসাগরের কাল আজও যেন অন্যরূপেই সমাজের বুকে টিকে আছে।

আজকের স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতবর্ষে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান এতটুকু বদলায় নি গ্রামীণ সমাজে।

গিন্নী বলে—দোজপক্ষের কোন ছেলে পাও দ্যাখো।

গিন্নীও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছে আজ। নরেশও বাধ্য হয়েই সেই কথাই ভাবছে।

মোহিনী মুখ বুজে ঘরের কাজ করে চলেছে। অন্তরালে থেকে সে মা-বাবার ওইসব কথাও শোনে। আজ মনটা নীরব ব্যর্থ হাহাকারে ভরে ওঠে। বিজয়ের কথা কাউকে সে জানায়নি। জানাতেও চায় না। নরেশ দোকানে বের হবে। হঠাৎ হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের গোমস্তাকে আসতে দেখে চাইল।

গোমস্তা বলে—মুখুয্যে মশায়, ঠাকরুন একবার দেখা করতে বলেছেন আজই দেখা করো। জরুরী তলব।

গিন্নীও কথাটা শুনেছে।

নরেশও ভাবছে কথাটা। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কাছে নরেশের টাকা-ধান অনেক দেনা আছে। ফি বছর দু-তিনবার করে ধান, টাকা নিয়েছে। আর উশুলও দিতে পারেনি।

অবশ্য সরকার খুবই হুসিয়ার লোক। সেইই বলিছিল।

—মুখুয্যেমশায় ধান টাকা তো নিয়েই যাচ্ছেন। একটা কাগজ তো করতে হবে। অবশ্য এটা সকলেই করে দেয়। দেনা শোধ করে দিলে কাগজও ফেরৎ পাবেন।

নরেশের টাকার দরকার। তাই বলে—ঠিক আছে। বলুন কি কাগজে সই করতে হবে?

কাগজ সরকার করেই রেখেছিল। নরেশও সই করে দেয়। তারপরও বেশ কয়েকবার টাকা-ধান এনেছে।

গিন্নী বলে—জোর তলব ঠাকরুনের। ব্যাপার কি গো?

নরেশ বলে—কোন দরকার পড়েছে। যাই দেখা করে ওই পথেই দোকানে যেতে হবে।

নরেশ মুখুয্যে ভাবতেই পারেনি যে তার জন্য এমনি এক সর্বনাশা সংবাদ অপেক্ষা করেছিল। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও কাছারি ঘরে রয়েছে। নরেশকে একবার কঠিন চাহনিতে আপাদমস্তক জরিপ করে বলে—সরকারমশাই ওর হিসাবটা বের করুন।

সরকারও সেটা বের করেই রেখেছিল। জানায় সরকার

—মুখুয্যেমশায় আপনার কাছে সূদে-আসলে বত্রিশ মন ধান আর চারহাজার তিনশো বাইশ টাকা পাবো। ধান টাকা অনেকদিন পড়ে আছে। কোন আদায়ই দেননি। দশদিনের মধ্যে ওসব টাকা ধান আদায় না দিলে আপনার বাস্তুভিটে আর তিন বিঘে ধান জমিই দখল করতে হবে।

নরেশ চমকে ওঠে—এ্যাঁ। দশদিনের মধ্যে আদায় দিতে হবে?

তারপরই হরিপ্রিয়াকে আর্তকণ্ঠে বলে—কোথেকে দোব?

হরিপ্রিয়া বলে কঠিন কণ্ঠে—সেটা আমি জানিনা। আমার ঘরে সিঁদ দেবে। আমার সর্বনাশ করবে আর তোমাকে ছেড়ে দোব?

নরেশ বলে—এসব কি বলছেন খুড়িমা? আমি আপনার সর্বনাশ করছি? এসব কি করে ভাবলেন?

হরিপ্রিয়া গর্জে ওঠে এবার। এ যেন রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে।

ঠাকরুন বলে—ন্যাকা। ভাজামাছটি উল্‌টে খেতে জানোনা? পেটে পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি তোমার। ওই মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছো বিজয়ের দিকে। মেয়েকে গছাতে চাও আমার ঘরে, আমার সর্বস্ব দখল করতে চাও আর মুখে বলছ কিছুই জানিনা।

নরেশ চমকে ওঠে।

—এসব কি বলছেন খুড়িমা? আমি এসবের বিন্দু-বিসর্গও জানিনা। আমার মেয়ে মোহিনীও এমন নয়।

—তবে কি ডেকে এনে মিছে কথা বলছি? কিছুই জানোনা? এই করে গোবিন্দবাবুর ঘাড়ে একটা মেয়েকে চাপিয়েছো—এবার ভেবেছো আর একটাকে কৌশল করে আমার ঘাড়ে চাপাবে। তাই বিজয়ের মাথা খেয়েছে ওই মেয়েটা।

নরেশ এসব জ্বালাবার কথাগুলো শুনছে নীরবে।

তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। হরিপ্রিয়া বলে—সাতদিনের মধ্যে দেনা ফেলে দাও, নাহলে ওই জমি-বাড়ির দখল নেব আদালত থেকে, তোমার গ্রামের বাস উঠিয়ে দোব। ওই মেয়েকে নিয়ে সহরেই যাবে—ওই ভাবে রোজগার সেখানে আরও অনেক বেশিই হবে। যাও—

নরেশ মুখুয্যে বের হয়ে আসে।

রোদের তাপও বেড়েছে। ওই মুক্ত প্রান্তর থেকে আগুনের হল্‌কা যেন ধেয়ে আসছে এদিকে। সর্বাঙ্গ জ্বলছে তার। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তার মেয়ে মোহিনী যে গোপনে ওই বড়লোকের নাতির সঙ্গে মিশেছে এতদিন এটা জানতোনা।

আজ ঠাকরুনের কথাগুলো নরেশকে যেন উন্মাদ করে দিয়েছে। গরীব হতে পারে সে। কিন্তু এত নীচ নয়। মেয়েকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে দেবার কোন ষড়যন্ত্রই সে করেনি।

এত নীচে নামতে পারেনি সে। আজ ওই মোহিনীর জন্যই এভাবে তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। শুধু তাই নয় হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও জেদী মহিলা। সে যা বলে তাই করে। তাই ভয় হয় এবার ওই মোহিনীর জন্য তাকে পথেই না বের হতে হয় সর্বস্ব হারিয়ে।

উন্মাদের মত হন হন্ করে নরেশ বাড়ির দিকে ফিরছে। খর রোদ তবু ছাতাটা মেলবার কথাও মনে পড়েনা তার।

মোহিনী উঠানে পাতকুয়োর ধারে বসে একরাশ ক্ষারে কাচা কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে। ক্লান্তিতে রোদে ঘামছে সে। নরেশকে ওইভাবে হন্ হন্ করে এই রোদে

গলদঘর্ম অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখে চাইল ওর স্ত্রী।

—কি ব্যাপার। ফিরে এলে যে।

নরেশ কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ সামনে কুয়োর ধারে মোহিনীকে দেখে লাফ দিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে ছাতাটা দিয়েই বেদম পিটতে থাকে।

আর্তনাদ করছে মোহিনী।

গিন্নী ছুটে আসে। ছোট ভাই-বোনগুলোও বাবার ওই রুদ্রমূর্তি দেখে কেঁদে ফেলে। নরেশ নির্দয়ভাবে মেয়েটার মাথায়-পিঠে প্রহার করে গর্জাচ্ছে।

—আজ খুন করেই ফাঁসি যাবো। হারামজাদা মেয়ে—পেটে পেটে এত শয়তানি তোর।

গিন্নী থামাবার চেষ্টা করে।

—করছ কি! এত বড় মেয়ের গায়ে হাত দাও! ছেড়ে দাও ওকে। ছেড়ে দাও—খুন করবো। এমনি করে সর্বনাশ ডেকে আনবে গুষ্ঠীশুদ্ধ সকলের?

মোহিনী কাঁদছে। নির্দয় মারে কপাল কেটে গেছে। সর্বাঙ্গে কালসিটে পড়েছে। কোনমতে মেয়েকে উদ্ধার করে ওর মা।

কান্নাকাটি হৈ-চৈ শুনে সুখদাও ওপাশ থেকে এসে পড়ে। তখন মোহিনীর কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া। কোনমতে আধছেঁড়া শাড়ি দিয়ে গা ঢাকার চেষ্টা করে ঘরের ভিতরে গিয়ে মোহিনী অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

নরেশ তখন গর্জাচ্ছে।

—কি করেছে শুধাও তোমার ওই মেয়েকে। ঠাকরুনের নাতি ওই পাগলা বিজের মাথা ঘুরিয়েছে। বিজে নাকি বলেছে ঠাকরুনকে মোহিনীকেই বিয়ে করবে সে। ঠাকরুনের পছন্দ করা ওই সহরের মেয়েকে সে বিয়ে করবে না।

গিন্নী কথাটা শুনে অবাক হয়।

—ওমা। এসব কি কথা?

নরেশ বলে—ঠাকরুন বলে আমরাই নাকি ষড়যন্ত্র করে মোহিনীকে ওই বিজের পিছনে লাগিয়েছি যাতে ওর নাতিকে হাত করে ওর সর্বস্ব দখল করতে পারি।

নরেশের গিন্নীও অবাক হয়—এসব কি কথা গো?

নরেশ বলে—তাই ঠাকরুন ডেকে নে গিয়ে যা-তা কথা শোনালো। গরীব হতে পার তাই বলে মেয়ের জন্য মানসম্মানও থাকবেনা? আর শেষ কথা শোনালো—সাতদিনের মধ্যে ওর সব দেনা শোধ করতে না পারলে আদালত থেকে এই বাড়ি—কাবিঘে জমি যা আছে দেনার দায়ে তার দখল নিয়ে আমাদের গাঁ থেকেই তাড়িয়ে দেবে।

নরেশের গিন্নী এই কথায় আঁতকে ওঠে। সেও চেনে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকে।

অনেকের অনেক সর্বনাশ করেছে সে। এবার তাদেরও পথেই দাঁড়াতে হবে ওর কোপে।

এসব সর্বনাশের মূলে ওই মোহিনীই। আজ তার জন্যই সারা পরিবারকে উৎখাত হয়ে পথে নামতে হবে। মোহিনীও শুনছে বাবা-মায়ের কথা।

সেও ভাবেনি যে বিজয়ের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তাকে এইভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে। তার বাবা-মা ভাই বোনদেরও সর্বস্ব হারিয়ে পথে বের হতে হবে। আজ মোহিনীর মনেও কি দুঃসহ জ্বালা ফুটে ওঠে।

খবরটা সরকারের কাছেই পায় বিজয়।

ওই মোহিনীর বাবাকে ঠাক্‌মা ডাকিয়ে এনে যা-তা বলেছে আর শাসিয়েছে ওদের সব দেনা সাতদিনের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। নাহলে বাড়ি জমি সব দখল করে তাদের গ্রাম থেকেই উচ্ছেদ করে দিয়ে পাপ বিদেয় করে নাতির বিয়ে দেবে ওই সহরের মেয়ের সঙ্গেই।

বিজয় কথাটা শুনে শুধোয়—মুখুযোমশায় কি বললেন?

সরকার বলে—কি আবার বলবে? দেনা দেবে কোথা থেকে?

—তাহলে ওদের গ্রামছাড়া-ভিটেছাড়াই করবে ঠাক্‌মা?

বিজয়ের কথায় সরকার বলে—কালই কোর্টে মুখুয্যের নামে নালিশ করতে বললেন কত্তামা।

বিজয় চেনে তার ঠাক্‌মাকে, সেও জেনেছে ঠাক্‌মার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা। এর আগে সেও দেখেছে নিধু ঘোষের মামলার শমনও চেপে দিয়েছিল কায়দা করে। বেচারা জানতেও পারেনি মামলার কথা। ঠাক্‌মা একতরফা ডিক্রি করিয়ে নিধুর পাঁচবিঘে জমির দখল নিয়েছিল। এখানেও তাই করবে।

বেচারা নরেশ মুখুয্যে জানতেও পারবেনা। তার সবকিছু হারিয়ে যাবে। আর এই সর্বনাশ ঘটবে বিজয়ের জন্যই। মোহিনী তার জন্য এতকিছু করেছে। আর তার বিনিময়ে বিজয় তাদের এতবড় সর্বনাশ করেই তার প্রতিদান দেবে?

এটা ভাবতেই পারে না বিজয়।

সে বলে—এটাকে আটকানো যাবেনা সরকার মশাই?

সরকার বলে—কত্তামার জেদের কথা তো জানেন। এটা তার জেদই। একে আটকানো যাবেনা ছোটবাবু।

বিজয়ের মনে ঝড় ওঠে। এই বাড়ি, এত সম্পদ যে এইভাবে লোকের সর্বনাশ করেই অর্জন করেছে তার পূর্বপুরুষ-এ কথাটাই বার বার মনে পড়ে। এসব পাপের ধন ভোগ করে বিজয়ের কেমন নিজেকেই পাপী বলে বোধহয়।

বৈকালে এসেছে বিজয় সেই বাগানে।

স্তব্ধ বাগানের ঘাটলায় প্রথম সে দেখেছিল মোহিনীকে এক সেবাপরায়ণা নারীর রূপে। সেদিন বেদনাহত বিজয়কে সে সেবা করেছিল তার মনে এনেছিল নতুন এক আশার আলো।

ক্রমশ বিজয় তার সান্নিধ্যে এসেছিল। নিজেকে ফিরে পেয়েছিল নতুন চেতনায়। আজ বিজয় পথ চেয়ে থাকে। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে. পাখিরা ঘরে ফেরে। স্তব্ধ বাগান পাখিদের কলরবে ভরে ওঠে। তারাগুলো জেগে ওঠে আকাশের আঙ্গিনায়, ঝড়ো বাতাস গাছে পাতায় যা খুশি তাই করছে।

জ্বলে ওঠে তারার রোশনী, মোহিনী আর আসে না।

বিজয়ের পথ চাওয়াই বৃথা হয়। মনে হয় তার জীবন শূন্য হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মোহিনী—তার জীবনের সেই উজ্জ্বল তারাটা।

মোহিনী দুপুর থেকেই খায়নি-দায়নি ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছে। চোখমুখ কেমন উদভ্রান্ত।

সুখদা ঠাকরুনও বলে—ওঠ মোহিনী। হাতে-মুখে জল দিয়ে কিছু খা। বাবা রাগের বশে কি করেছে ওসব ধরিসনা। রাগ চণ্ডাল। ওঠ।

মোহিনী নীরবেই বসে থাকে। আজ তার সব চেতনাই যেন লোপ পেয়েছে। সে যেন এক জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

নরেশ বাইরের দাওয়ায় গুম হয়ে বসে আছে।

বাড়িটা স্তব্ধ। মোহিনীর মা কোনমতে নিয়ম রক্ষার মত সন্ধ্যাদীপ জ্বালে মাত্র।

হঠাৎ কাকে উঠানে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে মোহিনীর মা। প্রদীপের ম্লান আলোয় দেখে বিজয় তাদের বাড়িতে এসেছে।

মোহিনীর মা চমকে ওঠে ওকে দেখে। অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে—বিজয়। তুমি।

বিজয় এর নামটা শুনে ঘরের ভিতরে বসে থাকা মোহিনীর মুখে যেন চাবুকের ঘা পড়ে। আজ এই অপমানের কারণ ওই বিজয়ই। মোহিনীকে সেই সবচেয়ে বেশি ঠকিয়েছে। অপমানিত করেছে!

তারপরও এসেছে এখানে। মোহিনী বের হয়ে আসে।

ওকে দেখে চমকে ওঠে বিজয়।

সুন্দর মুখটা কান্নায় ভারি হয়ে আছে। কপালের ক্ষতের রক্ত তখনও এখান ওখানে লেগে আছে। চোখে ওর কি দুঃসহ জ্বালা।

মোহিনী গর্জে ওঠে—আবার কেন এসেছো? এত সর্বনাশ—এত অপমান করেও

খুশি হওনি, এবার কাজ ফুরিয়েছে। বড়লোকের ছেলে এখানে দেনার দায়ে সব দখল নিতে এসেছো?

বিজয় বলে—মোহিনী—শোন—

মোহিনী গর্জে ওঠে—মিথ্যেবাদী ভণ্ড বের হয়ে যাও। সাতদিন পর দখল নিতে আসবে। এখন যাও। যাও এখান থেকে।

নরেশও গোলমাল শুনে ভিতরে এসে দেখে বিজয়কে।

নরেশ বলে—বিজয়, মেয়েটাকে অনেক দুঃখ দিয়েছো আমিও মাকে জানোয়ারের মত পিটেছি। দোষ তো ওরই। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছল। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা। তুমি যাও বাবা সাতদিন পর এই বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমরা যেখানে হোক চলে যাবো তোমার ঠাক্‌মাকে বলো। এই ক'দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও, শেষ কটা দিন।

বিজয় বের হয়ে যায় মাথা নীচু করে।

মোহিনীর মা বলে মেয়েকে—বোঝ এবার বড়লোকের ভালোবাসার ঠ্যালা। মেয়ে তো নোস শত্রু। এভাবে তোর জন্যে গুষ্ঠীশুদ্ধ পথে বসতে হবে তা কোনদিন ভাবিনি। ভাবিনি।

কি অসহায় ব্যথায় মায়ের বুক ভেঙ্গে কান্না আসে।

মোহিনী চুপ করে দেখছে, সবই শুনছে সে।

বিজয়ের রাতে ঘুম আসে না। বারবার মনে পড়ে মোহিনীর কথাগুলো। সেই কথাগুলো যেন চাবুকের মত তার মুখে এসে বাজে। মোহিনীকে ওরা নির্দয়ভাবে মেরেছে। কপালের রক্তে মুখ ভেসে গেছে। তার অপরাধ বিজয়ের জন্য ভেবেছিল তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, দিশাহারা বিজয়কে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল।

সুন্দর হাসিখুশি প্রাণবন্ত মেয়েটাকে আজ দেখেছে বিজয় একটা ধ্বংসস্তূপের মতই। সেইই এর জন্য দায়ী।

তার এই বংশপরিচয়, সম্পদ-প্রতিষ্ঠাই আজ মোহিনীর সবকিছু আশা-স্বপ্ন-সম্মান কেড়ে নিয়ে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বিজয় আজ নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করে।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে বিজয় ঠাক্‌মাকে বলার চেষ্টা করেছিল কথাটা। হরিপ্রিয়া ঠাকরুন বলে—তোমার কোন কথাই শুনবো না বিজয়। আমি ওদের কথা দিয়েছি। উকিলবাবুর কাছে কথার খেলাপ হোক চাই না। ওখানেই তোমার বিয়ে হবে।

আর এস্টেটের ব্যাপারে এখনও এসব আমারই। আমার কথামতই কাজ হবে। তোমার এ ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নাই।

বিজয় সরে আসে।

বিজয় বেশ বুঝেছে এই বাড়িতে তার কোন দামই নাই। ওই হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের হাতের পুতুল মাত্র সে। তার নিজস্ব কোন মতামতই নাই।

রাত্রি ভোর কি ভাবে বিজয়!

স্বপ্ন দেখে সে আর মোহিনী কোন দূর কাশফুল ফোটা নীল আকাশের অসীমে কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই রঙ্গীন মেঘের ভেলায় ছুটে চলেছে তারা নীল সাগর পাড়ি দিয়ে। হাওয়ায় উড়ছে মোহিনীর শাড়ির নীল আঁচল, এলো চুলের বন্যা নেমেছে।

ডাকছে তাকে বিজয়---মোহিনী, মোহিনী!

মোহিনী দূর থেকে তাকে ডাকছে, মুখে ঝলমলে কি খুশির হাসি, দুচোখ সেই হাসির দীপ্তি।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল বিজয়। চমকে ওঠে।

নিজের ঘরের মধ্যেই রয়েছে বিজয়। রাত অবধি জেগে কখন ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেনা। বেলা হয়ে গেছে।

সে স্বপ্নই দেখছিল। সে আর মোহিনী এসব ছেড়ে কোন দূরদেশে চলে গেছে। ধড়মড় করে ওঠে।

তার বাহন নোটনই ডাকছে তাকে। বিরক্ত হয়ে বলে বিজয়

—সাতসকালে এত হাঁকাহাঁকি কেন রে? ঠাকমা ডাকছে? বলগে তোর ঠাকরুনকে আমি কারো খাস তালুকের প্রজা নই। যা তো!

নোটন বলে—না গ। কত্তামা ডাকছেনা। কি কাণ্ড হয়েছে জানো? সারা গাঁ ভেঙ্গে পড়েছে!

—কি হয়েছে? শুধোয় বিজয়।

নোটন বলে—ওই নরেশ ঠাকুরের মেয়ে মোহিনী—গলায় দড়ি দে ঝুলে পড়েছে। ব্যাস—খতম!

বিজয় চমকে ওঠে---কি বললি?

ধড়মড় করে উঠতে গিয়েই কেমন মাথাটা টলে পড়ে যায় জ্ঞানও নাই তার, নোটন চীৎকার করে ওঠে—কত্তামা, সরকার মশায়, শীগগীর আসেন গ।

ছটুবাবু কেমন করছে। শীগগীর আসেন।

সারা গ্রামের হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় খবরটা।

নরেশ মুখুয্যে দাওয়াতেই শুয়েছিল। ওদিককার ঘরে গিন্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুয়েছিল।

রাতের বেলায় কখন মোহিনী ঘর থেকে বের হয়ে এসে ঢেঁকিশালের ওদিকে চালার বাঁশে গরু বাঁধা দড়িটা গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়ে।

ওর মা ভোরে উঠে ওই দৃশ্য দেখে চীৎকার করতে সারা পাড়ার লোক, গ্রামের লোক এসে পড়ে নামায়, রমণ ডাক্তারও এসেছে, গোবিন্দবাবু ও রমণ ডাক্তার বলে। আর করার কিছুই নাই কাকা। সব শেষ হয়ে গেছে।

গোবিন্দবাবু বলেন—এইভাবে শেষ হয়ে গেল মেয়েটা?

খবর পেয়ে চমকে ওঠে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও। সে একটু শাসন করতে চেয়েছিল নরেশকে যাতে তার মেয়েকে সেও শাসন করে। কিন্তু ঘটনাটা এইভাবে মোড় নেবে তা ভাবতেও পারেনি।

সরকারমশাই বলে—মেয়েটা সত্যিই ভালো ছিল কত্তামা। বিজয়বাবু ওর জন্যই সেরে উঠেছিল।

নোটন বলে—হঃ গো। ছোটবাবুর সঙ্গে পেরায় কথা হতো ওর ওই বড় বাগানের ঘাটলায়। সেইই ছুটবাবুকে পড়তে বলতো, ইস্কুলে যেতে বলতো, বলতো কত্তামার সব কথা শুনবে। ছোটবাবু ওর কথা খুব শুনতো গো।

হরিপ্রিয়া আজ যেন ভাবছে কথাটা। তবু ধমকে ওঠে—থাম তো?

তবু আজ কেমন যেন নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

সারা গ্রামের লোকের সামনে আজ হরিপ্রিয়া ঠাকরুন কি জবাব দেবে জানেনা।

বিজয়ের জ্ঞান ফিরেছে।

সব কেমন গুলিয়ে যায় তার, সে বের হয়ে আসে বাড়ি থেকে।

আনমনে চলছে। কোথায় যাচ্ছে সেও যানেনা। ওপাড়ায় লোকজনের গোলমাল শুনে দাঁড়ালো। কাকে হরিধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাঁদছে মোহিনীর মা-বাবা!

বিজয় হঠাৎ লাফ দিয়ে দৌড়ালো।

হরিপ্রিয়া, সরকারমশাই রয়েছে কাছরিতে হঠাৎ বিজয়কে দেখে চাইল ঠাকরুন। বিজয়ের দামী জামাটা ছিঁড়ে ঝুলছে। চোখ-মুখের চেহারাও বদলে গেছে।

এবার লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে হাসতে থাকে

—ঠাকরুন-বালিহারী ঠাকরুন, এ্যাঁ! মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিলে মাইরী?

কতটাকা আর জামাবে? টাকা আকড়ে স্বগ্গে যাবে! বলিহারী কি বলিহারী—সরকার! তুমিও পাপের সামালাদার। নরকে লটপট করবে—

চমকে ওঠে হরিপ্রিয় ঠাকরুন।

—ওরে বিজয়!

বিজয় হাসছে। অদ্ভুত এক হাসি যেন এক নতুন বিজয় যে আজ অতীতের সবকিছুকে ভুলে গেছে। বলে

—বিজয়। কে বিজয়! এ্যাঁ।

উন্মাদের মত বের হয়ে গেল। নোটন ডাকছে—ছুটবাবু, ছুটবাবু

—চোপ শালা ঠাকরুনের চামছে। তুইও নরকে যাবি।

বিজয় বের হয়ে গেল দৌড়ে।

এযেন আগেকার সেই উন্মাদই। হরিপ্রিয়া বলে।

—একি হল সরকার। সুস্থ ছেলেটা এ ক্যামন হয়ে গেল। ওরে নোটনা যা কোথায় গেল দ্যাখ!

নোটনাও ছুটলো পিছু পিছু।

গ্রামের শ্মশানে অনেকই গেছে।

একটা ফুলের মত মেয়ে শূন্যহাতে দুঃসহ অপমানের নীরব প্রতিবাদ করে নিজেকে শেষ করে দিল।

সুখদা বলে—একি সব্বোনাশ হলরে। দেখবি এ ধম্মে সইবে না। সকলেই নীরব।

এই গ্রামের একটি মেয়ে তবু অন্যদের প্রতিবাদ করে গেল। এসেছে টগরও। মোহনীকে সেও ভালোবাসতো। আজ মোহিনীর মৃত্যুও যেন টগরের মনে একটা নীরব ব্যর্থতার বেদনা আনে।

মেয়েদের কি এই ভাবে মুখ বুজে সব অপমান, অত্যাচার সহ্য করতে হবে। তারই প্রতিবাদে টগর সেই লোকটার ঘর ছেড়ে এসেছিল। তবু নিজে লড়াই করে বেঁচে আছে কিন্তু মোহিনী সেই লড়াইটা করতে পারেনি।

সেই সাহস তার ছিলনা। তাই এভিাবে নিজেকে শেষ করে দিয়ে গেল। টগর বলে—সেই বড়লোকের বাচ্চার মুখে ঁটা। মেয়েটাকে এভাবে ঠকালো? তারপর আবার সেজেগুজে যাবে সহরে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে?

সুখদা ঠাকরুন বলে ভগমান ইয়ার বিচার করবেক লা। টাকার গরমে হরিপ্রিয় ঠাকরুন মানুষকে মানুষ বলেনা। এখনও লোকের সর্বস্ব কেড়ে লিতে চায়। এর বিচার হবেক লা।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন জানেনা এ তারই শাস্তি কিনা। সকালবেলা থেকেই বিজয় বের হয়েছে। এখনও ফেরেনি। বিকেল হয়ে গেছে। দিনভোর ছেলেটার পাত্তা নাই।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনেরও নাওয়া-খাওয়া হয়নি।

বের হয়েছে নিজেই বিজয়ের সন্ধানে। মাঠ—এদিক ওদিক তার কোন পাত্তা নাই। নোটনের গলা শুনে চাইল।

—কত্তামা, ছুটবাবু ওই বড় বাগানের ঘাটের ধারে রইছে গো!

—চলতো!

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন চমকে ওঠে নির্জন বাগানে বিজয়ের বেসুরো গলার গান ভেসে

আসে। আগে পাগল হয়ে যেমন করে গাইতো এসেই সুরই। এগিয়ে এসে দেখে জামাটা ছিড়ে ঝুলছে, মাথায় আমপাতার মুকুটের মত, কাপড়টা ধূলিধূসর, হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে বাঁশরীতে পরিণত করে বিজয় গাইছে সেই গান

—আমি বৃন্দাবনের বনেবনে ধেনু চরাবো।।

ঠাকরুনকে দেখে এবার চাইল বিজয়। হরিপ্রিয়া ডাকছে

—বিজয়! ওরে বিজু!

বিজয় চমকে ওঠে—এ্যাঁ, ঠাকরুন। যাও ঝম্‌ঝম্ টাকার বাদ্যি শোন গে! অনেক টাকা তোমার, নে স্বপ্নে যাবে। ওই গ্যাঁড়াকলে আমি আর নাই।

—ওরে বিজয়! বাড়ি চল—আর্তনাদ করে হরিপ্রিয়া।

বিজয় তন্ময় হয়ে গাইছে

—বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবো।

ধেনু চরাবো গো আমি

বেনু বাজাবো।।

ও যেন আর হরিপ্রিয়া ঠাকরুনকেও চেনেনা। তার সম্পদও তার কাছে আজ তুচ্ছ। জীবনে যে আশার আলো জ্বেলেছিল সেই আলোটাই আজ তার নিভে গেছে। জীবনের মোহিনীরূপকে সে আজ আর চেনেনা।

বেসুরো বিকট চীৎকার করে চলেছে আবার আগেকার মত ছেলেটা। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের দুচোখে আজ বাঁধনহারা অশ্রু নামে। সে নিজের কত বড় সর্বনাশ করেছে লোভের বশে, জিদের বশে আজ মর্মে-মর্মে বুঝেছে সে।

শালবনের মাঝে পঞ্চতীর্থের আশ্রমে ওঠে উপনিষদের স্তোত্রপাঠের সুর। সকালের আলোয় ঝলমল করছে গাছগাছালি। বাতাসে মাধবী, কুর্চি—নাম না জানা বনফুলের সৌরভ।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের হোমাগ্নির পবিত্র সুবাস জাগে। গ্রামে অনেকেই আসে সকালে দিন শুরুর আগে, এখানে প্রাণাম করে যায়। প্রতিদিনের গ্লানি মালিন্য মুক্ত হতেই আসে এখানে সাংসারিক মনুষের দল। প্রতাপনারায়ণও আসেন।

পঞ্চতীর্থ নিতু অন্যদের পাঠ ব্যাখ্যা করছেন।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এসেছে। এক কঠিন আঘাত তাকে মুষড়ে দিয়েছে।

নীরবে বসে আছে নাটমন্দিরে। পঞ্চতীর্থ উপনিষদ পাঠ করছেন

— ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাগৃবিষয়াংস্তেষু গোচরাণ।

আত্মন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাগৃর্ম নীষিণঃ।।

মানুষের স্থূলদেহকে রথরূপে, সূক্ষ্মদেহকে রথের পরিচালক রূপে এবং আত্মা

বা আমিকে রথীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান, তাই বুদ্ধিকেই সারথী বলা হয়েছে আর মনকে লাগাম এবং ইন্দ্রিয়দের অশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

সারথি যদি সুবিবেচক হয় তবে লাগাম সংযত করে অশ্বদের নিজের ইচ্ছামত চালনা করতে পারবে। কিন্তু সারথী দক্ষ না হলে অশ্বগণই সারথি সমেত রথীকে কোন গভীর খাদে ফেলেই শেষ করে দিতে পারে।

তাই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটলে সর্বনাশ তো হবেই।

প্রতাপবাবু শুনছেন কথাগুলো, হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও আজ ভাবে সত্যদ্রষ্টার ঋষির এই কথা কঠিন সত্য। তারই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল। নিজেকে সে সংযত করতে পারেনি লোভ, জেদ আর অহংভাবের জন্য তাই আজ তার জীবনে এই চরম বিপর্যয়ই ঘটেছে।

প্রতাপবাবুর মনে হয় সারা সমাজ, দেশের মানুষ আজ যেন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে এমনি এক অতল অন্ধকারের দিকেই ছুটে চলেছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য অতীতকে ভুলতে চলেছি। সব মূল্যবোধকে তুচ্ছ করেছি এক গোলকধাঁধার আবর্তে গড়ে। তার ছেলে প্রদীপও আজ এক নতুন মতের বিশ্বাসী। নতুন পথের পথিক।

প্রতাপনারায়ণ ওই জঙ্গলের সাড়ে ছশো বিঘে জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। এদিকের কিছু জমি বিক্রি করার কথা ভেবেও রেখেছেন।

প্রদীপকে বলেন তিনি,

—ভাবছি এখানের জমিজায়গা বিক্রি করেদিয়ে দুর্গাপুরেই চলে যাবো। তুমিও এখানে থেকে কি করবে? তুমিও দুর্গাপুরে ওখানেই চলো। কিছু কাজকর্ম-ব্যবসাপত্রই করবে ওখানে। এখনতো ওখানের বাজার আরও জমে উঠবে।

প্রতাপবাবুও দেখছেন বনের মধ্যে দুচারটে গ্রাম বসত ছিল তাদের খাস জঙ্গলে, ওখানে কাছারি বাড়িও আছে বনের মধ্যে ওই কাছারি বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন।

প্রদীপও গেছে। ওই কাছারি কাছেই একটা বড় মজা দিঘি রয়েছে। বর্ষায় বনগড়ানি জলে তা ভরে ওঠে। পরে জল সামান্যই থাকে আর বনের চিতাবাঘ, বনশুয়োরের দল গ্রীষ্মে ওখানেই জলের সন্ধানে আসে।

রাতের অন্ধকারে পুকুরের বাঁধের নীচে কিছুটা গর্ত করে ওখানে অপেক্ষা করে বনশুয়োরের দল জল খেতে নামলে সেখান থেকে গুলি করে শিকার করেছেন তিনি।

প্রদীপও শিকার করেছে। সেইসব বন কেটে এখন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বড় বড় কারখানার কোয়াটার টাউনশিপ হচ্ছে। ওইসব জায়গার রূপও বদলে যাবে।

প্রতাপবাবু বলেন,

—ওখানেই চলো

প্রদীপ দেখেছে ওদিকের পরিবর্তনের ঢেউ ওখানেও এসে লাগবে। এই জায়গাটা তার মায়ের, মা আজ নেই। প্রদীপ মায়ের স্মৃতি বিজড়িত এই ঠাই ছেড়ে যেতে চায় না।

এখানেই থাকবে সে। এই শিল্পায়ণের পর ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের সময়ই দরকার মানুষকে ঠিক পথে চালানো যাতে মুক্ত শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কায়েম করা যায়।

প্রদীপ বলে—এখান থেকে যাওয়া আমার হবেনা বাবা।

—কেন? প্রতাপবাবু অবাক হন।

তার কাছে একটা খবর এর মধ্যে এসেছে।

গোসাঁইপুরে এতদিনের চেষ্টার পর হরিশবাবু অঞ্চলপ্রধান। গোবিন্দবাবুদের চেষ্টার বালিকা বিদ্যালয় হয়েছে। প্রদীপকেই তার সেক্রেটারী করা হয়েছে। এখন স্কুলেই সকালে মেয়েদের ক্লাশ চলছে। পরে চেষ্টা চলছে গার্লস স্কুলের নতুন বিলডিং করার জন্য। সেই গার্লস স্কুলের শিক্ষিকাও এসেছেন কয়েকজন।

মনিকা সান্যালই স্কুলের নতুন শিক্ষিকা, সহর থেকে এসেছে। আর প্রদীপের সঙ্গেই কলেজে পড়তো। শোনা যায় প্রদীপের চেষ্টাতেই সে চাকরি পেয়েছে। প্রদীপও চায় গার্লস স্কুলের বিলডিং হোক। এই নিয়েই সেও ব্যস্ত।

প্রদীপ বলে—এখানেই থাকতে হবে বাবা।

প্রতাপবাবু কথা বলেননা। তবে মুখে তার বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে।

কমল দাস এর মধ্যে আরও অনেক কিছু ভেবেছে।

সে বুঝেছে কাংসশিল্পের ব্যাপারটা ছাড়াও তাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে গেলে আর অন্য শিল্প কিছু গড়তে হবে। তাই জায়গারও দরকার।

ওই জঙ্গল মহল কেনার সময় কমল বুঝেছিল প্রতাপবাবু এখানের সব কিছু বিক্রি করে দিয়েই দুর্গাপুরে ফিরে যেতে চান। জমিদারের পরিচয় হারিয়ে এখানে সাধারণ মানুষের মত পড়ে থাকতে চাননা তিনি। তাই এখানের সবকিছু বিক্রিই করে দিতে চান।

কমলের ইচ্ছা ডাঙ্গার বাকী জমি মায় ওই জমিদার বাড়িটাই সে কিনে নেবে। ওই বাড়িতেই সে মেরামত করে কিছুটা আধুনিক ডিজাইন গড়ে নিয়ে এখানেই থাকবে।

তবু লোকে বলবে জমিদার আর নেই। সেই প্রাসাদ এখন কমলবাবুর। প্রতাপবাবুদের নাম মুছে যাবে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আজকের নতুন শ্রেণীর প্রতিভূ কমলবাবু।

প্রদীপ বাবার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছে বাবা হৃতগৌরব হয়ে এখানে থাকতে রাজী

নন। মহালই নেই, জমিদারএর ধ্বংসাবশেষ হয়ে এখানে থাকতে চাননা। তাঁর দিন ফুরিয়েছে।

কিন্তু প্রদীপ সেটা মানতে রাজী নয়। জমিদারী একদিন যাবেই এটা সে জানতো। কিন্তু শূন্যস্থান থাকেনা। সেই শূন্যতা নতুন কিছু দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। এখন সমাজের বুকে নতুন একটা শ্রেণীর উদ্ভব হবে।

একদিকে বৈশ্য আসবে টাকার পুঁজি নিয়ে, আর পাশাপাশি আর একটা শ্রেণীও গড়ে উঠবে সমাজে। যারা নিজেদের বুদ্ধি আর কূটনীতিতেই সমাজের বহু মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবে। দেশকে চালাবে।

জমিদাররা তো নিজেদের এলাকাতে প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছিল অনেক দিয়ে থুয়ে। আর দেশ চালাতো ইংরেজ তাদের মত করে। এখন ইংরেজ নেই। দেশ চালাবে দেশের এই শ্রেণীই। এরা হবে জমিদারের থেকেও অনেক শক্তিমান।

প্রদীপ সেই শ্রেণীরই স্বপ্ন দেখে।

গ্রামের প্রান্তে কয়েকটা একতলা বাড়ি গড়ে উঠেছে। পিছনে ডোম-লোহারদের পাড়া। এই কোয়াটারের একটাতে মণিকা সান্যাল এসে উঠেছে। সহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে।

কলেজে পড়ার সময় দেখেছিল প্রদীপকে।

ফর্সা রং চোখে-মুখে আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু তরুণ প্রদীপ রাজনীতি করতো বিরুদ্ধ দলেই। মণিকার সঙ্গে কলেজেই পরিচয়।

মণিকাও মহিলা সমিতির কাজ করতো। ছাত্র ইউনিয়নেও রাজনীতি করতো প্রদীপের সঙ্গে। মিটং-মিছিলেও যেতো। ভূধরবাবু তাদের জেলার নেতা।

তিনিও প্রদীপদের চিনতেন। তখন ওদের রাজনীতি করা ছিল বেশ ঝুকির। প্রতিপক্ষ অবিনাশ বাবুরাই দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত দল, সহরে তাদের আধিপত্য বেশি।

তাই মিছিলে গোলমালও হতো।

সেদিন ওদের মিছিল চলেছে সহরের মধ্য দিয়ে। লোকজন তখনও তাদের মতবাদকে সঠিকভাবে মেনে নিতেও পারেনি। তবু সহরের শ্রমিক সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সামনে তারা শোনাতো আশার বাণী। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনেও প্রদীপ সামিল হয়েছে ভূধরবাবুর নেতৃত্বে, মিছিল চলেছে সহরের বুক দিয়ে। মালিকরা সেই দাবীকে সমর্থন করেনা। তাই শ্রমিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্যই তারা বোমা মেরেছে কয়েকটা। অতর্কিত আক্রমনে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বোমা পড়ছে। কে প্রদীপকে টেনে নিয়ে একটা গলির ভিতর বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে ঢুকিয়ে দেয়।

বাইরে তখনও আক্রমণ চলেছে। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে ভীত-ত্রস্তভাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। পুলিশও আসে।

প্রদীপ আবিষ্কার করে এটা মণিকাদেরই বাড়ি। আর তাড়া খেয়ে সেখানেই সে আশ্রয় নিয়েছে। মণিকাই বলে—বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। চা খাবে তো?

প্রদীপ বলে—হঠাৎ বোম চার্জ করলো, একবার দেখে আসি।

মণিকার মা বলে—ওরা সব চলে গেছে। পথে দেখলাম পুলিশ টহল দিচ্ছে এখন বের হয়ো না বাবা। একটু শান্ত হলে বের হবে।

মণিকার ঘরে বসেই কথা বলছে প্রদীপ।

মণিকা এর মধ্যে চা-টোস্ট এনেছে বলে—অনেক স্লোগান দিয়েছো, এবার গলা ভেজাও গলা বসে গেছে! প্রদীপ বলে—এত সহজে গলা আমাদের বসে না। সামনে অনেক পথ। অনেক লড়াই, এত সহজে রণে ভঙ্গ দিলে চলবে?

মণিকা বলে—শুনি জমিদার বংশের ছেলে, তা এই পথে এলে কেন? রাজনীতি করতে সাধ তো দিব্যি নেতা সেজে বসলেই তো পারতে। জমিদারদের একটা কোটা আছে শুনি রাজনীতিতে।

প্রদীপ বলে—জমিদারীর দিন শেষ মণিকা। এখন আসছে জনতার যুগ। গণ-দেবতার কাল। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গেই থেকে সকলের জন্য লড়তে হবে। আর এই লড়াই-এ নিম্নমধ্যবিত্তকেই এগিয়ে আসতে হবে।

—কেন?

প্রদীপ বলে—সমাজ, দেশের নতুন শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের ঠাঁই করতে হবে মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য।

মণিকা বলে—নেতা হতে চাও?

—নেতা কি জানি না। তবে মানুষের, সমাজের রূপটা বদলাতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে, যেখানে মানুষের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে।

মণিকা বলে—আর সেটা আনতে চাইছ তোমাদের মত নেতারা?

তা ভালো। কিন্তু মানুষের মনের লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধে কি উঠতে পারবেন তারা?

প্রদীপ ভাবছে কথাটা। মণিকা বলে—তা যদি না পারেন তাহলে ইংরেজ শোষণ করেছে, এরাও তাই করবে। তারা টাকা লুঠ করেছে, এরাও তাই করবে। সেটা হয়তো এখনই হবেনা। কিন্তু অর্থের লোভ, গদির মোহ তাদের কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে?

প্রদীপ বলে—সেটা এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের নীতিতে যারা বিশ্বাসী তারা সেই নীতিভ্রষ্ট কোনদিনই হবে না। আর সেই জন্যই এই খাঁটি মানুষদের সব চেষ্টাকে ওরা আঘাত করে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

মণিকা দেখছে প্রদীপকে।

প্রদীপও দেখছে মণিকাদের সংসারের অবস্থা। কলেজেও দেখেছে মণিকা সাধারণ পোষাকেই যায়। অন্য অনেক মেয়েদের মত তার পোষাক, আশাক, প্রসাধনের বাহুল্য, জাঁকজমক, প্রদর্শনীর মনোভাবও নেই।

আর সেই সামর্থ্যও নেই তা বুঝেছে। তবে তার জন্য মণিকার মার্জিত রুচিবান মনে কোনও ক্ষোভও নাই।

প্রদীপ ক্রমশ ওদের বাড়িতেও যাতায়াত করে।

আর মণিকাও প্রদীপের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে। এখন সেও সহরের মহিলা সমিতির কাজকর্ম দেখাশোনা করে। প্রদীপ বলে—এর জন্য পড়াশোনা করা দরকার।

তাই প্রদীপই তাকে দেশ-বিদেশের কিছু বই, দলের পামলেট এসবও দেয়। মণিকারও মনে হয় এই পথে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা যেতে পারে। এদিকে সংসারের কথাও ভাবতে হচ্ছে মণিকাকে।

বাড়িতে বিধবা মা ছোট ভাই রয়েছে। তার স্কুলের খরচা—সংসারের খরচাও আছে। সহরের বাড়ির একাংশ ভাড়া দিয়ে আর মায়ের পেনসনের টাকাই ভরসা।

তাই প্রদীপই চেষ্টা করে তার চাকরির ব্যবস্থা করতে মণিকাও খুশি হয়। সদর থেকে এসে এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। সামনে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের শেষে শালবনের শুরু। স্কুলের পর তার অখণ্ড অবসর।

সে তাই বৈকালে গ্রামের মেয়েদের পড়াবার কাজই নিয়েছে।

সেই ক্লাস বসে বরুণদের বাড়ির বাইরের ঘরে। গ্রামের অনেক বৌঝিরা আসে। গোবিন্দবাবুর স্ত্রীও এই নারীশিক্ষা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে।

আসে টগরও।

যৌবনদৃপ্ত তেজী মেয়েটাকে দেখেছে মণিকা। পড়াশোনায় খুব মাথা। ক'মাসেই লিখতে-পড়তে, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতেও শিখে গেছে। মণিকা বলে—গার্লস স্কুলই ভর্তি হও টগর।

টগর বলে—সকালে তোমার ইস্কুল দিদিমণি, সকালে আমার দুধ দোহানো, মহাজনদের দুধ দেওয়া, দামের হিসাব করা, সংসারের কাজ, কত ঝামেলা। এই বৈকালেই আসবো।

প্রদীপ আসে স্কুলের পর।

এখন সে স্কুল বিলডিং-এর জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরছে টাকার জন্য।

সাধারণ মানুষও এগিয়ে এসেছে। এ যেন তাদেরই কাজ। এবার স্কুলের ওদিকে

পতিত ডাঙ্গাতেই স্কুল বিলডিং, মেয়েদের বোর্ডিংও হবে। সরকার থেকেও টাকা আসবে। প্রদীপদের জায়গা ওটা। প্রদীপ ওখানেই স্কুল গড়বে।

এমনি দিনে কমলবাবু আসে আবার প্রতাপের কাছে। এখন সে ওই ডাঙ্গা আর প্রতাপবাবুর বাড়িটাই কিনতে চায়। প্রতাপবাবু কি ভাবছেন।

কমল বলে—দাম যা বলবেন তাই দেব। তবে দেখছেন তো কত বড় মেরামত করাতে হবে। তার খরচাও কম নয়।

প্রদীপ দেখেছে কমলকে এ বাড়িতে আসতে। এর আগে কমল জলের দামে জঙ্গল মহলের বিস্তীর্ণ জমি কিনে নিয়েছে। পরে প্রদীপই বলে বাবাকে—ওই জমি কেন ওকে দিলেন?

প্রতাপবাবু ছেলের কথায় একটু অবাক হন। প্রদীপ বলে—ওখানের নীচে প্রচুর সেরা জাতের পাথরের লেয়ার আছে। ওটা জেনেই ও এসেছিল। আর আপনি জলের দরে ওটা ওকে দিয়ে দিলেন?

যেন কৈফিয়ৎ চাইছে প্রদীপ।

প্রতাপবাবু বলেন—ল্যাণ্ড শিলিং-এ আটকাতো, তাই দিয়ে দিলাম। তাছাড়া এখানের সব পাট চুকিয়ে দিতে চাই। তোমাকেও বলেছি।

প্রদীপ বলে—আমি এখানেই থাকবো।

প্রদীপ যেন তার মতামতই জানিয়ে দিতে চায়। এই নিয়ে পিতাপুত্রের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে। আর কমল দাস এই সুযোগটাই নিতে চায়।

বিভূতি দাস প্রতাপবাবুর জমিদারীর কাজকর্ম দেখতো। এখন জমিদারী নাই। বিভূতি অবশ্য তার আগেই প্রতাপবাবুর আশপাশের মহালের বেশ কিছু ধানি জমি বাগান-পুকুর বেনামীতে নিজেই বন্দোবস্ত নিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে।

আর কমল দাসও এহেন পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে কাজ দিয়েছে। এখন কমল দাসের জমিজারাত সেই দেখাশোনা করে। অবশ্য বিভূতিই মাঝে মাঝে এখনও প্রতাপবাবুর কাছে যায় আর সেইই ওইসব জঙ্গল মহাল কিনিয়ে দিয়েছে কমলকে জলের দরে। অবশ্য কমলও তাকে কিছু বকশিশও দিয়েছে সেটা গোপনেই।

বিভূতিকে বলে কমল—ওই বসতবাড়িটা বিক্রির জন্য বলো বিভূতি প্রতাপবাবুকে।

বিভূতি দাস এখনও পুরোনো মনিবের কাছে আসে। খোঁজ-খবরও নেয়।

আর বিভূতিই এখন কমলের ইঙ্গিত মত বাপ-ছেলের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইটাকে উস্কে দিতে চায়।

বিভূতিই বলে—প্রদীপবাবু তো এখনও ঘরের খেয়ে বনের মোষই তাড়াচ্ছেন। জমিদারী গেল—দুর্গাপুর জমে উঠছে। এখন ওখানে কত লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।

বংশের ধারা তো রাখতে হবে। এইসব করলে চলবে?

ছোট লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন। ওদের লাই দিলে তো মাথায় উঠবে। প্রতাপবাবু চুপ করে শোনেন কথাগুলো, আর কথাগুলো মিথ্যা নয় তাও তিনি জানেন। প্রতাপবাবু ভেবেছিলেন প্রদীপ দুর্গাপুরে গিয়ে ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করবে। এখন ওখানে কত কাজ। তার ভাইপোরা এর মধ্যে ঠিকাদারী, সাপ্লাই-এর কাজ শুরু করে অনেকে গাড়িও করেছে।

বিভূতি বলে—আর ওই নতুন মাষ্টারণীর সঙ্গেও দেখি বেশি মেলামেশা করছেন। গ্রামে মহিলা সমিতি গড়া হচ্ছে। কি হবে এসব করে?

তারপরই বিভূতি বলে—মনে হয় আপনি তাড়াতাড়ি দুর্গাপুর চলে যান এখানের পাট চুকিয়ে তাহলে ছোটবাবুও যেতে বাধ্য হবেন। তাতে তার ভালোই হবে।

প্রতাপ বলে—কিন্তু এখন ওসব তো বিক্রি বাটা হয়নি হে। যাই কি করে?

বিভূতি এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। এবার বলে সে

—যদি বলেন তাহলে খদ্দের দেখতে পারি।

প্রদীপ আড়াল থেকে বিভূতির কথাগুলো শুনেছে। ও জানে এসব কমল দাসের কৌশলই। প্রদীপ এখানে থাকলে সবকিছুর দখল পেতে কমলেব অসুবিধাই হবে। তাই এখানের পায়ের তলের মাটি কেড়ে নিয়ে কমল প্রদীপকে সরাতে চায়।

কথাটা মণিকাও শুনেছে। সে এই দূর পল্লীগ্রামে এসেছে প্রদীপের ভরসাতেই। জায়গাটা তার ভালো লেগেছে। গ্রামে গোবিন্দবাবুর পরিবারের সঙ্গেও মেশে দেখেছে মেয়েদের। এখানে করার কিছু আছে।

তবু প্রদীপদের সব বিক্রি করে চলে যাবার কথা শুনেছে টগরের মুখেই। গুণময়বাবুই নাকি বলেছে কথাটা সেদিন স্কুলে।

ইদানীং গুণময়ও গার্লস স্কুল কমিটিতে এসেছে কমলবাবুর তরফ থেকে। সেই আশা করে প্রদীপ চলে যাবার পর সেক্রেটারী হবে সেইই। মণিকা চুপ করে কথাটা শোনে মাত্র। তার কেমন ভয়ও হয়। ওই গুণময়বাবু এখন এখানের নামী ব্যক্তি। মটরবাইক হাঁকিয়ে সগর্জনে এলাকায় ঘোরে। লোকটাকে ভালো লাগেনা মণিকার।

মণিকা সেদিন প্রদীপকে বলে—এখানে চাকরি বোধহয় করা যাবে না বেশিদিন।

—কেন? প্রদীপ শুধোয়।

বলে মণিকা—তোমরা তো এখানের সবকিছু বিক্রি করে দুর্গাপুরেই চলে যাবে শুনলাম। তারপর কি এখানে থাকা যাবে?

প্রদীপ অবাক হয়। শুধোয় সে—এসব খবর কোথা থেকে শুনলে?

মণিকা বলে—গুণময় বাবুই বলছিলেন।

হাসে প্রদীপ—অবশ্য ওরা এইটাই চান মনে মনে তবে মণিকা, এখানে মাটিতেই উঠতে হবে আমাকে। এই নতুন দিনকে স্বাগত জানাতে আমি এখানেই থাকছি, থাকবো।

তাই কমল দাসের উপর নজর রেখেছিল প্রদীপ।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর জিপটাকে আসতে দেখেছে প্রদীপ। সঙ্গে বিভূতি দাসও রয়েছে। ওদের মতলব ঠিক বুঝতে পারে প্রদীপ।

তাই আশপাশেই থাকে সে। ও ঘরে বসে কথা বলছে ওরা।

কমল দাস বলে—বাড়ি আর ওই ডাঙ্গাজমি পঞ্চাশ বিঘের জন্যে লাখ দুয়েক টাকা দিতে পারি। মেরামতের খরচাই হবে লাখখানেক। এই পাড়াগাঁয়ে এত বড় বাড়ি কে কিনবে বলুন?

প্রতাপবাবু ভাবছেন কথাটা। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে কমল—আর না হয় বড়জোর পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি। ওই ডাঙ্গা জমির কোন আয় তো নাই। ঘাস তো হয় না।

এমনসময় প্রদীপ এসে বলে—এসব বিক্রি হবে না।

প্রতাপবাবু চাইলেন ছেলের দিকে।

প্রতাপবাবু শুধোন—কেন?

প্রদীপ বলে—এসব আমার মায়ের সম্পত্তি। এই বাড়ি আমার মায়ের স্মৃতিজড়িত। এটাকে বিক্রি করবেন না বাবা। মায়ের খাস জমি—যেখানে যা আছে তা থাকবে।

কমল অবাক হয়—তাহলে বিক্রি করবেন না?

প্রদীপ বলে—না। আপনি এ নিয়ে আর কথা বলতে আসবেন না।

প্রতাপবাবুর মুখ-চোখ যেন অপমানে লাল হয়ে ওঠে। তবু এদের সামনে প্রকাশ্যে ওকে কিছু বলতেও পারেন না। আইনত এসব জমি-বাড়ির বাকী অংশের মালিক প্রদীপই। কিন্তু প্রতাপবাবু ভাবতে পারেন নি প্রদীপ এদের সামনে এসে তাকেও এভাবে নিরস্ত করাবে।

কমলও বুঝেছে ব্যাপারটা। তবু বিভূতি দাস জানে এটা বিক্রি করাতে পারলে সে বেশ মোটা টাকাই কমিশন বাবদ পাবে। তাই বলার চেষ্টা করে।

—ছোটবাবু, এতবড় বাড়ি রেখে কি করবেন? দরকার হয় এ বাড়ি বিক্রি করে ওদিকে একটা ছোট সুন্দর বাড়ি বানান—

প্রদীপ বলে—সেটা পরে ভাবা যাবে। এখন যেতে পারেন।

কমল বলে—চলো বিভূতি, চলি বড়বাবু।

কমলরা চলে যায় জিপের গর্জন তুলে, সন্ধ্যার আকাশে পোড়া পেট্রলের বদগান্ধ ওঠে। প্রতাপবাবু বলেন—ওদের সামনে এভাবে কথাটা না বললেই পারতে। পরে বললেই হতো।

প্রদীপ বলে—-ওরা নেবার জন্যই এসেছিল। শকুনের জাত—ভাগাড়ে যেন মড়া পড়েছে তাই এসে হাজির হয়েছে। একবার তোমাকে ঠকিয়ে গেছে। আবার এসেছিল ওই মতলবেই। তাই ওইভাবেই কথা বলেছি।

প্রতাপবাবু চুপ করে থাকেন।

বেশ বুঝেছেন প্রদীপ তার নিজের পথে, নিজের মতেই চলবে। বংশমর্যাদার সংজ্ঞা তার কাছে স্বতন্ত্র। তাই প্রতাপবাবুর বংশমর্যাদার সংজ্ঞা সে মানে না তার মতকে সমর্থন করে না সে।

প্রতাপবাবু তাই নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। এখান থেকে চলে যাবেন নিজের পৈত্রিক বাড়িতে। বলেন তিনি।

—প্রদীপ, আমি ঠিক করেছি এখানের বাকী যা আছে তা তুমিই দেখাশোনা করো। আমি কালই দুর্গাপুরের বাড়িতে চলে যাবো।

প্রদীপ বুঝেছে বাবার মনোবেদনা। বলে সে—আমাকে ভুল বুঝে চলে যাবেন?

প্রতাপবাবু বলেন—না। এখন দুর্গাপুরের সম্পত্তির দাম অনেক। সেখানে বহু জমি-জায়গা। জঙ্গলমহল এসব রয়েছে। ভবিষ্যতে তোমার জন্যই এখন সেসব দেখাশোনা করতে হবে। তাই যেতেই হবে আমাকে। মাঝে মাঝে আসবো বৈকি। তুমিও যাবে বাড়িতে।

প্রদীপ চুপ করে বাবার কথাটা শোনে। মনে হয় বাবা আজকের এই পরিবর্তনকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। যেখানে রাজার সম্মানে ছিলেন সেখানে সাধারণ প্রজা হয়ে থাকতে চান না।

দুর্গাপুরে এখন নতুন সমাজ গড়ছে বাইরের বহু নতুন মানুষ। সেই অপরিচিতের মতই আত্মগোপন করতে চান সেখানে।

যেন একটা প্রজন্মের শেষ প্রতিভূ। ওরা ধীরে ধীরে জনতার ভিড়ে হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে ওদের নাম, পরিচয়ও।

কমল দাস ভেবেছিল প্রতাপবাবু চলে গেলে প্রদীপও এখান থেকে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার সব প্ল্যান ওই ছেলেটাই ভেস্তে দিয়েছে। রয়ে গেছে প্রদীপ।

আর হঠাৎ এদিকের গ্রামগুলোতে একটা সাড়া পড়ে গেছে।

দুর্গাপুর যাবার জন্য যে পুরোনো রাস্তা ছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে পথ কম করার জন্য তাদের গ্রামের পাশ দিয়েই নতুন এক্সপ্রেস ওয়ে হচ্ছে। কমল দাস খবরটা পায়

দুর্গাপুরেই।

গতিলালও এসে জানায়—পথ হবেক কি গো—পথের কাজ শুরু হয়ে গেছে। একেবারে মিলিটারির মত কাজ হচ্ছে। ইবার গোপগাঁয়ের হাল বদলে যাবেক গো। গাঁয়ের পাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ট্রাক গাড়ি যাবেক। ওঠো ইখানে আর নামবা দুর্গাপুরে আধঘণ্টার মধ্যে।

এ ছিল কল্পনারও অতীত। এখন তাই হতে চলেছে। কমল দাস একচক্ষু হরিণের মত ভেবেছিল বিপদটা আসবে একদিক থেকেই, কিন্তু অন্যদিকের থেকেও যে বিপদ আসতে পারে সে কথাটা ভাবেনি।

প্রতাপবাবু এখান থেকে চলে গেছেন একটি যুগ যেন শেষ হয়ে গেছে ওর সঙ্গে। এখন ওই বাড়িতে রয়েছে প্রদীপ। বড় বাড়িটার নীচে কাছারি ঘরগুলোয় শুরু হয়েছে সেই বিদ্রোহী কাংস্যশিল্পীদের সমবায়, ওদিকের মাঠে একটা ছোট ফার্নেসও গড়ে উঠেছে। সেখানে আর সাবেকী প্রথায় মুচিতে কাঁসা গালাই হয় না।

বড় ভ্যাটে মাল গালাই হয়।

আর ওইখানের শেডে, ওদিকের পরিত্যক্ত ঘরগুলোয় কারিগররা মাল তৈরি করে। সমবায়কে মাল দেয় তারা, সমবায়ই মাল সহরে রানীগঞ্জে ট্রাকবন্দী মাল পাঠায়।

কেদার কর্মকার, বরুণ, প্রদীপ এখন সমবায়ের কমিটি মেম্বার। আর অন্য সকলেই ওর মেম্বার। ওই শ্রমিকরাই তাদের লড়াইএ জিতেছে। এ যেন সারা এলাকার মানুষের জিত।

ওরা কিছুদিন আগেই সমবায়ের বর্ষপূর্তি উৎসব করলো ঘটা করে, সহর থেকে ব্যাণ্ড, এখানের অনেক গ্রামের ঢোল-জয়ঢাক ইত্যাদি নিয়ে বিরাট মিছিল করলো। সেই মিছিলে আর বাধা আসেনি। কমলদাসই বলে গুণময়কে—হেরেই গেলাম ভটচায। তুমিও কিছুই করতে পারলে না।

গুণময় অবশ্য এখন বেশ ভালোই আছে। এখন সেইই নিজে আর ঝুট ঝামেলা করতে চায় না। কারণ তার মদের ভাটির ব্যবসা এখন খুবই চালু হয়েছে। সভ্যতা যত এদিকে থাবা বসাচ্ছে। যত কাজ-কর্ম বাড়ছে এদিকে ততই মজুর আসছে। স্থানীয় কিছু লোক পয়সা পাচ্ছে আর তার বেশিরভাগই তারা মদের পিছনেই ঢালে।

এখন গুণময় বনের মধ্যে একটু ওদিকের গ্রামে বেশ কয়েকটা ভাটি করে এন্তার মদ চালান দিচ্ছে দুর্গাপুর, এদিকের নানা জায়গাতেও। গুণময়ও স্বপ্ন দেখছে কমল দাসের চামচা হয়ে থাকবে না সে। তবে তাকে চটানোও চলবে না।

বরং কমলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সে দেগে চলবে। চলছেও।

কিন্তু এই প্রথম শ্রমিক-মালিক লড়াই এবার হেরে গেছে গুণময়। কমলকে জেতাতে পারেনি। ওরা সমবায় করেছে আর কমল দাস বলে—ওদের সঙ্গে কাজ

করবো না। এবার ধান কলই করবো ভাবছি।

গুণময় বলে—তাই ভালো কমলদা। আর যা দিন কাল পড়েছে শুধু ব্যবসাতে চলবে না।

—তবে? কমল শুধোয়।

—এবার পঞ্চায়েতের ভোটে তুমি দাঁড়াও। ওই গোবিন্দ ঘোষকে হঠিয়ে তুমিই হবে অঞ্চলপ্রধান। গদি চাই নাহলে টেকা যাবে না।

কমলও ভেবেছে কথাটা। ক্রমশ জমিদারদের জায়গাতে এখন বসতে চলেছে ওই অঞ্চলপ্রধানই। তার হাতে অনেক ক্ষমতা। ক্রমশ আরও ক্ষমতা বাড়বে। টাকার আমদানীও বাড়বে পঞ্চায়েতে।

কমল বলে—কিন্তু সে তো অনেক হাঙ্গামা। অফিসের কাজ দেখতে হবে। এত সরকারি টাকার হিসাব রাখতে হবে। তারপর ভোটে জিততে হবে।

গতিলালও বানের আগে খড়কুটোর মত ঠিক এসে যায়। সে এখন পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে টাউটগিরি করে। অন্ধিসন্ধি অনেক জেনেছে। দেখছে গোবিন্দবাবু সৎ লোক। তাই সেখানে দুনম্বরী করার অবকাশ তত নেই। কমল দাস এলে তার সুবিধাই হবে। গতিলাল শোনে কথাটা।

গুণময় বলে—অফিসের কাজের জন্য লোক থাকবে। টাকার হিসাব? একবার একটু বেকায়দা ফেলেছে ওই প্রদীপ, তবে এবার আর পারবে না। গুণময়ের খেলটা দেখবে এবার. তুমি দাঁড়াও—

কমল বলে—একলা দাঁড়ালে হবে না। এর মধ্যে সারা অঞ্চলের কিছু মানুষকে দলে টানতে হবে। মানে পঞ্চায়েতের এগারোজন সদস্য—নিজের দলের এগারো জনকে নিয়ে প্যানেল করে নামতে হবে। গতিলাল বলে—আমিও জান লড়িয়ে দেব কমলদা। গুণময় তো আমাদের লিডার।

কমল বুঝেছে এবার এদিকেই বহু ছোট কারখানা গড়ে উঠছে আর ক্রশিং প্ল্যান্ট মাথা তুলছে মাঠের মধ্যে বনের ধারে যত্রতত্র। নতুন রাস্তার ধারের পড়ো-পতিত বন্ধ্যা ডাঙ্গাজমির দাম বাড়ছে হু হু করে। প্রদীপের উপর রাগ হয়। ওই জন্যেই বড় রাস্তার ধারে পঞ্চাশ বিঘে ডাঙ্গা ফস্‌কে গেল, ওই বিশাল বাড়িটার পিছন দিয়ে এখন সত্তর ফিট চওড়া রাস্তা হচ্ছে—দিনরাত কাজ চলছে সেখানে। রাস্তার কাজেও শ'দরুণে লোক খাটছে। ব্যারেজে—দুর্গাপুরে এখন কাজের অভাব নাই। এদিকে কমল দাসও এবার তৈরি হচ্ছে ভোটের জন্য। এই অঞ্চলে তার নাম-ডাক এখন বেশই হয়েছে। সে তুলনায় গোবিন্দ ঘোষ এখন প্রায় বিগত যুগের মানুষ।

কিছু জমিদারী ছিল। সাজা খাজনাও পেতো কয়েকটা মহাল থেকে এখন তাও

নাই। তবে মানুষ হিসাবে সৎ, উদার প্রকৃতির। বরুণ এখন জমিদারীর কাজ ছেড়ে বাগানের ব্যবসাপত্র দেখছে। এবার গোবিন্দবাবু আর অঞ্চলপ্রধান থাকতে চাননা।

কিন্তু প্রদীপ, বরুণ, কেদার, হরিশমাস্টার সকলেই বলে—আপনিই দাঁড়ান। নাহলে কোন মতলববাজ লোকদের হাতে অঞ্চলের ভার চলে গেলে অসুবিধাই হবে এখানের মানুষের।

তাই গোবিন্দবাবু দাঁড়িয়েছেন আর ওদিকে এবার কমল দাসও দাঁড়াচ্ছে এর মধ্যে গুণময় অঞ্চলের বেশ কিছু বিচিত্র মানুষকেও ভোটে দাঁড় করাবার কাজে নেমেছে। অবশ্য সে নিজেও থাকছে।

এমনিদিনে খবরটা শুনে চমকে ওঠে কমল দাস।

এতদিন ধরে সেইই এখানের জায়গাজমি সব কিনেছে। প্রতাপবাবুর পিছনেই পড়েছিল। তার এস্টেটের দিকেই ছিল কমলের নজর।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কথাটা সে ভাবেনি। ওই তেজস্বিনী মহিলাকে এড়িয়ে চলে কমল। কমলের অতীতের অবস্থা সে জানে। আজও কমল তার সেই দেনা শোধ দেয়নি।

গ্রামে সুধাময় ভট্টচায এখন পঞ্চতীর্থের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেই ভূত-ভবিষ্যৎ সব গণনা—গৃহশান্তি যাগযজ্ঞ করে বেশ নাম করেছে। দামোদরের উপর পাকা ব্যারেজ তৈরির কাজ শেষ না হলেও নীচে বর্ষাকাল ছাড়া অন্যসময় এখন অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে রাণীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান থেকে টানা গাড়ি চলে আসছে। এখন সুধাময়ের কাছে কোলিয়ারী অঞ্চলের অনেক শেঠও আসে তাদের গৃহশান্তি করাবার জন্য।

শেঠ পিয়ারীলাল আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকার নামকরা ব্যবসায়ী। নানা কিছুর হোলসেল এজেন্সী আছে আর কয়লাখনির বড় সাপ্লায়ার, কনট্রাকটার। এছাড়া আরও অনেক ব্যবসাই আছে তার যেগুলো সেও কাউকে জানাতে চায়না।

কোন ঝামেলায় পড়ে সে এখন পুলিশ-ইনকাম ট্যাক্স-এর হাতে খুবই ন্যাটা-ঝামটা খাচ্ছে। তাই সে এখন সুধাময়ের কাছে এসেছে খোঁজ পেয়ে, সেই সুধাময় মহারাজ নাকি কুপিত গ্রহদের ঠাণ্ডা করতে পারে। অবশ্য শেঠ পিয়ারীলাল দিল্লীতেও চক্কর চালিয়েছে। এদিকে কলকাতাতেও বড় উকিল, কোন নেতাকেও ধরেছে, আর সুধাময়ের কাছেও এসেছে।

সুধাময় এখন খড়ের চালের বাড়ি ভেঙ্গে সেখানে নতুন একতলা বাড়ি করেছে। একটা ছোট মন্দিরে কালীমূর্তি রেখে সামনে সে বসে শ্বেতপাথরে মেজেতে ওদিকে তাড়াবন্দী পুঁথি, ভূর্জপত্র, বেশকিছু পুরোনো বইও রেখেছে।

পঞ্চতীর্থমশায় এদিকে বড় একটা আসেন না।

ভাইদের কীর্তি কলাপের খবর অবশ্য রাখেন। গুণময় আর দাদার আশ্রমেও যায় না সেই চোলাই মদের ঘটনার পর। পঞ্চতীর্থও আর ওর কথা ভাবেন না।

মাঝে মাঝে দেখেন গুণময়কে জিপ না হয় মটরবাইকে যেতে। পরনে জিনস্, গায়ে জার্কিন, মাথায় টুপি, সবই তার বিজাতীয়।

আর তার বিপরীত পোষাক পরে আর এক ভাই সুধাময় এখন গ্রহাচার্য—সামুদ্রিক জ্যোতিষার্ণব ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করে বিরাট সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ব্যবসাই শুরু করেছে।

পরনে রক্তাম্বর, কপালে বিরাট সিন্দুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষ, স্ফটিকের মালা। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে—জয় কালী কপালিনী। জয় তারা।

আর এখন ব্যবসার প্রসার যত বাড়ছে ততই যেন একশ্রেণীর মানুষ দৈবী কৃপায় আরও অনেক কিছু পাবাব জন্যই মায়ের এইসব এজেন্টদের কাছে ছুটে আসে।

পিয়ারীলালজীও আসানসোল থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে সুধাময়ের চরণে পড়ে বলে—মুঝে বাঁচা লিজেয়ে বাবা!

সুধাময় ঝকঝকে নতুন গাড়ি, পিয়ারীলালের নধর বপু, হাতের আঙ্গুলে হীরা, পান্না, চুনি, নীলকান্ত মণির আংটির সংখ্যা দেখে বুঝে নেয় পার্টি বেশ ফিট! সেও বলে মধুমাখা কণ্ঠে—আমি কে বাবা? সব ওই মা। ওকে ডাক সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে। দেখি হাতটা।

এরপর ম্যাগনিফাই গ্লাশ দিয়ে পিয়ারীলালের বাঘের থাবার মত মজবুত হাতটাকে দেখে বলে—হুঁ! শনি কুপিত, বাহু বক্রী ভোগাচ্ছে। রাজদ্বারের ঝামেলা?

পিয়ারী বলে—হ্যাঁ বাবা, সি বি আই, ইনকাম টাক্স বড় পিছনে লেগেছে বাবা।

—লাগবে। তবে ভয় নেই। মহাসিদ্ধ হোম করতে হবে আর বৃহৎ বগলামুখী কবচ ধারণ করলেই ব্যাস—তিন সপ্তাহের মধ্যে গ্রহ শান্তি হয়ে যাবে। কোন ঝামেলাই থাকবে না।

—সো যো কুছ হ্যায় করিয়ে বাবা। রূপয়া পয়সা যিতনা চাহিয়ে—সুধাময় নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে—পয়সা রুপেয়া বড় নয় বাবা। মানুষের কল্যাণই আমার ব্রত। গুরুর নির্দেশ। হয়ে যাবে কোন ভয় নাই বাবা।

পিয়ারীলাল পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিল বাবার শ্রীচরণে রেখে বলে—উসব করিয়ে লিন। আউর লাগে দিবে বলে সুধাময়।

তোমাকেও আসতে হবে বাবা। তোমার নামে পূর্ণাহুতি হবে।

পিয়ারীলাল দু-একবার আসে। ঝড়ে কাক মরে ফকীরের কেরামতি বাড়ে। দিল্লী কলকাতার যুগপৎ চেষ্টাতেই পিয়ারীলালের বিপদ কেটে যায়। পিয়ারীলাল এসে

সুধাময়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে—আপ্ দেওতা হ্যায় বাবা। আপকা আশীর্বাদ সে সব লফরা সাফ হো গিয়া।

বাবার চরণে আবার প্রণামী পড়ে। মায়ের জন্য হারও আসে। সোনার হার।

আর পিয়ারীলালও জানে এসব খরচার উশুল করতে হয় কি ভাবে। আসা-যাওয়ার পথে এই গ্রামীণ এলাকা, বিস্তীর্ণ জমি—নতুন রাস্তাঘাট সব দেখেছে সে। এদিকের মানুষের দারিদ্র্যও চোখে পড়ে তার। সে জানে ওই দারিদ্র্য আর এই গ্রামীণ জীবনকে ভাঙ্গিয়েই সেও এখানে বাণিজ্য করবে।

এ জেলাটায় শিল্প কিছুই নাই। সরকার, জেলা কর্তৃপক্ষ তাকে বিশেষ সুবিধা দেবে, ব্যাঙ্কও ঋণ দেবে। তাই এখানেই কিছু করতে হবে। তাই পিয়ারীলাল দুচোখ মেলে জায়গাটাকে দেখেছে। আর ওই সুধাময়ের কাছেই খবর নিয়েছে ওই জমি কার।

ওদিকে বড় রাস্তার কাজ এগিয়ে চলেছে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এবার জীবনের লড়াইএ ক্লান্তি অনুভব করে। বিশেষ করে ওই মোহিনী মারা যাবার পর থেকে সেও বুঝেছে বিজয় আর সারবে না। এখন বিজয়ও ক্রমশ রুদ্রমূর্তি ধরে। মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে---তুমি খুনী। ওই মোহিনীকে তুমিই খুন করেছো।

—কি বলছিস, ওরে বিজু!

---ন্যাকা! কিছু জানো না? যাও টাকা গোন গে, ধানএর বস্তা গোন গে। স্বর্গে যাবে।

বের হয়ে যায় বিজয় ঘর থেকে। এদিক-ওদিকে ঘোরে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত। নোটন-এর এখন ঝামেলা আবার বেড়েছে। সেও ঠাকুরের পিছু পিছু ঘোরে। কখনও বাগানের ঘাটের ধারে বসে থাকে চুপ করে, সন্ধ্যা নামে, বলে বিজয়---মোহিনী কেন এল না বলতো নোটনা?

নোটন চুপ করে থাকে।

হরিপ্রিয়া এবার ওইসব ডাঙ্গাও দর পেয়ে বিক্রি করার কথা ভাবছে। সরকার বলে—আরও দর উঠবে মাঠান। এখুনি ছাড়বেন?

হরিপ্রিয়া বলে—কবে আছি কবে নাই, চোখ বুজলে তো যে-সে দখল করে নেবে। তার চেয়ে বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিই, যদি কোনদিন বিজয় সেরে ওঠে পাবে।

তাই সরকার পিয়ারীলাল শেঠের মুন্সীকে আসতে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নেয়। কিঞ্চিৎ দালালী পাবে সরকার। তাই ওই চল্লিশ বিঘের ডাঙ্গাও ভালো দামেই বিক্রি করে দিল শেঠজীকে।

কমল সেদিন খবরটা পেয়ে চমকে ওঠে।

তার জমির আগেই জমিটা। ডাঙ্গার ম্যাপে পথঘাটের নিশানাও নাই। আর ভাগ্যক্রমে শেঠজীর জমির মাথাতেই বড় রাস্তা পড়েছে, ভিতরে কমলের ডাঙ্গা। কিন্তু পথ নিতে হবে ওর কাছেই।

খবরটা শুনে কমল বলে গুণময়কে—ঠাকরুন জমি বেচে দিল জানো না? ওই কোন শেঠজীকে বিক্রি করেছে।

গুণময় নিজের ব্যবসা নিয়ে এখন ব্যস্ত। রম রম চলছে মদের কারবার! টাকাও আসছে অনেক। সেও নিজে ঠাকরুনের কাছেই বিঘে দশেক ডাঙ্গা কিনেছে- বনের ধারে। এর মধ্যে ওই রাস্তার মূল ঠিকাদার কোম্পানীকে ধরে নিজেও বেশ কিছু রাস্তার কাজ, পাথর সাপ্লায়ের কাজও পেয়েছে দুর্গাপুরে। এইসব নিয়েই ব্যস্ত। এবার মদের কারবারটা গোপনে করবে আর প্রকাশ্যে সে এখন কনট্রাকটার, স্টোন ক্রাশারের ব্যবসাদি করবে। সেইসঙ্গে ভোটেও দাঁড়াবে। ধাপে ধাপে উপরে উঠবে। এখন কমলের দয়া আর তার দরকার নাই।

তবে গুণময় খুবই হিসাব করে চলে।

সে জানে ব্যবসায় কাউকে চটাতে নেই। তাই কমলের কথায় বলে- -সেকি! কোন ব্যাটা শেঠ উড়ে এসে জুড়ে বসলো এখানে? ভেবোনা কমলদা, ওকে ফুটিয়ে দোব। জায়গা বিক্রি করে পালাতে পথ পাবে না। ভোটটা চুকে যাক। তারপর দেখব ওকে।

কমলদাস বলে--কি করে দেখবে?

বলে--তুমি হবে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। ওর আইনগত ফ্যাকড়া তুলে লাইসেন্সই আটকে দোব। দ্যাখো না।

কমলও তাই ভোটেই জিততে চায়।

এবার প্রদীপও বসে নেই। হরিশবাবুরা এখন সাধারণ মানুষদের প্রিয়জন, কাঁসার শ্রমিকরা এখন এদের হাতে, এবার হরিশবাবুরা এখানে গড়ে ওঠা পথের ধারে ক্রাশিং মেসিনগুলোর শ্রমিকদের কথা ভাবছে।

ওদের অধিকাংশই একেবারে সমাজের নীচের তলার মানুষ, তারা এতদিন ধান মাঠে মাত্র মাস তিনেকের কাজ পেতো।

পটু বাউরীর চার ছেলে। পটু এমনিতে বেশ পরিশ্রমী। চারটে জোয়ান ছেলে-বৌ এতগুলো লোকের ভরপেট ভাত জোটানোই ছিল দায়। শুধু পটু নয়, বাউরী লোহার পাড়া মায় আদিবাসী সাওঁতালদের অবস্থাও ছিল এমনি।

তাই ওরা ধান কাটার সময় গ্রামে কিছুদিন কাজ করে চলে যেত বর্ধমানের দিকে।

মাসখানেক ক্যানেল এলাকায় ধান কেটে কিছু রোজগার করে ফিরতো।

তাতে আর ক'দিন।

পটু বাউরী পাড়ার বটতলায় বসে বলতো

—শিমূলের ফুল ফুটলো
গরীবের ভাত উঠলো।

তারপর ধান ওঠার মুখ পর্যন্ত ওই তাপসতপ্ত দীর্ঘদিনগুলোয় কোনদিন কাজ জুটলে খেতে পেতো। মাঝে মাঝে চার ছেলেকে নিয়ে রিলিফের মাটি কাটতে যেত গম আর সামান্য পয়সার বিনিময়ে।

তাও সবদিন জুটতো না।

এখন ওই দুর্গাপুরের জন্য বনের এদিক-ওদিকে অনেক পাথরের ক্রাশিং প্ল্যান্ট বসেছে। বনের মধ্যে গাছপালা কেটে মাটি সরিয়ে ডিনামাইট দিয়ে পাথরের স্তর ফাটিয়ে না হয় ছেনি-গাইতি দিয়ে সেই পাথর কেটে তুলে এনে ক্রাশিং মেসিনে ভাঙ্গা হচ্ছে।

ওই বিশাল যন্ত্রেই ছোট বড় নানা মাপের ছাকনিও ফিট করা আছে। তাইতেই ৩/৮, ৫/৮, হাফ ইঞ্চি নানা মাপের টুকরো পাথর গাদা হয়ে পড়ছে।

ওরা ঝুড়িতে করে বড় বড় ট্রাকে লোড করছে।

দিনমজুরি তিরিশ টাকা, আর জলপানি, তাছাড়া ট্রাক বোঝাই-এর জন্য বকশিসও কিছু পায় নগদ।

পটু বলে---লে এখন ঝম ঝম ট্যাকা। কত লিবি। শালা ত্যাখন প্যাটে ভাত জুটতো না। ইখন দুবেলা ভাত আর লিশা।

পটুর সংসারে এখন পটু তার স্ত্রী ও মজুরাণীর কাজ করছে, আর চার ছেলে-কুল্যে ছ'জনের দৈনিক রোজগার নিদেন পৌনে দুশো টাকা। শুধু পটুই নয় এখন গ্রামে মাঠে কাজ করার মজুরও মেলে না।

যদি মেলে তারাও ওই পঁচিশ টাকা নিদেন চায়। সবাই এখন ওই ক্রাশিং মিলে, অনেকে দুর্গাপুরেই চলে গেছে নগদ টাকায় মজুরি জন্য। শরৎ ভটচায বলে—ই কি হল বাপ! রাখালি করার ছেলেও নাই। শেষে বুড়ো বয়সে নিজেদেরই গরু বাগালি করতে হবেক?

হরিশবাবুরা এখন ওইসব শ্রমিকদেরই জানায়—এই কাজের ঢেউ আমরাই এনেছি তোদের জন্য। অভাব থাকবে না। এবার ছেলেদের পড়ালেখা শেখা। নিজেরা ওই টাকা জমিয়ে কিছু জমি কেন। কাজ না থাকলেও জমিতে কাজ করবি।

ওই লোহার বাউরী পাড়ার মানুষগুলোও ভাবে এক নতুন যুগই আসছে। তাদেরই ভালো হবে এতে। তাই তারাও প্রদীপ, হরিশ, বরুণদের পিছনে আসে।

কমলবাবু এখন সমাজের মাথা। ক'বছরেই এদিকে একটা পরিবর্তন এসেছে। প্রতাপবাবু চলে গেছেন দুর্গাপুরে। গোবিন্দবাবুর জমিদারীও নাই, হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এবার জমিজমা বিক্রি করে পাততাড়ি গুটোতে চায়। আর মাথা তুলেছে কমলবাবুই।

তার সেই বনের জমি থেকে এখন পাথরের স্তর যা বের হয়েছে তাতে সে কয়েক লাখটাকা কামাবে। ব্যাঙ্কই টাকা দিয়েছে, দুটো ক্রাশিং প্ল্যান্ট চলছে তার দিনরাত। আর নিজেই চারটে বড় ট্রাকে মাল সাপ্লাই দিচ্ছে দুর্গাপুরেব স্টীল, কারখানার সরকারকে।

লোকে বলে—কমলবাবুর বরাত খুলছে। ধুলো মুঠো ধরে তো সোনা মুঠো হয়। তবু কমল ওই কাঁসা-শ্রমিকদের কাছে পরাজয়টাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। চুপ চাপই আছে। সময়মত ঘা ঠিকই দেবে।

এখন সে বুঝেছে ভোটে তাকে জিততেই হবে।

গুণময়ও জানে তাকে সরকারি পদ দখল করতেই হবে। আর তাই বিভিন্ন গ্রামের কিছু মানুষকে সে হাতে করেছে। কমলদের হয়ে তারাই শোভাযাত্রা করে, কমল, গুণময়, গতিলাল জিপে করে ঘোরে।

কমল মাঝে মাঝে এখন বক্তৃতাই দেয়।

তবে সেসব লিখে দেয় রামনিধি মাস্টার। রামনিধিও মাঝে মাঝে হাটতলার জনসভায় কমল, গুণময়বাবুদের দেশের জন্য আত্মত্যাগ, সেবার কথাও শোনায়।

আর হাটতলার ওদিকে গুণময় তার চোলাই ভাটির কিছু মদত দেয় ইত্যিজনকে। তারা মদ পেলে সব ভুলে যায়। তখন দলবেঁধে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে।

—জিতবে কে—কমল গুণময় আবার কে!

কমলবাবু, গুণময়কে ভোট দেন—ভোট দেন।

হরিশ মাস্টারও এসব দেখে প্রমাদ গনে।

প্রদীপ বলে—ভেঙ্গে পড়বেন না হরিশদা। ভোটে আমাদের জয় হবেই।

এতদিন এই অঞ্চলে মেয়েদের পথে-ঘাটে দেখা যেতো না। ঘরের বৌঝিদের এলাকাও ছিল সীমিত। হঠাৎ অন্তঃপুরের বন্ধ দরজাটা কোন ঝড়ে যেন খুলে পড়েছে।

এখন সেই খোলা দরজা দিয়ে বাইরে আলো-হাওয়াও যেমন ঢোকে, ঘরের মেয়েরাও তেমনি বাইরের আলোয় এসে পা রাখে, প্রদীপদের চেষ্টাতেই এখন মেয়েদের স্কুল হয়েছে।

প্রথমে আশপাশের গ্রামের অভিভাবকরা মেয়েদের মাঠ পার হয়ে ভিন গ্রামের স্কুলে যেতে দিতে খুব আগ্রহী ছিলনা। কিন্তু মেয়েরাই নিজেরা স্কুল আসার বায়না

ধরে।

আর মণিকাও মাঝে মাঝে এ-গ্রাম সে-গ্রামে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। ক্রমশ মেয়েরাই স্কুলে আসতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই সাইকেল চড়াও অভ্যাস করেছে। এখন মাঠ কাঁচা সড়ক ধরে সাইকেলে আসে তারা স্কুল।

মণিকাও গ্রামে গ্রামে যায়। ফলে এবার ভোটে মণিকাই এবার মেয়েদের প্রভাবিত করে। প্রদীপও আসে মাঝে মাঝে। খবর নেয়—কেমন লাগছে?

মণিকা বলে—ভালোই। সহরের মত গ্রামের মেয়েরাও এখানে আগ্রহী। তারা ভোট সবাই দেবে।

প্রদীপ বলে—আমাদের এই ভোটে যদি জিতি তাতে তোমার অবদানও কম থাকবে না মণিকা।

মণিকা দেখছে প্রদীপকে।

ছেলেটা এখন দিনরাত খাটছে একটা আদর্শকে অবলম্বন করে সে যেন বেঁচে থাকতে চায়। তার জন্য অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে প্রদীপ। মণিকা জানে সে দুর্গাপুরে গেলে অনেক কিছুই করতে পারতো। জীবনে প্রভূত অর্থ রোজগার করতে পারতো। অনেক আরামে থাকতো কিন্তু সেসব কিছু ত্যাগ করে প্রদীপ এখানেই পড়ে আছে।

মণিকা জানে এ নিয়ে ওর বাবার সঙ্গেও মতান্তর হয়েছে।

তাই মণিকা বলে—কেন এভাবে নিজের কথা না ভেবে পড়ে আছো?

হাসে প্রদীপ—তুমিও দেখছি একেবারে সাধারণ মেয়েদের মতই কথা বলছো মণিকা। দেখছ সমাজের বুকে বাঁচতে গেলে পদে পদে দুঃখই পেতে হবে। তাই সুখে-শান্তিতে বাঁচতে গেলে এই সমাজকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। না হলে চোরাবালিতে ঘর বেঁধে লাভ কি? কোনদিন অতলে তলিয়ে যাবে।

মণিকা দেখছে প্রদীপকে। দিনের বেলাতে এখনও ঘুরছে সারা এলাকায়। কখন খায় দায়, কোথায় থাকে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। মিটিং নিয়ে ব্যস্ত।

রাতে বাড়ি ফেরে, কাজের লোক যা রেঁধে রাখে তাই খায়। মণিকা মাঝে মাঝে ওর বাড়িতেও গেছে।

বিশাল বাড়ির দোতালার ঘরগুলো এখন বন্ধই পড়ে আছে। একদিন এখানে মানুষের কলরব উঠতো, এখন সব শূন্য, প্রতাপবাবুর ঘরটা বন্ধই থাকে।

কাজের লোক দুখীরাম মাঝে মাঝে সাফ সুতরা করে। আবার তেমনি ধুলোর আস্তরণ জমে বসার ঘরে কার্পেটে, আসবাবে, দেওয়ালে কয়েকটা তৈলচিত্র, পূর্বপুরুষ দুর্গাশংকরের থেকে কয়েকজনের ছবি আছে।

তারপর ওই জমিদারীর পাট চুকে যেতে এখন সেই ঘরও বন্ধ। প্রদীপের ঘরটায়

বই-কাগজপত্রে ঠাসা। আলনায় বিছানায় জামা-প্যান্ট ছড়ানো।

ঘরে ঝাঁটও ঠিকমত পড়ে না। মশারিটা ছত্রির উপর লাটপাট করে তোলা পড়ে আছে। মণিকা বলে—এ যে সাপ-কাঁকড়াবিছের আড়ত করে রেখেছো। দুখুদা—দুখু বলে ঘর সাফ করবো কখন? এই এল আবার ভোরে বের হবে। এ ঘরে মানুষ থাকে?

গজগজ করে দুখুই ঘর সাফ করে। মণিকাও হাত লাগায়।

বলে সে—দুখুদা! ওর খাবার আনো। আমি এসব দেখছি।

মণিকা অবাক হয় প্রদীপের খাবার দেখে। অগোছালো সংসার। কোন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নাই। প্রদীপ হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। রুটি, ডাল আর ভেণ্ডির চচ্চড়ি। মণিকা অবাক হয়—বাস, এই তোমার ডিনার?

প্রদীপ বলে এইটুকুই কতজন পায় না তা জানো? এ-দেশে এই যথেষ্ট।

মণিকা বলে—না খেলে খাটবে কি করে?

দুখীরাম বলে—তাই বল দিদি ওকে। কত বলি দুধ, মাছ, ডিম খাও—তা ওর ওই এক কথা। পেটে না খেয়ে কি দেশসেবা গো?

প্রদীপ বলে—থাম তো!

মণিকা চুপ করে দেখে, প্রদীপের জন্য একটা সহানুভূতিই জাগে। মনে হয় ও মনে-প্রাণে খাঁটি একটা মানুষ। যে সত্যিই দেশের সাধারণ মানুষের একজন হয়েই তাদের সেবা করতে চায়। নিজের কথা সে একবারও ভাবেনি। নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে সে এখানেই এই নির্বান্ধব পুরীতে বাস করছে।

মণিকা তাই প্রদীপ সন্ধ্যার মুখে এসে বলে—এখানে খেয়ে যাবে।

প্রদীপ সেদিন দেখে মণিকা তার জন্য লুচি আলুর দম আর পায়েস করেছে। মাছ এখানে হাটবারে মেলে. কখনও মাংসও জোটে। মণিকা ওর কাজের মেয়েকে দিয়ে তাও আনায়।

প্রদীপ বলে—এত খাবার। এ্যাঁ, মাংস, পায়েস। অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছ তুমি।

মণিকা হাসে—কেন, আগে তো দেখেছি তোমাদের বাড়ির খাওয়া। তোমার বাবাই তো একসের মাংস খেতেন। নাহলে এক বাটি ক্ষীর।

হাসে প্রদীপ—ওই খাওয়ার চোটেই তো সরকার জমিদারী কেড়ে নিল। একজন যদি এত এত খায়। চাষীদের ভাগে কি জুটবে বলো। তাই সব গিয়ে ভালোই হয়েছে। এখন কবিগুরুর ভাষায়—

সকলের সাথে ভাগ করে খেতে হবে অন্নপান।

মণিকা বলে—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তবে দেখা যাক তোমাদের এই নীতি-বিবেকবোধ কতদিন থাকে।

—কেন থাকবে না? প্রদীপ শুধোয়।

মণিকা বলে—দেশের শাসনভার, ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠাই মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। আজ তোমাদের হাতে সেই শাসনক্ষমতা, শোষণের সাধ্য, অর্থভাণ্ডার হাতে নেই। তাই প্রতিপক্ষকে গাল দিচ্ছ। এসব তোমাদের হাতে যদি কোনদিন আসে সেদিন তোমাদের এই নীতিবিবেক যদি বজায় থাকে দেশেরই মঙ্গল হবে। কিন্তু ভয় হয় তা কি থাকবে? কথায় আছে যে যায় লঙ্কায় সেইই হয় রাবণ—তোমরাও রাবণের দলেই না পরিণত হও।

প্রদীপ বলে—আমাদের দলের মানুষরা আগুনে পোড়া খাঁটি সোনা। তাদের বিচ্যুতি ঘটবে না। তাই সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষকরা আমাদের সমর্থন করবেই।

ওদের প্রস্তুতি এগিয়ে চলে।

গুণময় কমল দাসরাও বসে নেই। কমল দাসও ঘরে ঘরে যাচ্ছে ভোটের জন্য।

সে এসেছে পঞ্চতীর্থমশায়ের আশ্রমে এখন হরিপ্রিয়াও ওখানে আসে। সুখদাও আসে। সেদিন আশ্রমে অনেকেই রয়েছে। কমল এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে।

চাইলেন পঞ্চতীর্থ, উপস্থিত অনেকেই দেখে কমলবাবুকে। এখন সে এলাকার মানী ব্যক্তি। কমলই বলে—পণ্ডিতমশায় এবার দেখলাম এলাকার মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। এদিকে যুগের উন্নতি চাই, ডাক্তারখানা চাই, মানুষের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

পঞ্চতীর্থ বলেন—তা তো দরকারই। এখন যুগ বদলাচ্ছে, মানুষের প্রয়োজন, চাহিদাও বাড়ছে।

—তাই ওসব সমস্যা দূর করার জন্য পঞ্চায়েতেই দাঁড়াচ্ছি।

কমলের কথায় পঞ্চতীর্থ বলেন—তাই নাকি।

কমল বলে—তাই এবার হাটতলায় জমায়েত করছি। আপনি যদি সেই মিটিং-এ কিছু বলেন আমার হয়ে, তাহলে ভালো হয়। সৎ কাজ করতে চাই—তাই আপনার সমর্থন পাবো তা জানি।

পঞ্চতীর্থ চুপ করে শুনছেন ওর কথা। বলেন—তুমি সৎকাজ করতে চাও করো। কাজ করলে সমর্থন নিশ্চয়ই পাবে। তবে সেটা কিছু করার পর। আমি ওসব ভোট-এর রাজনীতিও বুঝি না ওসবে বলার অধিকারও আমার নাই।

কমল একটু হতাশই হয়। তবু বলে—শাস্ত্রজানা পণ্ডিত আপনি।

হাসেন পঞ্চতীর্থ। বলেন—ওইখানেই হয়েছে মুস্কিল হে। এখন যুগ বদলাচ্ছে, এতকালের শাস্ত্রে বিধানগুলো নিয়েও এ-যুগে নতুন করে ভাবার দিন এসেছে।

— কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।।

বিনা বিচারে এতদিন ঋষিদের নির্দেশ মেনে চলে আমরা বিশৃঙ্খলা, অধর্ম আর দুর্দশার মধ্যে এসে পড়েছি এখন আর এসব নির্দেশও বিনা বিচারে পালন করা উচিত নয়। নিজের বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত নাহলে চন্দন কাষ্ঠবাহী গর্দভের মত অবস্থা হবে, কেবল বোঝাই বইতে থাকবে চন্দন কাঠের সৌরভ, মহিমা সে কিছুই বুঝবে না।

বুঝলে কমল—এতদিনের প্রচলিত সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথাও এ-যুগে মানুষ নিজের বুদ্ধিতে বিচার করে তবে মানে, সুতরাং তোমার ওইসব প্রতিশ্রুতির কথা সত্য প্রমাণিত হলে তবেই তার পক্ষে কথা বলা উচিত। সেটা প্রমাণ করো—তারপর নিশ্চয়ই বলবো।

কমল চুপ করে বের হয়ে যায়। বেশ বুঝেছে ওই বৃদ্ধ পঞ্চতীর্থ মশায়কে টলানো যাবে না।

দূরে গাড়িতে গুণময় বসে আছে। সে চেনে তার বড়দাকে। মুখের উপর কঠিন সত্যকথাটা বলতে তার এতটুকু বাধে না। তাই গুণময় তাকে এড়িয়েই চলে।

কমল চুপচাপ গাড়িতে এসে বসে। ওর মুখ দেখেই গুণময় বুঝেছে ব্যাপারটা। তবু শুধোয়—বুড়ো কি বললো? যাবে মিটিং-এ?

কমল বলে—না। যাবে বলে মনে হল না।

গুণময় বলে—শ্লোক-টোক আওড়ে লম্বা লম্বা কথা বলেই বিদেয় করেছে?

করবে তা জানতাম। ভণ্ড—বিটকেল বামুনের কথা ছাড়ো তো কমলদা? তলে তলে হরিশমাস্টারকেও সাপোর্ট করে। ও বুড়ো-হাবড়াদের বাতিলের দলে ফ্যালো। চলো—মধুগঞ্জের রসিকলাল ওখানে মিটিং-এর আয়োজন করেছে।

ওরা চলে গেল বাতাসে পোড়া পেট্রলের গন্ধ ছিটিয়ে রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে।

গোবিন্দবাবু এতকাল পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এবার তিনি হালচাল দেখে আর দাঁড়াননি। বরুণই দাঁড়িয়েছে। এবার ওই বরুণ, প্রদীপ, হরিশবাবুদের দলও প্রচার চালাচ্ছে। মিছিলে তাদের সঙ্গে জুটছে এলাকার কৃষক, শ্রমিক অনেকেই।

গুণময় বুঝেছে হাওয়া ওই হরিশবাবুদের পালেই লাগছে।

এখন আসছে পরিবর্তনের যুগ। সাধারণ মানুষ, ওই পটু বাউরীর মত খেটেখাওয়া মানুষরা আজ কাজ পাচ্ছে এখানে, দুর্গাপুরে। তাই জমিতে কাজও করতে চায়না তারা। জমির কাজের চেয়ে বেশি মজুরি মেলে ওইসব কাজে।

আর কিছু লোক এর মধ্যে দুর্গাপুরের বিভিন্ন কারখানাতেও কাজ পেয়েছে তাই রোজগারের পথ খুলে যেতে নীচুতলার অবহেলিত মানুষরা আজ উপরতলার মানুষদের

যেন এতদিনের বঞ্চনারই জবাব দিতে চায়।

আর প্রদীপরা সেই মানুষদেরই জমায়েত করছে। তারা বাউরীপাড়ার পটুকেও মেম্বার করতে চায়।

শরৎ ভটচায এখন তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কমলের দলেই ভিড়েছে। সতীশ চাটুয্যে দেখে পটুকেও। এখন সেও মিটিং যায়, পরনে ক্ষারেকাচা ধুতি, হাফহাতা সার্ট পায়ে চটি জুতো। জুতো পরার অভ্যাস ছিল না পটুর।

পটুর ব্যাটাই বাবার জন্য জুতো কিনে আনে। এতকাল মাঠে-জলে-কাদায় লাঙল ঠেলেছে পটু। পাগুলো ইয়া বড় আর থ্যাবড়া। পটুব বৌ বলে—ওমা, ইকি রে। জুতো?

পটু বলে—ভোটে দাঁড়াতে হবেক। ভদ্দর লোকদের সাথে উঠবোস করতে হবেক, জুতো পরবো নাই?

কোনমতে টেনে-টুনে জুতোজোড়া পরে পটু আর উঠতে পারেনা। পায়ে যেন সান্ নেই। বলে—ইকি রে! পা যে বিবশ লাগছে।

পটুর ব্যাটা গোবরা এখন ক্রাশিং মিলে কাজ করে। সে দুর্গাপুরে টকি দেখতে যায় শনিবার প্যান্ট, জামা জুতো পরে। সে বলে—পেথম লাগবেক, পা কাটবেক—তারপর ঠিক হয়ে যাবেক। হাঁটো—

পটু বাউরী পাড়ায় জুতো পরে হাঁটা অভ্যাস করছে। অনেকেই দেখে পটু কদিন অভ্যাস করার পর এখন জুতো পরে হাঁটে পথে-ঘাটে। সেদিন হরিমণ্ডপের পথের ধারের রকে বসে শরৎ ভটচাযের দল হুকো টানছে আর এবার চাষের সময় মুনিস মাহিন্দার না পেলে চাষ হবে কি করে তাই ভাবছে। হঠাৎ পটুকে আসতে দেখে চাইল তারা। পরণে ধুতি, হাফসার্ট আর পায়ে জুতো পরে আসছে পটু। এ যেন অন্যকোন জন।

যে লোকটা এতদিন চারপাই ধান আর জলখাবার দরুণ দুপাই মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজএর মজুরিতে কাজ করেছে কোমরে একটুকরো কাপড় জড়িয়ে মাথায় গামছা বেঁধে রোদে-বৃষ্টিতে এ সে নয়। এই যুগ ওদেরও আমূল বদলে দিয়েছে।

সতীশ চাটুয্যে বলে—ই কি রে পটু!

পটু বলে—আজ্ঞা ভুটে দাঁড় করাইছে, তাই—

—কোথায় চল্লি? সতীশ চাটুয্যের কথায় পটু জবাব দেয়

—আজ্ঞা, মিটিন আছে গোঁসাইপুরে, তাই যেছি।

পটু চলে গেল। শরৎ ভটচায হুঁকো টানা বন্ধ করে, ওকে আপাদমস্তক দেখছিল আরও অবাক হয় যে পটু প্রণাম করতে এতদিন মাথা নীচু করে ব্রাহ্মণদের সামনে হাত নামিয়ে যেতো, সেই পটু আজ তাদের সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে জুতো পরে

বের হয়ে গেল দেশোদ্ধারের মিটিং-এ।

শরৎ ভচটায বলে—দেখলে চাটুয্যে শালা বাউরীর ব্যাপারটা। মুখের সামনে দে জুতো-জামা পরে বাবু সেজে গটগটিয়ে চলে গেল। বলে কি না মিটিং-এ যাচ্ছি।

সতীশ বলে—যুগ বদলে যাচ্ছে ভচটায। গাড়ির চাকা এতদিন ছিল নীচে এবার উপরে উঠছে আর উপরে দিক চলেছে নীচে মাটির দিকে। এবার কর্ণের রথচক্রের মত সেই উপরের চক্রকে ধরণীই না গ্রাস করে হে।

শরৎ বলে—তাই দেখছি। এবার চাষ-আবাদও আর করবে না। শেষে হাল ঠেলতে না হয় বামুনদেরও।

মদন ঘোষ বলে—তাও হয়েছেন গো। আগুড়ের মনি মুখুয্যের এত এত জমি, দেখি কলের লাঙল এনে ওর ছেলেই এবার নিজেই মাটি চষছে গো।

শরৎ ভটচায বলে—কি দিন পড়লো রে। এ্যাঁ।

সতীশ চাটুয্যে বলে—ওই দুগ্গোপুর আমাদিকে খেলেক। উখানে লোহাগলানো চুল্লি বসছে হে, যতদূর ওর আলোর আভা যাবেক ততদূর পুড়িয়ে ছারখার করে দিবেক।

শরৎ ভটচাযের ছেলেটা এতদিন বেকারই ছিল। গাঁয়ে খেতো দেতো আর মোড়লি করতো। দু-একবার বর্ধমান, রাণীগঞ্জে গেছে যদি কোন কাজের সন্ধান মেলে। গাঁয়ে তো কাজ নাই। কিন্তু কোন কিছু না পেয়ে ফিরে এসেছে।

এরপর প্রায়ই দুর্গাপুরে যাতায়াত শুরু করে শরৎ ভটচাযের ছেলে অসিত, বামুনপাড়ার নন্দ, গোয়ালাপাড়ার ভক্তি আরও অনেকে।

সকালের বাসে যায়, দিনভোর এ কারখানা—ওদিকের নির্মীয়মান কোন কারখানার গেটে লাইন দেয়, সেখানে লাইন দিয়ে থাকে অনেকে ভোর থেকেই, তাদের থেকে কিছু লোকদের নেওয়া হয় দৈনিক কাজের জন্য, কেউ নেয় হপ্তাহ ভোর কাজের জন্য। অনেকে কাজ পায় কেউ পায় না।

এইভাবে আসা-যাওয়া করতে করতে আরও অনেক খবর পায় তারা। চারিদিকে ছোট-বড় কারখানা তৈরি হচ্ছে অনেক। তেমনি কোন কারখানাতে চাকরি পেয়ে যায় তারা। শুধু তারাই নয় এদিকের বিভিন্ন গ্রামের বেকার ছেলেরাও চাকরি পাচ্ছে। শরৎ ভটচাযের বেকার ছেলেটা এখন নতুন সাইকেল কিনে বাসরাস্তা অবধি যায়। সেখানে সাইকেল রেখে বাসে কাজে যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। মাস গেলে গ্রামের অনেকের বাড়িতেই নগদ টাকা কিছু আসছে। ছেলেদের পোষাক-আশাক চাল-চলনও বদলে গেছে এখন। তবু যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট তো খেতেই হবে।

তাই শরৎ নগদ টাকার লোভে ছেলের আবদার মেনে চলে। টাকাও পায় মাসে মাসে। শরৎ তাই সতীশের কথায় বলে—তবে লোকে খেতে পাচ্ছে হে। কাজকর্ম পাচ্ছে।

সতীশ চাটুয্যে বলে—হ্যাঁ, ওই এক মুঠো ভাতের লোভ দেখিয়ে জাত মারছে তা বুঝবে পরে। দেখছ তো—পথের জঞ্জাল মাথায় উঠছে। ওই পটুদের এবার সামলাতে পারবে?

শরৎও ভাবছে কথাটা।

ওরাও এবার ওই ভোটের মিছিলে সামিল হয়েছে। তারাও প্রদীপদের দলে মিশেছে। ওরা এই অঞ্চলের খেটে-খাওয়া বঞ্চিত মানুষদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের দলে এনেছে। দুর্গাপুরেও এখন প্রদীপদের দলের অন্যতম কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে বাইরের নেতারা এসে সারা দেশের দারিদ্র্য দূর করার কথা ঘোষণা করে।

কমলদাস—গুণময়দের সঙ্গে এখন এসে যোগ দিয়েছে শেঠ পিয়ারীলালও। শেঠজী সেদিন সুধাময় ভটচাযের মন্দিরে এসেছিল। এখন সে ওই সুধাময়ের খুবই অনুরক্ত। কারণ সুধাময়ের কবচ আর যাগ-যজ্ঞের জোরে তার সব বিপদ নফরা একদম সাফ হয়ে গেছে।

তাই শেঠ বাবার কাছে আসে তার সঙ্গে আরও দুনম্বরী কারবারীদের অনেকেই আসে। সুধাময়ও জানে ওদের পাপের কড়ি কিছু মিথ্যা অং-বং করে ঠকালেও পাপ নাই। সে চোরের উপর বাটপাড়ি করে মাত্র।

শেঠ পিয়ারীলাল সেদিন ফিরছে, পথে গাড়িটা বিগড়েছে মহুয়াবনের মধ্যে। মিস্ত্রি মেকানিক কাছাকাছি নাই। হঠাৎ মটরবাইক নিয়ে একজনকে আসতে দেখে তাকেই থামায় শেঠজী। মাথায় হেলমেট, চোখে গগলস্, গায়ে চকচকে জার্কিন পরা যুবককে দেখে শেঠজী বলে ওঠে—আরে গুণধর, তুম্ ইধার।

গুণময় চিনেছে শেঠ পিয়ারীলালকে। এই শেঠজীই ছিল তাদের দলের ওয়াগন ভাঙ্গা, ট্রাক থেকে লুট করা লোহা, টায়ার, টিউব, মটর পার্টস যাবতীয় চোরাই মালের মহাজন।

ওর গুদামে মাল তুলে দিলে ওদের দায়িত্ব খালাস। আর শেঠজী তাদের দামেও বিশেষ ঠকাতো না। টাকাও ঠিকমত দিত। আবার শেঠজীর লোকজন ছিল রেল অফিসে। তারাই শেঠজীর গদিতে খবর দিত কোন মালগাড়ির কোন ওয়াগনে দামী মাল আছে আর কখন সেই মালগাড়ি যাবে। শেঠজী গুণধরদের সেই খবরগুলো দিয়ে বলতো।

—হুসিয়ারী সে কাম করনা গুণধর। সব মাল মেরেকোই দেনা।

ওদের কারবারেও সুনামের প্রশ্ন আছে। একবার বেইমানী করে সেই লুঠের মাল অন্যত্র বেশি টাকার জন্য দিলে আর এরা কোন খবরও দেবে না। অন্য দলকে দিয়ে

কাজ করাবে। আর চাই কি গুণধরদের মাল লুটের হদিশ দিয়ে তাদের এ্যাকশানে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকেও খবর দেবে।

যদিও পুলিশের সঙ্গে এদের ব্যবস্থা থাকে, তবুও পুলিশও জানে এই দলকে শেষ করা দরকার, যাতে বশংবদ অন্যদল নিরাপদে কাজ করতে পারে, তাই পুলিশও হামলা করে, গুলি চালিয়ে দেয়। লাশও পড়ে।

তাই এই অন্ধকারের মানুষগুলো পারতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুনম্বরী করে না। এইভাবে চলছিল। কিন্তু বেশি লুঠপাট হতেই সরকারের টনক নড়ে। ওরাও নতুন বাহিনী এনে হানা দিতে দু-চারজন ধরা পড়ে যায়। কয়েকজন পুলিশের গুলিতে মরে আর গুণধরও গা ঢাকা দেয় এখানে।

সে কয়েক বছর আগেকার কথা।

তবু শেঠজী চিনেছে গুণধরকে, গুণধরও চিনেছে শেঠজীকে।

গুণধর নেমে এগিয়ে যায়—কি ব্যাপার শেঠজী, এখানে?

শেঠজীও বোধহয় এদিকে নতুন কোন ধান্দার চক্করে এসেছে ভেবে নেয় গুণময়। কারণ শেঠজী কোন চক্কর ছাড়া কোথাও যায় না। শেঠজী বলে—ওই গোপগাঁ আছে না, উখানে সুধাময় বাবার কাছে আসলো।

গুণময় দেখেছে ইদানীং তার অগ্রজ সুধাময় ভেক বদলে এখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আর মন্দিরও ভক্তদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ বড় সড় করেছে। গ্রামে জমি-পুকুরও কিনছে বাবা সেজে।

ওদিকে বড়দা কালিকান্ত পঞ্চতীর্থ সেই জঙ্গলের ধারে আশ্রমেই রয়ে গেছে। সে তেমন রোজগারও করতে পারে না। এ যুগের অচল মাল। মেজদাই এখন চালু, নাহলে এই ফেরব্বাজ শেঠজীদের সে টুপি পরিযে রোজগার করছে।

গুণময় বলে—তাই নাকি?

—গাড়িটা বিগড়ে গেল।

গুণময় দেখে বলে—একটু ছায়ায় বসুন, দেখি আমি মেকানিককে পাই কিনা। ইদানীং ওদিকে বড় রাস্তা হচ্ছে, ওদের ক্যাম্পও হয়েছে। সেখানে কর্তাদের জিপ, কার, ট্রাক সবই থাকে। মিস্ত্রিও থাকে। গুণময় তাদেরই একজনকে নিয়ে আসে।

সে ওদিকে গাড়ির কাজ করছে।

গুণময় বলে—আমার বাড়ি ত এই গ্রামে।

শেঠ খুশি হয়—হ্যাঁ। তাহলে তো ভালোই হলো। তুম্ জান পহচান আদমী। কাজের ছেলে। তা এখানে কাম ধান্দা কি করছে?

গুণময় বলে—এই টুকটাক কাজের ধান্দা করছি। ওইসব ওয়াগনের কাজ তো বন্ধই হয়ে গেল। বহুৎ খতরা কাম ওসব। এখন অন্য কাজ-কারবারের চেষ্টাই করছি।

শেঠজী বলে—ওই যে উধারওয়ালা জমিন বাইশ একর ডাঙ্গা, উ হামি লিয়েছে। বড় রাস্তার বগল, উধার হম্ প্লাষ্টিকের কারখানা করবে শোচলো।

গুণময় এবার যেন ধান্দার গন্ধ পেয়ে বলে—তাহলে তো ভালোই হয় শেঠজী।

শেঠজী বলে—পারমিট, টারমিট, লাইসেন্স হমকো মিলেসে। এবার কারখানার বাউণ্ডারী ওয়াল শেড—উধার অফিস—পানি ট্যাঙ্কি, ডিপ টিউবওয়েল ইসব বানাতে হবে।

গুণময় জানে নাড়ু নাড়াচাড়া করলেই গুড়ো পড়ে। বড় বড় নাড়ু হলে গুঁড়োও বড় হবে। হিসাবে মিলবে ভালোই। তাই বলে—শুরু করে দিন শেঠজী। পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড়াচ্ছি। জিতবোই আর জিতলে অঞ্চলপ্রধান আমিও হতে পারি, না হয় দলের কেউ হবে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আর কনস্ট্রাকসনের কাজও দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশোনা করে দিতে পারবো। এলাকায় কারখানা হলে এখানের লোকদেরও উপকার হবে। কোন ভাবনা নেই, চলে আসুন।

শেঠজীও ভাবছে কথাটা। গুণময় তাহলে এখানে এখন জাঁকিয়ে বসেছে।

এবার গুণময় বলে—ওই সুধাময়জী আমার দাদা!

শেঠজীর বিশ্বাস ভক্তি এবার বেড়ে যায়। ছোকরা শুধু এলেমদারই নয়, বেশ করিতকর্মা। তাই শেঠজী বলে—ভালোই হলো গুণময়। তাহলে তুমি একদিন আসানসোলে আমার বাড়িতে এসো। ভোটের কথাও হবে। আর কারখানা তৈরীর বাতচিত ভি হবে।

গাড়ির কাজও ততক্ষণে হয়ে গেছে।

শেঠজী বুঝেছে গুণময়ের এখানেও শিকড় আছে। তাই ভরসা পায় সে।

গুণময় সব তাসগুলো বের করে খেলে না। পাকা খেলোয়াড় কখনই অপরকে তার শক্তি বা দুর্বলতা কোনটারই সঠিক খবর দেয় না, দিতো চায় না। এখানে সে কমল দাসের ঘাড়ে চেপে যাত্রা শুরু করেছে। ক্রমশ ধাপে ধাপে উপরে উঠছে গুণধর।

এখন তার নিজের ওই চোলাই মদের ব্যবসাতে দৈনিক রোজকারও কম নয়, সেও একটা ক্রাশিং প্ল্যান্টও করেছে। তবে কমলবাবুর পাশেই আছে। ওই মেটাল ফ্যাক্টরী আর হয়নি।

কমলবাবু ওখানে ধানকল করছে, গুণময় তার ওইসব কাজ দেখাশোনা করছে, সদরে কখনও কলকাতায় যাতায়াত করে মালপত্র আনাচ্ছে।

কিন্তু গুণময়-এর স্বপ্ন অনেক। সে কমলকে টেক্কা দিতে চায়। অবশ্য মুখে সেটা কদাপিও জানায় না। এবার ওই শেঠজীকে হাতে আসতে দেখে গুণময় আবার নতুন করে ভাবছে কথাটা।

শেঠজীর যোগাযোগ কলকাতার উপর মহলে মায় দিল্লি অবধি। ওর টাকার জোরও অনেক। এবার শেঠজীকে এখানে প্রতিষ্ঠা করাতে পারলে তার ফাঁক থেকে গুণময়ই ঠেলে উঠবে কমলের চেয়েও অনেক উপরেও, তাই সাবধানে পা ফেলতে হবে তাকে।

কমলকে শেঠজীর কথা কিছুই বলে না গুণময়। কমলদাসকেই একান্তে ভজনা করে চলেছে সে।

কমল দাস এখন ভোটে জেতার স্বপ্ন দেখছে। ওই মেটাল ইনঞ্জিনিয়ারিং গড়তে দেয়নি তাকে ওই প্রদীপ, হরিশ, কেদারের দল। ওদের এই ভোটেই তার জবাব দেবে।

গতিলাল এখন খুবই ব্যস্ত।

সে দেখে কামারপাড়াতেও রাতে মিটিং করছে প্রদীপ, কেদারের দল। ভোটের কোন বুথে কোন দলের ভোট বেশি পড়বে, কোথায় কম পড়বে সে সবের হিসাবও করে তারা।

গতিলাল নীরবে শোনে। আর সেই খবরগুলো এনে দেয় কমলের কাছে। গুণময়ও থাকে। কমল বলে—গুণময়, গোসাই গঞ্জে ওদের পুরো ভোট, দে গায়ের দুটো বুথে ওরাই টানবে—গোপগাঁয়ের একটা বুথে ওরাই জিতবে। তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে?

গুণময় জানে ভোটের কলা-কৌশল।

আসানসোল, রাণীগঞ্জের ইলেকশনে তারা কাজ করেছে। দরকার মত বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোটও দিয়েছে। না হয় বুথে হাঙ্গামা করে আসল ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে তাবপর নিজেরাই যা করার করেছে। বলে গুণময়ের দাদারাই সেখানেই জিতেছে বার বার।

গুণময় বলে—ওর ব্যবস্থা করে দিতে পারি কমলদা, তবে ইয়ে মানে থানা তো তোমার হাতেই, ওদের একটু মুখ ফিরিয়ে থাকতে বলবে। আর কিছু খরচা করতে হবে।

—কেন?

গুণময় এবার কমলকে সব ব্যাপারটাই বিশদভাবে জানায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে। কমল দাসও মন দিয়ে শুনছে গুণময়ের পরিকল্পনার কথা। অবাক হয় কমল—এইভাবে সহরে ভোটে জেতে তাহলে?

গুণময় বলে ভোটারদের ভোটে থোড়াই জেতে, ওইসব কলা-কৌশল করে জিতিয়ে দিই আমরাই, আর ওই নেতারা গলায় মালা পরে আবীর মেখে দলবল নিয়ে বিজয় মিছিল করে। তারপর গদিতে বসে পাবলিকের পিছনেই আছোলা বাঁশ দেয়। তুমিও তাই দেবে কমলদা, তোমাকেই জিতিয়ে দোব।

কমল তবু বলে—কোন গোলমাল হবে না তো?

গুণময় বলে—গোলমাল। আমরা বলি গোলমাল করে দে মা, লুটে-পুটে খাই। গোলমাল তো করতেই হবে, নাহলে জিতবে কি করে? গোলমাল হবে তবে তোমার গায়ে আঁচ লাগবে না।

কমলের জেতার দরকার। তার খুব ইচ্ছা ওদের সেই আগেকার বিজয় মিছিলের মত সেও মিছিল করবে। তাই বলে—তাহলে যা করার করো গুণময় তবে খুব গোপনে। টাকাকড়ি যা লাগে নাও। সহরের ওদের এনে গ্রামের বাইরে ওই নতুন কারখানার ভিতরে রেখে দোব, কেউ যেন জানতে না পারে।

গুণময় টাকা-কড়ি বুঝে নিয়ে বলে—ওর জন্য একদম ভাবতে হবে না। আমার এসব কাজে বেশ সুনামই আছে, দেখবে এবার গুণময়ের খেল।

কমলও স্বপ্ন দেখছে, জেতার স্বপ্ন—মিছিলের স্বপ্ন।

গুণময় শহরে এসেছে শেঠজীর কাছেও যায়। শেঠজীও তাকে আপ্যায়ন করে বসায়। আর কারখানার কাজের কথাও বলে। গুণময় বলে—ভোটটা হয়ে যাক। তারপরই নামা যাবে।

শেঠজী জানে কখন কি করতে হয়। এদের পঞ্চায়েতে আনার দরকার। তাই নিজে থেকেই হাজার পঁচিশ টাকা দিয়ে বলে—রেখে দাও, তোমাদের ভোটের জন্য দিল।

গুণময় মালক্ষ্মীকে কখনও প্রত্যাখান করে না। তাই তুলে নেয় টাকাটা।

অনেকদিন পর ঠেকে যেতে পুরোনো চ্যালারাও খুশি গুণময়কে দেখে। —কি গুরু, আবার ধান্দায় আসছো? এসো—

একজন বলে—তোমার মত ছেলেক পেলে আবার পুরোদমে ওই তোড়তাড় এর ধান্দা শুরু করি বস্। এসব ছুটকো-ছাট্কা ধান্দা করে মন ভরে না। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

গুণময়এর খাতিরে মাংসের দোপেঁয়াজী, চিকেন রোস্ট, বিলাতী মালও আসে।

গুণময় পুরোনো বন্ধু, চ্যালাদের নিজেই খরচা করে খাওয়ায় আর বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে—সন্ধ্যার পর একটা ট্রাক নে চলে যাবি। আমি বড়জোড়ার মোড়ে থাকবো তোদের জন্যে।

একজন বলে—কাজটা কি গুরু? ট্রাক লুঠ?

গুণময় বলে—না, না। লুঠই করতে হবে, তবে ট্রাক নয়, ভোট।

বুলেট ওদের এখনকার দলপতি, গুণময়ের হাতের তৈরি ছেলে। সে বলে—তাহলে নেতা হবে গুরু। সাবাস! এমনি নেতা তো চাই, নাহলে আমাদের কি হবে? তাই তোমাকে জিতিয়েই দোব গুরু। বেফিকির থাকো।

মন্টা বলে—কোন ব্যাটাকে বুথের ধারে-কাছে আসতে দোব না।

বুলেট বলে—গুপী, ত্যানা আজ থেকেই মশলা এনে ছোট-বড়-মাঝারি তিন সাইজের বোম বানাতে শুরু কর। পাড়াগাঁয়ের ভোটে ওটার খুব দরকার। যেন আওয়াজ বেশি হয়, একেবারে পিলে কাঁপানো আওয়াজ।

সারা এলাকার মানুষ ভোটের জন্য তৈরি হয়েছে।

এবারের ভোট যেন একটা হৈ-চৈ ফেলেছে। একদিকে ওই সাধারণ মানুষ, শ্রমিকদের দল, অন্যদিকে কমল দাস গুণময়, এলাকার বেশ কিছু সুবিধাভোগী সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষের দল।

গ্রামীণ সমাজের মধ্যে এতদিন এই পার্থক্যটা ঠিক স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। সবাই মিলে-মিশেই থাকতো। সুখে-দুঃখে সমব্যথী ছিল সকলেই সকলের। উৎসবে-সমারোহে একত্রিত হতো।

এখন যেন হঠাৎ সমাজের সেই বাঁধানো চত্বরে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে আর সেই ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। এখন এ-দল ও-দলের মধ্যে নীরব একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

ভোটের দিন সকাল থেকেই সাজসাজ রব পড়ে যায়।

গ্রামের ছেলেরাও যে-যার দলে ভিড়ে কাজ শুরু করেছে। বিজয় এখনও চুপচাপই থাকে। লক্ষভ্রষ্টের মত ঘুরে বেড়ায়, আর নোটন তার সহচর হয়ে ঘোরে।

বিজয়ও সেদিন চীৎকার করে—ঠাকরুন, যাও ভোট দিতে যাবে না?

তুমি কাদের ভোট দেবে বলোতো—তাহলে তার উলটো দিকে আমি ভোট দোব।

ভোট ফর—হরিপ্রিয়া ঠাকরুন।

হরিপ্রিয়ে ঠাকরুনকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। এ্যাই নোটনা চুপ করে রইলি যে! বল—হরিপ্রিয়ে ঠাকরুনকে—ভোট দিন। ভোট দিন।

হরিপ্রিয়া চুপ করেই থাকে। বিজয়ের সেই উদগ্রভাবটা গেছে। কিন্তু মনের অতলে জ্বালাটা কমেনি।

বিজয়ও আজ সেজেগুজে ভোটপর্ব দেখতে গেছে।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে বুথ হয়েছে। ভিন গ্রামেও বুথ হয়েছে। প্রদীপ-বরুণরাও ব্যস্ত।

গোবিন্দবাবু প্রথম থেকেই চাননি বরুণ ভোটে দাঁড়াক। বলেন—এতদিন ভদ্রলোকের মত ভোট হয়েছে, কাজ করার চেষ্টা করেছি। এরপর দিন বদলেছে। নোংরা রাজনীতিই হবে। ওসবে আর যাস্ নে বরুণ। কাজকর্ম দ্যাখ,

বাসন্তীও বলে স্বামীকে।

—কি দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে? বাবাও নিষেধ করছেন। ওসবের

মধ্যে আর যেও না।

বরুণ বলে—না গেলে যারা আসবে তারা তো পরিস্থিতি এমন ঘোরালো করে দেবে যে শান্তিতে বাঁচারই উপায় থাকবে না। তাই এই লড়াই আমাদের বাঁচার লড়াই। এর থেকে মুখ ফেরানো চলবে না বাসন্তী।

বরুণও ব্যস্ত আজ।

সকাল থেকেই প্রদীপ হরিশবাবু বরুণরা ঘুরছে গ্রাম-গ্রামান্তরের বিভিন্ন বুথে। ওদের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলছে। জরুরী নির্দেশ দিয়ে চলেছে। ভোটাররাও এসে বুথে ভিড় করছে।

কমলবাবু, গুণময়, গতিলাল, রামনিধিবাবুর দলও তৈরি। তারাও দেখাশোনা করছে। বেলা হতে না হতে মেয়ে পুরুষদের ভিড় জমে বুথে বুথে।

এবার দেখা যায় বেশ কিছু নতুন মুখদের। তারা জিপে, মটরবাইকে ঘুরছে। আর হঠাৎ গোসাঁইপুরেই বেশ কয়েকটা বোমা ফাটে কোন বুথের সামনে।

তেমনি ভাবে দেগো—গোপগাঁয়েও বোমার শব্দ ওঠে।

কলরব-হৈ-চৈ পড়ে। ভীতত্রস্ত ভোটারের দল এদিক-ওদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। হরিপ্রিয়া, সুখদা ওরাও ভোট দিতে আসছিল ওই বোমার শব্দ কলরব আর ভীত পলায়মান জনতাকে দেখে দাঁড়ালো।

বিজয়ও এসেছিল ভোট দিতে। সেও এবার দৌড়ছে সামনে হরিপ্রিয়াকে দেখে বলে—যাও ঠাকরুন, একেবারে স্বগ্গে গে ভোট দেবে। যা দমাদ্দম বোমা পড়ছে ওখানে।

অবাক হয় হরিপ্রিয়া ঠাকরুন।

—সে কি রে!

নোটন বলে—যেও না কত্তামা, বুড়ো বয়সে বোম খেয়ে মরবে। কারা একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড করেছে। যেওনা গ।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রামের লোক বাস করে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা হলেও সেটার পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই মিয়ে যায়। মার দাঙ্গার প্রশ্নই ওঠে না।

পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বাস করে তারা একে অন্যের জন্য ভাবে, তাদের বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। এ তাদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ব্যবস্থা।

এর আগেও ভোট হয়েছে।

চীৎকার-চেঁচামেচি, ঝগড়াও হয়েছে। সেটা আবার ভোট চুকে যেতে থেমেও গেছে। তাদের দিন-যাপনের গতিতে স্বাভাবিক সেই হৃদ্যতাও ফিরে এসেছে।

কিন্তু এবার এই অঞ্চলের পরিবেশ হঠাৎ কেমন বদলে গেছে।

এবার আমদানী করা হয়েছে পেশাদার গুণ্ডাদের টাকার বিনিময়ে। তারা দুদিনের

জন্য এসে ওই বোম মেরে এতদিনের হৃদ্যতা, সমাজব্যবস্থা, বাতাবরণকেই যেন বদলে দিল।

পঞ্চতীর্থ মশায় ভোট দিতে আসছিলেন। সঙ্গে রয়েছে তার ভাইপো নীতু। নীতু এখন কৃতিত্বের সঙ্গে জলপানি পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে এখন কলেজে পড়ছে। জ্যাঠামশাই-এর জন্যই আজ নীতু নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। বাবার ওই ভণ্ডামির তাবিজ কবচ, হোম-যজ্ঞের মধ্যে সে নেই। এখন সে বিজ্ঞানের ছাত্র। সবকিছুকে সে বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে বিচার করে।

তার ছোটভাই বাদল এখন তস্য পিতৃদেব তান্ত্রিকাচার্য জ্যোতিষার্ণব মহা মহোপাধ্যায় সুধাময় ভটচাযের সহকারী হয়ে উঠেছে। সেও রক্তবস্ত্র পরে মাঝে-মাঝে হোম-যজ্ঞ করে। যজমানের পকেট সাফ করার বিদ্যেটাও শিখেছে। আর কাকা গুণময়ের মদের ঠেকের ব্যবসার হিসাবও রাখে। তার থেকে বেশ রোজগারও করে।

বাদল আজ প্যান্ট, টাইট গেঞ্জি, পায়ে দামী কেডস পরে গুণময়দের পোলিং এজেন্ট হয়ে বুথে ছিল।

দেখছে সে বাইরে বোমা ফাটছে, পালাচ্ছে ভীতত্রস্ত সাধারণ মানুষ। ধোঁয়া—বারুদের গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এই অবসরে সেও তার দু-একজন চ্যালাকে নিয়ে এবার পোলিং অফিসারের হাত থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে কাকাদের দলের প্রার্থীদের নামে ছাপ মারতে শুরু করে।

পোলিং অফিসার বেচারা ভয়ে কাঁপছে। বাইরের বোমার প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া।

এদিকে ঘরের মধ্যে এই কাণ্ড দেখে সে বলার চেষ্টা করে—কি হচ্ছে এসব?

বাদল গর্জে ওঠে—চুপ করে বসে থাকুন। নাহলে ওদের ডাকি ঘরের মধ্যেই দু-চারটে বোমা টপকে দেবে। সব বিলকুল সাফ হয়ে যাবে।

ওরা প্রাণভয়ে চুপ করে থাকে।

এদিকে এরাও বাদলের নেতৃত্বে তখন ব্যালট পেপারে ছাপ্পা মারছে আর বাক্সে ঢোকাচ্ছে। গোছা গোছা ব্যালট পেপার ঢুকে গেল বাক্সে।

গুণময় প্ল্যানটা বেশ নিখুঁতই করেছিল। এসব এ্যাকশনের প্ল্যান সে নিখুঁত ভাবেই করতে পারে। আসানসোল ফিল্ডে তার প্ল্যানেই বড় বড় ওয়াগন ব্রেকিং হয়েছে। পুলিশের নাকের উপর এ্যাকশন করে পুরো মাল নিয়ে অন্ধকারেই কেটে পড়েছে তারা।

এখানের এ্যাকশন তার তুলনায় কিছুই নয়। তাই ওটা বেশ নিখুঁতভাবেই করেছে সে। আর প্রতিপক্ষকে এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে দেয়নি। তারাও তাই এ ব্যাপারে অবহিত ছিল না।

তাই বোম বিস্ফোরণ হৈ-চৈ এমনি ধরনের আক্রমণের মোকাবিলা করার মত

উপায়ও তাদের হাতে ছিল না।

প্রদীপ—বরুণরাও খবর পেয়ে আসে। তখন ওই বুলেট মন্টার দল অন্য গ্রামের শান্তিপূর্ণ বুথে গিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। সেখানেও জনতা বোমার ভয়ে পালায়। বুথ ফাঁকা—সেখানের বুথেও গুণময়ের কর্মীরা ওইভাবেই ভয় দেখিয়ে ব্যালট বাক্স ভরিয়েছে।

পরে গোলমাল থেমে যায়। ওই বোম পার্টিও সেই অবসরে সরে পড়ে। বরুণ প্রদীপরা ভোটারদের আবার এনে লাইনে দাঁড় করায়। তারাই বলে—ভোট দেবেন। নিজেদের মতামত নিশ্চয়ই জানাবেন।

পঞ্চতীর্থমশায়ও এসেছেন এবার হরিপ্রিয়া ঠাকরুন, সুখদা ঠাকরুনরাও আছে।

কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখেন তারা, তাদের ভোট হয়ে গেছে।

পঞ্চতীর্থ বলেন—সে কি! আমি ভোট দিলাম না, সবে এসেছি, বলছেন ভোট হয়ে গেছে।

পোলিং অফিসার খাতা দেখিয়ে বলে—দেখুন।

—সে কি! পঞ্চতীর্থ বলেন—এ যে দেখছি মিথ্যার যুগই এলো!

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের ভোটও হয়ে গেছে। ওই আগেই বাদলের দল সেই কর্ম সেরে দিয়েছে। সুখদা ঠাকরুন গর্জে ওঠে। সে এবার নিজ মূর্তি ধরে গর্জায়—আমার ভোট হয়ে গেছে? রং-চালাকি পেয়েছো? এলাম নাই, যুদ্ধ চলছিল মুখপোড়াদের আর এসেছি ত্যাখন বলছ ভোট হয়ে গেছে? মিথ্যু খালভরার দল! যমের অরুচি।

পোলিং অফিসার ভদ্রলোক এর আগে বোমার হাত থেকে বেঁচেছে। এখন আবার এহেন তীক্ষ্ণধার বাক্যবাণের সামনে পড়ে আর্তকণ্ঠে বলে—দেখুন মা।

—চোপ ইস্টুপিট, আমি ভোট দোবই। সুখদা ঠাকরুনকে চেনো না? ওই কমল দাস কত দিয়েছে এ্যাঁ?

লোকজন জুটে যায়। এবার পোলিং অফিসার বলে—ঠিক আছে, আপনি দিয়ে যান ভোট।

বাদল কমলের পোলিং এজেন্ট, সে কি বলতে যাবে। এবার ঠাকরুন ফুঁসে ওঠে—চোপরাও মা কালীর বাচ্চা। য্যামন ফেরেব্বাজ বাপ তেমনি ফেরেব্বাজ ব্যাটা। লোককে মাদুলিতে মাটি পুরে পয়সা নিস—তাই নে গে যা। ইখানে কেনে? দাও—ভোট-এর কাগজ!

সুখদা ঠাকরুন সগর্জনে ভোট দিয়ে বের হয়ে আসে কমল দাস এণ্ড কোম্পানীর মুণ্ডপাত করতে করতে।

পঞ্চতীর্থ আশ্রমের দিকে চলেছেন। আজকের ব্যাপারটা দেখেছেন তিনি। আর দেখেছেন গুণময়কে ওই বোমাবাজ ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলতে। তার দৃঢ় বিশ্বাস

এই অশান্তির নায়ক ওই গুণধরই। শুধু গুণধর নয়, তার মনে হয় ও যেন একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রতীক। অনাগত এক নিষ্ঠুর ভবিষ্যত।

গুণধর এদিকের ভোট সাফ করে এবার দে গাঁয়ের বুথের দিকেই অভিযান চালাতে নির্দেশ দেয় তার বাহিনীকে। এর মধ্যে প্রদীপ বরুণদের দল, কেদার অন্যরাও বুঝেছে গুণধর তাদের হারাবার জন্যই বাইরে থেকে লোকজন আমদানী করে এইভাবে বোমবাজী করে বুথ খালি করিয়ে নিজেরাই ছাপ্পা ভোট দিয়েছে।

তাই ওরাও এবার প্রতিআক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে দে গাঁয়ে এসে হাজির হয়েছে। ওদিকে আমবাগান, সরবন এদিকে স্কুলে ভোট হচ্ছে। হরিশবাবুও খবর পেয়ে তৈরি হয়েছেন।

তার দলবল নিয়ে রয়েছেন বুথের চারিপাশে। ভোট চলছে হঠাৎ দুটো জিপ তীরবেগে এসে বোমবৃষ্টি শুরু করে, স্তব্ধ পরিবেশে বোমার বিকট শব্দ ওঠে। ধোঁয়ার বিষাক্ত কটু গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে। বুথের লোকজন মেয়েরাও ভীতত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিকে পালাবার চেষ্টা করে।

ওদিকে বুলেটের দলও বোমচার্জ করছে।

এমনসময় আমবাগান, সরবন, বাশবন থেকে এলাকার মানুষ এবার মার মার শব্দে ছুটে আসে। ওরাও লাঠি সড়কি কুড়ুল নিয়ে তৈরি। আর পাথুরে মাটি, ছোট-বড় পাথরের অভাব নাই। তাই নিয়েই ওরা ওই জিপের উপর পাথর বৃষ্টি শুরু করে।

বুলেট মন্টার দলএর আগে দু-জায়গায় বীরত্ব দেখিয়ে বোমবাজী করে বাজিমাৎ করে এসেছে। ভেবেছিল এখানেও ফাঁকা মাঠে ওরা কাজ সেরে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা বদলে যায় এখানে।

ওরাই প্রায় ঘেরাও হয়ে গেছে। পাথরের ঘায়ে দুচারজন আহতও হয় ওদের। হরিশবাবুও দলবল নিয়ে এগিয়ে আসেন। ওরাই বাইরে থেকে এসে এখানে তাদের আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে চায়। এদের ধরতেই হবে। তাই বলেন তিনি—ওদের ঘিরে ফ্যাল। ধরতেই হবে ওদের। তারপর সব বের হবে।

মারমুখী জনতা বুলেটের দলকে ঘিরে ধরতে চায়।

বুলেটও জানে ধরা পড়লে জনতাই তাদের শেষ করে দেবে। এ তাদের মরা বাঁচার প্রশ্ন। তাই তারাও মরীয়া। তারা জানে এসময় কি করা কর্তব্য। জনতাও এগিয়ে আসছে।

পাথর বৃষ্টি হচ্ছে জিপের কাঁচই ভেঙ্গে পড়ে। এবার পথ পরিষ্কার করার জন্যই ওরা বোমচার্জ করে। দু-তিনটে বোম পড়েছে সামনে এদিক ওদিকে।

বিস্ফোরণের শব্দে আকাশ কেঁপে ওঠে। ধোঁয়ায় ভরে ওঠে চারিদিক আক্রান্ত জনতা পালাচ্ছে, আর্তনাদ ওঠে। এই অবসরে আরও দু-তিনটে বোমা মেরে তারা জিপ নিয়ে ওই ধোঁয়ার মধ্যেই বেগে বের হয়ে যায়।

সোজা তারা বাসরাস্তার দিকে এগিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় বনের মধ্যে।

জনতা ধাতস্থ হয়, ধোঁয়া কেটে গেছে।

বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন অল্প-বিস্তর আহত হয়েছে। আর ওদিকে রাস্তার উপর পড়ে আছে হরিশবাবুর রক্তাক্ত দেহটা। বোমাটা লেগেছে তার গায়েই, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হাতই উড়ে গেছে।

প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে।

সারা এলাকার মানুষ ভেঙ্গে পড়ে। নিমেষের মধ্যে চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে ওই বহিরাগত হিংস্র নরপশুর দল পালিয়ে গেছে। বরুণ, প্রদীপ, কেদাররাও এসে পড়ে। সারা এলাকার শ্রমিক, সাধারণ মানুষও ভিড় করে আসে। গোবিন্দবাবু, শরৎ ভটচায, সতীশ চাটুয্যের দলও আসে। রমণ ডাক্তার দেখে বলে—ডাইরেক্ট হিট, এভাবে শেষ করে গেল মানুষটাকে?

প্রদীপের চোখের জল যেন শুকিয়ে গেছে কি জ্বালায়। তারা যেন এখানের আন্দোলনের প্রাণপুরুষকে ইচ্ছা করেই এইভাবে শেষ করে গেছে। মণিকাও এসেছে। তার চোখে জল নামে।

আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না হরিশবাবুর। এই অবহেলিত অঞ্চলের মানুষকেই তিনি আপনজন করে নিয়েছিলেন। এখানে সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে তিনিই জ্বেলেছিলেন জ্ঞানের প্রদীপ।

আজ সেই স্কুল এখন অনেক বড় হয়েছে। এখানের অসহায় নিপীড়িত মানুষদের সুখ-দুঃখের তিনিই ছিলেন নিকটআত্মীয়। আজ তাদের জন্যই নিজের প্রাণও বিসর্জন দিয়ে গেলেন।

ওই প্রতিপক্ষ আজ চরম আঘাতই দিয়েছে এখানের সাধারণ মানুষদের। ভোটের ফলাফল কি হবে সেটা জানার আগ্রহও আর নেই প্রদীপদের। আজ তাদের চরম আঘাত দিয়েছে ওই কমলবাবুর দল এটা সত্যি।

পুলিশও আসে।

এবার কমলবাবু, রামনিধিবাবুরাও আসে। দারোগাবাবুকে কমলবাবুই বলে—দেখুন স্যার। এলাকায় কোনদিন অশান্তি ছিল না। এরাই বাইরে থেকে লোকজন এনে অশান্তি করলেন। আর মুড়ি-মুড়কির মত বোমাও ফেলে বুথ থেকে ভোটারদের তাড়িয়েছেন। সেই বোমা ফেটেই এমনি সর্বনাশ হয়েছে।

প্রদীপ বলে—তারা বাইরে থেকে এসেছিল, তাদের চিনি না।

রামনিধিই সব থেকে খুশি হয়েছে। এর আগেও সেই স্কুল থেকে হরিশবাবুকে তাড়াতে চেয়েছিল, আগেকার চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়। হরিশবাবুকে সরাতে পারেনি।

এবার ওই বাইরের লোকরাই হরিশবাবুকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে দিয়ে তার

হেডমাস্টারির পদ পাকাফলের মত তার হাতে এনে দিয়েছে। তাদের কাছে কমলবাবু বিশেষ করে গুণময়ের কাছে রামনিধি অশেষ কৃতজ্ঞ।

রামনিধি বলে—বাইরের লোক তো বটেই। তবে তারা এখানে এলো কেন? যারা তাদের এনেছে—ভগবান তাদের ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ গ্রামে নিরীহ লোকদের ওপর এইভাবে বোমা মেরে যাবে? এর তদন্ত করতেই হবে দারোগাবাবু?

দারোগাবাবু এর মধ্যে কমলবাবুদের কাছে প্রণামী ভালোই পেয়েছে। তাই বলে —নিশ্চয়ই তদন্ত হবে। এখন লাশ পোষ্টমর্টেমে পাঠাতে হবে সদরে। প্রদীপ বলে —দেখতেই তো পাচ্ছেন কি ভাবে মৃত্যু ঘটেছে, তার ওপর আর কাটা ছেঁড়া নাই বা করতে পাঠালেন।

দারোগা বলে—আইন মোতাবেক কাজ করতে আমি বাধ্য।

প্রদীপ বলে—তাহলে যারা খুনীদের এনেছে তাদের এ্যারেস্ট করুন।

এর মধ্যে বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

ভোটের ফলাফলও বের হয়েছে। গোসাঁইপুর গোপগাঁ যেখানে ওরা বোমচার্জ করে ভিড় হঠাতে পেরেছিল সেখানে কমলবাবুরা বিশাল ভোটে জিতেছে, আর এখানে বোম চার্জ করে সুবিধা করতে পারে নি এখানে তারা হেরেছে। তবু ভোট গুনতিতে কমলবাবুর দলই জিতেছে।

বরুণ বলে—বোম যেখানে পড়েছে সেই দুটো জায়গাতে কমলবাবুরা অনেক বেশি ভোটে জিতেছে, আর দেগাঁয়ে বাধা দিতে তারাই হেরেছে। তাহলে বোম মেরে জেতার জন্যই কমলবাবুরাই ওদের এনেছিলেন এইটাই প্রমাণিত হয়।

প্রদীপ বলে—তাহলে ওদের এ্যারেস্ট করুন। দোষী ওরাই।

দারোগাবাবু বলেন—দোষীকে নিশ্চয়ই এ্যারেস্ট করা হবে। তার আগে তদন্ত করা দরকার। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট আসুক। দোষীদের শাস্তি হবেই। কেউ রেহাই পাবে না।

কাল বৈকালে বডি সদর হাসপাতালে পাবেন।

ডেডবডি নিয়ে চলে গেল ওরা।

প্রান্তরে সন্ধ্যা নামে। ভিড় আর নেই। ভোটের ফলও বের হয়ে গেছে। যে যার ঘরে ফিরেছে। সেই প্রান্তরে একটা পাথরের উপর বসে আছে প্রদীপ, আজ সে পরাজিত, বিধ্বস্ত।

ওই অর্থবান প্রতিষ্ঠাবান মানুষদের কাছে তারা হেরে গেছে।

কেদার, বরুণও চুপ করে আছে। তারাগুলো ফুটে ওঠে আজও আকাশের আঙ্গিনায়, বনের দিক থেকে হিমেল বাতাস ভেসে আসে।

বরুণ বলে—হেরে গেলাম সবদিক থেকেই।

কেদার বলে—এমন হবে জানলে আমরাও তৈরি থাকতাম। ওদের দু-চারটে লাশও ফেলে দিতাম। এখন—

এখন কি হবে জানে না ওরা।

প্রদীপ নীরবে কি ভাবছে। মণিকা বলে—লড়াইএ হার জিত আছেই। তাই বলে হেরে গিয়ে লড়াইকে থামিয়ে দেবে?

বরুণ বলে—হরিশদা নেই—

মণিকা বলে—লড়াই তবু থেমে থাকবে না। যে লড়াই এ হরিশদা প্রাণ দিলেন ভয়ে তোমরা যদি সেই লড়াই থামিয়ে দাও বলবো তোমরা ভীরু কাপুরুষ। হরিশদার সঙ্গে তোমরা বেইমানি করেছো।

—না! প্রদীপ গর্জে ওঠে—হরিশদার লড়াই থামবে না বরুণ, কেদার। মণিকা ঠিকই বলেছে। বরং আবার নতুন করে লড়তে হবে। এই লড়াই-এ সামিল করতে হবে সকলকে। ওই ক'জন টাকাওয়ালা সমাজের ভুঁইফোড় মানুষের কাছে সারা দেশের মানুষ কোনদিন হার মানবে না।

আমাদের এই লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

কেদার বলে—তাই হবে প্রদীপদা। এই শুরু হলো এবার আমাদের এগিয়ে চলার, সেই চলার পথে কমল দাস—গুণময়দেরও আমরা পায়ের তলে মাড়িয়ে যাবো।

অন্ধকার রাত্রির বুকে ওদের মনের আকাশে তারাগুলো যেন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই সহর থেকে হরিশবাবুর দেহটা নিয়ে আসে ওরা একটা ভ্যানে। সারা এলাকার মানুষ ভেঙ্গে পড়ে। কাল ওরা বোমবাজি করে শান্ত গ্রামজীবনে একটা বিপর্যয়, ঝড়. বিস্ফোরণ এনেছিল।

আজ যেন তার চেয়েও বড় এক মানসিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে হরিশবাবুর ফুলে ঢাকা মৃতদেহটা। ও এখানের কেউই নয়। তবু এখানের মানুষ তাকে আপন করে নিয়েছিল। তাই আজ ওদের চোখে জল নামে। গ্রামের শ্মশানে সমবেত হয়েছে অনেকেই।

বরুণ প্রদীপরা রয়েছে। কেদার এসেছে, কামারপাড়ার মানুষজনও ভেঙ্গে পড়েছে।

হঠাৎ দেখা যায় আসছেন পঞ্চতীর্থমশায়।

সকলেই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়। পঞ্চতীর্থমশায় এসেছেন আজ হরিশবাবুকে শেষ বিদায় জানাতে। প্রদীপদের চোখে জল, পঞ্চতীর্থ বলেন—দুঃখ-শোক কেন? জানো না গীতায় বলেছেন—

—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—

ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।।
অজো নেত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

যে একে হন্তা বলে জানে, বা হত বলে জানে তারা দুজনেই অজ্ঞ। ইনি হত্যা করেননি, হতও হন না। আত্মা অবিনশ্বর, তাকে কোন অস্ত্র দিয়েই ছিন্ন করা যায় না। তিনি অবিনশ্বর, অমর-অমৃতপথযাত্রী।

সেই জীর্ণ পরিত্যক্ত দেহটাকে অগ্নিসংস্কার করে তারা। অন্ধকার রাত্রিতে আগুনের শিখা বনতলের অন্ধকার উদ্ভাসিত করে তোলে। ছায়ামূর্তির দল শেষ বিদায় দিল তার প্রিয়জনকে। জল ঢেলে চিতাগ্নি নিভিয়ে বসুমতীকে শীতল করে ফিরছে তারা। আজ হরিশবাবু বেঁচে রইলেন তাদের মনে।

স্তব্ধ গ্রামসীমা হঠাৎ ঢোল, ব্যাণ্ড—জয়ঢাকের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। হেসাকের আলো জ্বলছে। বাদ্যভাণ্ড সহকারে কমল দাস-গুণময়-রামনিধি তাদের দলবল এবার খোলা জিপে বসে আবীর রঞ্জিত হয়ে মালা পরে শোভাযাত্রা করে বিজয় মিছিল নিয়ে চলেছে। সামনে গতিলাল আজ ব্যাণ্ডের তালে নৃত্য করছে।

বেশ কিছু পেটোয়া লোকের অভাব নেই ওদের। তারাও চলেছে জয়ধ্বনি দিয়ে।

প্রদীপরা নীরবে দাঁড়ায়।

ওদের দেখে গুণময়ের ইঙ্গিতে ব্যাণ্ড পার্টি জোরে জোরে বাজাতে থাকে। তাসা পার্টির সঙ্গে গতিলাল এখন বেদম নৃত্য করছে কয়েকজন সাগরেদকে নিয়ে। জয়ধ্বনি ওঠে—জিতল কে—কমলবাবু আবার কে। কমলবাবু—জিন্দাবাদ।

ওরা বীর বিক্রমে এগিয়ে চলে গ্রামের পথে।

পঞ্চতীর্থ ফিরছেন। সব দেখে তিনি বলেন—যুদ্ধের প্রথম বলি কি জানো প্রদীপ? ন্যায়, ধর্ম আর সত্য!

কমলবাবু, গুণধরের দল এবার প্রথম লড়াইএ জিতে পঞ্চায়েত দখল করেছে। এর মধ্যে পঞ্চায়েতের টাকা থেকেই কমলবাবুর অফিস ঘরটা সাজাবার ব্যবস্থা করেছে গুণধর।

কমলবাবু প্রথমে অঞ্চলপ্রধান হতে চায়নি। সে বলে—আমার অনেক কাজ ব্যবসাপত্র বাড়ছে, ওদিকে দুর্গাপুরেও ব্যবসা শুরু করছি। টানাপড়েন করতে হচ্ছে। প্রধান হওয়ার সময় কই গুণময়?

রামনিধি মাস্টার এখন কমলবাবুর খুবই বশংবদ ব্যক্তি। রামনিধিও পঞ্চায়েতের সদস্য হয়েছে কমলবাবুর দৌলতে।

সেই কল্পনা করে যে সে অঞ্চল প্রধান হয়েছে।

স্কুলের মাস্টারির প্রমোশনও সে পেয়েছে। হরিশবাবু মারা যাবার পর সেইই এখন প্রধান শিক্ষক হয়ে স্কুলের সর্বেসর্বা হয়েছে।

এবার আশা করে অঞ্চলপ্রধান হয়ে এখানের একজন হয়ে যাবে। দুদিকে দুহাতে রোজগার করবে।

তাই কমল দাস ঠিক রাজী না হওয়াতে রামনিধিই বলে—ওর অনেক কাজ। এসব সামান্য কাজের সময় কোথায় ওঁর?

গুণময় মানুষ চরিয়ে খায়। এর মধ্যে সে অনেক ঘাটের জলই খেয়েছে, ওই রামনিধির মত মানুষদের সে চেনে। ওরা অনেক কিছুরই স্বপ্ন দেখে। ইদানীং কমলবাবুর পিছু পিছু ঘোরে।

গুণময় জানে কমলবাবু বসে যাক রামনিধি তাই চায়। তাহলে গুণময়ের থেকে যোগ্য লেখাপড়া জানা ক্যানডিডেট হিসাবে সেইই প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করার সুযোগ নেবে।

তাই গুণময়েরও সাবধান হওয়া দরকার। কারণ কমলবাবু চেয়ারে থাকলে গুণময়ের কথাই বেশি চলবে। রামনিধিকে সামলাতে বেগ পেতে হবে গুণময়কে। তাই গুণময় বলে—তবু কমলবাবুকে প্রধান হতে হবে। নাহলে পাবলিক আমাদের বিশ্বাস করবে না। তারা কমলদাকে দেখেই ভোট দিয়েছে। আমাকে আপনাকে দেখে নয়। তাছাড়া কি এমন কাজ? কেরানীবাবুরাই সব সামলাবেন। একটা মর্যাদার পদ কমলদাকেই সেখানে বসতে হবে।

কমলও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লোভেই সেখানে বসতে চায়। গুণময়ই তাকে বসালো সেই পদে। কমলই বলে—গুণময়, তুমি উপপ্রধান হও।

গুণময় ধাপে ধাপে উঠতে চায়। তার লক্ষ্য আর অনেক দূরে। সামান্য অবস্থা থেকে সে আজ নানা কৌশলে এইখানে এসেছে। এখানেই থামতে চায় না সে।

তাই আপাতত ওই নিয়েই নেতাগিরির ধান্দার শিক্ষনবিসী করতে চায়। রামনিধিকে বলে কমল—মাস্টারমশাই স্কুলকে আরও বাড়াতে হবে।

রামনিধি বলে—হায়ার সেকেণ্ডারী করতে গেলে অনেক টাকার দরকার।

গুণময় বলে—সৎ কাজে টাকার অভাব হবে না মাস্টারমশাই। দরকার হয় সারা অঞ্চল—আশপাশের অঞ্চলের মানুষের কাছেই হাত পাতবো। সরকারি সাহায্যও আনবো। শিক্ষার প্রসার করতেই হবে। না হলে দেশের মঙ্গল হবে না।

গুণময়ও এখন দেশের মঙ্গলের কথা খুব গভীরভাবেই ভাবছে। তাই কমলবাবুদের নিয়ে প্রথমদিন ঘটা করে অঞ্চল অফিসের দপ্তরে বসলো।

কমলবাবু বলে—কালই বর্ধমান যেতে হবে, দুর্গাপুরের ওখানে একটা ব্যবসাপত্র

করবো, পারমিটের দরকার। তারপর আসানসোল যেতে হবে—ক'দিন থাকছি না।

গুণময় বলে—ভাবতে হবে না কমলদা! আমি তো আছি।

গুণময় এবার থানাতেও বেশ জমিয়ে নিয়েছে পদাধিকার বলে। অবশ্য তাদের প্রণামীটা এখন ঠিকমত পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে গুণময়ের চোলাই ব্যবসা ভালোই চলছে।

সেও গোপনে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কাছে বাকী বিঘে দশের ডাঙ্গাও কিনেছে। এবার অঞ্চল অফিসে বসে দেখে এ যেন সোনার খনি।

সরকার অঞ্চলের পথঘাট উন্নয়ন, পানীয় জল প্রকল্প, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, নানা খাতে ঋণদান প্রকল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা খাতে প্রচুর টাকা দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা সেগুলো একসঙ্গে খরচ করা যায় না। লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে থাকে। সেগুলোই এবার তুলে গুণময় ব্যাঙ্কে রাখে।

কমলবাবুকে বলে—ওর থেকে তুলেই সব খরচ-খরচা করা যাবে।

কমলও নিশ্চিন্ত হয়। নানা কাজ শুরু হয়েছে।

এখন বাদল অর্থাৎ গুণময়ের বড়ভাইএর ছেলেই রাতারাতি ঠিকাদার হয়ে গেছে। নানা জায়গায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, প্রচুর মজুর খাটছে, মাটি পড়ছে রাস্তায়, ট্রাক-ট্রাক মোরাম ঢালা হচ্ছে। কোন গ্রামে ইদারা খোঁড়ার কাজও শুরু হয়।

লোকে বলে—হ্যাঁ। কাজ করছে বটে কমলবাবুর দল। গোবিন্দবাবুরা এ্যাদ্দিন যা করেছে এরা তার চে ঢের বেশি কাজ করছে।

বাদল কয়েক মাসের মধ্যে ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেল ছেড়ে নানা সাইডে কাজ তদারক করার জন্য অঞ্চল থেকেই একটা স্কুটারই পেয়েছে। সেই খাটো ধুতি ছেড়ে বাদল এখন প্যান্ট, সার্ট পরে মাথায় বারান্দাওয়ালা একটু টুপি পরে বেশ বীরদর্পে হাঁটে।

গুণময়ের অফিসেও আসে সন্ধ্যার পর।

এখন গুণময়ের সুযোগ্য ভাইপো বাদলও কাকার ব্যবসার অনেক কিছুই দেখভালও করছে।

এই পরিবর্তনের ঢেউ কুমোরপাড়ার শান্ত পরিবেশে এসেও লেগেছে।

অতুল কামার গোবিন্দবাবুদের দিনের মানুষ। সে তার ওই হাঁড়ি-মালসার কারবার নিয়েই আছে। বয়স হয়েছে।

এখন দেখেছে হাটে হাঁড়ি-মালসা ইত্যাদির বিক্রিও কমছে। মাটির হাঁড়ি সহজেই ভেঙ্গে যায়। আবার কিনতে হয়। আর ইদানীং মজুরি, কাঠের খরচা—এসবের দাম বাড়ার জন্য হাঁড়ি-কলসীর দামও বাড়ছে। তাই এখন অধিকাংশ সংসারেই এনামেলের হাঁড়ি, কলসী, বালতির চলই বেশি হয়েছে।

কুমোরের কারবারে আর পয়সা নাই। তাই এতদিনের জাতব্যবসা ছেড়ে অনেকেই

দুর্গাপুরে চলে গেছে কোন কারখানায় কাজ নিয়ে। পাড়ার গোবরা, বদন, মুকুন্দরা—শাল তুলেই দিয়েছে।

আগে কুমোরপাড়ার ঘরে ঘরে শাল চলতো। মাটি আনতো বনের মধ্যে শালি নদীর ধার থেকে, বেলে-দোঁয়াশ মাটির সঙ্গে এখানের মাঠের মাটি দিয়ে মেখে দুদিন পচান দিয়ে চাকে বসতো। সেই পাটকরা মাটিতে হতো হাঁড়ি, কলসী, মনসার ঝারি, হাতি-ঘোড়া নানা কিছু, সন্ধ্যার মুখে সেইসব শুকনো মাল শালে বসিয়ে পোয়াল চাপা দিয়ে শালের মুখ পুরু মাটির প্রলেপ দিয়ে বন্ধ করে নীচের দিকে আগুন দিত।

ক্রমশ সেই আগুন কুয়োর মত শালের মধ্যে রাখা পোয়াল, জ্বালানীতে ধরতো। ভিতরে গনগনে আগুনে পুড়তো ওইসব শিল্পকর্ম। বাতাসে উঠতো পোয়াল, কাঠ-কাঠা মাটি পোড়ার গন্ধ।

কুমোরপাড়ার আকাশ-বাতাস ভরে উঠতো ওই গন্ধে। অতুলের নাকে ওই সুবাস আসছে ছেলেবেলা থেকেই। গোপ-গাঁয়ের কুমোরদের মালের সুখ্যাতি ছিল সারা এলাকায়।

বাইরের পাইকেররা আসতো, গাড়ি বোঝাই করে মালপত্র কিনে নিয়ে যেতো। এছাড়া তারা এখানের হাটে বিক্রি করতো নানা মাল। বিয়ে-পৈতেতে বড় বড় অর্ডার থাকতো হাঁড়ি, মালসা, গ্লাস বাটির, এখন যেন মানুষের রুচিই বদলে গেছে।

কুমোরপাড়ার লোকজন এবার নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে। —দিনকাল কি পড়লো হে খুড়ো, জাতব্যবসা ঘুচিয়ে দিতে হবেক?

বদন বলে—সবাই এনামেলের হাঁড়ি-কলসী কিনছে হে।

কেষ্ট বলে—সহর বাজারে ওই দুগ্গোপুরেই এক কাজের বাড়িতে দেখলাম ডেকরেটার না ক্যাটারার তারাই বড় বড় হাঁড়ি কড়াই ডেকচি এনে রান্না করে চিনেমাটির পেলেট আর পেলাসটিকের গেলাস বাটিতেই ভোজ খাইয়ে আবার সব ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে গেল। ওইসব দিয়েই আবার কার ছাদ্ধ বাড়িতে ভোজ খাওয়াবে। শালো মাটির গেলাস ঝপ্‌টি যা হাজার দরণে তৈরি করতাম তারও ন্যাতার মেরে দিলেক।

সকলেই ভাবছে কথাটা।

বদন বলে—তাই দুগ্গাপুরে ঢালাই কারখানায় কাজ পেলাম, চলেই যাবো সিখানে। ই মাটির জিনিষের খদ্দের আর থাকবেক নাই।

ক্রমশ ওরা অনেকেই চলে গেছে।

অতুলের বয়স হয়েছে। চোখেও ঠিক নজর নাই। তার আর বাইরে যাবার উপায়ও নাই। কিছু জমির সামান্য আয়-পয় যা হয় আর মাঝে মাঝে এখন একাই সে শালে হাঁড়ি-কলসী কিছু করে তাই বিক্রি করে কোনমতে দিন চলে।

চন্দনের এসব খেয়াল নাই।

সে এখনও ওই চালায় মাটির নানা কিছু তৈরি করে, অতুল বলে—এ্যাই, ইসব বাতিক ছাড় ইবার চন্নন। মাটির পুতুল বিচে প্যাট ভরবেক নাই। সব্বাই দুগ্গোপুরে যেছে, কলে-কারখানায় ভালো মাইনের কাজও পেছে, ইসব ছেড়ে তুইও কাজের চেষ্টা দ্যাখ।

চন্দন স্বপ্ন দেখে সে বড় ভাস্কর হবে।

এখন শুধু মাটির কাজই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে পাথরের কাজও শুরু করেছে। ছেনি বাটালি দিয়ে পাথরের বুকে নিপুণ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলতে চায়।

মাটির কাজও করে।

এখন নানা ধরণের টেরাইকোটার কাজএর চাহিদা হয়েছে।

সে জানে এই আদিম শিল্পের মৃত্যু নাই। না হলে কত শতাব্দী আগে বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্পীদের অমর সৃষ্টি এতকালের ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে আজও বেঁচে আছে।

আর আজকের বিজ্ঞানের জন্য মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের বাজারে মাটির হাঁড়ি-কলসী অপ্রচলিত হতে পারে। কিন্তু শিল্পীর অমরসৃষ্টি তা কোন দিন লুপ্ত হবে না। তাই সে বলে অতুলকে—বাবা, হাঁড়ি-কলসীর ব্যবসা না চলুক। আমাদের মাটির কাজ সেই শিল্প আজকের বাজারেও পুরো দামই পাবে।

অতুল বলে—কুমোরপাড়ার সব্বাই চলে গেলো কাজ কম্ম ছেড়ে, এখনও বলছিস তুই ইসব চলবেক? লুকে দাম দিবেক?

—দেবে! নাহলে আমার টেরাইকোটার মাল তো পড়ে থাকছে না। অতুল বলে—কে জানে। আজ লিছে, কাল যে ফেলে দিবেক নাই তার ঠিক কি! তুই ইসব ছেড়ে দুগ্গাপুরেই যা।

অতুল ভাবছে কথাটা।

অতুলের বৌও বলে—তোমার ছেলেটার মাথাই খারাপ হইছে। উহার বিয়ে-থা দাও। ঘাড়ে যোয়াল চাপলে তখন দেখবা ইসব বদখেয়াল ছেড়ে কাজের ধান্দাই করতে যাবেক।

অতুলও ভাবছে কথাটা।

এই বয়সে কুমোরপাড়ার অনেক ছেলের বিয়ে-থা হয়েছে। ছেলেমেয়ের বাপও হয়েছে তারা। অতুল এবার ছেলের বিয়ে দিয়ে ওর ঘাড়ের ভূত নামাবে। কাজের চেষ্টাতে অন্য পথেই পাঠাবে। তাদের পাড়ারই অনেকে এখন কারখানায় কাজ করছে। বদন, কিষ্টরা এখন প্যান্ট চক্কর-বক্কর সার্ট জুতো পবে বেরোয়। সিগ্রেট টানে বাবুদের মত।

কানে পোড়া বিড়ি গুঁজে হাটুর উপর ময়লা ধুতি পরে খালি গায়ে বসে কাদা হাতে কুমোরের চাক আর ঘোরায় না। ওরা নাকি ইলেকট্রিকে ঘুরন্ত চাকার সামনে

মালপত্র ধরে, আগুনের ফিন্‌কি ওঠে—ঝকঝকে পালিশ করে, হপ্তাহে মাইনে পায়।

অতুল স্বপ্ন দেখে চন্দনও অমনি প্যান্ট-জামা-জুতো পরে কারখানায় কাজ করবে। আর দুর্গাপুরের কাছে ফরিদপুরেই তাদের কুমোর সম্প্রদায়ের কিছু লোক আছে। মুখ চেনাও আছে দু-চারজনের সঙ্গে। ফরিদপুরের বসন্ত কুম্ভকার নিজেই একদিন এসে হাজির।

তার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে চন্দনের বিয়ে দিতে চায়। আর এও জানায় কিছু জমি-জায়গা, বাড়িঘরও তার আছে একেবারে দুর্গাপুর অঞ্চলে জি-টি রোডের ধারেই। এখন তার অনেক দাম, সেসবও হবে মেয়েরই। আর যেহেতু তারা দুর্গাপুর অঞ্চলের স্থানীয় লোক, তাদের কিছু জমি কারখানাতেও গেছে। সুতরাং কারখানায় চাকরির দাবীও তাদের আছে। চন্দন কোন চাকরিও পাবে ওখানে বিয়ে হলে।

অতুল, অতুলের বৌও কথাটা ভাবে। এমন সুযোগ তারা হেলায় হারাতে চায় না। তাই অতুল ওসব ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার জন্য, আর মেয়েটিকে দেখার জন্যও ওখানে যেতে রাজী হয়।

চন্দন এসব খবর রাখে না। সে মাটির পাট করতে ব্যস্ত, ক'টা নতুন টেরাইকোটার ছাঁচ বানিয়েছে। বিষ্ণুপুর শৈলীতে সূক্ষ্ম কাজ করে দশাবতারএর স্টাইলে।

টগর প্রায়ই আসে এখানে।

সকালের দিকে তার দুধের ব্যবসার কাজকর্ম থাকে। গরু দোহানো, তাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা নিজে দেখে, দরকার হলে নিজেই হাত লাগায়।

তারপর মহাজনদের দুধ ডেলিভারি দিয়ে হিসাব করে টাকা বুঝে নিতে হয়।

বাড়িতে মা অবশ্য সংসারের কাজ করে। এখন টগরের পরিশ্রমে আর বুদ্ধির জন্য তাদের সংসারের অভাব আর নাই। তবু মায়ের মনে মেয়েটার জন্য একটা নীরব বেদনা কাঁটার মত বাজে।

এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের জন্য টগরের রূপ-যৌবন আর সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মেয়েটার ঘর হয়েও হলো না। সেই সর্বনাশা খবর শুনেই মারা গেছল টগরের বাবা হাবু ঘোষ।

টগরের মা এখনও স্বপ্ন দেখে তার জামাই ভূষণ আবার এসেছে।

টগরের ঘর-সংসার হবে, মা হবে টগর। তার শূন্যঘর পূর্ণ হয়ে উঠবে। টগরের মা বলে মাঝে মাঝে—তোর শ্বশুরবাড়ির লোকটার খবর তো নিবি মাঝে মাঝে, না হয় চলেই এসেছিস, হাজার হোক তবু স্বোয়ামী। শুনেছি বিয়ে-থা করে এখন টানাটানিতে রয়েছে ভূষণ—

টগর ওই নামটা শুনে চটে ওঠে। ওই দিনগুলোর কথা সে ভোলেনি, যেন কুকুরের

মত ব্যবহার করেছিল ওরা তার সঙ্গে আর ওই ভূষণ সেদিন স্ত্রীর হয়ে একটি কথাও বলেনি।

দুঃসহ অপমানই সয়েছিল, শাশুড়ী তার বাবার দেওয়া সব গহনা মায় সোনার নোয়াবাঁধাটুকু যা এয়োস্ত্রীর লক্ষণ সেটাও কেড়ে নিয়েছিল। লজ্জায়-অপমানে-রাগে সেদিন ওই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল টগর।

তাদের জন্যই বাবাকে হারিয়েছে। তবু সেই লোকটা তার চরম বিপদের দিনে একবার উঁকিও দেয়নি। খোঁজখবরও নেয়নি। কি করে দুটি অসহায় মেয়ের দিন কাটছে জানতেও চায়নি।

সেই কঠিন সংগ্রামের দিনগুলোর কথা ভোলেনি টগর। সেদিন সে বাঁচার জন্য একাই লড়াই করেছিল। আজ তার দিন বদলেছে: তবু মাকে সেই লোকটার কথা বলতে দেখে টগর বলে—ওর নাম আর মুখে আনবা নাই মা। সিদিন যে একবার খপরও নেয়নি, আজ আমি যাবো তার খপর নিতে?

—তবু তোর স্বোয়ামী। মা বলার চেষ্টা করে।

ফুঁসছে মেয়েটা—স্বামী! তার সঙ্গে আর কুন সমন্ধ নাই। অমন স্বোয়ামী থাকাও যা না থাকাই তাই।

মা চমকে ওঠে—ওকথা বলিস না লা।

টগর জবাব দেয় না।

বৈকালের স্তব্ধতা নেমেছে গ্রামের বাগানে। টগর বের হয়ে পড়ে।

ওর মা জানে মেয়েটার গতিবিধির খবর। ও মেয়ের মন-মেজাজ বোঝা ভার। সবই ভালো ওর। কিন্তু ওই জেদই তার ভবিষ্যতকে না অন্ধকারে ঢেকে দেয়।

মা জানে টগর চলেছে কুমোরপাড়ার দিকে। লোকমুখেও শুনেছে ওই অতুল কুমোরের ছেলে চন্দনের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা।

ছেলেবেলার জানাশোনা ওই চন্দনের সঙ্গে। গ্রামে সকলেই সকলকে চেনে। ছেলেবেলাতে টগর চন্দনের সঙ্গে মিশতো।

সেটা ছেলেবেলার ব্যাপার।

কিন্তু ওই মেলামেশাটা যেন একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েই চলে গেছল। মায়ের মনে হয় চন্দনের জন্য আকর্ষণই টগরকে সেই রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসার সাহস জুগিয়েছিল।

আর আজ টগর উদ্ভিন্ন যৌবনা একটি মেয়ে, এখনও ওদের মেলামেশাটা নিয়ে পাড়ায়, ঘরে অনেক কথাই শোনে টগরের মা। তারও ভালো লাগে না। টগরকেও বলেছে কথাটা।

টগর বলে—কে কি বল্লেক ওসবে কান দিও না মা। তোমার দিন তারা চালায়

না। তবে তাদের কথায় কেন কান দেবা?

মা বলে—তবু পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, গাঁয়ে-ঘরে থাকি এসব শুনতেও ভালো লাগে না।

টগর বলে—তাদের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই ছাড়ো তো ওসব কথা।

মা চুপ করে যায়। টগরের মনেও জ্বালাটা ঠেলে ওঠে।

ওদের হিংসাই। আজ টগর পায়ের তলে মাটি পেয়েছে তাই ওদের হিংসাই। চন্দনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি তা নিজেও জানে। বন্ধুর সম্পর্কই। তাই মেয়েটা ওসব কথা না তুলে এখানে আসে।

চন্দনের নতুন ছাঁচগুলো দেখে টগর।

দশাবতারএর বিভিন্ন মূর্তিগুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। কিছু কৃষ্ণের দোললীলার মূর্তিও আছে। মাটির উপরই যেন সবকিছু প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

টগর বলে—ই যে একেবারে বিষ্টুপুরের মতনই করেছো গো কারিগর।

চন্দন বলে—ভালো হয়েছে?

—তা জানিনা বাপু, তবে বাহারের হয়েছে। টগর মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মতামত প্রকাশ করে।

বৈকাল নামছে বাঁশবনে। কোথায় উদাস সুরে ঘুঘু ডাকছে।

কুমোরপাড়া এখন নীরবই। শালগুলো আর জ্বলে না। বৃষ্টিতে মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে, পড়ে আছে পোড়া ছাই মাটি, কেমন যেন একটা ধ্বংসপুরী।

চন্দন বলে—সারা পাড়ার লোক শাল তুলে দিয়ে দুর্গাপুরের কারখানায় কাজ করতে চলে গেছে।

—কেনে?

টগরের কথায় বলে চন্দন

—কুমোরের জাতব্যবসা আর চলছে না। মাটির শিল্পীর আর কোন দাম নাই, এই লোহা-ইস্পাতের যুগে। তাই পেট চালাতে এবার মৃৎশিল্পীরা চলেছে লৌহশিল্পী হতে। এর ফল কি জানো?

—কি! টগর ডাগর দুচোখ তুলে শুধোয় ওকে। চন্দন বলে—কামারের কাজ কুমোরে করে ধরতে না জানলে পুড়ে মরে। কোনদিন তাই হবে। তবু যাচ্ছে সবাই। দেখছ না পাড়ায় আর শাল নাই, লোকজন নাই।

টগর তা দেখেছে। এবার কারণটা শোনে। চন্দন বলে—তাই বাবা বলে এসব ছেড়ে-ছুড়ে তুইও দুর্গাপুরে যা, দ্যাখ যদি কারখানায় কোন কাজ পাস।

টগর ভাবছে কথাটা। চন্দনও চলে যাবে।

তার মনেও যেন কি নীরব বেদনার সুর জাগে। শুধোয় টগর—তুমিও চলে যাবে?

এই শিল্পের কাজ, গড়ার কাজ সব ছেড়ে দেবে কারিগর?

চন্দন বলে—তাই ভাবছি টগর। বাঁকুড়ার এই পোড়ামাটির কাজ বহু শতাব্দীর। কত শতাব্দী ধরে তারা মাটির বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাধনা করেছে। এ আমাদের দেশের, জাতির সম্পদ।

কিন্তু তাকে ছেড়ে ওই কারখানার কাজে যেতে হবে কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না মিতেন। এতদিনের শিল্প কি শিল্পীকে দুবেলা দুমুঠো অন্নও দেবে না?

টগর কি ভাবছে, বাঁশবনে ঝরা পাতার ঝড় ওঠে দমকা বাতাসে।

চৈত্রের শেষ। তাপসন্তপ্ত পৃথিবীর বুক যেন কি নিদারুণ ব্যর্থতা, রুক্ষতায় বিবর্ণ। এখানে যেন সবই হারিয়ে যাবে সকলের। সব আশা-স্বপ্ন-সবকিছু। এ যুগ যেন কঠিন, নির্মম। মানুষের জীবনের সব সুন্দর, সব সুরকে কেড়ে নিয়ে তাকে এক ছাঁচে ঢেলে ইস্পাতের যন্ত্রের মত মানুষে পরিণত করতে চায়।

টগর বলে—কারিগর, কি হবেক জানি না। বড় ভয় হয় গো, সব যেন একালে হারিয়েই যাবেক। কি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকবেক তাহলে বলতে পারো?

এর জবাব চন্দনও জানে না, ভাবছে সেও।

ক'দিন থেকেই দেখছে চন্দন বাবা খুবই ব্যস্ত। কোথায় গেল সেদিন পাড়ার ঈষাণ খুড়োকে নিয়ে। চন্দন খেয়াল করেনি। বোধহয় কোন কাজেই গেছে।

মাকেও কিছু শুধোয়নি। পরদিন ফিরে এসেছে। দুপুরে খেতে বসার সময় বলে অতুল—চন্দন, একটো কথা ছিল তুর সঙ্গে।

চন্দন তেমন গুরুত্ব দেয় না। বলে সে—কি কথা?

তারপর অতুল এবার বলে—আমার বয়স হয়েছে। কবে আছি কবে নাই। তাই ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম।

—কি ঠিক করলে?

বলে অতুল এবার সব ব্যাপারটা। জানায় সে—মেয়েটিকে দেখলাম, বেশ ভালোই। আর দুর্গাপুরের ফরিদপুরেই তাদের বাড়িঘর, জমিজমাও আছে। কিছু জমি কারখানায় নেছে। তাই কারখানাতে তোর চাকরিও হবেক উখানে বিয়ে করলে। আমিও ওদের কথা দিয়েছি—তুই আর এ বিয়েতে অমত করিসনি বাপ!

চমকে ওঠে চন্দন, এমনি কথা শুনবে তা ভাবতেই পারেনি। এবার বুঝতে পারে ওইসব দেখাশোনা করার জন্যই বাবা গিয়েছিল। কদিন বাড়িতে ছিল না।

চন্দনের মনের পর্দায় ফুটে ওঠে টগরের মুখখানা।

আয়ত চোখ, গভীর কালো চোখের চাহনিতে কোন অচেনা সাগরের আহ্বান, ওর দেহের সোচ্চার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে চন্দনের মনে। ওকে ঘিরেই তার শিল্পী-

মন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিল।

এই জীবনে টগরের অবদান অনেক। তার শিল্পীসত্তার সঙ্গে টগর যেন জড়িয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবেই। তাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়ের কল্পনাই সে করতে পারে না।

আর টগরকে হারানোই নয়। এই সঙ্গে হারাবে তার এতদিনের সাধনা, স্বীকৃতি। একটা ব্রতই নিয়েছিল সে এই মহান শিল্পের ধারাকে সে অব্যাহত রাখবে।

সেই সবকিছুরই শেষ হয়ে যাবে।

তাকে সব ফেলে দিয়ে চলে যেতে হবে ওই ময়দানবের লৌহপুরীতে—যেখানে মানুষের সব শিল্পীসত্তার অপমৃত্যুই ঘটে থাকে।

শুধুমাত্র বাঁচার জন্য এতবড় পরাজয়কে স্বীকার করতে চন্দনের বাধে।

কোনরকমে খেতে থাকে সে।

খাবারও যেন বিস্বাদ ঠেকে। অতুল দেখছে ছেলেকে। তার কথাগুলো যে চন্দনের মোটেই ভালো লাগেনি তা ওর মুখ-চোখ দেখেই বুঝেছে। বলে সে—কি হল তুর? কথা বলছিস নাই যে?

চন্দনের মা চেনে ছেলেকে। ছোটবেলা থেকেই চন্দন এমনিতে জেদী। যা ধরবে তা করবেই। তাই মা তখনকার মত ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যই বলে—এখন খেতে দাও তো, পরে ওসব কথা কইবা। খা চন্দন।

চন্দন কোনমতে আধখাওয়া করে উঠে চলে যায়।

অতুল বলে---বিহার কথা শুনে মাথা বিগড়ে গেছে। ওই হাবু ঘোষের মেয়েটাই ওর মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

চন্দনের মাও দেখেছে টগরকে। ছোটবেলা থেকেই আসে এখানে, মা দেখেছে ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা। তবু টগরের বিয়ে হতে চন্দনের মা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েটার বিয়ের পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসার খবর শুনে বলেছিল—কি সর্বনেশে মেয়েগো!

সেই টগর আজ নিজে ডেয়ারি করে ভালো রোজগার করছে। কিন্তু এখানে আজও আসে। সারা দেহে ওর যৌবনের যোয়ার। তাই ভয় হয় চন্দনের মায়ের। ছেলের চোখেও দেখেছে টগরের প্রতি আকর্ষণ।

এবার কি হবে কে জানে। ভয় হয় ছেলেকে বেশি ঘাঁটাতে চায় না সে। যদি বেঁকে বসে তাহলে বিপদ হবে। তাই বলে অতুলকে বুঝিয়ে বলো—বেশি ধমকা-ধমকি করো না। আজকালকার ছেলে। ওদের মতিগতি বুঝা ভার।

অতুল বলে—তাই বলে ভবিষ্যতের কথাও ভাববেক নাই? কি হবেক কাঁচকলা ওই কাদা ঘেঁটে। প্যাট ভরবেক?

বৈকালের ছায়া নামা বউড়ি গাছের পাকা ফলের লোভে টুনটুনি-বুলবুলি পাখির দল হানা দিয়েছে। ওদের ঠোটের ঘায়ে দু-চারটে পাকা ফলও টুপটাপ ধরছে।

ওই গাছের নীচে বসে আছে চন্দন।

আজ তার মনে কি যেন ঝড়ই উঠেছে। সামনে তার চালাঘরটায় রাজ্যের মূর্তি, ছাঁচ, মাটির তাল—মাটির বড় পাত্রে কার্নিশের রং পড়ে আছে। ওসবে হাত দেবার মত মনের অবস্থাও নাই।

টগর বৈকালে এসেছে। চোখে ওর মিষ্টি হাসির আভা, পানের রসে নিটোল ঠোট দুটো কমলালেবুর কোয়ার মত রাঙ্গানো। পরনে হালকা চাঁপা রং শাড়ি। নিটোল দেহে যেন অফুরান যৌবন উপছে পড়ে।

- কি গো কারিগর! চুপ করে বসে রইছ যে! এ্যাঁ----

চাইল চন্দন। বেদনাক্লিষ্ট চাহনি। ওই চাহনিতে যেন অনেক না বলা যন্ত্রণারই প্রকাশ। এগিয়ে আসে টগর। সেও বুঝেছে একটা কিছু বিপর্যয়ই ঘটেছে।

শুধোয়—কি হয়েছে কারিগর?

চুপ করে থাকে চন্দন। টগর কাছে এসে বলে—-

কি হয়েছে তা আমাকেও বলতে পারো না?

টগরের দিকে চাইল চন্দন। আজ টগর যেন কি খুশিতে সেজেগুজেই এসেছে। সামান্য সাজলেই ওকে সুন্দর দেখায়। যেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি সে। মাটির সবুজ সজীবতা ওর দেহে-মনে।

চন্দন বলে—বাবা আমার বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এসেছে। দুর্গাপুরের কোন একজনকে। তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে সেই লোকটি কারখানায় আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। তার একমাত্র মেয়ে, তাই তার বাড়িঘর জমিও পাবো ওখানে বিয়ে করলে। ওখানেই থাকতেও পাবো।

টগর চমকে ওঠে।

তার এতসব গুণ কিছুই নাই। তাছাড়া সমাজের চোখে এখনও অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। চন্দনকে নিয়ে তবু একটা দুঃসাহসিক স্বপ্নই দেখেছিল মনে মনে টগর। আজ ওই কথায় তাই চমকে ওঠে।

তবু টগর সেই বেদনাটা প্রকাশ না করার জন্যই উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ে বলে, ওমা, এ যে অর্ধেক রাজত্বি আর রাজকন্যে গো। তুমি বাপু আর অমত করো না। ওখানেই বিয়ে করো। পাকা চাকরি—ভালো মাইনে, সহুরে বৌ ব্যাস আবার কি চাই?

চন্দন দেখছে ওকে। অবাক হয় সে টগরের কথায়।

চন্দন বলে—তুমি বলছ? সত্যি বলছ টগর? তুমি বলছো এতদিনের সাধনা পরিশ্রম

সব মিথ্যে? এতদিনের চেনা-জানা, কাছে আসা এসবের কোন দামই নাই? সব অর্থহীন, মিথ্যে? মিথ্যে? তাহলে এতদিন ধরে কেবল ভুলই করে এসেছি?

টগরের ডাগর চোখে জল চিক চিক করে। টগরের এইটাই মনের কথা। সে পারেনি জানাতে, সে মেয়েছেলে, লজ্জা তার বেশি। কিন্তু চন্দন কথাটা বলেছে অকুণ্ঠভাবেই। যা টগরের মনে ঝড় তুলেছে।

সে অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অবাক হয় চন্দন।

—টগর, এ্যাই মিতে!

ওর সুন্দর মুখটা যে চিবুকে হাত দিয়ে তুলেছে, নিটোল মুখ সুন্দর দুটো কমনীয় ঠোঁট, তার ডাগর চোখের জলধারায় বুঝতে পারে চন্দন টগরের বেদনাটা।

টগর বলে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিতে, আমিও অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমাকে ঘিরে বাঁচার স্বপ্ন। তাই ওই ঘর ছেড়েই চলে এসেছিলাম। আমাদের কি বাঁচারও হক নাই মিতে? চলো—আমার যা আছে তা কম নয়, দু-জনে দূরে কোথাও গিয়ে এই সমাজের বাইরে আবার নতুন করে বাঁচবো। মিতে—যাবে? যাবে তুমি?

চন্দন শুনছে টগরের কথাগুলো। আজ টগরের এই নিঃশেষ আত্মনিবেদন তার মনেও ঝড় তুলেছে। টগরকে কাছে টেনে নেয়। ওর দেহের নিবিড় স্পর্শ দুজনের মনেই বাঁধন ছেঁড়ার জোর আনে।

টগর বলে— ভেবে দ্যাখো মিতে! তাহলে কালই আমরা চলে যাবো এখান থেকে দূরে। সেখানেই নতুন করে ঘর বাঁধবো। কাল সকালে আসবো, তখনই পাকা কথা হয়ে যাবে।

হঠাৎ টগর যেন কি বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে। কাতর কণ্ঠে বলে টগর।

—জীবনে আমার সব হারিয়ে গেছে মিতে। তোমাকে আর হারাতে পারবো না। সে দুঃখ আমার সইবে না গো।

টগর চলে গেছে।

সন্ধ্যা নামছে নির্জন কুমোরপাড়ায়। আকাশের শেষ আলোটুকু মুছে মুছে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। ভীরু চাহনিতে দুচারটে তারা রাতপালির হাজিরা দিতে এসেছে।

চন্দনের মা সন্ধ্যা দিতে আসছে।

শালে সন্ধ্যাবাতি দেখায় তারা। অতুলের শাল—অন্যদের শাল-এর মাটি সব ভেঙ্গে পড়েছে। চন্দনের শালটা আছে এখনও। চন্দনের মা সন্ধ্যাদীপের আলোয় চন্দনকে একা ওখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়।

—ওমা, একা এই আঁধারে বসে কি করছিস?

চন্দন বলে—এমনিই বসে আছি। ভাবছি এতদিন ধরে যা শিখলাম সব মিথ্যা,

এর কোন দামই নাই?

চন্দনের মা বলে—বাজার হিসেবে, বাজারের চাহিদা হিসাবেই মালের দর কমে-বাড়ে চন্দন, একালের বাজারে এর দাম হয়তো নাই।

চন্দন বলে—না। আছে। এখানে ওই দুর্গাপুরের নতুন চমকে—ওই লোহাকলের ফার্নেসের আলোয় সব সুন্দর, শিল্প—আশা পুড়ে ছাই হলেও এখনও অনেক ঠাঁই আছে সেখানে এর কদর আছে মা।

চন্দনের মা কি ভাবছে।

সে জানে ছেলের এই বেদনাটাকে। তাই বলে—একা একা বসে না থেকে ঘরে চল বাবা।

চন্দন বলে—তুমি যাও, আসছি।

একাই থাকতে চায় চন্দন। বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। চাঁদ উঠেছে। ম্লান আলোয় দেখছে ওই শাল—তার মাটির কারখানাকে। ওসব ছেড়ে সে কারখানার মিস্ত্রি হতে পারবে না।

টগরের কথা মনে পড়ে। ওই মেয়েটিও আজ তাকে এক নতুন জীবন—নতুন সৃষ্টির জগতের সন্ধান দিয়েছে। ওরা নতুন করে কোন অন্য দূর জগতে গিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, চন্দন সেখানে তার সৃষ্টির কাজ করতে পারবে। চন্দন ভাবছে সেই কথাটা। তারা যেন দু-জনে এখান থেকে দূরে কোথায় ঘর বেঁধেছে।

টগর আজ এই গতানুগতিক জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, এই বাঁধন ভেঙ্গে সে আজ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। ব্যবসায় কঠিন পরিশ্রম করে সে বেশ কয়েক হাজার টাকা বাঁচিয়েছে। ওই টাকা নিয়েই সে আর টগর অন্যত্র চলে যাবে।

লোকে মন্দ কথা বলবে—তা বলুক।

ওসব শোনার অভ্যাস আছে টগরের, মা দু-দিন চোখের জল ফেলবে, তারপর আবার সব ভুলে যাবে। টগর তবু নিজের জীবনে সার্থকতা খুঁজে পাবে।

বাড়ি ফেরে। হঠাৎ বাইরের ঘরে কাকে বসে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেল। অনেকেই গরু বিচতে আসে তার কাছে অভাবে পড়ে, ওই লোকটা বোধহয় তাদেরই একজন। ইসব ব্যাপারে সতুদাই কথা বলে।

টগর এখন সতু ঘোষকেই তার কাজকর্ম দেখার জন্য রেখেছে। একা সবদিক সামলাতে পারে না।

টগর বাড়িতে ঢুকতে মা এগিয়ে আসে।

যেন খুশি খুশি ভাবই। মা বলে—ভূষণ এসেছে। তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য

বসে আছে।

টগর অন্য কি ভাবনার মধ্যে আজ ডুবে আছে। তাই ওসব নামএর কথা ভাবতে পারে না। শুধোয়—ভূষণ—কে ভূষণ!

মা জিব কেটে চমকে ওঠে। চাপা স্বরে বলে ওঠে—মরণ! নিজের স্বোয়ামীর নাম নিলি এই তিন সন্ধ্যেবেলায়? ভূষণ এসেছে।

—কেন? চাপা স্বরে টগর যেন ফুঁসে ওঠে। বলে—বিয়ে-থা করে বেশ সুখে শান্তিতেই আছে শুনেছি। তা এখানে আবার কেনে?

মা বলে—বেচারা খুব কষ্টে আছে রে। মা গত হয়েছে। আর এ পক্ষের বৌ-এর তিনটে ছেলে-মেয়ে, আবার বাচ্চা হবেক।

—তা আমাকে কি করতে হবেক? ওই সতীনের আতুড় তুলতে যেতে হবেক? স্বোয়ামী! মুয়ে আগুন এমন স্বোয়ামীর।

কথাটা টগর বেশ জোর দিয়েই বলে যাতে ওই লোকটাও যেন শুনতে পায়। মা বলে—কি যা তা বলছিস?

—ঠিকই বলছি। ওর জন্যই শোকে-তাপে বাপটা মলো, দুটো মেয়ে আতান্তরে পড়লাম সেদিন উঁকিও দেয়নি। আজ কেন এসেছে? ওকে বলে দাও ওখান থেকে একবার যখন বেরিয়ে এসেছি আর ওমুখো হবো না।

মা বলে—ও তোকে কি যেন বলতে চায়।

—সোহাগ কতো। ওর কোন কথা শোনার সময় আমার নাই।

টগর ওকে পাত্তাই দিতে চায় না। মা বলে—কিছু টাকার দরকার। সংসারে টানাটানি চলেছে। আয়-পয়ও তেমন নাই।

টগর কি ভাবছে। ঘরের দিকে চলে গেল।

ভূষণ ঘরের মধ্যে বসেছিল কে একটা বাতিও দিয়ে গেছে। হুকো টানছিল।

ভিতরের উঠানে মা-মেয়ের কথাগুলো কিছু সে শুনেছিল। তবু ভূষণ এসেছে। শাশুড়ী ঠাকরুন আদর-যত্ন করে জলটল খাওয়ায়। টগর ছিল না। আশা করে ভূষণ আজ রাতে এবাড়িতেই থাকবে।

ভূষণ এখন দেখেছে এদের বেশ ভালো অবস্থাই। বড় গোয়ালে দশ-বারোটা জারসী গাই। উঠানে ধানের বড় মরাই। তাব সংসারের অবস্থাটা মনে পড়ে। সর্বস্ব গেছে। এখন ছেলেপুলে নিয়ে দিন চলাই দায়। হঠাৎ ভূষণ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

সেদিনের ছোট মেয়েটা আজ পূর্ণ যৌবনা, সুন্দরী, ঐশ্বর্যময়ী।

দেখছে টগর ভূষণকে। গালে অযত্ন বর্ধিত গোঁফ, দাড়িতে সাদা-কালো ছোপ ধরেছে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো যেন বাবুই পাখির বাসা। পরনে লালচে কাদামাটির

রংধরা সার্ট-ধুতি। হুকো টানছে আর কাশছে।

ওই মানুষটার হাত থেকে বেঁচে গেছে বলেই মনে হয় টগরের। যেন নির্মম দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। ভূষণ ভেবেছিল প্রণামই করবে টগর। তা করে না।

ভূষণ শুধোয়—ভালো আছো তো?

টগর বলে—হঠাৎ এখানে?

ভূষণ ওর কণ্ঠস্বরে একটু চমকে উঠে চাইল। ও যে আদৌ খুশি হয় নি তা ওর মুখচোখ দেখেই বুঝেছে ভূষণ। আজ তার মনে হয় জীবনে সেদিন পরশ পাথরই পেয়েছিল সে। কিন্তু চিনতে পারেনি। হেলায় দূরে ফেলে দিয়েছিল। মা-বোন ওর উপর নিদারুণ অত্যাচার করেছিল। ভূষণ কোন কথাই বলেনি স্ত্রীর হয়ে। ওর বাবা মারা গেল শুনেও মা-বোনের কথাতেই আসেনি কোন খবর নিতে। এতদিন, এত বৎসর কোন সম্পর্কই রাখেনি। আজ খুবই বিপদে পড়েই এসেছে। ভূষণ বলে —মানে, ইয়ে দিনকাল খুব খারাপ চলেছে। এত খরচা—ওদিকে ঘরে ছেলেপুলে তাই

—তাই টাকার জন্যে এসেছো? টগরের কথায় চুপ করে থাকে ভূষণ। টগর বলে—সেবার বাবার টাকা, গহনা সব নিয়েছো, আবার এসেছো আমার টাকা নিতে? ভূষণ চুপ করেই থাকে ওই সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটির সামনে। টগর কিছু টাকা দিয়ে বলে—আড়াইশো টাকা দিলাম।

ভূষণ টাকাটা পেয়ে খুবই খুশি হয়। ফতুয়ার পকেটে পুরে এবার নিশ্চিন্ত মনে হুকো টানতে যাবে এবার টগরের কথায় চাইল। টগর বলে—টাকার জন্যই তো এসেছিলে, টাকা পেয়েছো এবার এসো।

ভূষণ অবাক হয়। সে আশা করেছিল আজ রাত্রে এ বাড়িতেই জামাই আদরেই থাকবে। শাশুড়ি ঠাকরুন সেইরকম আভাসই দিয়েছিল। টগরকে দেখে ওর স্বামীর পরিচয়ে এখানে রাত্রিবাস করার বাসনাটাও জেগেছিল, কিন্তু সেই স্বপ্নকে টগরই চুরমার করে দিয়ে বলে—এসো। আর ভবিষ্যতে টাকার জন্য না এলেই ভালো করবে।

ভূষণ নীরবে ছাতাটা নিয়ে উঠে পায়ে-পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সন্ধ্যা সবে হয় হয়, তার গ্রাম ক্রোশ দুয়েক পথ, এমন রাতে পথভাঙ্গা অভ্যেস তাদের আছে।

—চলি! ভূষণ বিদায় নিয়ে চলে যায়, টগর তখনও চুপ করে দাড়িয়ে আছে। ঢুকছে টগরের মা। সে বাইরে থেকে শুনেছে কথাগুলো।

মা আশা করেছিল ভূষণকে আজ রাতে থাকতে দেবে এখানে। হয়তো স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আলাপ-আলোচনায় দু-জনের মনের দ্বিধা জড়তাও দূর হবে।

হোক সতীন, তবু জামাই এখানে মাঝে মাঝে আসবে। এখানেই টগরের সংসার

হবে। তাই দেখেই খুশি হবে মা। সেই স্বপ্নই দেখেছিল। কিন্তু টগর তার সব আশা-স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

মা বলে—এ কি করলি টগর? ভূষণকে এমনি সাঁঝবেলায় চলে যেতে বললি? কতদিন পর এল বেচারা!

টগর বলে—তুমি আমার ওপর কথা বলো না মা। ওই আধবুড়ো পথের মানুষটাকে আমি চিনি না, জানি না, জানতেও চাই না।

টগর ভিতরে চলে গেল।

মা অবাক হয়ে দেখছে মেয়েকে। ওই জেদী মেয়েটাকে মাও কিছু বলতে সাহস পায় না। ভেবেছিল সমস্যার একটা সমাধান হবে। কিন্তু তা হল না। টগর নিজের ঘর নিজের হাতেই ভেঙ্গেছিল। আজও তাই করলো ওই মানুষটাকে তাড়িয়ে দিয়ে।

রাত নামে।

টগর বুঝেছে মাই বোধহয় ষড়যন্ত্র করে ওই ভূষণকে আনিয়েছিল, ভবিষ্যতেও মা আবার এমনি চেষ্টাও করবে।

কিন্তু ওই বিশ্রী মানুষটাকে টগর কোনদিনই মেনে নিতে পারেনি। এবার টগর নিজের পথ নিজেই দেখে নেবে। নিজের জিনিষপত্র, টাকাকড়ি গহনা সব গুছিয়ে নেবে কালই।

আজকের রাতই টগরের এখানের শেষ রাত্রি। তারপর সে হারিয়ে যাবে অন্য কোন জগতে। সতুদা আছে সেই দুধের কারবার সামলাবে। মায়ের অসুবিধা হবে না। ওই জামাই বোধহয় পুত্রবৎ এসে এখানেই ডেরা গাড়বে।

যে যা করে করুক, টগরের তাতে কিছুই যায়-আসে না। সে তখন বহুদূরেই চলে যাবে, নিজের ঘর বাঁধবে দুজনে, সে আর চন্দন।

তাই ওই ভূষণকে আজ নিষ্ঠুরভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে সে।

মা কথাই কয় না। মেয়ের উপর রাগ-অভিমান জমে রয়েছে।

রাতে টগর ভাবছে কথাটা। যেন কোন দূর জগতের আহ্বানই শুনেছে সে। ঘুম আসে না কি উত্তেজনায়। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না টগর।

ভোরেই সতু ঘোষ লোকজন নিয়ে এসে গোয়ালের তালা খুলে দুধ দোহাবার কাজ শুরু করে। ওদের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় টগরের। বিছানাতেই শুয়ে থাকে। আর যেন তার কাজেও মন নাই।

এতদিন ধরে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যা গড়েছে কাল থেকে তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই থাকেবে না। আর মায়ায় আবদ্ধ হতে চায় না সে। যা পারে ওরাই করুক।

সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ে গাছগাছালির বুকে। পাখিগুলো কলরব করে ঝগড়া শুরু করেছে। টগর চলেছে কুমোরপাড়ার দিকে।

তখন এদিকে লোকজন কাজে বের হচ্ছে। চন্দনের শালের কাছে এসে দেখে কেউ নেই। জিনিষপত্র ছত্রাকার করে পড়ে আছে।

চমকে ওঠে টগর। কে যেন ডাণ্ডা দিয়ে ওই মাটির কাজগুলোকে নিষ্ঠুর হাতে চুরমার করেছে। ছিটকে পড়ে আছে কাচের বাক্সে রাখা তাকের উপর চন্দনের তৈরি মাটির মূর্তিটা।

এত যত্নে যা করেছিল সেটাকেও নিষ্ঠুরভাবে গুড়িয়ে ধুলো করে রেখেছে।

অতুল কামারকে দেখে চাইল। বুড়োর চোখে শূন্য ছাই।

—কে! কে ওখানে?

টগর এগিয়ে আসে। কাছে আসতে বুড়ো চিনেছে ওকে। অতুল হাহাকার করে ওঠে—এইসব চুরমার করে বলে—নতুন করেই নতুন দেশে বাঁচবো। যিখানে শিল্পীরা বাঁচতে পারে সিখানেই যাবো। ইখানে আর লয়। চলে গেল রে টগর—চন্দন চলে গেল। সব ছেড়ে চলে গেল।

বুড়োর বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে ওই কথা বলতে। চন্দনের মাও আসে। সে দেখছে টগরের চোখে জল। কি শূন্যতার বেদনা নামে টগরের বুকে। চোখ জলে ভরে আসে। চন্দন তার স্মৃতিও যেন নিষ্ঠুরভাবে তার জীবন থেকে মুছে চলে গেছে।

চন্দনের মা বলে—তোর সঙ্গে এত মাখামাখি তোকে কিছুই বলেনি? তুই জানতিস না? এমনি করে চলে যাবেক সে?

টগর মাথা নাড়ে—কিছুই বলেনি।

মা আর্তনাদ করে—এভাবে চলে গেল ছেলেটা। কোথায় যে গেল?

টগর ফিরছে নীরবে বাড়ির দিকে।

তার জীবনে এত আঁধারের মাঝে যেন এক ঝলক বিজলির আভার মতই এসেছিল ওই চন্দন। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্নই দেখেছিল। চন্দনও বলেছিল তারা দুজনেই চলে যাবে।

কিন্তু তাকে ফেলে চন্দন একা চলে যাবে কোন অজানার পথে এটা ভাবতেই পারেনি। আজ টগরেরও সব হারিয়ে গেছে।

মা ওকে থমথমে মুখ নিয়ে বাড়ি ঢুকতে দেখে চাইল। বলে—কোথায় গেছলি সাতসকালে?

টগর ফুঁসে ওঠে—যমের বাড়ি। তা যমও নিলে নাই ফিরিয়ে দিলেক।

কথাগুলো বলে টগর ঘরের মধ্যে চলে গেল। মা গজগজ করে—কি যে হয়

মেয়ের। একেবারে রণচণ্ডী মূর্তি ধরেই রইছে।

জীবনের ব্যর্থতা, শূন্যতার জ্বালা কতখানি বাজে তা বোধহয় মা জানে না। আজ টগরের কাছে সব জগৎ যেন শূন্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধ অতুলের বুকফাটা কান্নাটা এখনও কানে বাজে তার।

রাগে হয় টগরের চন্দনের উপরই। সে যেন জীবনের লড়াইকে মোকাবিলা না করেই হেরে পালিয়ে গেল। টগর কিন্তু পিছু হঠবে না।

বড় রাস্তার কাজ প্রায় শেষ। পিচ ঢালা রাস্তায় এখন ট্রাক-বাস চলছে। আগে গোপ গাঁ থেকে বাসরাস্তা ছিল মাইল তিনেক দূরে। মধ্যে কিছুটা শালবনও পড়তো।

এখন ওই পুরোনো রাস্তার বদলে এই নতুন চওড়া পিচঢালা রাস্তা দিয়েই বাস ট্রাক, প্রাইভেট কার চলেছে সবসময়। গ্রামের বাইরে প্রান্তরের বুক চিরে রাস্তাটার ধারে এখন দুচারটে চা পানবিড়ির দোকান বসেছে আরও দোকানের জন্য জায়গাও দখল করছে অনেকে।

ক্রমশ এই জনহীন প্রান্তরই এখন জমজমাট হয়ে উঠছে নতুন গোপগাঁ নতুন সাজে। ওপাশে কমলবাবুর সেই মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার জায়গায় এখন মাথা তুলছে বিরাট ধান কল। অনেকখানি এলাকা জুড়ে সীমাপ্রচীর, ওদিকে বিস্তীর্ণ সান বাধানো উঠানে ধান শুখোবার জায়গা, ঝকঝকে শেড একটা চিমনী নীল আকাশে মাথা তুলেছে শাল মহুয়া বন সীমার উর্ধে। আগেকার অরণ্য-আরণ্যক পরিবেশ আজ অবলুপ্ত। সেখানে ওই কারখানা, চিমনিটা যেন আগামী সভ্যতার জবরদখলের প্রতীক হয়ে মাথা তুলেছে।

চিমনী থেকে বের হয় চাপ চাপ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। নীল আকাশে ওই কালো ধোঁয়া যেন কলুষতার ছাপই একেছে। কমলবাবু এখন ধানকল ভালোই চালু করেছে।

কৃষিপ্রধান এলাকা।

দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও ধানই প্রধান ফসল, ইদানীং দুর্গাপুরের ক্যানেলের জলও যেতে শুরু হয়েছে সেখানে। তাই বোরা ধানের চাষও শুরু হয়েছে।

অর্থাৎ বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠ জুড়ে চাষীরা এখন দু-দুটো ধানের চাষ শুরু করেছে। আগে আমন ধানের চাষ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো। বৃষ্টি হলে কিছু ধান পেতো, নাহলে সবটাই বরবাদ, এই অজন্মা ছিল তাদের নেত্যসঙ্গী।

এখন চাষীদেরও দিন বদলেছে, জলের সরবরাহ থাকে ক্যানেলে, নামমাত্র টাক্স দিয়ে সেই পর্যাপ্ত জলে মাঠে দু'বার ধান ফলায়। আর গ্রামের মাঠের পুকুর, ডোবাতেও সেই জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ধরে রাখে বর্ষার উপছে পড়া ক্যানেলের জলের সময়। শীতকালে সেই জলের সেচ দিয়ে অন্য জমিতে গম, আলুও করছে। জমির

দামও বেড়ে গেছে।

কমলবাবু চাষীদের সেই সব ধানই কেনে আর ধানকলে চাল তৈরি করিয়ে কিছু লেভী বাবদ সরকারকে দেয় আর বাকীটা গুণময় এর মধ্যে কালনা, কৃষ্ণনগরের দিকে মহাজনদের ঠিক করেছে। ট্রাক ভর্তি সেই চাল এদিকে আসে আর গুণময়ের চেনা-জানা সেই মহাজনরা সেই চাল আলুর ট্রাকের মাল কি ভাবে বাংলাদেশে পাঠায়।

ভালো দামই পায়, বাজার দরের প্রায় দ্বিগুণ দাম, তার থেকে বাজার দরের দাম কমলকে দিয়ে বাকীটা গুণময় নিজেই পকটস্থ করে। গুণময় তাই এখন বিনামূলধনে ভালোই বাণিজ্য করছে। সে স্বপ্ন দেখে কমলবাবুর ঘাড়ে পা দিয়েই তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। তবে সেটা খুবই গোপনে।

টাকা এখন তার ভালোই আসছে।

তার মনে হয় শুধু ওপরের মাল পাঠালেই হবেনা, এদিকে এসে দেখেছে অনেক মাল এদিক থেকে যেমন যায় ওদিকে, ওদিক থেকেই প্রচুর বিদেশী জিনিষপত্র আসছে, সেসব মালের চাহিদাও আছে হালফিল গজিয়ে ওঠা দুর্গাপুর আর কোলিয়ারী মুলুকের বাজারে। গুণময় ভাবছে ওই সব ব্যাপারে তার আমদানীর টাকা কিছুটা লাগালে ভালোই আমদানী হবে।

সে দুর্গাপুর আসানসোল মার্কেটে ওই সব সৌখিন বিদেশী জিনিষের আমদানীও শুরু করেছে।

ফলে গুণময় এখন খুবই ব্যস্ত। তবে ভাইপো বাদল এখন এদিকে ওই চোলাই মদের ব্যবসাটা ভালোই দেখাশোনা করছে।

চোলাইএর প্রধান কাঁচামাল চাল আর গুড়, আর বাখর ইত্যাদি।

এখন গুণময় কমলবাবুর ধানকলের ছাঁটাই যত চালের খুদ হয় তা কিনে নেয় কম দামেই। সেই সস্তায় কেনা খুদের জন্য এখন ওর প্রডাকশন খর্চাও কম পড়ে। কপিল এতকাল চোলাই বানিয়েছে, তার বৌ ভাদুরী বলে,

—ওই বিষ আর বানিয়ো না, কত লুকের সব্বোনাশ আর করবা?

হাসে কপিল—লুকের সব্বোনাশ না হলে তুর পৌষমাস হবেক কি করে? ভাদুরীর এসব ভালো লাগেনা।

সে বলে—এই পাপে তুমার ঘরে ছেলেপুলে এল নাই। কে খাবেক তুমার পাপের পয়সা?

কপিল গর্জে ওঠে—থামবি তুই! দিনরাত ওই ফ্যাচর-ফ্যাচর ভালো লাগেনা। ই আমার বেবসা! কত পাই জানিস?

এর মধ্যে সে এই ব্যবসার কাজে ভাদুরীর ছোট বোন মাতনকেও এনেছে। মেয়েটা এমনিতে বেশ সুন্দরই, চোখে-মুখে ওর কথা। যৌবন যেমন উপছে পড়ছে ওর সর্বাঙ্গে,

কথাও তেমনি জ্বলন্ত তুবড়ির মত বের হয় ওর মুখ থেকে।

মাতনকে আনার কিছুদিন পর থেকেই ভাদুরী বুঝেছে কপিলের মদের নেশার সঙ্গে আর একটা নেশাও ধরেছে মনে।

তাই ভাদুরীর রাগটা বেড়ে যায়।

মাতন এখন মদের ভাটির তার সব জেনে গেছে। ড্রামে ভাত পচানির গাঁজালা দেখে সে বুঝতে পারে এবার চোলাই করতে হবে। ইদানীং বাদলই দেখেছে দুর্গাপুরে বিলিতি মদের খুবই চাহিদা। কারখানার বাবুদের কাঁচা পয়সা—আর বাড়তি পয়সাও তারা পায় নানা ভাবে। তার বেশ কিছুটা যায় মদের পিছনে।

এখন মাতনই বুদ্ধিটা বের করেছে। চিড়ের সঙ্গে শুকনো মহুয়ার ফুল-কলা-গুড়-বাখর দিয়ে মেখে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে মাটিতে সাতদিন রেখে তুলে এবার চোলাই শুরু করে তাতে রক্তচন্দন, এলাচ কিছুও দেয়। সেই চোলাই করা মাল—দুর্গাপুর রাণীগঞ্জ, আসানসোলের বিভিন্ন ঠেক থেকে সংগৃহীত খালি বিলেতি মদের বোতলে পুরে সহরের ঠেকে চালান দেয়, বিলিতি মদ বলেই তা চড়াদামে বিক্রি হয়।

ভাদুরী বলে—তুরা মহাপাপী।

মাতনকে বলে—তুর লরকেও ঠাঁই হবেক নাই। ইখানে কেনে মরতে এলি?

মাতন বলে—স্বপ্নের খপর জানার জন্যে। দ্যাখ তুমি যদি দিতে পারো।

ভাদুরী দেখেছে কপিলের চোখে সেই নেশাটাকে। মাতনও যেন ইচ্ছে করেই কপিলের সামনে তার অফুরাণ যৌবনকে প্রকাশ করার জন্যই আধ-আদুড় গায়ে ফেরে।

দিদি বলে—মাতন তুর মানুষটাকে বল যেন চোখ বুজে থাকে। দিনরাত তাতে গরমে কাজ, পটের বিবি হয়ে থাকলে চলবেক?

সন্ধ্যার পর ইদানীং গতিলালও আসে এখানে। গতিলালও এখন ওই দুস্বরী বিলেতি মাল কিছু এদিক-ওদিকে বেচে। গতিলাল, বাদলকে বলে, মাল দেবে, পয়সা বিক্রি করে দোব।

বাদল চেনে গতিলালকে, ও মহা ধড়িবাজ। নানা ধান্দায় থাকে। অঞ্চল অফিসে এখন কমলবাবুর রাজত্ব, গুণময় তার প্রধানমন্ত্রী। গতিলাল অফিসের আশপাশে থাকে, অনেকেই আসে এখন কৃষিলোন, পাম্পসেট কেনার জন্য টাকা নিতে, এছাড়াও বলদ কেনার জন্যও লোন দেয়। এসব পার্টির জন্য তদ্বির-তদারক করে গতিলাল। বেশ কিছু আমদানীও হয় তার।

মাতন বলে গতিলালকে ধারে মদ না দিয়ে।

—আজ লগদ কাল ধার। মালের ব্যবসাতে ধারবাকী নাই গ।

গতিলাল দেখে মাতনকে। তার বুকেও ঝড় ওঠে। গতিলাল বলে

—তোর কথাগুলোও মিষ্টিরে মাতন!

মাতন হাসে—তাই নাকি গ! হাতের মদও মিষ্টি, কথাও মিষ্টি, তালে যাই কথাটা বলিগে তুমার গিন্নীকে! তারও মিষ্টি লাগবে।

গতিলাল তার গিন্নাকে জানে। সবসময়েই মা-মনসা হয়েই আছে। তাই বলে—একে মা-মনসা তার ধূপের ধুনো। ওসব সব্বোনাশ করিস না মাতন।

টাকা নগদই দেব, মাল দে।

মাতনের হাবভাব ভাদুরীর ভালো লাগেনা।

তাই নিয়ে কপিলকেও বলে—ও মুখপুড়ির দিকে এখন তুর খুব লজর! কপিলের দুর্বলতা যে নেই মাতনের উপর তা নয়। তবু সেটা প্রকাশ করতে চায় না কপিল।

তাই বলে—না, না। সব লজর আশার তুর দিকেই। তাই তোর হিল্যে করার জন্যই ওই বড় রাস্তার ধারে জায়গাটা লিলম।

--কি হবেক উখানে?

ভাদুরীর কথায় বলে কপিল

—উখানে চলতি ধাবা বানাবো। বুউলি, কত ট্রাকের লোকজন উখানে থামবেক, খাবেক। দিনেরাতে বিক্রি হবেক। তুই দেখভাল করবি। টাকা যা আসবেক তুর!

ভাদুরী ছবিটা কল্পনা করে। সে চায় নিজের কিছু করতে।

আর এটা ওই মদ বেচার মত, মদ তৈরি করার মত বাজে কাজ নয়। তাই বলে সে—সত্যি!

—হ্যাঁরে। দেখগা চালাঘর-উনুন, খাটিয়া-বাসনপত্তর সব কিনেছি। চল দেখবি চল। নিজের ব্যবসা নিয়েই থাকবি।

কপিল ভাদুরীকে সরাতে চায় কৌশলে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে যাতে মাতনকে নিয়ে সে ওই জঙ্গলের মধ্যে মদের ঠেকে মধুযামিনী যাপন করতে পারে।

ভাদুরীও খুশি হয় সব দেখে।

গ্রামের বাইরে বনের গা-ঘেষে দুটো বড় মহুয়া গাছের নীচে বেশ খানিকটা জায়গায় বেশ গুছিয়ে ধাবা বানিয়েছে। একটা ইদারাও খোঁড়া হয়েছে জলের জন্য।

ওদিকে ট্রাক দাঁড়াবার জায়গা, লম্বা চালায় গোটা পঁচিশ খাটিয়াও পাতা রয়েছে। কপিল বলে, —কিরে, পছন্দ হইচে?

ভাদুরী বলে—বাঃ সুন্দর জায়গাটা।

কপিল বলে—আমিও মাঝে মাঝে আসবো, আর পাঁচুই থাকবেক ইখানে। একজন শক্ত-পোক্ত ছেলের দরকার। উই সব দেখবেক। তুই মালকিন হয়ে একটো চেয়ারে বসে কেবল ট্যাকা গুনবি।

ভাদুরী জীবনে এমন দিন আসবে তা কোন কালেই ভাবেনি।

পরের বাড়িতে খেটে-খুটে, জমিতে কাজ করে তাদের কোন মতে দিন কাটতো।

এখন সে ভদ্দর লোকের মেয়েদের মত চেয়ারে বসবে। দোকানের মালিক হবে।

দিন সত্যিই বদলেছে। ভাদুরীও এবার মনে মনে তৈরি হয়। ক'দিনের মধ্যেই লাইনে নতুন ধাবার খবরটা ড্রাইভার মহলে চাউর হয়ে যায়। গতিলালও মাঝে মাঝে আসে এখানে

—কিরে ভাদুরী তোর ধাবা কেমন চলছে?

ভাদুরী বলে—এসো গো বাবু! ওরে পাঁচু, গতিদাকে চা দিতে বল!

গতিলাল একটা বেঞ্চে ঠ্যাং তুলে বসে বলে

—বলিনি ভাদুরী তোর দিন বদলাবে! এখন দ্যাখ, আরে তোর ধাবার খবর আমি রাণীগঞ্জ মোড়ে, বেনাচিতি বাজারে, পানাগড়ের ট্রাক অফিসে কোথায় বলিনি? এখন দ্যাখ, কত ট্রাক আসছে।

—তা সত্যি! ভাদুরীও সেটা স্বীকার করে।

ওর ধাবা এই অঞ্চলের মধ্যে নাম করেছে। দিনে-রাতে দূরগামী ট্রাকের লোকজন আসে। স্নান-খাওয়া করে। ছায়াঘন মহুয়াগাছ দুটোর ছায়ায় খাটিয়ায় বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু করে তারা।

ইদানীং এদিকে অনেক ক্রাশিং মিল হয়েছে। পাথার যায় রোজ এক দেড়শো ট্রাক। এদের মধ্যে দিলীপ সিং এর ট্রাকই বেশি। লোকটা একদিন এসেছিল ভর দুপুরে। ভাদুরী দোকানে বসে আছে। বলিষ্ঠ ওই লোকটি নেমে আসছে জিপ থেকে। গরম থেকে ছায়াঘন ধাবাতে এসে খাটিয়ায় বসে। ভাদুরীই নিজে ওকে এক গ্লাশ জল এনে দেয়, তৃষ্ণার্ত লোকটা আকণ্ঠ জলপান করে ওর দিকে চাইল।

ভাদুরীর দেহে এখন যৌবনের মত্ততা ফুরিয়ে যায়নি। মা হতে পারেনি। তাই দেহের সজীবতা এখন নিটোল রয়েছে। সিংজী দেখছে ওকে। ভাদুরীর কাছে ওই চাহনিটা কেমন যেন টানে তাকে। বলে সে

—লস্যি দোব সিংজী!

দিলীপ সিং বলে—লস্যি! পিলাও।

ক্রমশ সিংজী জানতে পারে সেইই এ ধাবার মালকিন। ভাদুরী বলে

—কিছু কাজ-কাম করতে হবে তো সিংজী। তাই ধাবাই বানালাম।

সিংজী দেখছে ভাদুরীকে। শ্যামবর্ণা মেয়েটির চাহনিতে যেন নীরব একটা তৃষ্ণা তার চোখে পড়ে। দিলীপ সিং বলে

—বহুৎ আচ্ছা কিয়া। আমারও অনেক ট্রাক মাল নিয়ে যাতায়ত করে। আমার নাম দিলীপ সিং. ছোটা-শোটা কন্ট্রাকটর আছে।

ভাদুরী তার নাম শুনেছে। সেও অবাক হয়।

—আপনিই সিংজী! কত নাম শুনেছি আপনার?

হাসে দিলীপ সিং—ক্যা! নাম না বদনাম? হামার তো লাইনে বদনামই আছে বহুৎ!

ভাদুরী বলে—না, না। কত বড় ঠিকাদার আপনি।

দিলীপ বলে—কাম-কাজ কুছু করে। ব্যাস, তোমার ধাবাতেই ওরা সব আসবে। অব চলে!

ভাদুরী বলে—এই ধূপ রোদে যাবেন? একটু বসে ঠাণ্ডা হয়ে যান।

সিংজী ওর কণ্ঠে সমবেদনার সুর শুনে চাইল, দেখছে সে ভাদুরীকে।

বলে সিংজী,—গরম হামাকে লাগেনা। অব চলে, ফিন্ আসবো।

ভাদুরীও ব্যবসা করতে করতে রসাল খদ্দেরকে কি ভাবে বেঁধে রাখতে হয় তা বুঝে গেছে। বলে সে —আসবেন না ভুলেই যাবেন সিংজী?

সিংজী বলে—না, না। জরুর ইয়াদ থাকবে। অব চলে।

চলে যায় সিংজী, ভাদুরী চেয়ে থাকে। হঠাৎ যেন মনে হয় তার জীবনে অনেক কিছুই সে পায়নি।

কপিলও এখন এখানে আসা-যাওয়াও কমিয়ে দিয়েছে। ভাদুরীও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার মাঝেই আজ যেন জীবনের একটা বঞ্চনার কথাই ভাবছে সে। মনে মনে কপিলের উপর তার রাগটাই বেড়ে ওঠে।

কমল দাস এর মধ্যে ওই প্রদীপ বাবুদের কথাটাও ভেবেছে। প্রদীপরা ওই ভোটের যুদ্ধে হেরে যাবার পর এখন একটু চুপচাপই আছে। হরিশবাবুর মৃত্যুটা তাদের আন্দোলনকে বেশ কঠিন আঘাতই দিয়েছে। এখন বরুণ প্রদীপ আর কেদারের দল একটু থমকে গেছে। মণিকাও দেখেছে সেটা।

প্রদীপ বলে—এভাবে সমস্ত আন্দোলনকে ওরা আঘাত করবে তা ভাবিনি।

সন্ধ্যা নামছে। কেদার বরুণও এসেছে প্রদীপের সঙ্গে মণিকার বাসায়।

মণিকা ওদের চা দিয়ে বলে।

—এত সহজে তোমরা হাল ছেড়ে দেবে? ওরা তো আঘাত করবেই। কিন্তু তোমাদের দিকে চেয়ে আছে এলাকার সাধারণ মানুষ। শুনি ওই গুণময় কমলবাবুর দল এখন পঞ্চায়েতের কাজেও নানা ভাবে টাকা সরাচ্ছে। পথ-ঘাট উন্নয়নের কাজও হচ্ছেনা। এই নিয়েই আন্দোলন করো।

কেদার বলে—তাতো করবোই। কিন্তু এদিকে একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কঠিন সমস্যা!

প্রদীপ বলে—সমস্যা তো দেখি একটার পর একটা আসছে। তোমার আবার কি সমস্যা হলো?

কেদার বলে—ওই কাঁসার বাসন নিয়েই সমস্যা।

বরুণ বলে—এটা যে এভাবে আসবে তা ভাবিনি প্রদীপ! লোকে এখন কাঁসার বাসন আর তেমন কিনছেনা।

—কেন? প্রদীপ শুধোয়।

মণিকাই বলে

—লোকে এখন দেখছনা নতুন বের হয়েছে স্টেনলেস স্টিলের বাসন, তাই কিনছে।

প্রদীপেরও খেয়াল হয় আগে সেইই দেখেছে গ্রামে-ঘরে প্রতিটি গৃহস্থের ঘরে তখন কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাশ, হাঁড়ির ব্যবহার ছিল।

এখন ক্রমশ দ্রুতগতিতে কাঁসার থালা বাসনের ব্যবহার কমে আসছে। সেসবের ব্যবহার যেন সেকেলেপনাই হয়ে উঠেছে। সকলেই যেন এখন আধুনিক হতে চায়।

তাই পোষাক-আশাকও যেমন বদলেছে এখন, তেমনি ঘরের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে তারা। তারই একটা পদক্ষেপ হিসাবে তারা ঘর গেরস্থালী থেকে ওই ভারি কাঁসার বাসনগুলোকেও বাতিল করেছে। ওসবের দামও এখন অনেক বেশি পড়ছে আর হাজারও সমস্যা। সেদিক থেকে স্টেনলেস স্টীলের বাসন হাল্‌কা, বাহারি আর একটু কোন ওয়াশিং পাওডার দিয়ে মাজলেই ঝকঝকে চমকদার রুপোর বাসনের মত দেখায়।

দামেও কম, ফলে এখন কাঁসার বাসনের বাজার হঠাৎ কমে গেছে। চাহিদাও নাই।

কিন্তু বিপদে পড়েছে এদের সমবায়ের কয়েক শো কারিগর। কয়েক বছর আগে আন্দোলন করে ওরা ওই কমলবাবুর মত মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরাই সমবায় করে প্রচুর মাল তৈরি করেছে। শালও গড়েছে নতুন করে, মূলধনও লাগিয়েছে সকলে। সমবায় করে এরা ভালোই ছিল। দুটো পয়সারও মুখ দেখেছে।

তাই আরও বাইরের অর্ডার ধরার জন্য প্রচুর টাকার কাঁচামালও কিনেছে তারপরই এবার ওই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। বাজারে মহাজনরাও আর তেমন মাল কিনছে না। তারাই বলে

—এখন ওসব বাসন আর চলবেনা। সৌখীন যুগ, এখন লোকে ইস্টিলের বাসনই কিনছে।

—তাহলে আমাদের এত টাকার মাল তৈরি হলো তার কি হবে?

মহাজন বলে—ধরে রাখুন। দেখুন বিয়ে-পৈতের সময় কিছু মাল লাগলে পরে জানাবো।

কেদার চমকে ওঠে—এত মাল গুদামে পড়ে থাকলে কত টাকা আটকে থাকবে বলুন? মেম্বারদের তো কাজও দিতে হবে।

মহাজন বলে—এসব কাজের আর বাজার উঠবে না; এবার অন্য লাইনে যেতে বলুন কারিগরদের!

অনেক সমবায়ের লোকজন, ছোট-খাটো মালিকরাও এসেছে। তারা বলে মহাজনের কথায় একটা এতদিনের প্রাচীন শিল্প, এই জেলার গৌরব।

এই শিল্পের কি হবে? এত লোক এতে খাটছে তাদের কি হবে?

মহাজন ব্যবসা করে। সে এতদিন লাভ করেছে এই ব্যবসাতে তাই এই কাঁসার বাসনের ব্যবসা করেছে। এখানেরই নয়—সে মাল আনায় অন্য মোকাম থেকেও। তাই বলে

—এ বিপদ একা আপনাদেরই নয়, সারা দেশের। নবদ্বীপ, দাঁইহাট, খাগড়ার বাসনের নামই সব চেয়ে বেশি। সেরা মাল, সেরা কারিগর তাদের বাজারই নাই। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

—তাই বলে প্রাচীন শিল্পই লুপ্ত হয়ে যাবে?

মহাজন বলে

—ওসব কথা সরকারকে বলুন গে, তারা যদি কোন পথ বের করতে পারে এরা সুরাহার। আমাদের দিয়ে কিছুই হবেনা। বাজার নাই, টাকা দে মাল কিনে ফেলে রাখার মত মূলধনও আমাদের নাই।

মহাজনও সাফ জবাব দেয়।

কেদার-বরুণ-প্রদীপরা এবার ভাবনায় পড়েছে। সমবায়ের গুদামে প্রায় লাখ খানেক টাকার মাল জমে গেছে। কাঁচামালও রয়েছে এখনও অথচ মালও নিচ্ছেনা মহাজন। টাকা না ঘুরে এলে মেম্বারদেরই কিভাবে মজুরির টাকা দেব।

তাই শত দেড়েক কারিগর কামারপাড়ার মানুষের রোজগার নাই। এদিকে বাজারে জিনিষপত্রের দামও বাড়ছে. ফলে এবার কামারপাড়ার বহু মানুষ, দেগাঁ, গোঁসাইপুরের কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। অভাবে পড়লে মানুষের স্বভাবও বদলে যায়। তাই যাদের এতদিন তারা বিশ্বাস করতো সেই বরুণ-প্রদীপ-কেদারের দলকেই তারা এবার সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

সেদিন সমবায়ের সভায় ওই শ্রমিকরাই এবার আওয়াজ তোলে—আমাদের টাকা ফেলে দাও। ই সমবায়ের গ্যাড়াকলে আমরা থাকবো নাই।

প্রদীপ ওদের গুদামের মাল দেখিয়ে বলে'—মহাজন এত টাকার মাল তুলছে না; টাকা আটকে গেছে।

ফটিক এমনিতেই চড়া মেজাজের। ইদানীং সে গুণময়ের চ্যালা গতিলালের সঙ্গে মিশছে। ফটিক ভালো কারিগর। তারমত অনেক কারিগরের কাজ নাই।

ইদানীং কমলবাবু ধানকল ছাড়াও বেশ কয়েকটা ক্রাশিং মিল করেছে। আরও

অনেকের ক্রাশিং মিল, হাস্কিং মিল এসব আছে। তার জন্য কমল দাসের ভাই একটা ছোট কারখানা করেছে। লেদ, ড্রিলিং মেশিন, শেপিং মেসিন এসবও বসিয়েছে।

কমলবাবুর কাছে গতিলালই কামারপাড়ার সমবায়ের খবরগুলো দেয়। বলে গতিলাল—সেদিন তে মেজাজ দেখিয়ে আপনাকে টপকে সমবায় করলো।

এখন কাঁসার বাজারও নাই। শালারা এবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করেছে।

গুণময় কমলবাবুর মাথা। পঞ্চায়েতের সব কাজ ওর কথামতই হয়। এর মধ্যে গুণময় জেনেছে কাকে কখন ঋণ দিতে হবে কাকে টাইট দিতে হবে যাতে মাথা না তুলতে পারে। ওসব শুনে সে ভাবে এই সুযোগ। ওই প্রদীপদের দলকে সে ছত্রভঙ্গই করে দেবে চরম ঘা দিয়ে।

বলে গুণময়—গতি, ওই ফটিক আরও কজন ছেলেকে এবার তাতিয়ে দে। কমলদা, দরকার হয় দু-চারটে ছেলেকে ওই লেদকারখানাতে দু-একমাসের জন্য কাজই দেবে।

কমল বলে—ওদের কাজ দেব? তারপর?

গুণময় শোনায়—কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ওদের দল ভেঙ্গে কিছু ছেলেকে আমাদের হাতে আনো। টুক-টাক কাজও দিতে হবে। ওদের দল চৌপাট হলে তখন ওদের বিষ দাঁত থাকবে না। এদেরই তাড়িয়ে দেবে। তখন এরাই হবে ওদের কাছে শত্রু। মরুক শালারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে।

কমলবাবু গুণময়ের নীতিতে বিশ্বাস করে, তাই বলে,—কোন গোলমাল হবেনা তো?

গুণময় বলে—না, না। গতিলাল তাহলে কাজে নেমে পড়ো।

গতিলালও সেই মত এখন ফটিকদের নিয়ে বসে গাঁয়েরই বাইরে ওই ধাবার পিছনের ঘরে। ওখানে এখন ব্যবসা জমে উঠেছে। কপিল ওখানে রাতের অন্ধকারে মদের ব্যবস্থাও রেখেছে। মহুয়াগাছের ছায়া অন্ধকারময় প্রান্তরে বসে গতিলাল ফটিকদের মদও দেয়। আর অন্য পরামর্শও দেয়।

ওরা বলে—ওসব কাঁসার কাজ এবার লাটে উঠলো হে।

ফটিক বলে—তাই। আর আগেকার হিসাবেও ঠিকমত দেয় না।

হরিপদ বলে—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ওই বাবুরা কি মাগ্না খাটছে হে? দ্যাখোগে—কত মেরেচে।

ফটিক বলে—তাইই। নালে ওই প্রদীপবাবু দুর্গাপুরের বাপুতি জমিদারী কারবার ছেড়ে ইখানে পড়ে আছে কেন? এমনি?

নিরাপদ বলে—কে জানে। তবে ওই ম্যাষ্টারনীর সঙ্গে খুব পীরিত দেখি। ও যায়, ম্যাষ্টারনীও আসে। মনে হয় রাসলীলা ভালোই চলছে।

ফটিক বলে—আমাদের প্যাটে মেরে উরা গুছিয়ে লিবেক। শুধু কায়ের জন্য সইছি।

গতিলাল বলে—কাজ করে তো পয়সাও নাই! আরে তোদের মত কারিগর এবার কাঁসার লাইন ছেড়ে লোহার কাজে এসো। লেদ ড্রিলিং মেসিন এসবের কাজ শেখ, পয়সা নগদ। কাজেরও অভাব নাই।

কথাটা শুনে কি ভাবছে ফটিক। মনে হয় তাদের পিতৃ-পুরুষের শিল্পের ব্যবসা আর চলবেনা। অন্যপথই দেখতে হবে। তাই ফটিক বলে—তা বুঝেছি গতিদা। কিন্তু সেই কাজ কে দিবেক? ওসব মেসিনে দু-চারদিন কাজ করতে পারলেই শিখে যাবো। এখন এসবেরই দিন। তা কে সেই কাজ দিবেক?

গতিলালের ঝুলি থেকে এবার বিড়াল বের করে। বলে সে

—তোদের মত কারিগরকে পেলে ওর লেদকারখানায় কমলবাবুই কাজ দেবে। শিখবি, মাইনেও পাবি। কাজ শিখলে তেমনি পুরো রোজ। দিনে ধর চল্লিশ টাকা—

ফটিক, নিরাপদ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

বলে ফটিক—আমাদিকে কাজ দিবে কমলবাবু?

হাসে গতিলাল।

বলে সে—আরে ওরা কি তোর আমার মত মনে কিছু পুষে রাখে? সে সময়ও ওদের নাই। ওরা কাজের লোক—তাই কাজের লোকের দাম দিতে জানে। কোন ভয় নাই—কালই চল, কথা বলিয়ে দেব গুণময়দার সঙ্গে। গাঁয়ের কাজের ছেলে তোরা কাজ পাবিনা, গাঁয়ের কারখানায় কাজ পাবে বাইরের ছেলে তাই কি হয়? তবে এখন এসব কাউকে জানাবিনা।

ফটিক নিরাপদ আরও দু-চারজনকে গতিলাল গুণময়ের কাছে নিয়ে যায়। কমলবাবুও ভোলেনি সেইদিনের পরাজয়টাকে আজ তাই প্রদীপদের সমবায়কেও শেষ করে দিতে চায়।

গুণময় বলে—ফটিক, তোরা গাঁয়ের ছেলে তোদের কাজ দেব আগে। তবে সমবায়ের মেম্বার থাকলে কথা হবে তোদের ভাঙ্গাচি। এসব কথা শুনতে রাজী নই। কি করবি ভেবে-চিন্তে জানাস!

নিরাপদ বলে—উ সমবায়ে আর কিছু নাই গো। দুমাস টাকা পাইনি। মাগের রুলিটা বিচে প্যাটের ভাত হছে! উ সমবায়ে আমি আর নাই!

গুণময় বলে—মুখে বললে হবে না। লিখে জানাতে হবে সমবায়কে।

—তাই জানাবো নিরাপদ বলে।

ফটিকও এখন স্বপ্ন দেখছে লেদ, অন্য মেশিনে কাজ শিখছে সে। শালের আগুনে সর্বাঙ্গ জ্বালা করেছে এতদিন। ওই আগুনের তাপে বসে হাতুড়ি মেরেছে। খেটেছে অসুরের মত। এখন দু'মাস পয়সাও নাই। ফটিক বলে—আমিও এমন সমবায়ের মুখে

ইয়ে করে চলে আসবো।

বেশ কিছু দলও জুটে গেছে ফটিকদের পাশে, সেদিন সমবায়ের মিটিংএ কেদার ওইসব অবস্থার কথা জানাতে ফটিকরা চীৎকার করে—এতকাল এত লাভ করেছো সেটা কোথায় গেল?

প্রদীপও দেখছে ব্যাপারটা। সে দেখে ফটিক বেশ কিছু তরুণ নিয়ে এখন একদিকে। প্রদীপ খবর পায় গতিলালের সঙ্গে ফটিককে নাকি রাতের অন্ধকারে কপিলের ধাবায় দেখা গেছে।

প্রদীপ বলে—মাথা ঠাণ্ডা কর ফটিক, টাকা সমবায় পেয়েছে। কত পেয়েছে তার হিসাবও আছে। তার থেকে এতদিন ধরে তোদের মজুরী বোনাস সব দিয়েছে আর ওই লাখখানেক টাকার বাসন তৈরি করেছে। ওটা বিক্রি হলে, টাকা এলে কোন সমস্যাই হতো না। এখন বাজার নাই।

ফটিক গর্জে ওঠে—তাহলে আমাদের কি হবেক?

নিরাপদ বলে—প্যাটে কিল মেরে থাকবো ছেইলা-পুইলে নিয়ে?

এই প্রশ্ন আজ অনেকেরই, তাই গোলমাল-কলরবও বাড়তে থাকে। আজ ওই মানুষগুলো যাদের নিয়ে প্রদীপ একটা আন্দোলন গড়ে তুলে সমাজে একটি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল আজ তারাই তাদেরই অপরাধী সাব্যস্ত করে।

ফটিক বলে---ই সমবায়ে নাই।

নিরাপদও প্রতিধ্বনি তোলে---আমিও নাই। ই লাও তোমাদের ইস্তফা, আমার টাকা বুঝিয়ে দেবা সাতদিনের মধ্যে।

ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন ওই কথাটাই জানিয়ে দেয়। মিটিং ওই গোলমাল চীৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ভণ্ডুল হয়ে গেল। তারাও জানিয়ে যায়, যে ভাবে হোক ওদের প্রাপ্য টাকা ফেলে দিতে হবে।

সন্ধ্যা নামছে, সমবায়ের গুদামের ওদিকের বারান্দায় বসে আছে প্রদীপ, বরুণ, কেদার আরও দু একজন, আজ তারা দেখেছে তাদের সামনে আশার কোন আলো নাই। অনেক সংগ্রাম করেছিল তারা হরিশদাও এদের জন্য আজীবন লড়ে গেছেন। অনেক আশা নিয়ে সমবায় করেছিল আজ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন সেই শিল্পের সম্ভাবনাও অবলুপ্ত হতে চলেছে। তাদের চেষ্টা তাই ব্যর্থই হয়ে গেল।

প্রদীপ বলে---কিছু টাকা পেলে আপাতত এই বিপদ ঠেকানো যেতো।

কেদার বলে—তারপর? এই শিল্পই মরতে বসেছে।

বরুণও বলে—তাহলে সংগঠন থেমে যাবে? আন্দোলন চলবে না? কমলবাবুদের সব অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? এর মধ্যে পঞ্চায়েতে কত কি ঘটছে

চাষীদের কোন উপকারই হচ্ছে না।

প্রদীপ বলে—শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষদের নিয়েই অন্দোলন করতে হবে।

বরুণ বলে—কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন কি হল দেখাল তো?

প্রদীপ বলে—তবু থামলে চলবেনা। ওরাই চেষ্টা করে সমবায়ের কিছু স্বার্থপর মানুষকে দিয়ে এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছে নিশ্চয়। আর ওরা তাই করবে।

—কিন্তু এর প্রতিবিধান কি? কেদার প্রশ্ন করে।

কিন্তু এর সমাধান চোখে পড়ে না। বরুণ বলে,—আপাতত কিছু টাকা দিয়ে যারা চলে যেতে চায় তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। তারপর দরকার হয় লোকসান দিয়েই এসব মাল বিক্রি করে সমবায়কে অন্য কিছু করার কথাই ভাবতে হবে।

প্রদীপ বলে—তাই ভালো. তবু বদনামের হাত থেকে বাঁচা দরকাব।

গুণময় কমল দাস সব খবরই পায় গতিলাল মারফতে। গতিলালই জানায় আজ লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেছে গো সমবায়ে।

গুণময়ও সব শোনে। বুঝেছে মেম্বারদের নিজেদের মধ্যেই এবার লেগেছে। এর পরিসমাপ্তি ঘটাবে গুণময়ই, শেষ চাল দিয়ে সেইই বাজীমাৎ করাবে। তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

গুণময়ের মাল এখন এদেশ থেকে ওদেশে যাচ্ছে। ওদেশ থেকে এদেশেও আসছে। ট্রাক বোঝাই চাল রাতের অন্ধকারে এখান থেকে যায়। বুলেট মন্টারদল এখন গুণময়েব কাজেই ব্যস্ত। তারা জানে কোন কোন জেলার ট্রাফিক-পুলিশকে প্রণামী দিতে হবে। এই লাইনে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাই বিনা বাধায় তারা ট্রাক নিয়ে যাতাযাত করে। ওদিকের খদ্দেরদের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে, তারা ভালো দামেই দেবে মাল পেলে।

সেদিন নামে আচমকা বৃষ্টি। অসময়ের ঝড়-বৃষ্টি—দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে। এর মধ্যে এগ্রামে বিজলির লাইনও এসে গেছে। গ্রামে যেখানে সন্ধ্যার পরই জমাট অন্ধকার নামতো, এখন সেখানে বিজলির আলোয় অন্ধকার মুছে গেছে।

আজকের ঝড়ে লাইন চলে গেছে। তাই চারিদিকে নেমেছে জমাট অন্ধকার আর বৃষ্টিও নেমেছে। প্রান্তর-ওদিকের গুদামও নির্জন, ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির দাপট সমানে চলেছে।

অবশ্য ওর মাঝে যারা কাজ করার লোক তারা নিপুণ হাতেই তাদের কাজ করে যায়।

বুলেট মন্টার দল আগে থেকেই গুদামটা দেখে গেছ। পথও দেখে রয়েছে। ওই

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গুদামের ওদিকের দরজার মজবুত বড় বড় দুটো তালা তাদের হাতের স্পর্শের গুণে সহজেই খুলে যায়। ওরা ভিতরে ঢুকেছে, ট্রাকটাও এসেছে দরজার কাছে। কেউ কোত্থাও নেই এদিকে।

চৌকিদারের ঘরটা ওদিকে একটু তফাতে। ওই ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে সে বের হয়নি। তালাচাবি দিয়ে এসে ঘরে ঢুকে কপিলের তৈরি মদের বোতলটা খুলেছে। অবশ্য কপিলের লোকসান তার বন্ধু দু-এক বোতল মদ ওই চৌকিদারকে দেয়। আজও দিয়েছে।

আর কপিল জানে কাকে কখন কোন ধরণের মদ দিতে হবে। গুণময়ের কথামত বিশেষ ধরনের মদই দিয়েছে ওরা আজ চৌকিদার বেচারাকে। সে খেতেই ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে তারপর গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে।

মন্টা বুলেটের দল ওদিকে বস্তা বস্তা দামী কাঁসার বাসনগুলো ট্রাকেব ভিতরে বোঝাই করে চলেছে। মালও কম নয়। দুটো ফুল পাঞ্জাব বডির ট্রাক প্রায় বোঝাই হয়ে যায়। সামনে কয়েক বস্তা চাল তুলে আসল মাল আড়ালে রেখে চালের ট্রাক হিসাবেই ওই ঝড়-জলের মধ্যে বের হয়ে যায় গাড়ি দুটো।

কাল সকাল নাগাদ ওরা একেবারে দেশের সীমান্ত পার হয়ে ভিনদেশে চলে যাবে কেউ টের পাবেনা। মাঝ থেকে গুণময়ের পকেটে আসবে প্রচুর নগদ টাকা, তার থেকে বুলেটের দলকে কিছু দিতে হবে এছাড়া বিশেষ প্রণামী কিছু যাবে। দিয়ে থুয়েও মন্দ থাকবেনা।

আর এর ফলও হলে সাংঘাতিক। একঢিলে দুই পাখীই মরবে।

হয়েছেও তাই।

পরদিন সকালে চৌকিদার উঠে এদিকে এসে দেখে গুদামের দরজা ভেজানো, তালা দুটো ভাঙ্গা পড়ে আছে জলে কাদায়, আর গুদামে ঢুকে দেখে এত মালের মধ্যে সামান্য কয়েক বস্তা মাল পড়ে আছে মাত্র, বাকী সব সাফ।

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে কামারপাড়ায়, দেগাঁ গোসাঁইপুরেও ছড়িয়ে যায়। লোকজন এসে পড়ে। প্রদীপ, কেদাররাও ছুটে এসে দেখে মাল সাফ, প্রায় রকম বারো আনা মাল নেই। হাজার সত্তর আশি টাকা বা তারও বেশি তৈরি মাল, বেশ কিছু খুট কাঁসা, যার থেকে বাসন তৈরি হয় সে মালও নাই।

বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দু-একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে, তাও বৃষ্টির জলে ধুয়ে-মুছে গেছে। এবার ফটিকদের দলও এসে হাজির।

তারাই বলে—এ-মাল নিজেরাই চুরি করে পাচার করে এখন ডাকাতির কেস সাজানো হচ্ছে।

পুলিশও আসে, এখন এই অঞ্চলে বড় রাস্তা হবার পর শ দরুনে রোজ ট্রাক

বিভিন্ন মালপত্র নিয়ে যাতায়ত করে। সুতরাং ট্রাকে করেই এ-মালও পাচার করা হয়েছে রাতের অন্ধকারে।

কিন্তু ধরার কোন উপায়ই নাই।

প্রদীপ বলে—এ ডাকাতিই। আমরা রাণীগঞ্জ বাঁকুড়ার মোকামেও খবর নিতে পাঠিয়েছি এমন কোন মাল সেখানে গেছে কিনা, তারাও যেন নজর রাখে।

ফটিক বলে—এসব সাজানো ডাকাতি দারোগাবাবু।

দারোগাবাবুও বুঝেছে কোন গোলমাল আছে। আর তারও রোগ আছে। কারণ ইদানীং এসব অঞ্চলে দুনম্বরী ব্যবসার তারাও কিছু প্রণামী পায়। কিন্তু এই কেসে কোন প্রণামীই আসেনি। তাই বলে দারোগাবাবু—তদন্ত হবে। দোষী হলে যে যিনিই হোন ছাড়া পাবেন না। কোমরে দড়ি পরিয়ে সিধে চালান করে দেব।

তারপর চৌকিদারকে ধমকায়—চল শালা থানায়। তুই সব জানিস! দু-চার ঘা পড়লে তারপর সব বের হবে। চৌকিদার কাঁদ কাঁদ সুরে বলে,—আমি এসবের কিছুই জানিনা দারোগাবাবু।

দারোগা গর্জে ওঠে—কাল কে কে ছিল দলে বল?

এবার সভ্যরাই সর্বস্ব এভাবে চলে যেতে ফুসে ওঠে। কে বলে,—ওকে কেন, সমবায়ের ওই কত্তাদেরই ধরুণ। এত বড় সব্বোনাশ ঘটে গেল এর জন্য ওরাই দায়ী।

আজ প্রদীপও ভাবনায় পড়ে। সে বুঝেছে এসব ঘটছে নিশ্চয়ই কাদের কারসাজিতে। কিন্তু কাজটা তারা এমন নিখুতভাবে করে গেছে যে ধরা পড়ার কোন পথই রাখেনি! একেবারে পাকা হাতের কাজ। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। ওই চোরের দল শুধু মালই চুরি করে নিয়ে যায়নি। চুরি করে নিয়ে গেছে এই সমিতির সাধারণ মানুষদের মনের সব আশা, বিশ্বাস।

আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এবার ফটি: নিরাপদ কেন্দ সমিতির বহুমানুষ সমবেত হয় সমবায়ের অফিসের সামনে। বরুণ, কেদার, প্রদীপরাও রয়েছে।

এর মধ্যে ওদের লোকও বাঁকুড়া রাণীগঞ্জের ‹:সেন মহাজনদের গদিতেও খবর নিয়ে এসেছে। এমন কোন মালই যায়নি।

ফটিক বলে,—কাল মাল সরিয়ে কেউ আজই মহাজনের ঘরে বিচতে যায়? ওমাল অন্য কোথাও রইছে, উদেরই শুধোও।

প্রদীপ বলে—বিশ্বাস করো তোমরা—

প্রবীণ বিনোদ কর্মকার বলে—এরপর আর বিশ্বাসের কথা ওঠেনা বাবু। আমাদের ট্যাকা ফেরৎ দ্যান, সমবায়ে আর দরকার নাই।

ফটিক এর মধ্যে গুণময়ের গ্যাস খেয়েছে। সে জানে এদের অপদস্থ করতে পারলে তার চাকরি কমলবাবুর কারখানাতে পাকা হবে। তাই ফটিক গর্জে ওঠে। টাকা না

পেলে কোর্টে যাবো। তহবিল তছরুপের দায়ে বাবুদের কোমরে দড়ি পরাবো। সমবেত জনতা আজ চড়া মেজাজে কথা বলে।

প্রদীপরা চুপ করে শোনে সবকিছু। তাদের এতদিনের স্বপ্ন আজ নিদারুণ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

মণিকাও সবই শুনেছে। সে বরুণদের বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে। গ্রামের অনেক বাড়িতেই আসে। গ্রামেরই মেয়েদের একজন হ'য়ে উঠেছে। ওই সমবায়কে ভেঙ্গে দেবার কথাও শুনেছে সে।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও শুনেছে কথাটা। সুখদা ঠাকরুন এ গ্রামের এখন চলমান গেজেট। অনেক খবরই থাকে তার কাছে। সেও এসে হাজির হয়েছে গোবিন্দর বাড়িতে। গোবিন্দবাবু এখন অঞ্চলপ্রধান কেন অঞ্চলের মেম্বারও নন। ক্রমশ তিনি দেখেছেন আগে রাজনীতিতে সৎ মানুষ থাকতো, যারা নিঃস্বার্থভাবেই সমাজের মানুষেব সেবার কাজে এগিয়ে আসতেন।

আজ এসেছে বেশ কিছু স্বার্থান্ধ লোভী মানুষ। তারা এই রাজনীতিকে অবলম্বন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়। তাই সর্বক্ষেত্রেই অশান্তির সূত্রপাত করে তারা নিজেদের গদি কায়েম রাখতে। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাকে হঠাতে চায় তারা যে কোন প্রকারেই।

এ যেন তেমনিই একটা প্রচেষ্টা।

প্রদীপ, কেদার বরুণদের অবস্থা আজ করুণ। তাদের কোন অদৃশ্য কালো হাত কলঙ্কের কালিতে কলুষিত করেছে।

সুখদা ঠাকরুন বলে—এ ওই কমল আর ওই দেবতাকুলের অসুর গুণময়েব কীর্তি।

পঞ্চতীর্থ মশায়ের মত দেবতুল্য লোক সব শুনে বলেন—দেশ পাপে ভরে যাচ্ছে। তাই হয়েছে। ভালো মানুষ এখন চোর আর ডাকাত লম্পট আর মদের ব্যাপারী হলো দেশসেবক।

সুখদা ঠাকরুন ছড়া কাটে—ইরকুনির বিটি ফিরকিনী-সে পরেছে হীরে।
এত ছলিন থাকতে আল্লা অম্বলে দিলি জিরে।।

দেশের কি হবেক গো! চোর হল কত্তা। ডাকাত হল মাথা!

হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এসেছে, তার এখন অন্য ভাবনা। গ্রামে এর আগে কখনও চুরি-চামারিও হয়নি। এই অঞ্চলে চুরির খবরও ছিলনা। উঠানে দুচারশো মন ধান মরাই-এ থাকতো, দাওয়ায় পাঁচ সাত মাপ, চালের পুঁড়ো এমনিই পড়ে থাকতো।

ঘটি-বাটিও থাকতো যত্রতত্র, গোয়ালে গরু বলদ থাকতো। দরজায় থাকতো মাত্র শিকল তোলা। এত খোলামেলার মধ্যেও কোনোদিন কিছু চুরি যায়নি কারোও।

তবে নষ্টচন্দ্রের রাতে কলা—ফলমূল চুরি যেতো, তাও সুখদা ঠাকরুনের দাপটে

বন্ধ হয়ে গেছে। শান্তিতেই ছিল সবাই। এবার রীতিমত গুদামের তালা ভেঙ্গে ট্রাক নিয়ে ডাকাতি করে গেছে। ওই ডাকাতদের কেউ ধরাও পড়েনি। তাই ভয় হয় হরিপ্রিয়ার। তার ঘরের সিন্দুকে পুরোনো বেশ কিছু সোনাদানা, টাকা কড়িও আছে।

যদিও বাড়িতে সে তিন-চারজন লোক রেখেছে তবুও ভয় হয়। তাই এসেছে সেও গোবিন্দবাবুর কাছেই।

মণিকাও রয়েছে, সেই হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের কথা শুনে বলে, —ওটা সাজানো ব্যাপার মাসীমা।

অবাক হয় হরিপ্রিয়া—কি বলছ মা?

মণিকা বলে—সমবায়কে তুলে দিতে চায় ওই কমলবাবুরা। আগেকার জ্বালাটা ভোলেনি। তাই বরুণবাবু, অন্যদের চোর প্রতিপন্ন করার জন্যই এইভাবে গুদামের চৌকিদারকে মদের সঙ্গে কিছু খাইয়ে বেহুঁস করে তালাভেঙ্গে ওরাই মাল সরিয়েছে। ওদেরই ট্রাক যাতায়ত করে। ওসব কাজের জন্য লোকজনও আছে ওদের।

সুখদা বলে—তা হতে পারে। ওই কপ্‌লে হতভাগা তো গুনোরই মদের কারিগর। গতিটাকেও দেখি ঐদিক-উদিকে ঘুর ঘুর করতে। সব কটা শয়তান মিলে দশচক্রে ভগবানকে ভূত বানিয়েছে লা। দেখছি এর পিতীকার কি হয়?

বাসন্তীও শুনছে কথাগুলো।

কাল থেকে দেখেছে বরুণ কেমন ভেঙ্গে পড়েছে।

গোবিন্দবাবু বলে—তা হতে পারে কাকীমা। আজকাল রাজনীতি নিয়ে এইসবও হচ্ছে। সবই সম্ভব।

হরিপ্রিয়া বলে—তবে হাজার হাজার পুলিশ কি করতে আছে? চুরি-ডাকাতির কিনারা হবেনা?

গোবিন্দবাবু জানেন ক্রমশ প্রশাসনের চরিত্রটা কেমন বদলাচ্ছে। কিছুদিন আগেও নিঃস্বার্থভাবেই পুলিশ তার কাজ করতো। এখন ক্রমশ যে কোন কারণেই হোক পুলিশ প্রশাসন ক্ষেত্র বিশেষে নীরবতাই পালন করে চলেছে। তবু গোবিন্দবাবু বলেন,

—দেখছি দারোগাবাবুকে বলে, তবে কি জানো কাকিমা, এতদিন শান্ত-নির্জন পরিত্যক্ত গ্রাম ছিল, এখন সভ্যজগতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে, এখানেও ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে। সভ্যতার সুফলের সঙ্গে কুফলও কিছু আসে, তা এই চুরি-ডাকাতি, আদর্শহীনতা, মূল্যবোধ চুরি হবেনা? —সেগুলোও তাই আসছে। একে তো এড়ানো মুস্কিল।

—তবু তো সাবধান থাকতে হবে! বলে হরিপ্রিয়া—নাহলে এই অনাচারই বাড়বে। সত্যিকার ভালো ছেলের নামেই চোর বদনাম জুটলো আর যারা নাটের গুরু তারা রইল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মণিকাও বুঝেছে গ্রামের অন্যমানুষরা বিশ্বাস করে এই চুরি করেছে অন্যরাই। প্রদীপ আসে সন্ধ্যায়। আজ সে বিধ্বস্ত।

মণিকা দেখছে ওকে। প্রদীপ বলে,—ভাবছি চলেই যাবো দুর্গাপুরে, এখানে এত খেটে এই অপবাদ সয়ে থাকা উচিত নয়।

মণিকা জানে প্রদীপের মনের অবস্থা। তবু মণিকাও রয়েছে এই বনবাসে প্রদীপের জন্যই। সেও চায় প্রদীপের অন্দোলন জয়যুক্ত হোক। তার পাশেই ছিল সে, অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। মণিকাও ওই আন্দোলন যুক্ত করেছে।

আজ দেখেছে মণিকা গ্রামের মহিলাদের মধ্যে রয়েছে প্রদীপদের জন্য সহানুভূতি। তারা ওই কমল-গুণময়ের সবকিছুকে সমর্থন করে না। ঘরে ঘরে প্রতিবাদের ধূমায়িত রূপকে সে দেখেছে, তাই মণিকা আশা হারায়নি। বলে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই না করে হেরে মুখ লুকিয়ে পালাবে? এই শক্তি, এমনি ঠুনকো মানসিকতা নিয়ে লড়াই করে এসেছিলে তাহলে?

প্রদীপ কি ভাবছে। মণিকা বলে,

—লড়াই এ হার জিত আছে। আজ হেরেছো—তবু লড়াই থামাবেনা। অনেক ঝড় আসবে, সে ঝড় কেটেও যাবে প্রদীপ। ওই সমবায়ের কিছু মানুষ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ওরা ওদের ভুল বুঝবে একদিন, সেদিন ওরাই রুখে দাঁড়াবে ওই আসল অপরাধীদের বিরুদ্ধে। সেদিনের জন্য তৈরি থাকতে হবে প্রদীপ, হেরে পালাবেনা। তোমাদের দিকে অনেক আশা নিয়ে অনেক মানুষই চেয়ে আছে। তাদের আশা ব্যর্থ করার কোন অধিকার তোমাদের নাই।

প্রদীপ অসহায় কণ্ঠে বলে—কিন্তু কি করবো মণিকা?

মণিকা বলে—এখন মানুষের সামনে থাকবে, তাদের জন্য কাজ করবে।

সরকারকে চাপ দিয়ে এখানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার কাজই শুরু করো।

প্রদীপ ওব কথায় অবাক হয়। মণিকা সত্যিই করণীয় একটা কাজের কথাই বলেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জায়গা হরিপ্রিয়া ঠাকরুন আর গোবিন্দবাবুরা দু-জনে দিয়েছে। কিছু টাকাও উঠেছে। সরকারি ফাইলটার কাজ ত্বরান্বিত করতে পারলে এখানের জনসাধারণ চিকিৎকার সুযোগ পাবে।

প্রদীপ বলে—কথাটা মন্দ বলোনি মণিকা। ওই কাজই শুরু করছি কাল থেকে। প্রদীপ, বরুণ, কেদারের দলও যেন করার মত একটা কাজ পেয়েছে।

গতিলাল এখন বেশ খুশি। কমল দাস গুণময়ের এখন প্রিয়পাত্র সে। কারণ গতিলালও ওই সমবায়-সমিতিকে লাটে তোলার কাজে বিশেষ ভূমিকাই নিয়েছিল।

এখন ফটিক, নিরাপদকেও চাকরি দিয়েছে গুণময় ফুলবেড়র পাথর খাদানে। ওই অঞ্চলে এখন বেশ কয়েকটা ক্রাশিং মিল চলে। বিস্তীর্ণ পাথুরে ডাঙ্গা, ঝাঁটিবন নির্মূল করে কয়েক মাইল এলাকার ছোট-বড় টিলাগুলো ভেঙ্গে পাথর বের হচ্ছে শুধু উপরের পাহাড়েই নয়, মাটির নীচেও কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে বিশাল কালো গরুমহিষানী পাথরের জমাট স্তর পাওয়া গেছে।

এতে লোকে বলে—বামনাই কপাল!

ওসব বন্ধা বনপ্রান্তর ছিল প্রতাপনারায়ণদের জমিদারীতে, ওই বনের বেশ কিছু এখন সরকারই দখল করেছে।

এর আগে জমিজায়গার মালিকানার মত এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ শালবনের মালিক ছিল জমিদাররাই। কারো দশ হাজার বিঘে, কারোও তার বেশি, কম শাল জঙ্গল ছিল। অনেক ছোট-খাটো জোতদারের পাঁচ-সাতশো-হাজার বিঘের ছোট জঙ্গল ছিল, তারা নিজেরাই লোক দিয়ে সেইসব জঙ্গল দেখাশোনা করতো। আর যে-যার জঙ্গলেব পাঁচ ভাগের একভাগ জঙ্গলে এক বছব কিছু শাল, অন্য কাঠ জ্বালানীব জন্য কাটতো। আর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষানুক্রমে কিছু বড় বড় শাল-মহুয়া এসব গাছ রেখে দিল। তাদের বলা হতো রাখা শালগাছ। এগুলোতে হাত দেওয়া হতো না। ফলে জঙ্গল বজায় থাকতো। কিছু গাছ কিছু এলাকা এক বছর বিক্রি করলেও অন্য এলাকাতে ঘন বন থাকতো। আর এক বছরের কাটাই করা শালবন পাঁচ বছরে নতুন গজিয়ে উঠে গাছে ছেয়ে যেতো। তাই বন ছিল প্রচুর।

জমিদারী অধিগ্রহণ করার পর মালিকরা কিঞ্চিত অর্থ পেয়েছিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কিন্তু সরকার এক কলমের খোঁচায় সারা দেশের অরণ্য সম্পদ অধিগ্রহণ করে নিল রাতারাতি। আর পরদিনই আশপাশের গ্রামের মানুষ কুড়ুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এতদিনেব অধিকার বর্জিত অরণ্যভূমিতে। তারা নির্বিচারে এতদিনের সযত্নে রাখা শাল, পিয়াশাল মূর্গা, আসান প্রভৃতি দামী গাছগুলোকে কেটে-কুটে লুঠপাট করে নিল।

অসহায় বনকর্মীরা বাধা দেবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কিঞ্চিৎ উপার্জনের জন্য তাদের সহযোগিতা করলো। ফলে অরণ্যভূমি পরিণত হলো লুঠের রাজ্যে। বিলীন হয়ে গেল সবুজ সম্পদ।

এরপর সেই সব জমি আশপাশের প্রান্তরের বুকে ছোট-বড় টিলা পাহাড়গুলোকে ভেঙ্গে চলেছে। কোথাও ডিনামাইট দিয়ে মাটির বুক কাঁপিয়ে পাথর তুলে ক্রাশিং এর কাজ চলছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে।

বর্তমান সভ্যতার নিদর্শন গড়ে তোলার জন্য চাই পাথর। সব যাচ্ছে দুর্গাপুরে কর্মকাণ্ডে নানা দিকে। কমলবাবু গুণময়ও ওই কাজে নেমেছে। এসেছে ফটিক নিরাপদের মত বহু শ্রমিক।

গতিলাল খেটে খায় না। সে খায় তার বুদ্ধি দিয়ে রোজগার করে। এখন সে অঞ্চল অফিসের প্রধান দালাল। চাষীদের অনেকেই আসে গতিলাল ও পাকড়ায় —কি গো মোড়ল, পাম্পএর জন্য লোন চাই?

হারু মোড়ল সাপগাঁয়ের বড় সঙ্গতিপন্ন চাষী। পাম্পসেট কিনবে। গতিলাল বলে—হয়ে যাবে!

নিজেই ফর্ম এনে দেয় ফিলআপ করে দেয়। হারু মোড়ল বলে,—হবে তো? পনেরো হাজার টাকা চাই—

গতিলাল বলে—পাবে, তবে ধরো গে খরচ-খর্চা, তাঃপর কেরানীবাবুকেও কিছু দিতে হবে। তারপর ধর্মগোলা চাঁদা—সব মিলিয়ে ধরো হাজার দুয়েক পড়বে বাপু! এর কমে হবে না। এখন পঞ্চাশ ট্যাকা দাও, ফর্মটা জমা করিয়ে দিই।

কাটাবাঁধের নকুল মুখুয্যে তার লোন ফর্ম জমা দিতে আসে।

গতিলাল বলে—আমি করে দিচ্ছি।

নকুল বলে—আমিই দিচ্ছি!

নকুল জমা দেয় ফর্ম, অবশ্য হরিপদবাবু কেরানী গতিলালের সহযোগী। সোজা পথে গেলে সে ফর্ম জমাই পড়ে না। ঘোরা ঘুরিই করছে নকুল। ওদিকে হারু মোড়ল ততদিনে পাম্প কিনে বোরো চায শুরু করেছে! অবশ্য তার জন্য দুহাজার টাকা দিতে হয়েছে।

নকুল মুখুয্যে চীৎকার করে—আমার লোন এর কি হলো?

হরিপদ বলে— ফর্ম ঠিকমত ভর্তিই হয়নি, সাক্ষী-গ্যারান্টারদের কাগজপত্র কই?

নকুল তিনমাস পর এই কাণ্ড দেখে গর্জায়—কি হয় এখানে? সব জমা দিলাম, বাকী কাগজ গেল কোথায়?

হরিপদ বলে—এই তো পেয়েছি।

গতিলাল এর ভালো রোজকার হয় বলদলোনে। অবশ্য সেটা গতিলাল বেশ বেছে কুছে নিজের লোকদেরই পাইয়ে দেয। গুণময়ের ভাইপো বাদল দু-বছর অন্তর বলদলোণ নিয়ে চলেছে। আরও কয়েকজনকে গতিলাল গুণময়কে ধরে ওটা করিয়ে দেয়।

বলদ লোন বাবদ নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হলো চাষীদের।

বাদল বলে—এতে লাভ কি গতিদা? টাকা তো শোধ দিতে হবে। বলদ তো আমার আছে।

গতিলাল বলে—যা আছে থাক। ও টাকাও শোধ দিতে হবে না তোকে।

বাদল বলে—সেকি। সরকারি টাকা শোধ দিতে হবে না?

হাসে গতিলাল, বলে—পরে বলবো। তবে তখন কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্দ্ধেক—আড়াই হাজার আমাকে দিতে হবে।

বাদল কেন বেশ কয়েজন চাষী গতিলালের কথা শুনে বলে।

—তালে আমরাও আড়াই হাজার টাকা দোব গতিলাল! আমাদের ঋণ যদি শোধ দিতে না হয়!

গতিলাল বলে—ঠিক আছে। তবে আরও ধরো পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে। ওটা আগামই দিয়ে রাখো।

গতিলালের হাতে তারাও পঞ্চাশ টাকা করে দেয়।

গতিলালের বৌ মঞ্জরী এমনিতেই বেশ দজ্জাল মেয়ে। ওই ফেবেরবাজ লোকটাকে বিয়ের পর আসল করে চেনার পর থেকে সে ওকে সহ্য করতে পারে না। মঞ্জরী ভটচায্ বাড়ির মেয়ে। ঠাকুর-দেবতার ভক্ত, গতিলাল নামেই বামুন, ওইসব পূজো পাঠে সে নেই!

গুণময়ের ওখানে মুরগীর মাংস—একটু মদ-টদও খায়। সেদিন মঞ্জরী বাড়ি মাথায় তোলে।

—মরণ নাই! বামুনের ছেলে হয়ে এইসব ছাই পাশ গেলো। ঠাকুর-দেবতাতেও মতি নাই!

গতিলাল বলে—ঠাকুর খেতে দেবে? কাঁচকলা দেবে! বুঝলি যে যুগের যে দেবতা তাকেই মানতে হয়। পুজো দিতে হয়। পাথরের ঠাকুরের যুগ আর নাই।

—তোমার ঠাকুর ওই কমলবাবু আর ওই গুণময়।

হাসে গতিলাল—ওদের জন্যেই পায়ের ওপর পা দিয়ে খেছিস! দুটো পয়সার মুখ দেখছি।

—ঝাঁটা মারি এমন পয়সার মুখে ফুঁসে ওঠে মঞ্জরী।

গতিলাল ওসব কথা কানে তোলেনা। সে তার কাজই করে যায়। ইদানীং বেশ কয়েকটা বলদলোন মকুব করাতে হবে তাই নিয়েই ব্যস্ত সে। বের হয় গতিলাল, একটু পরিশ্রম করতে পারলেই নগদ আড়াই হাজার টাকা। অবশ্য তার জন্য করণীয় একটা কাজও আছে। হাতে গোটা দশেক বলদলোন মুকুবের কেস আছে। কড় কড়ে পচিঁশহাজার টাকা ক্যাস পাবে। তাই গতিলাল হন্যে হয়েই ঘুরছে এ গ্রাম সে-গ্রামে এই ধূপ রোদে।

কাজটা করতে হবে খুব গোপনেই। তাই খুব বিশ্বস্ত কোলা মুচিকে নিয়েই ঘুরছে এ গ্রাম সে গ্রামের নির্জন ভাগাড়ে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখে কোথাও শকুন উড়ছে কিনা।

কেলো বলে—হয় ইদিকে উড়ছে গো। মনে হচ্ছে কাটাবাঁদের ভাগাড়ে পড়েছে

কিছু।

—চল! গতিলালও চলে কেলোকে নিয়ে।

তিন-চারদিন দূর দূরান্তরের গ্রামের ভাগাড়ে ঘুরে ঘুরে গতিলাল বেশ কিছু মাল সংগ্রহ করে গোয়াল ঘরের চালায় পদ্মপাতায় মুড়ে ন্যাকড়ার পুটুলিতে করে রেখেছে। ক'দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাল সংগ্রহ করেছে। কালই ওগুলোর ব্যবস্থা করতে পারলে দশটা বলদ লোন মুকুব হয়ে যাবে। গুণময় বাবুকে কিছু দিতে হবে আর পেট মোড়া হরিপদ কেরানীও গিলবে কিছু। বাকীটা গতিলালেরই থাকবে।

বাড়িতে সেদিন গতিলালের শালা-শালী এসেছে। গতিলালও মেজাজেই আছে। বলে মঞ্জুরীকে খুশি করার জন্য।

—শালা-শালীরা এসেছে। ভালো করে খাওয়াও, আমি বরং হাট থেকে মাংস কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেশ ভালো করে মাংস বানাও, আসছি একটু কাজ সেরে।

মঞ্জরী বলে—মাংস পাঠিয়ে দিও, গোয়ালের চালাতে যেন রাখে। আমি বাপু বার বাড়িতেই মাংস রাধবো। ভিতরে ঠাকুর দেবতা রয়েছে। ওসব হবেনা।

মঞ্জরীর এমনিতেই ছুঁচিবাই, তবু ভাইবোনদের জন্য মাংসই রাধবে। মঞ্জরী মশলাপত্র বাটছে। আদা-পিঁয়াজ বেঁটেছে। গমরমশলাও আনিয়েছে। যুত করেই মাংস রাধবে সে।

বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা হাট থেকে ফিরে হাঁক পাড়ে গোয়াল বাড়ি থেকে; মান্সো এনেছি গো গুলিন—

মঞ্জরী ভিতরবাড়িতে কাজে ব্যস্ত। বলে সে।

—গোয়ালের বাতায় রেখে যা। পরে যাচ্ছি।

ছেলেটা সেই মত রেখে চলে যায় গরু চরাতে। সে খুশি আজ নিদেন একটুকরো মাংস তার ভাগেও পড়বে।

বেলা হয়ে গেছে, মঞ্জরী ওদিকের রান্না সেরে এবার বার বাড়িতে আসে মাংস রান্নার জন্য। ছোট বোন উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাদাও এসেছে বার বাড়িতে।

মঞ্জরী কড়াই তেল মশলা এনে এবার গোয়ালের বাতা থেকে ঝুলন্ত মাংসের পুটুলি খুলতেই নাকে লাগে বিশ্রী পচা গন্ধ। দাদা, বোন যারা এবাড়িতে বেড়াতে এসেছে তারাও অবাক।

—এ কিরে! মাংসের এত বিশ্রী গন্ধ। কিসের মাংস?

মঞ্জরী এবার নাক চেপে মাংসের পুটুলি খুলেই আঁতকে ওঠে। কোথায় ছাগলের মাংস! যত্ন করে কলাপাতা পদ্মপাতায় জড়ানো রয়েছে বেশ কয়েকটা মরা গরুর কান কাটা।

তেমনি বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ ছাড়ছে।

মঞ্জরী আর্তনাদ করে লাফিয়ে ওঠে—এরে বাপ্‌রে।! একি সর্বনাশ কাণ্ড! ছি, ছি! সর্বাঙ্গ তার অপবিত্র হয়ে গেছে। দাদা-বোনও অবাক।

—একিরে দিদি, বামুনের ঘরে মরা গরুর কান-এখানে কে আনলো? ঢুকছে গতিলাল খুশি মনে, অঞ্চল অফিসে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন ওই গরুর দশজোড়া কাটা কান দেখালেই সরকারিভাবে প্রমাণিত হবে যে যে বলদের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দশ জোড়া বলদ সত্যিই মারা গেছে। সুতরাং গরীব চাষীর সর্বনাশই হয়েছে। অতএব ওই দশজোড়া বলদের জন্য দেওয়া ঋণ আর ফেরৎ নেওয়া হবে না। ঋণ মকুব করা হোল।

এর ফলে গতিলাল পাবে আড়াই হাজার টাকা করে এক জোড় বলদ পিছু, তাই আজ দমকা পঞ্চাশ টাকার মাংস কিনে পাঠিয়েছে রাখালছেলেটার হাতে।

গতিলাল বাড়ি ঢুকে বলে খোসমেজাজে

—মাংস কেমন দিয়েছে? ভালো খাসির মাংসই দিয়েছে।

তারপরই বোম ফাটার মত ফেটে পড়ে মঞ্জরী

—এই তোমার মাংস! গরুর পচা কান কাটা! কি সর্বনেশে কাণ্ড!

চমকে ওঠে গতিলাল।

তার সামনে ছড়ানো রয়েছে এত কষ্টে গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে রোদে পুড়ে সংগ্রহকরা সেই মূল্যবান গরুর কান গুলো! গতিলাল গর্জে ওঠে।

—ওসব কে ছড়ালো? এ্যা!

সে ছাতা ফেলেই এবার নিজের হাতের ছড়ানো বস্তুগুলো সংগ্রহ করে আবার পুঁটুলি বাধছে। দেখছে শালা-শালীও তাদের ভগ্নীপতির কীর্তি।

মঞ্জরী গর্জে ওঠে।

—ছিঃ ছিঃ! ওইসব তাহলে তুমিই ধরে এনে তুলোছে? তুমি বামুন না চণ্ডাল? বামুনের ছেলে হয়ে

গতিলাল গর্জে ওঠে—রাখো তোমার বামনাইগিরি, কি দাম বামুনের? টাকা! নগদ কড়কড়ে হাজার হাজার টাকার কাছে এই পৈতা ক'গাছির কি দাম? সুতো বই তো নয়। রাখো তো—

গোয়ালের ওদিকে একটা ঝুড়ির নীচে চাপা দেওয়া তালপাতার মোড়কে বাঁধা মাংসটাকে দেখিয়ে বলে,—ওই তোমার ছাগলের মাংস। ওইটাই রাধো। আমি আসছি।

গতিলাল ওই পচা কানের পুটুলি নিয়ে দৌড়লো অঞ্চল অফিসের দিকে। অনেক টাকার মাল, এগুলোর সদ্গতি করে টাকাটা নিয়েই ঘরে ফিরবে।

মঞ্জরী গর্জে ওঠে — পুটি! ওই তালপাতার মোড়কের মাংসও ফেলে দে আস্তাকুড়ে। আজ নিরামিষই খাবি। যাই পুকুরঘাটে আবার গণ্ডা কতক ডুবে আসি।

ছিঃ ছিঃ! বামুন! টাকার লোভেই সব ধর্ম কর্ম বামনাই জলাঞ্জলি দিল লোকটা!

এই গোপগাঁয়ের অন্যপ্রান্তে তখন পঞ্চতীর্থ উপনিষদ পাঠ করে চলেছেন

—অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বনি দেববয়ুনানি বিদ্বান।
যুযোর্ধস্মজ্জু হুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।

হে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর আমাদের সকলকর্ম ও উপাসনা, শ্রদ্ধা তোমাতেই অর্পিত। তুমিই এই বিশ্বসংসারের ভবসাগরের একমাত্র রত্ন। তোমাদের পাইবার জন্য যেসব উপায়, পথ রহিয়াছে সেইসব পবিত্র পথে তুমিই আমাদের পরিচালিত করো। যেসব কুটিল পাপ-প্রলোভন সেই পথের অন্তরায়, বাধা, সেইসকল বাধাকে দূরীভূত করো। তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

ওই উপনিষদের মন্ত্রের সুর মিশেছে হোমাগ্নির সৌরভে। এখানে যেন লোভ-লালসা নাই। অতীতের তপোবনের প্রশান্তি এখানে বিদ্যমান।

সুধাময়ের বড়ছেলে নীতু এখানেই এসেছে।

এখন সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র তবু সে জ্যাঠামশাইএর মতই বেদ-উপনিষদ অতীতের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

সে বিশ্বাস করে বিজ্ঞানমানুষকে আজকের দিনে নবচেতনায় জাগ্রত করেছে। কিন্তু ভারতের বেদ-উপনিষদের ঋষিদের মতের সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞানের কোন সংঘাত নাই।

তাদের মতবাদও সুষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনন ও চিন্তানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ-শান্তি লাভের পথ নির্দেশই রয়েছে সেখানে।

পঞ্চতীর্থ নিতুকে বলেন—তোর বাব কাকা তো এসবের মর্যাদাও দেয় না। এমনকি তোর ছোট ভাই বাদলও।

নিতু বলে— ওদের কাছে ধ্যান-জ্ঞান ওই টাকা আর প্রতিষ্ঠা। তারজন্য ওরা শাশ্বত ধর্মকেও বিকৃত করে। বাবা ওই করে লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠকায়। আর কাকা, বাদলও তাই করে। তবে তাদের পথ আরও ভয়ানক।

পঞ্চতীর্থ বলেন—-এই সর্বনাশা যুগই আসছে নিতু। মনে হয় বাইরের এক বিকৃত সভ্যতার উত্তাল ঢেউ আমাদের সব কিছু যেন ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাবে।

নিতু বলে—নিজেদের চেতনা, সংস্কৃতির গভীরে যদি মূল শিকড় প্রতিষ্ঠিত থাকে তবেই নিজস্ব রীতিতে সে এই বিকৃত বহিরাগত সভ্যতার বিষকেও অমৃত করে নিতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় বহু জাতি এসেছে তাদের বহু বিচিত্র সংস্কৃতি নিয়ে এই ভারতের মাটিতে। ভারতবর্ষ তাদের নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে

নিজের মহিমায় বিরাজমান। এই বহিরাগত বিকৃত সভ্যতাকে সে একদিন নিজস্ব রীতিতে মিশিয়ে নেবেই। তবে হয়তো সময় কিছু লাগবে।

পঞ্চতীর্থ বলেন তোরা আগামী যুগের মানুষ একাজ তোদেরই করতে হবে। আমাদের দিন তো শেষ হয়ে আসছে নিতু!

নিতু কি ভাবছে।

পঞ্চতীর্থেরও মাঝে মাঝে মনে হতাশার সুর জাগে। এ-যুগে সবই বদলে যাচ্ছে। ভিতরে বাইরে দু'দিকেই বদলাচ্ছে। কোথায় এর শেষ পরিণতি তা তিনিও জানেন না। এই গোপগাঁয়েই দেখেছেন সেই পরিবর্তনটাকে। মাথা তুলেছে নতুন একটা শ্রেণী, লোভ-লালসা যাদের সীমাহীন। মানবিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শের কোন শিক্ষাই তাদের নাই। এরাই সমাজ-দেশকে শাসন করবে।

তবু তাদের পাশে খুব কম হলেও নিতুদের মত কিছু তরুণও আসছে। যারা এই বিকৃত মানসিকতাকে প্রতিরোধ করতে চায়। দেখেছেন তিনি প্রদীপদেরও।

বাবার দেওয়া বিলাসব্যসন, নিশ্চিন্ত জীবনকে ত্যাগ করে তারা এই প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু দেখেছেন তাদের উপর অপমান—আঘাতের কাহিনী।

নিতু বলে— প্রদীপদার সঙ্গে কথাও হয়েছে জ্যাঠামশাই। দেখলাম ওরা সহজে ভেঙ্গে পড়তে রাজী নয়। ওরা লড়াই চালিয়ে যাবেই।

পঞ্চতীর্থ শুনছেন কথাগুলো, বলেন। ---ওদের একদিন নিয়ে আসবি নিতু!

নিতু একটু অবাকই হয়। শুধোয় সে— কেন?

পঞ্চতীর্থ বলেন —আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলবো। ওদের উপর আমার অনেক আশারে। ওরাই হবে নতুন যুগের তরুণ যারা এক কঠিন সর্বনাশের মাঝে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখছে।

শূন্য প্রান্তরের বুকে এবার শেঠ পিয়ারীলাল তার নতুন কারখানা গড়ছে। ঝকঝকে টিনের শেড, বিস্তীর্ণ সীমা প্রাচীর ঘেরা জায়গাটার উপর এবার শেঠজী বিরাট ফ্যাবরিকেশন ফ্যাকটরী গড়ছে।

এতকাল এই ডাঙ্গার বুকে কমল দাসের ধানকলটাই একক একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে কমল দাসের মহিমার প্রতিভূ হয়েছিল। আজ তার পাশেই মাথা তুলেছে সেই প্রতিষ্ঠাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই কারখানা। পিয়ারীলাল এখন মাঝে মাঝেই আসছে এখানে।

আর প্রায়ই আসে তখন সুধাময় মহারাজের কাছে। সুধাময় এখন বাড়ির লাগোয়া বাঁশঝোপ কেটে সেখানে ঝকঝকে মন্দির করেছে।

দামি টালি বসানো মন্দির, নাটমন্দির। পাশেই তার সাদন কুটির, শেঠ পিয়ারীলাল

কেন আরও অনেকে আসছে এখন। শনি-মঙ্গলবার যেন লোকজনের মেলা বসে যায়।

বাদল এই দুদিন আর দুটো ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের নাম লেখা, প্রণামী নেওয়া। পূজোর নির্মাল্য, দেওয়া আর বিশেষ ব্যক্তিদেরই বাবার কাছে তারা পাঠায়। সাধন কুটিরে মহারাজ তখন যোগাসনে বসে তাদের বক্তব্য শোনেন দু-চারটে নির্দেশও দিয়ে থাকেন, বিনিময়ে একশো এক মুদ্রা থেকে আর উপরের দিকে প্রণামী দিতে হয়।

শেঠ পিয়ারীলাল মহারাজকে দিয়ে হোম-যজ্ঞি করিয়ে ওই কারখানার কাজ শুরু করেছে। কমল দাস দেখছে ওর কারখানার বিস্তার।

গুণময় অবশ্য শেঠজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তবে বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় বাইরেই। বুলেট মন্টারাও জানে এসব। তারা চায় আরও পার্টি আসুক। তাদের মাসিক রোজগারই বাড়বে।

আর গুণময় চায় এবার কমলকে ছাড়িয়ে যেতে। সে হবে এবার এই এলাকার এম-এল-এ। সে অঞ্চলেই আটকে থাকতে চায় না। তার নজর আরও উপরের দিকে।

সে আশা করে এম-এল-এ হবে। আর কলকাতার নেতারাও তার চেনা-জানা। তারাই আশা দিয়েছে ওই জেলার কোটায় সেই মন্ত্রী হবে। গুণময় তাই স্বপ্ন দেখে। এ ব্যাপারে শেঠজীকেও দরকার হবে। তাই সবরকম মদতই দেয় গুণময়।

শেঠজী কমলের ওখানে আসে।

—রাম রাম কমলজী, খবর সব আচ্ছা তো?

কমলও খাতির করে বসায় তাকে। —আসুন! আসুন! বসুন

শেঠজী বলে - আপনি অঞ্চলের হেড—ইয়া শের আছেন। ইদিকে আসলো, তাই একবার দর্শন করিয়ে গেলাম।

ওদিকে গুণময় বসেছিল। অঞ্চল অফিসের কি জরুরী আলোচনা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। গুণময় বলে —কমলদা, শেঠজীএলেই আপনার কাছে আসেন।

—আসবে না? কি বলছে গুণময়? এলাকার পয়লা নম্বর আদমী। ওর কৃপাসেই ছোট খাটো কাম ধান্দা করছে।

কমলও খুশি হয়।

আরও নিশ্চিন্ত হয় যে ওর ব্যবসাই আলাদা। লোহালক্কড়ের মাল তৈরি। সুতরাং তাদের মধ্যে প্রতিযোগতা হবে না। তা সহযোগিতা করতেও তার বাধা নেই।

তাই মাথা তুলছে তার কারখানা। গুণময়ও মাঝে মাঝে আসে দেখা-শোনা করে। শেঠজী এখন কারখানার ওদিকে একটা বাংলোও বানিয়েছে, গাছগাছালি লাগিয়ে জায়গাটাকে সুন্দর করে তুলেছে।

শেঠজী, দু-চারজন তার পার্টনারও আসে এখানে।

মাতনকেই আনে গুণময় এখানে মদের ব্যবস্থাও থাকে। অবশ্য সেসব তার কুটির শিল্পের তৈরি মাল নয়, এসব আনে শেঠজী আসানসোল থেকেই।

আর নিজেরাই গাড়ি পাঠিয়ে সদর থেকে দু-চার জন অফিসার, নেতাদেরও আনায়। খানাপিনার আসরে আপ্যায়ন করে।

সহর থেকেই দু-একজন মেয়েও আসে। একজন নাকি শেঠজীর পি-এ—তার বান্ধবীও আসে।

মাতন ক্রমশ দেখেছে অনেক কিছুই।

গ্রামের সাধারণ মেয়েই। তবে স্কুলে ক্লাশ সেভেন-এইট অবধি পড়েছিল। গরীব বাবা তারপর মেয়ের দায়িত্ব এড়াতে কপিলের হাতেই দিয়ে বলেছিল একে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করো যদি পারো। মাতনের রূপ তখন সব খুলছে। যেন অনাঘ্রাতা বনজ ফুলের কুড়ি।

ওর মনে আশা ছিল দিদি-ভগ্নীপতি তাকে স্কুলে পড়াবে, ওদের গাঁয়ে ইস্কুল আছে। সে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে যেভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু এখানে এনে কপিল তাকে ওই মদের ভাটির কাজে লাগিয়েছে। মদের হিসাব রাখা, কোথায় কত জেরিক্যান মাল কত পাইট গেল সেসবের হিসাব, মাল তৈরির হিসাব এই কাজেই লাগিয়ে দিয়ে গ্রামের বাইরে ওই বনের মধ্যেই রেখেছিল।

মনে মনে একটা ক্ষোভ মাতনের ছিলই। কিন্তু খুবই চাপা সে। তাই মুখে প্রতিবাদ করেনি। তবে ব্যবসার থেকে নিজে বেশ কিছু টাকা সরিয়েছে। জল বেচা টাকার সঠিক হিসাবও থাকেনা। তাই গুণময়ও কিছু বলেনি।

বরং সে ওই মেয়েটাকে প্রশ্রয়ই দিত। গুণময় বলতো।

—কি রে মাতন! এ্যাঁ ক্যামন চলছে তোর কারবার?

মাতনও বুঝেছে তাকে এই মাটি থেকেই উঠতে হবে। আরও বুঝেছে কপিল তাকে সহজে ছাড়বে না। লোকটার নজর তার দিকে।

মাতনকে প্রকৃতি রূপ যেমন দিয়েছে তেমনি দিয়েছে সহজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। মানুষের চোখে সে দেখে এখনই লোভের ছায়া।

কপিলকে নয়—তার দরকার গুণময়বাবুকেই। গুণময়ও ধাপে ধাপে উঠেছে, মাতনকেও তেমনি উঠতে হবে। তার জন্য কিছু দিতে হলেও সে দেবে। বিনিময়ে আরও অনেক বেশি কিছুই মাতনকে পেতে হবে।

মাতনের দেহে এসেছে যৌবনের বাঁধভাঙ্গা ঢেউ। নিজেকে সাজাতে জানে মেয়েটা। মাতন এর মধ্যেই পুরুষের বুকে তুফান তুলতে পেরেছে। এতে সেই বেশি খুশি।

মাতন গুণময়ের কথায় বলে—তোমার কারবার চলবে না। তুমি তো ভালো ব্যপারী গো। মানুষের নেশার ব্যাপারী।

গুণময় দেখছে মেয়েটাকে। পানপাতার মত মুখ, ফর্সা রং। দেহের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে যেন পুরুষকে নীরব আমন্ত্রণ জানায়। চোখের তারায় এক আবেশভরা চাহনি। বৈকালের স্তব্ধতা নেমেছে বনে।

গুণময়ের মনে হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। — শোন! এ্যাই মাতন।

মাতন জানে পুরুষের মনের ঝড়কে। এটা যেন তারই সৃষ্টি। মনে মনে খুশিই হয় মাতন। বলে,—কি! বল না গো?

গুণময় ওকে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। সারা দেহ দিয়ে গুণময়ই উষ্ণ দেহের ওম্‌টুকু অনুভব করে। দুহাতের নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে যেন পিষে ফেলতে চায়। ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁটের সব প্রাণরসকে নিজেই আহরণ করতে চায়।

হাঁপাচ্ছে মেয়েটা কি উত্তেজনায়। দেখেছে সে গুণময় এখন তার হাতে। চাপা স্বরে বলে মাতন,—কি গো খেয়ে ফেলাবা নাকি! ছাড়ো—কেউ দেখে ফেলবে। ছেড়ে দেয় গুণময় ওকে। মাতন বলে হালকা স্বরে

—তুমারই যে নেশা ধরে গেল গো।

গুণময় দেখছে মেয়েটাকে। বলে—তুই নেশা ধরালি মাতন।

সেই নেশাটা ভালোই ধরেছে গুণময়ের।

দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে এখন। বাড়িতেও বলার কেউ নাই।

বৌদি-বড়দা পঞ্চতীর্থের সামনে যায়না গুণময়। পঞ্চতীর্থ থাকেন সংসারের বাইরে। সুধাময়ও এখন পরম তপস্বী-বাকসিদ্ধ পুরুষ।

গুণময় বলে—আমি লোককে মাল বিচে পয়সা নিই, সুধাময়দা স্রেফ কথা বিচে মাল বানায়। ও আমার চেয়েও ধড়িবাজ। আমি ভেক নিইনি, ও ভেক ধরে লোক ঠকায়। ডেঞ্জার লোক। সুধাময় ভাইকে এড়িয়ে চলে। কখন কি বলে দেবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই।

তাছাড়া সুধাময় ওর বড় ছেলে নিতুকেও এড়িয়ে চলে। সুধাময় দেখেছে নিতু যেন ওই বড়দারই প্রতিচ্ছবি। অমনি পড়াশোনায় গভীর জ্ঞান। কম কথা বলে। সুধাময় ওকেও বলে

—এসব শেখ, তন্ত্র-মন্ত্র—তন্ত্রসার পড়।

নিতু বলে—ওই বিদ্যে নিয়ে যাতে রোজগার না করতে হয় তার জন্য অন্য পড়াই পড়ছি বাবা।

সুধাময় বলে ওর স্ত্রীকে

—তোমার ছেলেকে ওই বড়দাই বিগড়ে দিয়েছে। বাদলটা তবু কিছু শিখছে, নিতের এদিকে মন নাই। বেশি পড়ে কি হবে? আমি ওই বুদ্ধি দিয়েই যা রোজকার করছি তা কি কম?

ওর স্ত্রীর এসব পছন্দ নয়।

সে জানে হোম যাগ-যজ্ঞির যা হাজার টাকা নেয়, তা সবই ফাঁকি। দুটো কাঠ জ্বেলে সামান্য ঘি ছিটিয়ে অং বং করে মাদুলিতে স্রেফ বেলপাতা পুরেই দর হাঁকে।

—বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বগলা কবচ। পাঁচশো একটাকা প্রণামী।

স্রেফ লোককে ধাপ্পা দিয়েই টাকা কামায়। আর গুণময়ের খবরও জানে সুধাময়ের স্ত্রী। মেয়েমহলেও আলোচনা শোনে। সুখদা ঠাকরুন তো মুখের উপরই বলে।

—ভালো কারবার ফেঁদেছে তোর স্বোয়ামী আর দেওর। একজন গেরুয়া পরে বাত বিচছে আর একজন মদ বিচছে আর নেতা সেজেছে।

কথাটা মিথ্যা নয়। টগরও বলে।

—এ আবার নতুন ব্যবসা গো ভাজবৌ।

সুধাময়ের স্ত্রী চুপ করে শোনে। বাড়িতে স্বামীর কথায় বলে।

—তোমরা না পণ্ডিতের বংশ। বড় ঠাকুরকে দ্যাখো—দেবতুল্যি মানুষ, নিতু তার হাতে তৈরি, তাই সে তোমাদের এই নোংরা পথকে কোনদিনই মেনে নিতে পারবে না। সে তাই বাড়িতেই থকে না। আশ্রমেই থাকে।

সুধাময় বলে—পণ্ডিত হবে? বড়দা কি করেছে এত পণ্ডিত হয়ে? ওসব পণ্ডিতীর কোন দামই নাই। টাকা চাই—টাকা, মান, কতলোক পায়ে এসে মাথা ঠোকে দেখেছো? এই পায়ে?

গিন্নী বলে—থাক! ওরা যেদিন জানবে তোমার বিদ্যের বহর সেদিন ঝাঁটা মারবে। দুই ভায়ে যা শুরু করলে?

গুণময়কে সংসারী করতে পারেনি ওর বৌদি। গুণময়ও বলে

—আগে থিতু হই। তারপর ভাবা যাবে। যতদিন ছাড়া গরু আছি ভিন গোয়ালে জাবনা খেতে দোষ কি?

গতিলাল ওর প্রধান সহচর। গতিলাল বলে

—ঠিক কথা। বিয়ে করে এখন ঝাঁটা খাচ্ছি সর্বস্ব দিয়ে-থুয়ে। অমন কাজ করোনা গুণময়।

গুণময় বলে—ঠিক কথা গতিলাল।

গুণময় মাতনকেই মনের মত করে তৈরি করতে চায়। টাকা-পয়সা দেয়। গুণময় কলকাতা এলে বা বিদেশী মাল কিছু আনালে তার সঙ্গে মাতনের জন্য ঢাকাই জামদানীও আনায়, বিদেশী সেন্ট সাবানও আসে।

মদের ব্যবসা বেড়েছে। মাতন এখন অফিসেই বসে সেজেগুজে। মাতনও ক্রমশ নিজেকে তৈরি করতে চায়। সে দেখেছে ওই কপিল এখন যেন বদলে গেছে।

কপিল চেয়েছিল তার বৌ ভাদুরীকে সরিয়ে দিয়ে সে মাতনকে নিয়েই এবার

সুখসাগরে ভাসবে। তাই মাতনের দিকেই হাত বাড়ায়।

রাতের অন্ধকারে কপিলের মুখখানা এগিয়ে আসে। ওর দু'চোখ জ্বলছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি। মাতন চাইল।

—কি বলছ?

কপিল এর মধ্যে বেশ খানিকটা মদও গিলেছে। মাতন মদের কারবার করে কিন্তু মাতালদের দেখতে পারে না। কপিল বলে—তোকে ছাড়া বাঁচবো না মাতন, তোর জন্যে তোর দিদিকে সরিয়েছে।

মাতন ওই লোকটাকে মেনে নিতে পারে না। কেমন যেন বন্যপ্রকৃতির মানুষটা। মাতন বলে—তাই ভয় হয়। যদি আমাকেও মজা লুটে ফেলে দাও কুনদিন!

কপিল বলে—না নারে! শোন—

এগিয়ে আসে লোকটা। হঠাৎ গুণময়ের মটরবাইক এসে পড়ে সগর্জনে। জোরালো হেড লাইটের আলোটা পড়েছে গাছগাছালির উপর। মাতন বলে, —গুণময়বাবু এসেছে।

কপিলও সরে যায়! সে দেখে মাতন যেন সেজেগুজেই ছিল।

গুণময় ওকে মাঝেমাঝে এখন ওই নতুন শেঠজীর বাংলাতেও নিয়ে যায়, মাতন প্রথমে যেতে চায়নি। বলে—ভয় লাগে বাবু!

এর মধ্যে গুণময় ওকে হাতের মুঠোয় এনেছে। নিজে দখল করেছে ওই লাস্যময়ীকে। এবার তাকে দিয়ে নিজের কাজও করিয়ে নিতে চায়। মাতনও জানে ওই গুণময় তাকে কোন মর্যাদাই দেবে না। এশুধু যেন লেনদেনরই হিসাব, এখানে হৃদয় মনের কোনও স্পর্শও নাই।

মাতন যেন একটা লোভী চক্রের মধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে।

একদিন ওই কপিল, তাকে দখল করতে চায়। আর অন্যদিকে গুণময় যে তাকে দখল করেই খুশি নয়, তাকে দিয়ে ওই শেঠজীকে বাঁধতে চায়। বাণিজ্য করে নিতে চায়।

মাতনের মনে একটা জ্বালা জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। পথ খোঁজে মাত্র। কি ভাবে সে এই লোভী মানুষগুলোকে জবাব দিতে পারবে।

গুণময় ওকে দেখছে। খুশি হয় ওকে দেখে।

ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলে—না, তোর নামটা সার্থক রে। মানুষের বুকে মাতনই তুলিস তুই। চল—

—কোথায়? জানে মাতন ওই শেঠজীর ওখানেই আজ রাত ভোর মত্ততা চলবে। সহরের দু-একজন মেয়েও আসে। ওই মহফিলে তারাও থাকে।

কিন্তু শেঠজী মাতনকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—গুণময়, উ সহরের টবের ফুলের মৌ খুসবু, চমকদারী নাই। ই মাতন একদম বনের তাজা ফুল! একদম ফেরেস!

ওই জগতে মাতনের মন কি নীরব জ্বালায় জ্বলে ওঠে তবু যেতে হয়।

গুণময় ওকে বাইকে তোলে। হাসছে মাতন।

—ছাড়ো বাবু! কি করছ গো।

ওরা চলে গেল। তখনও কপিল দাঁড়িয়ে আছে। মদের নেশাটা চড়ে যাচ্ছে। তার মুখের গ্রাস যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওই গুণময়বাবুই। কপিল গর্জায় শালা বেইমান, আর মাতনও অমনি, দেখে লিব সবাইকে! ওর মনে পড়ে ভাদুরীর কথা।

তাকে সরিয়ে ওই মাতনকেই পাবার স্বপ্ন দেখেছে এতদিন। কেন জানেনা বারবার আজ ভাদুরীকেই মনে পড়ে। সে তাকে এভাবে ঠকায়নি। মাতন তার দিকে ফিরে চাইল না। গুণময়বাবুর সঙ্গে কোথায় চলে গেল।

ভাদুরীর ধাবা এখন ভালোই বলছে।

দিনে দু-চারটে ট্রাক আসে যায়, কিছু প্রাইভেট গাড়িও থামে, ছায়াঘন পরিবেশে শালবনের ধারে বসে চা খায়। ইদানীং দিলীপ সিং সেই কন্ট্রাকটারও আসে। সেই দুর্গাপুর এজেন্টদের বলে এখানে ফ্রিজ, আর কোল্ড ড্রিংসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওই পেপসী কোম্পানীই ব্যানার কাট আউট দিয়ে সাজিয়েছে ধাবাটাকে। দু-চারটে রঙিন বড় ছাতা—চেয়ারও দিয়েছে।

ভাদুরী বলে—সিংজী তোমার জন্যই ধাবার চেহারাই বদলে গেছে। সিংজী বলে—সার, তুমার জিন্দেগী ভি বদলে যাবে ভাদু।

ভাদুরীর দেহে এখনও যৌবনের ঢল ফুরোয়নি। মা হতে পারেনি সে। কপিল তাই যেন তাকে দূরে এই ধাবা করে সরিয়ে দিয়ে ওই মাতনকে নিয়েই রয়েছে।

কোথায় হেরে গেছে ভাদুরী। তাই সিংজীর কথায় বলে,

—কি বলছ সিংজী?

সিংজীও যেন স্বপ্ন দেখে, দেশবিভাগের সময় সে ছিল নিতান্ত ছোট। মা-বাবার সঙ্গে দেশ মুলুক ছেড়ে এসে পথে পথে ঘুরেছে। বাবা আজ নাই। মাও দিল্লির ওদিকে ভাইএর কাছে আছে।

দিলীপ সিং ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিল বাংলা মুলুকে ট্রাকের ড্রাইভার হয়ে। রাণীগঞ্জে কোন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে ট্রাক চালাতো। রাতের অন্ধকারে দুনম্বরী নানা মাল নিয়ে যাতায়ত করে। ক্রমশ দিলীপ সিং ওই কারবার থেকেই নিজেও হিস্যা নিতে থাকে। একটা ট্রাক করে তারপর নিজেই চালাতে থাকে। আমদানীও হয় ভালোই।

ক্রমশ একটা থেকে দুটো—তিনটে ট্রাক করেছে। এখন ক্রাশিং মিলও করেছে।

মালিয়াড়ার দিকে পাথর খাদানও চলছে তার। এতদিন থামবার সময় ছিলনা, পাগলের মত ছুটেছে সে টাকা, ব্যবসার পিছনে।

হঠাৎ সেদিন প্রথম ভাদুরীকে দেখে এক রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে। ওই রুক্ষ তাম্রাভ পৃথিবী, মাটির বুক থেকে তাত উঠছে। বাতাসে যেন আগুনের হল্কা উঠছে।

ওই তাপদগ্ধ পরিবেশ যেন দিলীপ সিংএর জীবনের মতই নিঃস্ব হতাশায় ভরা। তেমনি দিনে দিলীপ সিং দেখেছিল ওই ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশে। এগিয়ে এসেছিল মেয়েটি।

—জল দেব?

দিলীপ সিংএর মনে হয়েছিল তার শূন্য নিঃস্ব এই জ্বালাভরা শূন্য জীবনে ওই মেয়েটিই এনেছে স্নিগ্ধতার স্পর্শ। সেদিন থেকেই দিলীপ সিং ওখানে প্রায়ই আসে। ব্যবসার কথা বলে। দিলীপ সিংএর ট্রাক কয়েকটা এখানে আসে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ড্রাইভারই তাদের ট্রাক আনে এখানে।

খাওয়া-দাওয়া করে। ভালোই বেচাকেনা হয়।

দিলীপ সিংই বলে—ভাদু, পিছনে দুটো কামরা বানাও, উধার বসবে ড্রাইভাররা, দারু ভি পিবে। ভলো দামে বিলাতী মদ ভি বিচবে।

ভাদুরী প্রথমে রাজী হয়নি। কিন্তু পরে দেখেছে ভালোই রোজকার হয় ওতে। পঁচিশটাকার বোতল চল্লিশটাকায় পড়তে পায় না। সেই সঙ্গে মাংস-ডিমের বিক্রিও বাড়ে।

ভাদুরীব পোষাক-আশাকও বদলেছে। গ্রামেরই আট-দশজন ছেলেকে কাজও দিতে পেরেছে। তারও আমদানী মন্দ হয় না।

কপিল আসে, ভাদুরীই তাকে সেদিন বেশ কিছু টাকা দেয়। কপিল বলে—টাকা!

ভাদুরী আজ লোকটাকে যেন অন্য চোখে দেখে, বলে ভাদুরী

—তুমি টাকা দিলা ধাবা করতে শোধ দিতে হবো না? রাখো এটা। হাজার দশেক টাকাই দেয় কপিলকে। কপিল টাকাটা নেয। ভাদুরীই বলে —বাকী টাকা সামনের মাসে দোব।

কপিল এখানের খবরও রাখে। দেখে সে শুধু চালাঘর আর কিছু মালপত্র দিয়েছিল মাত্র। হাজার পনেরো বিশ টাকা হবে। এখন ধাবায় ওই পেপসী কোম্পানীর ছাতা—নানা আসবাবের বাহার এসেছে। ওদিকে রান্নার জায়গা পাকা করেছে। পিছনে ভাদুরী নিজের জন্য একটা ঘর করে সেখানেও সাজিয়েছে।

কপিল বলে—ওই খাদান মালিক দিলীপ সিং ইখানে আসে প্রায়ই!

ভাদুরী বলে—খদ্দের তো এমন কতই আসে যায়। ও আসে!

কপিল আরও কিছু বলতে চেয়েছিল এই প্রসঙ্গে। কিন্তু একটি পরিবার নিয়ে দুটো গাড়ি ঢুকেছে, নামছে বৌ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির লোকজনও।

এগিয়ে যায় ভাদুরী—আসুন দিদিরা, আসুন সাব, এ্যাই ননী জল দে এখানে, বসুন! কি দেব? ঠাণ্ডা—

ভাদুরী খদ্দেরদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কপিলের দিকে নজর দেবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই। টাকা দিয়ে আজ ভাদুরী যেন নিজেকে ওই লোকটার হাত থেকে মুক্ত করেছে অনেকখানি। ওর জন্য তেমন কোন বন্ধনই আর নেই। বাকী টাকাও সামনের মাসে মিটিয়ে দেবে।

ভাদুরীও কেমন বিচিত্র স্বপ্ন দেখে ওই দিলীপ সিংকে ঘিরে। লোকটা এসে যেন নীরব ধাবাকে সোচ্চার মুখর করে তোলে। ভাদুরীকে ওই বিশেষ পাঞ্জাবী টিকিয়া, তড়কা রান্না শিখিয়েছে।

ভাদুরী সেদিন নিজেই রেঁধেছে তড়কা। মশলা মেথিপাতা টম্যাটো দিয়ে মাখন দিয়ে "নিয়েছে তড়কা আর টিকিয়াও করেছে। আমচূর, রসুন, আদ্রক তাজা মশলা দিয়ে ধনেপাতা বেটে পুর দিয়ে ময়দার লেট্টি ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ওই গরম লেট্টি ঘিয়ে ফেলে তুলেছে।

দিলীপ সিং দুপুরে ফেরার পথে এসেছে ধাবায়। সকাল থেকে খাদানে ক্রাশিং মিলে ছিল। গ্রামে ধুলোয় বিবর্ণ। যখন খাটে তখন ওবা অসুরের মতই খাটে।

ওকে দেখে ভাদুরী বলে—এমা এযে ধুলোয়-ঘামে একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেছ গো। একটু বসে যাও, আমার ঘরেই বাথরুমে চান করে নেবে। আজ দুপুরে এখানে খেয়েই যাবে।

সিংজীর খাবারও ঠিকানা নাই। তবু বলে.

—আবার তোমাকে তক্‌লিব দেবে। আরে ক্যাম্পে গিয়ে নেয়ে ধুয়ে খেয়ে নোব। এক গ্লাশ লস্যি দাও. খেয়ে পাড়ি দিই।

—না, যেতে পাবেনা। আজ আমি তোমার জন্য নিজে রেঁধেছি।

খেয়ে যেতে হবে। ভাদুবী ওকে যেন এবার জোর করেই বলে কথাটা। সিংজী দেখছে ভাদুরীকে। এমন জোরকরে কেউ ডাকে কথা বলেনা। বরং খাদানে মিলে—অন্যত্র সেইই লোককে ধমকায়। তাই বলে সিংজী,

—ঠিক হ্যায় বাবা, খেয়েই যাবো হামি।

ভাদুরী ওর ঘরের লাগোয়া বাথরুমে নতুন সাবান তোয়ালে একটা নতুন লুঙ্গিও রেখেছে। বলে,

—যাও চান করে নাও। আমি ওঘরেই খাবার নিয়ে যাচ্ছি একটু পরে । ওঠো।

ভাদুরী ঘরটাকেও আজ যেন বিশেষ করে সাজিয়েছে। বিছানায় নতুন চাদর পেতেছ। জানলায় পর্দাও রয়েছে। বাথরুমেও ওইসব দেখে খুশি হয় দিলীপ সিং!

এমন ঘরের আহ্বান সে অনেক দিনই শোনেনি। কোন মেয়ের এমন একান্ত সেবাও

পায়নি। দিলীপ সিংএর ব্যর্থ বঞ্চিত মন আজ যেন এক নতুন অনাস্বাদিত জগতের স্বপ্নই দেখেছে। খাবার দেখে খুশি হয় দিলীপ সিং

—আরে একদম ঘরকা খানা! ব্যাস! মজা আগিয়া!

তৃপ্তি করে খাচ্ছে সে। ওই তড়কা, টিকিয়া আর টক দই। এ যেন শৈশবের সেই ঘরের স্মৃতিই মনে পড়ে তার।

ভাদুরী বলে—এর পর একদিন চাপাটি সর্ষের শাক খাওয়াবো। সর্ষোকো শাক। বাহ! সিংজী খুশিতে একপাক ভাংড়াই নেচে নেয় ভাদুরীকে জড়িয়ে ধরে।

—ও বোলে বোলে—

ওই বলিষ্ঠ পুরুষটির নিবিড় স্পর্শে সারা দেহমনে কি যেন উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায় ভাদুরীর, জীবনে কপিলকে নিবিড় করেই পেতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু সেই স্বপ্ন তার ব্যর্থই হয়ে গেছে। কপিল মাতনকে পেয়ে তাকে আর কাছেও টানেনি। নির্মমভাবে প্রত্যাখানই করেছে। এই প্রত্যাখ্যাত হয়েই কাটাতো ভাদুরীর সারা জীবন।

কিন্তু আজকের এই পরিবর্তনের যুগে ভাদুরী গ্রামের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে এই ধাবার দোকানে বসে বাইরের অন্য এক জগতকে দেখেছে। সেই জগতে আজ সে নতুন করে বাঁচার পথ পেয়েছে।

সিংজীর চোখে দেখেছে সেই আহ্বান।

ভাদুরী বলে—কবে ফের আসবে সিংজী?

দিলীপ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—দিল চায় রোজই আসবে।

লেকিন কাম ধান্দা মে ফাঁস যাতা, তবু দু-তিন রোজের মধ্যেই আসবে। হ্যাঁ মকাই কা রোটি আর সর্ষো কি শাক মৎ ভুলনা।

ভাদুরী তব্ চোখ কি বিচিত্র হাসির ঝিলিক এনে বলে,

—শুধু খেতেই আসো নাকি গো?

সিংজী বলে—তোর টানেই আসে ভাদুরী।

—ভুলে যাবে না তো আবার?

সিংজী ওকে কাছে টেনে নেয়। ভাদুরীর মনে কি সুরের আবেশ। আজ যেন ওই বলিষ্ঠ পুরুষের আহ্বানে নিজেকে নিঃশেষ সমর্পণ করে সে খুশি হতে চায়।

সেই দুর্বার আকর্ষণেই আসে দিলীপ সিং। এবার সেও স্বপ্ন দেখছে ওই ভাদুরীকে নিয়ে। একদিন বলে সিংজী।

—তোকে সাদী করবে ভাদুরী। ঘর বসাবে!

ভাদুরী চমকে ওঠে। সেও নতুন করে বাঁচতে চায়।

কপিল রাতের অন্ধকারে দেখেছে মাতনও চলে গেল গুণময়ের সঙ্গে। আজ ব্যর্থ-বঞ্চিত কপিলের মনে পড়ে ভাদুরীর কথা। সেই ভাদুরীকে সরিয়ে দিয়েছিল ওই মাতনের জন্যই। ভুলই করেছে সে। এখন সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তই করবে সে। ভাদুরীকে নিয়েই ঘর বাঁধবে আবার। সেই দিনগুলো ছিল অনেক শান্তির। সেই দিনের স্বপ্ন নিয়ে চলেছে কপিল আবার ভাদুরীর কাছে।

এই মদের কারবারই আর করবে না। এখন সে ওই ভাদুরীর সঙ্গে নতুন করে ঘর বেঁধে এবার ধাবার ব্যবসাই করবে। গুণময় বাবুদের ব্যবসাতে আর নেই সে।

কপিল আসছে দূর থেকে পথের উপর ধাবার আলোটা দেখা যায়। লাল-নীল অলো জ্বলছে গাছে, নীচে বসার জায়গাতেও আলো। ওদিকে অনেকগুলো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভার ক্লিনাররা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে। বেশ জমজমাট হয়ে আছে। এত রাতেও ওই ধাবা।

কপিল এসে উঠলো ধাবায়।

রাত তখন অনেক। আগে এখানে সন্ধ্যার পর নামতো বনভূমি, প্রান্তরে আদিম আরণ্যক অন্ধকার। শিয়াল হুড়ারদের ছিল বিচরণ ক্ষেত্র। এখন মানুষ সেখানে নতুন দিনের পরিচয় চিহ্ন একে দখল নিয়ে আলোয় সেই অন্ধকারকে মুছে দিয়েছে।

দোকানের ক্যাসে একজন কর্মচারী বসে আছে। গ্রামেই ছেলে, খরিদ্দারদের ভিড়ও রয়েছে। রাতেই ভিড় জমে বেশি।

ছেলেটা কপিলকে চেনে।

কপিলই শুধোয়—ভাদুরী কোথায় রে?

ছেলেটা জানায়—ওই দিকে, ওর নিজের ঘরেই রইছে।

কপিলের মনে হয় ভালোই হলো। ওকে এই ভিড়ের মধ্যে কিছু বলা যেতো না। ওর ঘরে বসে নিভৃতে কপিল আজ ক্ষমা চেয়ে নেবে ওর কাছে। আবার সে আসবে এখানে। তাদের ঘর গড়াবে নতুন করে তারা দুজনে। মাতনের কথা সে ভুলে যাবে। গুণময়দের কথাও।

এই দিকটা নির্জন। দু-একটা পুরোনো মহুয়া গাছ এখনও রয়েছে। এখন পাতা ঝরার দিন। পত্রহীন ডালে মহুয়া ফুলগুলো ফুটেছে। কিছু ঝরেও পড়েছে হলুদ রসালো ফুলগুলো। ওদের মিষ্টি সুবাসে বাতাস ভুর ভুর করছে, যেন নেশা লাগায় এই বাতাস।

কপিল এসে ঘরের বাইরে দাঁড়ালো।

এখানে জানলায় ঘষা কাঁচ লাগিয়েছে ভাদুরী। ভিতরে আলো জ্বলছে। ভাদুরীর হাসির শব্দ কানে আসে। ওই মিষ্টি হাসি যেন কপিলের মনে কি সুর আনে।

—ভাদুরী! ভাদুরী! ডাকছে সে চাপা স্বরে দরজায় টোকা দিয়ে। ভিতরে ভাদুরী বোধ হয় শুনতেইপায়নি। হঠাৎ দেখে কপিল কাচের জানলায় ভাদুরীর দেহের রেখা

গুলো ফুটে উঠেছে। খোলা চুল পিঠে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওই দেহটাকে মত্ত আলিঙ্গনে যেন আর একটা বলিষ্ঠ ছায়া মূর্তি পিষে ফেলতে চায়।

চমকে ওঠে কপিল, তার স্ত্রী—সেই দখলদারী মনই যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। জোরে ধাক্কা দেয়। এ্যাই ভাদুরী! এ্যাই—

ভাদুরী ডাকটা শুনেছে এবার। ওই গলা তারও চেনা।

সেই কপিল অপদার্থ বেইমান মানুষটা এসেছে রাতের গভীরে তার কাছে!

ভাদুরী দরজাটা খুলতে যাবে। দিলীপ সিংও ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করেনি। সে জানে ভাদুরী এখন তারই, তাই বলে সে।

—যানে দো!

ভাদুরী আজ এর একটা হেস্ত-নেস্তই করতে চায়। তাই দরজাটা খুলে দাঁড়ায়। কপিল দেখে ভিতরে দিলীপ সিংকে। কপিল গর্জে ওঠে

---ইসব কি হচ্ছে?

ভাদুরী এবার বলে—তাতে তুর কি? তোর টাকা সব ফেরৎ দিছি। সেদিন থেকেই তোর সঙ্গে ছোড়ছাড়ও করে নিয়েছি। এখন আমার যা খুশি তাই করবো। সিংজীকেই বিহা করছি শুনে রাখ।

চমকে ওঠে কপিল। সিংজীকে সেও বিলক্ষণ চেনে। তার তুলনায় কপিল তুচ্ছ নগণ্য একটা বাতিল মানুষ। তবু বলে কপিল

—ঘরে বৌ—

হাসে ভাদুরী—ঘরে বৌকে কি দিয়েছিলি? ঘর-সুখ না ছেলে—কিছুই দিসনি। খেটেই খেয়েছি! তুই মাতনের নেশায় আমাকে দূর করেছিলি। এখন আমি তোর কেউ লই। তুইও আমার কেউ নোস। সব শেষ হয়ে গেছে।

কপিলের মুখের ওপব কথাগুলো স্পষ্টভাবে শোনায় ভাদুরী।

কপিল ভাবতেও পারেনি যে কোন বৌ তার স্বামীর মুখের ওপর এইসব কথা শোনাবে! আগে তাদের গাঁয়ে ঘরে মেয়েরা সব অত্যাচার সহ্য করেও চুপ করে থাকতো।

আজ এই শান্ত গ্রামের দিন বদলেছে। বদলাচ্ছে সেই গ্রামীণ মানুষের স্বভাবও বাইরের সভ্যতা, স্বাধীনতার ছোঁয়ায়।

কপিল বলার চেষ্টা করে—শোন—

ভাদুরী কঠিন স্বরে বলে শোনার আর কিছুই নাই। যা বলার বলেছি তুই যা এবার, আর কথাটা মনে রাখিস। আমি এখন সিংজীকেই বিয়ে করেছি।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয় ভাদুরী। আজ সে এতদিন পর ওই অপদার্থ বেইমান লোকটার মুখের মত জবাব দিতে পেরেছে। সিংজী সব শুনেছে। এবার সে

ভাদুরীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে

—ঠিক বোলা!

কপিল কি ভাবে ফিরেছে তার সেই জঙ্গলের ডেরায় তা জানেনা। আজ সে ফিরে এসে তাজা দুটো পাইট গলায় ঢেলে বসে আছে।

ভাদুরীও আজ হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সে আজ তার চেয়ে অনেক বড় একজন মানুষকে পেয়েছে।

কপিলের সেখানে আর কোন ঠাঁইই নাই।

তার একমাত্র পথ ওই মাতনই। মাতনের জন্যই হারিয়ে গেছে ভাদুরী তার জীবন থেকে, মাতনকে ছাড়তে পারবে না। মদের ব্যবসা করে সে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে। আসানসোলের কোন চোলাই ভাটির মালিক হরদয়ালজীও তার খুব চেনা। সেইই বলেছিল তাকে

—আমার ভাটিতে আ যাও কপিল, ব্যাস—আর মাসে পাঁচ হাজার টাকা তস্কা দিবে।

কপিল সেদিন মত দেয়নি। এবার সেখানেই চলে যাবে।

তার নিজেরও কিছু টাকা আছে। মাতনকে নিয়ে ওই দিকে গিয়ে সে সেখানে নিজের ভাটিই চালু করবে।

তার হাতের তৈরি মালের সুনাম আছে। মাতন সঙ্গে থাকলে তার ব্যবসাও জমে যাবে। সে মাতনকে নিয়েই চলে যাবে এখান থেকে। ভাদুরীর কথা ভুলে যাবে।

মাতন এখন অন্য জাগতের স্বপ্ন দেখে।

শেঠজীও রূপের কদর দিতে জানে। রাতের মহফিলে আজ এসেছে সহরের বড় একজন অফিসার, কোন মহান নেতা। গুণময় জানে ওদের খুশি করতে পারলে শেঠজীর লাভ তো হবেই, আর সেই সঙ্গে গুণময়ও অনেক কিছু পাবে। বিশেষ করে ওই নেতাকে হাতে রাখা দরকার। কারণ সামনের ভোটে দাঁড়াতে গেলে ওর মদত চাই। কলকাতাতেও তার বেশ হাত আছে প্রদেশ কমিটিতে। শেঠজীও খুশি।

মাতনের কাছে এসব যেন নিছক একটা খেলাই।

সে নিপুণভাবে সেই খেলাই খেলে চলেছে মনের সব জ্বালাকে চেপে রেখে। সে চিনেছে ওই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী শ্রেণীকে। তারা চেনে শুধু টাকা আর চায় সব কিছুকেই দখল করতে।

মাতন সেই অভিনয়ই করে চলে।

রাত ভোর হচ্ছে। এবার ক্লান্ত সবাই।

গুণময় মাতনকে নিয়ে বের হলো সেই আস্তানায় পৌছে দিতে। তখনও আলো

ফোটেনি।

বনে বনে আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। বাতাসে শেষ রাতের স্নিগ্ধতার বুকে বনের মহুয়া ফুলের সুবাস ওঠে।

গুণময় বলে—'আজ শেঠজী খুব খুশি হয়েছে, তোকে ওর খুব ভালো লেগেছে তাই আবার যেতে বলেছে। আর এটা রাখ।

পাঁচশো টাকা দেয়। মাতন এখনও অভিনয় করে।

—মাইরী!

নোটগুলোও দেখে শাড়ির আঁচলে বাধে। গুণময় ওকে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আদর করে বলে—চলি।

চলে যায় সে। মাতন দেখছে ওকে। ওই মানুষগুলোর মনের অতলের সব খবরই তার জানা হয়ে গেছে। হঠাৎ কার ডাকের চাইল মাতন।

কপিল এগিয়ে আসছে। টলছে নেশায়।

মাতন বলে—ইকি! রাতভোর নেশাই করছো, ঘুমোও নি?

কপিল দেখেছে গুণময়বাবু ওকে আদর করছে। কপিল বলে

—তোর সঙ্গে কথা ছিল মাতন! জরুরী কথা।

মাতন ফুঁসে ওঠে রাতভোর লোকের কথাই শুনি আর কি? এখন যাও তো। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। কথা-টতা পরে হবে।

আধ আদুড় গা—শাড়িটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। নিটোল পুরুষ্ট উদ্ধত বুক—সোচ্চার দেহের রেখাগুলো। যৌবনের মত্ততা ছড়িয়ে মাতন গিয়ে ওর ঘরে ঢুকে ওই অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে!

কপিল দেখছে।

এবার সে মাতনকেই দখল করবে। ওকে এদের হাত থেকে নিয়ে পালাবে অন্যত্র। এখানে আর নয়।

চন্দন সেই যে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে আর তার কোন খবরও কেউ পায়নি। বুড়ো অতুল কামার এখন বিপদে পড়েছে। চোখেও তেমন দেখতে পায় না। বুড়ো বুড়ির সংসার তাও অচল প্রায়।

টগর তবু আসে এখানে মাঝে মাঝে। এখন তার ব্যবসা আরও বেড়েছে। সে আরও কয়েকটা গরু কিনেছে। একটা ভ্যানও কিনে রোজ ভোরে সেই ভ্যানেই বড় বড় ক্যানে দুধ পাঠায় দুর্গাপুরের কোথায়।

এছাড়া বাড়িতে গোবর গ্যাসের প্লান্ট বসিয়েছে। তাতেই আলো জ্বলে, রান্নার কাজও হয়, আর প্ল্যান্টের গোবরে মাঠে সারের কাজও হয়। ধান জমিও কিনেছে।

গরুর খাবার ভূষি, কুঁড়ো, খড় নিজের চাষেই উৎপন্ন হয়।

গ্রামের কয়েজন লোক ওর ওখানে কাজকর্ম করে।

তবু মাস কাবারে কমলের দোকান থেকেই অতুলদের সব জিনিষপত্র, যায় চাল ডাল-মশলা—তেল সব ওদের ওখানে পৌছে যায় টগরের খর্চায়।

নিজেও যায় টগর খোঁজ নিতে।

—কেমন আছো গো কাকিমা! কাকা কোথায়?

অতুল এখনও টুকটাক মাটিব পুতুল গড়ে। অতুলের গিন্নী বলে

—তুই আর জন্মে আমার মেয়েই ছিলি রে

অতুল বলে—আর এ জন্মে? ছেলেরও বাড়া। সোমথ ছেলে বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে চলে গেল। খবরও নেয়না! বেঁচে আছি কি নাই। তুই তবু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিস মা।

টগর বলে-কোতায় গেল চন্দন?

অতুল বলে—তার কথা আর বলিস না রে। সে ছেলে লয় শত্তুর। এক নম্বর বেইমান। নাহলে এমনি করে সবাইকে ফেলে পালায়।

চন্দনের মা বলে—ওগো, দেখবে সে ঠিক ফিরে আসবেই!

—সে শালার ব্যাটার মুখদর্শনই করবো না। অতুল রাগে ফুঁসছে।

তবু টগর আসে এখানে কিসের টানে। শালের চারিদিকে এখন বনজঙ্গল গজিয়েছে। এদিকটা এখন শূন্য পবিত্যক্ত। তবু টগর না এসে পারে না। এখানে এলে সে যেন চন্দনের স্পর্শ পায়।

হঠাৎ মাতনকে দেখে চাইল টগর।

মাতন বনের দিক থেকে গ্রামে হাটবাজার করতে আসে ওই পথ দিয়েই।

টগরকে সেও চেনে। জেদী মেয়েটি এখন নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে গ্রামের একজন হয়ে উঠেছে।

টগরই বলে—কিরে কেমন আছিস?

মাতন বলে—আমাদের আর থাকা! শ্যাল-কুকুরের টানাটানিতে জান লবে জান হয়ে গেল দিদি। তাই মনে হয় এর নাম বাঁচা? এর থেকে বেরুবার পথও জানিনা গ! ই যেন সেই মহাভারতের অভিমন্যুর চক্রব্যূহ গো। গিলে ফেলে শেষ করে দিবেক।

টগরও ভাবছে কথাটা।

দেখেছে সে কত অসহায় মেয়েকে নীরবে মুখ বুজে ঘরে বাইরে কত অত্যাচার-অবিচার সয়ে চলেছে। আজ সমাজ বদলেছে কিন্তু মেয়েদের উপর পুরুষদের দখলদারি আর অত্যাচারের দিন শেষ হয়নি।

মাতন বলে—উদের দখলে হাত দিলে ওরা তা সইবেনা। শেষই করে দেবে।

টগরও দেখেছে ওই মণিকাদিকে। প্রদীপ-কেদার-বরুণদের গড়া সমবায়কে তুলে দিয়েছে। ওদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে এই পথেই সেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে থামিয়ে দেবে ওরা।

মাতন বলে—এতদিন ছিল কমলবাবুর রাজত্ব এখন এয়েছে ওই শেঠজী। একা রামে রথে নাই সুগ্রীবদোসর। দু'জনে ই'খানের সব কিছু গিলে ফেলাবেক, আর উদের ডান হাত ওই গুণময়বাবু!

টগরও শুনেছে সবই। অনেক খবরই সে পায় বাসন্তীর কাছে।

ওই বরুণদার স্ত্রী। আর মাঝে মাঝে আসে সুখদা ঠাকরুন। টগর ওই বুড়িকে আধসের করে দুধ দেয় রোজ।

সুখদা বলে—দুধের দাম কোথা থেকে দোব লা ছুঁড়ি। এ্যা—রোজতো দুধ পাঠাস!

টগর বলে—ঠাক্‌মা, নাতনীর ঘরের বাড়তি দুধ একটু পাঠাতে দিবা নাই? দামের কথা তুলছ কেনে?

সুখদা অবাক হয়—সি কিলা? রোজ দুধ দিবি?

হাসে টগর-না হয় দিলমই।

সুখদাই বলে—না তুই তেজী দাপুটে মেয়ে আছিস লা। বুঝলি। মেয়েদের চোপাও চাই। নালে এই সুদ ঠাকরুনকে কবে ফৌত করে দিত।

টগর বলে—তা আছে বাপু তেমার! দারোগা মায় ম্যাজেস্টর অবধি তোমাকে ডরায়। পুইশাক সে যা করলে—

বুড়ি দাঁতপড়া মাড়ি বের করে হাসে। বলে

—ছাড় ওসব ছেলেমানুষীর কথা। গোবিন্দ বলছিল এখন মেয়েরাও ভোটে দাঁড়াতে পারে। মেয়েদের হয়ে কথা বলার কেউ নাই। তুই বাপু ভোটেই দাঁড়া। মেয়েদের ভোটেই জিতে যাবি তুই। সহরে গে বলবে মেয়েদের কথা—তাদের কষ্টের কথা।

টগর শুনছে কথগুলো।

জীবনে তার উপর আঘাতও কম হয়নি। শ্বশুর ঘর থেকে চলে আসায় সমাজ তাকে একঘরে করেছিল। তার ব্যবসাতেও ঘা দিয়েছে কতজন। মাঝে মনে হয়েছিল হেরেই যাবে সে। কিন্তু সে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে লড়াই করে আজ মাথা তুলেছে। অনেকের কথাই ভাবে সে। তাই সুখদার কথায় বলে

—ওরে বাবা! ভোটে দাঁড়াবো?

—হ্যাঁ! তুই ওই কমল, গুণধরের তুলনায় অনেক খাটি সোনা। আমি নিজে বলছি সবাইকে। মাথা জোর করে তুলতে হয় বুঝলি!

টগর কথাটা ভাবছে।

সে দেখেছে কমল, গুণধরদের অনেক কীর্তি। মাতনের কথায় সেই যন্ত্রণার সুরই

ফুটে ওঠে। আজ মেয়েদের মধ্যেই আসবে প্রতিবাদ। তারাও এগিয়ে আসবে সুস্থ জীবনকে গড়ার কাজে।

মণিকাও দেখেছে প্রদীপরা এবার ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষও তাদের যথাসাধ্য দান করছে। বরুণ-প্রদীপ-কেদারের দল এখন মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁচেছে তাদের নিঃস্বার্থ সেবার জন্যই।

হাসপাতালের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

মেয়েরাও এখন দুপুরে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের বাড়িতে সমবেত হয়। এখন হরিপ্রিয়া ঠাকরুনের নাতি বিজয় কিছুটা সুস্থ হয়েছে, হরিপ্রিয়া এবাব ওর বিয়ের কথা ভাবছে।

সেই সঙ্গে ভাবছে এবার হরিপ্রিয়া অন্যকথাও। একদিন ধরে সে মানুষের অনেক কিছু লুঠ করেছে। এবার মনে হয় তাদের অভিশাপেই বিজয় পাগল হয়েছিল। এখন আবার কিছুটা সুস্থ হতে সে এবার এখানের মানুষদের জন্য কিছু করতে চায়।

মণিকাও আসে এখানে।

সেদিন হরিপ্রিয়াই বলে— প্রদীপকে একবার আসতে বলো।

হাসপাতালে এক্সরে কেনার টাকা আমিই দোব।

সুখদা বলে—তা দাও। তবে এবার ভোটে ওই কমলদের হারাতেই হবে। মেয়েদের একজনকেই দাঁড় করাতে হবেক।

হরিপ্রিয়া অবাক হয়— সেকি!

মণিকাই বলে— কেন হবে না ঠাক্‌মা? দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আর তাদের উপর অত্যাচার তো কম হয়নি, তারা কি এসবের প্রতিবাদ করবে না এখনও!

বাসন্তীও আসে এখানে।

সেও দেখেছে ওই কমলবাবুদের শয়তানি। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আন্দোলনকে ওরা পিষে দিতে চায়। বরুণদের ওরাই চোর প্রতিপন্ন করেছে।

তাই বাসন্তীও বলে—এর প্রতিবাদ করতেই হবে। কিন্তু কাকে দাড় করাবে এখান থেকে?

সুখদা ঠাকরুন তখনই নামটা প্রকাশ করে না। বলে

—সে লোক ঠিকই পাবে এখন থেকেই মেয়েদের মধ্যে কথাটা প্রচার করতে হবেক। মণিকা স্কুলের অনেক গ্রামের মেয়েদের চেনে। তাই বলে

—সেটা হয়ে যাবে।

কমলবাবু, গুণময় আরও অনেকেরই এখন ক্রাশিং মিল চলছে, পথের খাদানেও

কাজ চলছে পুরোদমে। বৈকালের দিকে খাদানের কুলিদের হঠিয়ে দিয়ে সেখানে পাথরের বিভিন্ন স্তরে ডিনামাইট লাগিয়ে পাথরে স্তরে ব্লাষ্টিং করা হয়।

কেঁপে ওঠে গ্রামের বাড়িগুলোও। বুম-ম্ ম্—শব্দগুলো বনে-প্রান্তরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। ওই পাথর তুলে নিয়ে গিয়ে ক্রাশিং মিলে নানা সাইজে ভাঙ্গা হয়।

তারপর পাহাড়প্রমাণ সেই টুকরো কোনটা ফাইভ এইট, কোনটা থ্রি ফাইভ. কোনটা কোয়াটার বাকী সব চিপ্‌স হিসাবে আলাদা করে আলাদা দামে বিক্রি হয়। চালান যায়। মায় পাথরে ধুলো অবধি রাস্তার ঠিকাদাররা ভালো দামে তুলে নিয়ে যায়। শেঠ পিয়ারীলালেরও দু-তিনটে ক্রাশিং মিল চলে।

এখন কাঁসাশিল্প অবলুপ্ত প্রায়, সেই শ্রমিকরাই অনেকে ওই ক্রাশিং মিলে কাজ করছে। এছাড়া পাথর-খাদানে-মিলে কাজের জন্য লোকের দরকার। নগদ মজুরিও পায়।

পঞ্চায়েতের টাকাও আসে। বিশেষ করে এদিকে গ্রীষ্মকালে ক্ষেতমজুরদের কাজ থাকতো না। তার জন্য সরকার থেকে লাখ লাখ টাকার গম, কিছু টাকাও বরাদ্দ থাকে।

রাস্তাঘাট-পুকুর দিঘি ছোট জলাধার সংস্কারের কাজ শুরু হয় তখন গুণধর এখন তার সুযোগ্য ভাইপো বাদলকেই ঠিকাদার বানিয়েছে. আর গতিলাল তার সহকারী মুন্সী। ওরাই লোক লাগিয়ে মোবাম, পাথরের ধুলো তুলে এনে রাস্তা বানায়। দিঘির কাজ করায়।

সেখানে কাজ অর্ধেকও হয় না। মাটি কাটার মাঝেও কারচুপিটা শিখে ফেলেছে গতিলাল। ওভার শিয়ারকেও কি ভাবে খুশি করিয়ে বিল পাশ করতে হয় শিখে গেছে।

মজুর এখন মেলেনা। সবাই খাদানে মিলে না হয় দুর্গাপুরে কাজ করতে যায়। তবু তিরিশজন মজুর লাগিয়ে গতিলাল ডান আঙ্গুল, বাঁ আঙ্গুলের টিপছাপ দিয়ে পঞ্চাশ জন মজুরের মজুরি বের করে নেয়।

মাঠে কিছু কাজ হয়, যোড়ে এখন গ্রীষ্মেও কিছু জল থাকে। ওই জল দোনীতে করে তুলে আখ. আলু, কুমড়ো, গম কিছু চাষ হয়।

কিন্তু বাড়তি মজুর মেলেনা। চাষের সময় জমিতে চারটে চাষ দিতে লাগে। বীজতোলা তৈরি করে, বীজধান ফেলতে হবে। তারপর রোয়া-পোঁতা আছে। তখন সারা মাঠে সকলেই চাষে নামে। আর চাষের সময় সীমাও নির্ধারিত। কথায় বলে

শ্রাবণের পুরো ভাদরের তেরো।

এর মধ্যে যতো পারো।

অর্থাৎ ওই সময় সীমার মধ্যে চাষ শেষ করতেই হবে। তার পর ধান পুতলে আর কিছুই হবে না।

তখন মজুরের বেশি দরকার। কিন্তু তারা তো ওইসব কাজে ব্যস্ত। রোদে-বৃষ্টিতে

পুড়ে-ভিজে কাজ করার লোক নাই। শরৎ ভটচায, সতীশ চাটুয্যে, গোবিন্দবাবুদের মত চাষীদেরই মুস্কিল। বাড়তি মজুর মেলেনা।

শবৎ ভটচায বলে—শালা দুগ্গোপুর হয়ে ছোটলোকেরই রমরমা হলো। আর আমাদের এতকালের চাষবাস এবার শিকেয় উঠবে।

তখন মজুররাই ঘুরতো কাজের আশায়। এখন সেই দিনই বদলেছে। এখন জমির মালিকদেরই কাজের জন্য তাদের পিছনে ঘুরতে হচ্ছে। তারাও বলে

—উ চার পাই ধান আর একসের মুড়িতে আর হবেক নাই ঠাকুর। তিরিশ ট্যাকা নগদ দিতে হবেক। তবেই আটটা থেকে চারটে অবধি খাটবো, মাঝে দুঘণ্টা খাবার ছুটি।

ওরাও এবার আইন মোতাবেক কাজের কথা বলে, কারণ মিলে-খাদানে ওদের আট ঘণ্টা ডিউটি। তার বেশি কাজ করলে বাড়তি পয়সা দিতে হবে।

এবার সমস্যা দেখা দিয়েছে ভদ্রচাষীদের। যারা নিজেরা জমিতে কাজ করে তারাই চাষ ঠিকমত করতে পরছে। কারণ বর্ষার সময় মাঠে তাদেব পরিবারের সকলেই মাঠে নামে। চাষের কাজ করে।

কিন্তু যারা বাড়িতে মুনিষ মাহিন্দার রেখে গরু-বলদ রেখে চাষ করে তাদেরই হয়েছে বিপদ। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। শরৎ ভটচায, সতীশ চাটুয্যে, মায় হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও এবার ভাবছে কথাটা। গোবিন্দবাবু বলেন

—জমিজায়গা শেষে বিক্রিই না করতে হয়।

শ্রমিকদের দিন ঠিকই চলছিল, আর এবার তাদেরও চাহিদা বাড়ছে। কারণ রোজগার যেমন বাড়ছে তেমনি খর্চাও বাড়ছে। দুই দিক আর মেলানো যাচ্ছেনা।

তাই তাদের দাবী ওঠে মজুরি বাড়াতে হবেক।

তাই নিয়ে মাঝে মাঝে মিলের ম্যানেজার খাদানের ম্যানেজারদের সঙ্গে বাদানুবাদও শুরু হয়।

গুণময়-কমলবাবুরা শোনে কথাটা। শেঠজীও এসেছে অঞ্চল অফিসে। তার খাদানেও সেদিন কয়েকজন শ্রমিক নাকি মুন্সীকে মারধোরও করেছে।

এবার ফটিক নিরাপদের দলও বুঝেছে যে কাঁসার সেই সমবায় তারা তুলে দিয়েছিল গুণময়-কমলবাবুর কথাতেই। তারপর তাদের এই খাদানে কাজ দিয়েছিল।

কিন্তু এখানে এসে বুঝেছে রোদে-বৃষ্টিতে এখানের কাজ খুবই কষ্টের। দিনরাত ক্রাশিং মিলের মিহিধুলো জমছে ওদের বুকে। পাথরের ব্লাষ্টিংএর সময় পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সেবার জামবেদের কেষ্টতো ছিটকে আসা পাথরে টুকরোর ঘায়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। নিরাপদও এখন খক খক্ করে কাসছে। জ্বরও হচ্ছে।

হে সময়। হে সময়। যুগ। মহাকাল।

আমায় ফেরাও। ফেরাও। ফেরাও।

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুয়ে চুয়ে পাঁচটা বছর এইভাবে কেটে গেছে। এইভাবে কেটে যেতো আরো বহু পাঁচবছর। যেভাবে কেটে যায়। স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলায় খেলায়। কিন্তু সময় তা কাটতে দেয় না। ছেদ টেনে দেয়। যতিচিহ্ন বসিয়ে দেয়। পর্দার আড়াল টেনে দেয়। সে চিৎকার করতে চেয়েছিল হৃদয়খোলা। পৃথিবীদীর্ণ চিৎকার। আর্তনাদ। হৃদয়বিদারক আত্মবীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অরুণাচল থেকে আসা চিঠিটা দর্পণের মতো সামনে ধরে রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল সুমন্ত। পুরস্কৃত কবি সুমন্ত। মিডিয়া সেটা প্রচারও করেছে। যখন ভিখিরি ছিল, মিডিয়া তখন ছ্যা ছ্যা করতো। যখন স্মাগলার হলো, তখন মিডিয়া এসে সুকতলি অবদি ছবি তুলল।

সেই খ্যাতির এভারেস্ট জয় করতে করতে উঠে আসা।

জয়ের শঙ্খনিনাদ।

উলুজোকার।

মাঘমাসের পাঁচ তারিখে গায়ে হলুদ।

হলুদ তাকে মাখতেই হবে। মণিমালার বাসনা। মিসেস ভাটের অনুরোধ।

পাঁচ হাজার মানুষের আপ্যায়নের মহাসমারোহ।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাজেট করে বসে আছেন মিঃ ভাট। জর্মন থেকে প্রচুর টাকা ব্যয়ে ছাপিয়ে আনা হয়েছে বিয়ের কার্ড।

এখন কদিন বাকি আর?

নদিন। নদিন আর কতটুকু সময়?

একটু একটু করে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে, অভিমান করতে করতে, খুনসুটি করতে করতে, আনন্দের, স্মৃতির পাতা উলটে পালটে দেখতে দেখতে মণিমালার বড় হয়ে ওঠার ইতিহাস। সেই কিশোরী থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি! রূপ দেখে তোর দিন কাটে সই/এতই কাছে চোখ বুজে ছুঁই/তবুও ছোঁয়া হয় না/মনের এ পাপ অশ্রুতে ধুই/সুধার ভাণ্ড বক্ষেতে থুই/ভাণ্ড যে কথা কয় না! কয় না।

সত্যিই কয় না।

অপেক্ষা এখন পাঁচই মাঘের। এসো পূর্ণ করো বলে দু বাহু ছড়িয়ে আবাহন তার।

আবাহন তারও। যেমন করে সে ছুঁতে চায়। তুমি ছুঁতে চাও।

দুটি চিঠি পাশাপাশি তার সম্মুখে।

একটা অ্যারোগ্রাম। ফ্রম অরুণাচল। কোনো ঠিকানা নেই। কেন ঠিকানা নেই ক্যানো?

অন্য চিঠিটি জর্মন প্রিন্টেড পাঁচই মাঘের চিঠি। প্রথমটি সাদামাটা। দ্বিতীয়টি ইন্টারনেটের যুগের সর্বোচ্চ দেমাগে অহংবৃত।

অ্যারোগ্রামের ভেতরটাতেও দুটি অংশে বিভাজিত। চিঠির নীচে কচি হাতে তিনটি লাইন। পৃথিবীর কোনো ডটকম্, কোনো ইন্টারনেট এই হৃদয়াবেগ সৃষ্টির ধারেকাছে আসতে পারে না। পারা সম্ভব নয়। লাল নীল আর হলুদ পেন্সিলে লেখা ঃ

বাপুজি গো। আমি সায়ন্তী। পাঁচ বছর তিন মাস।
আমি মনে মনে রোজ তোমায় ডাকি। তোমার ছবির
সঙ্গে কথা বলি। মা খুব কাঁদে যে। তোমাকে আমি
হাজারটা চুমু খাবো। ভালো থেকো। ভুলো না যেন।
তোমার সানু।

হু হু করে কাঁদে সুমন্ত। আশ্চর্য এই যে। শয়তান এমন করে কাদে? নিষিদ্ধ গন্ধমের দিকে হাত বাড়িয়ে শয়তান যখন স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এসেছিল, সেই দুঃখে কি কেঁদেছিল শয়তান?

কে জানে সেকথা! এখন সে অসম-সময়ের জগদ্দল পাহাড় মাথায় নিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদে।

মনের ভেতরে গুঞ্জরিত হয়, সানু। সানু। সানু। এইভাবে বিড়বিড় করে। অনেকটা সস্তা সিনেমার নায়কের মতো। একসময় তো কবিতা ছিল তার প্রাণ। কাব্যময়তাও। কোন্ স্মৃতির অপরিমেয় ভালোবাসার ঢেউ ছুটে আসে। এখনোও! কাশফুলের খেলা তো দেখা আছে তার।

সেই সিরাজগঞ্জের বড়পিয়ারীর চর। অথৈ যমুনার কুলকুল ধ্বনিতে তার অবিশ্রান্ত বহে চলা। ছুটে চলা। মাঝখানে কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে আছে একখণ্ড চরভূমি। নাম তার বড়পিয়ারী। তার কাশফুলের ভরা যৌবন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। দম্‌কা হাওয়ায় যমুনার ঢেউ যেন কাশবনের ধবধবে গভীর পুচ্ছে ঢেউ হয়ে দোলা দেয়। তোলে গভীর-গভীরতর তরঙ্গ। কিছু কিছু ফুল ছিঁড়ে ঝরে যায় উতল হাওয়ার টানে। খাব্‌লা খাব্‌লা...জমাট, অথচ জমাট নয়, স্নাইপার পাখির পালকের মতো হালকা, আর নরম।

সানু নামটার মধ্যেও কি সেই গভীর উষ্ণতা? অসীম গভীরতা? কী বিপুল

এদিকে গুণময়ও অঙ্ক কষে ফেলেছে। এতদিন ধরে গুণময় কমলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে বাজীমাৎ করেছে। এবার কমলবাবুই সেটা করতে চায় দেখে গুণময় চিন্তিত হয়।

তবে সেসব কথা প্রকাশ না করে গুণময় বলে

—তাহলে দারুণ হয় কমলদা। প্রদীপদের দলও নাকি প্রর্থী দেবে।

কমল বলে—কে দাঁড়াচ্ছে ওদের দলে?

—তা জানিনা এখনও। তবে সদর থেকেই জেনে যাবো।

কমল বলে—যেইই দাঁড়াক তাকে হারাতেই হবে গুণময়। আমাকে জিততেই হবে।

গুণময় বলে—তার ব্যবস্থাই করবো।

গুণময় বুঝেছে এবার সংঘাত একটা বাধবে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু অর্থবল কমলের অনেক বেশি গুণময়ের তুলনায়, শুধুমাত্র বিদেশী শেঠজীর উপর ভরসা করে এই লড়াই জেতা যাবে না।

অথচ কমলবাবুকে দাঁড়াতেও দেওয়া হবে না। কোনমতে তাকে বসাতে পারলে তখনই মাথা তুলতে পারবে গুণময়। তার সামনে এখন কঠিন এক পরীক্ষা।

গুণময় এবার ভাবনাতে পড়েছে। এক সম্ভব হয় সহরের নেতারা যদি কমলকে মনোনয়ন না দেয় তাহলে সহজেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই সহরের দাদাকে খুশি রাখতেই হবে। মনে পড়ে মাতনের কথা। দাদাকে খুশি করার পথ ওই মাতনই বের করে দেবে।

তাই গুণময় এখন মাতনকে খুশি রাখতে চায়। ব্যবসার পার্টনাব করেছে। ক্রাশিং মিলেরও মালকিন করে দেবে।

মাতন বলে—কি ব্যাপার গো ছোটবাবু, হঠাৎ গরীবের দিকে তোমার এত দয়া! হেঁচে-কেশে ব্যাপারটা বলোতো?

বলে গুণময় তোকে যদি নিজের পার্টনার করে নিই —অবাক হয় মাতন।—সে আবার কি গো?

গুণময় ওকে কাছে টেনে এনে বলে ঘনিষ্ঠভাবে।

—মানে বুঝলি না? তোকে যদি বিয়ে করি?

চমকে ওঠে মাতন। সে এইভাবে নিজেকে বেসাতি করতে চায় না। তার চিরন্তন নারীমন আজ একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। সে দেখেছে টগরকেও।

এত থেকেও কোথায় যেন ব্যর্থ সে। নিজের দিদি ভাদুরীর কথা মনে পড়ে। তাকেও কপিল সরিয়ে দিয়েছে এখান থেকে, তার নজর মাতনের দিকে।

মাতন দেখেছে রাতের অন্ধকারের ওই শেঠের মহফিলের মানুষগুলোকে, যেন ক্ষুধার্ত হায়না তারা। দিকে-দিকে ওদের দলই ঘুরছে। তার থেকে বাঁচার পথ সেও

খুঁজছে বার বার।

. আজ গুণময়ের কথায় বলে মাতন।—ঠাট্টা করছো ছোটবাবু?

—কেন? গুণময় বলে—ঠাট্টা করবো কেন?

মাতন বলে—আমি মদবেচা একটা নীচু জাতের মেয়ে আর তুমি পাঁচগ্রামের মানী লোক ওই পণ্ডিত মশাইএর ভাই, বামুন, আমাকে সাতপাক দিয়ে উলু বাজিয়ে ঘরে তুলবা?

গুণময়ের চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন। বলে সে

—ওসব জাত-ফাত আমি মানি না। মন্তর-ফন্তরেও আমার বিশ্বাস নাই। তুই থাকবি আমার কাছে। দু'জনে মিলে কাজ-কারবার করবো।

মাতন কি ভাবছে। গুণময়ের কথাটা ঠিক বুজতে পারে না। তবে বুঝেছে গুণময় তাকে সহজে ছাড়বে না।

কপিল এবার কথাটা জানায় মাতনকে।

সন্ধ্যা নামছে বনভূমিতে। এখনও এদিকে লোকজনের যাতায়ত নাই। বাতাসে মদের গাঁজলার পূতিগন্ধ বনের সব সৌরভকে ম্লান করেছে। তারাগুলো জেগে ওঠে।

কপিল বলে—ইখানে থাকবো নাই মাতন, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আসানসোলে গিয়ে কাম ধান্দা করবো। ঘর বাঁধবো দুজনে। চল মাতন ঢের হয়েছে, ই মাটি বিষিয়ে গেছে। চল ইখান থেকে পালাই।

মাতন চাইল ওর দিকে।

আজ তার মনে হয় গুণময় তাকে শুধু আশাই দিয়েছে। এতদিন ধরে নিজে ওর সর্বস্ব লুঠ করেছে। তাকে ওই শেঠ আর নেতাদের ভোট দিয়ে নিজের আখেরই গুছোতে চায়।

তাকে বিয়ে করার মিথ্যে স্বপ্নও দেখিয়েছে।

সেসব স্বপ্নই। মাতনও বুঝেছে তার একটা আশ্রয় চাই। একজনকে পাশে চায় যে তাকে আশ্রয়-আশ্বাস দিতে পারবে। সেদিক থেকে কপিলকে তবু কিছুটা ভরসা করা যায়। কারণ এর আগে সেইই তাকে অভাব-অনটনের সংসার থেকে এখানে এনে এক নতুন জগতের সন্ধানই দিয়েছে।

গুণময়ের তুলনায় কপিলের চাহিদা অনেক কম। মাতন এই চক্র থেকে বের হতে চায়।

কপিল বলে—এত কি ভাবছিস মতন? আমাকে বিশ্বাস হয় না? তোর জন্যে তোর দিদিকেও পর করলাম। আজ আমি একা—

মাতন ওর কণ্ঠস্বরে বুঝেছে ওর ব্যাকুলতার কথা। মাতন বলে

বিরোতে একা একা চলাফেরা করবেন না। ইচ্ছে করে সংঘাতে যাবার দরকার নেই। হুইসপারিং ক্যাম্পেনটাই ক্রমশ হাইতে নিয়ে যাও। জাস্ট হেট ক্যাম্পেনে।

মনে করে দ্যাখো। লেনিনের কাছে স্তালিন-বিরোধীরা বহুবিধভাবে স্তালিনকে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। একটা পর্যায়ে লেনিনও কিন্তু দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। সেই ব্যাপারটা যদি সম্ভব হতো? বহু আগে আমাদের বড়ো এনিমি 'স্তালিন' খতম হয়ে যেত। কিন্তু লেনিন স্তালিনকেই তাঁর সব থেকে বিশ্বস্ত কমরেড বলে আরো আঁকড়ে ধরলেন। মেনশেভিকরা বাধ্য হয়েছিল পিছু হঠতে। এখন কিন্তু কোনোরকম দুর্বল হেট ক্যাম্পেন করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। ওয়ান থিং! আমরা গোয়েবলস্‌কে সমর্থন করি না ঠিকই। কিন্তু তার কৌশলটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দীপঙ্কর ঘোষালের বিরুদ্ধে লাগাতার ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যেতে পারলে—লোকে তাকে ফেলে দেবে।

এইসব নোংরা, কুৎসিত চক্রান্তের অনেকটাই দেখেছে সুমন্ত। সে তখন নীরব দর্শক। তার চুপ করে থাকাকে ধীরাজ চ্যাটার্জী, সুবোধ পালরা ধরে নিয়েছে, ওদের চক্রান্তের পেছনে তারও নীরব সমর্থন আছে। আর যেহেতু সুমন্তকে কেন্দ্র করেই নিজের সমর্থকদের নিয়ে বেরিয়ে গেছেন দীপঙ্কর ঘোষাল। চুপ করে না থেকে তার তখন অন্যদিকে তাকাবার পথ কোথায়? সেটা তো তার উচ্চারোহণের সময়। টাফ সময়। তুচ্ছ ভাবাবেগের কী মূল্য আছে? নিজের নাক কেটে সেপথে কিছুতেই হাঁটতে চায়নি সুমন্ত।

দীপদাকে ওরা অ্যান্টিসোশ্যাল দিয়ে আক্রমণ করালো। বেদম মার খেয়ে তিনি হাসপাতালে গেলেন। একটি উচ্চতর কাগজে কৌশলে এটাকে নারীঘটিত ব্যাপার বলে প্রচার করা হলো। রসিয়ে, জমিয়ে, নামগোত্রহীন একটি মেয়ের ছবিও ছাপা হয়ে গেল। বুর্জোয়া কাগজগুলো এসবে ওস্তাদ। একজনের ঘাড়ে অন্যজনের ছবি সুপার ইম্পোজ করে বসিয়ে দেয়। নেতাজীর মতো মহান কীর্তিমানকেও এরা নানা ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়েছে।

অন্য কাগজগুলো কিন্তু দীপদাকে নিয়ে স্ক্যাণ্ডেলে যায়নি। দীপদার প্রতিবাদ, তার জ্বালাময়ী ভাষণ, তাঁর বিবৃতি মোটামুটিভাবে ছাপতে লাগল। কোনো কোনো কাগজে বেশ গুরুত্ব দিয়েই। লড়ে যাচ্ছেন দীপদা। অনলসভাবে। নিরাশ্রয়ে। অথচ আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয়ের খোঁজে। একদিন একটা টেলিফোন এলো সুমন্তর অফিসে।

কথা বলতে গিয়ে কিরকম বিবশ হয়ে গিয়েছিল সুমন্ত। টেলিফোনের অপর প্রান্তে দীপদা স্বয়ং। শান্ত। সংযত তিনি। তিনি বললেন, পরিবর্তনটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফল। আর সব যুক্তি মিথ্যে। এক ঐতিহাসিক অবস্থায় যা সত্য, বাস্তব, অন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষায় তা অসত্য বা অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। বদলে যায়। পালটে যায়। দ্বন্দ্বের এটাই অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া। তোমার এই লাম্পট্যের সাম্রাজ্য দখল একদিন ধুলায় বিলীন হয়ে যাবে। যাবেই। অপেক্ষা করো....।

দীপদা! দীপদা!

নাড়া খেয়ে ওঠে সুমন্তর বিবেক। তার মুখোশের আবরণ ভেদ করে আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছিল অন্যকিছু। কিন্তু তার আগেই লাইন কেটে দিয়েছিলেন দীপদা।

সেদিন অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন তিনি। ক্যানো? কিসের অপেক্ষা? লাম্পট্যের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার অপেক্ষা? অপেক্ষা কথাটা কি তবে হুমকি ছিল? ধুলায় মৃত্তিকায় হাত পা ভেঙে পড়ে যাবার ইঙ্গিত?

এখন রাত দশটা পঁচিশ।

মণিমালার টেলিফোন। হাতে রিভলবার।

সেলফের আয়না থেকে সরে এলো সুমন্ত। কুঁকড়ে যাওয়া তার মানসিক শক্তিকে কোনোমতে ধরে নিয়ে এগিয়ে গেল সে তার প্রিয়তমার টেলিফোন রিসিভ করতে।

মাই লাভ!

ইয়েস।

সমুদ্রের অতল থেকে উৎসারিত হলো সুমন্তর কণ্ঠনিঃসৃত স্বর—মণি!

চুমু দিচ্ছি তোমাকে। ঘুমোবে এখন?

জেগে আছি। জেগে থাকতে চাই আমি। ভীষণভাবে জেগে থাকতে চাই।

তোমার কণ্ঠটা অতো ভারী ক্যানো সু? শরীর ভালো তো?

সানুর কথা ভাবছি। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এখন সানু।

কে সানু? কার নাম সানু?

প্রকৃতি। বিশ্ব প্রকৃতি। যে শুধু বদলে দিতে পারে। অমোঘ শক্তির সে এক আধার!

মাই গড্। তুমি মা কালীতে বিশ্বাস করছো? কী ভালো। কী ভালো।

মণি! তোমাকে আমার সেই অমোঘ শক্তির কথাটা জানানো দরকার।

জানোয়ারদের কাছ থেকে সরে গিয়ে। চলি—যদি পায়ের তলে মাটি পাই একদিন এসে দেখা করে যাবো দিদি।

চলে যায় মাতন।

টগরও মনে মনে খুশি হয়েছে। তার ভালোবাসার কোন পরিণতিই ঘটেনি। ব্যর্থ শূন্য জীবনের বোঝাই বয়ে চলেছে সে। তবু মাতন সুখী হোক কপিলকে নিয়ে।

এতদিন পর সেই ভুলটা ভেঙ্গেছে ওদের।

রাত নামে। মাতন আজ তার ঘরে নিজের মালপত্র গুছিয়ে ফেলেছে। ভোররাতে গাড়ি আসবে বনের ওদিকে বড় রাস্তায়। কপিল কোন চেনা ড্রাইভারকে বলে রেখেছে। ওরা দু'জনে পালাবে এখান থেকে রাতের অন্ধকারে।

কপিলেরও রাতে ঘুম আসেনা।

এই রাত যেন ফুরোতে চায়না। বনে অন্ধকার নেমেছে। বাতাসে বনের পাতাগুলোর মাতামাতির শব্দ, দু'একটা ঘুমভাঙ্গা পাখি ডেকে উঠে আবার থেমে যায়। দরমার ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে আছে কপিল।

স্বপ্ন দেখছে সে আর মাতন চলেছে গাড়িতে। রাতের অন্ধকারে হেড লাইট জ্বেলে ছুটছে গাড়িটা। বড়জোড়া পার হয়ে ওরা দামোদরের দিকে চলেছে। এখন আর নদীর বাধা নেই। ব্যারেজের উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে, ওদিকে শুরু হয়েছে দুর্গাপুরের সীমানা। ব্লাস্ট ফার্নেসের আভা ওঠে আকাশে, সারা আকাশ লাল হয়ে ওঠে---

একটা ছায়ামূর্তিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চাইল কপিল

---মাতন!

মাতন এসেছে। বোধ হয় যাবার জন্য ডাকতে এসেছে সে। কপিল উঠতে যাবে হঠাৎ একটা ধারালো কি যেন তার পেটেই বসেছে। হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে সেই ছায়ামূর্তিকে। কিন্তু মূর্তিটা তার মুখ টিপে ধরছে। যাতে কোন শব্দ না করতে পারে। সেইসঙ্গে পেটে ওই ধারালো ছুরিটা ঢুকিয়ে টেনে দেয়!

লুটিয়ে পড়ে কপিল মেজেতে। মাটির বুকে রক্তের ধারাস্রোত নামে। ছায়ামূর্তিটা বের হয়ে যায়। কপিলের দেহটা কয়েকবার বাঁচার শেষ চেষ্টায় দাপাদাপি করে নিথর হয়ে পড়ে থাকে ঘরের মেজেতে।

রাত ভোরের মুখে। পাখিদের কলরব ওঠে। মাতন জেগে উঠেছে। সে বের হয়ে আসে। নিঝুম চারিদিক। বনের গাছগাছালি থেকে রাতের শিশির জলকণা হয়ে গাছে-পাতায় ঝরছে টপ-টাপ শব্দে। ওদিকের চালার ঝাপ বন্ধ। কয়েকজন লোক থাকে তারা তখনও ঘুমে অচেতন।

মাতন এগিয়ে আসে কপিলের ঘরের দিকে।

দরজাটা ভেজানো। ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে মাতন। হাতের টর্চের আলোটা জালতেই চমকে ওঠে দৃশ্যটা দেখে। তক্তপোষের থেকে মেজেতে ছিটকে পড়েছে দেহটা মেজেতে রক্তের ধারা।

বিস্ফারিত চোখ রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে মেজেতে। মাতনের আর্ত কণ্ঠস্বরে জেগে ওঠে কয়েকজন। তারাও এসে দেখে ওই ভয়ানক দৃশ্যটা।

কপিলকে কারা খুন করে ফেলে রেখে গেছে।

সকালেই খবরটা গ্রামে—আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এখানের পল্লীর পরিবেশে আগে কখনও খুনখারাপি হয়নি। গোপগাঁয়ের ইতিহাসে, এই অঞ্চলের ইতিহাসে এই ভাবে রাতের অন্ধকারে খুনের ঘটনাও ঘটলো এই প্রথম।

এর আগে মারা গেছলেন হরিশবাবু, আর এবার রাতের অন্ধকারে খুনীরা খুন করে গেল কপিলকে তার ঘরের মধ্যে।

পুলিশও আসে। লোকজন ভিড় করে। গ্রামের লোকও জুটেছে। এর মধ্যে গুণময়ও এসে পড়ে। পুলিশ দেহটা নিয়ে চলে গেল সদরে। এরপর তদন্ত শুরু হবে।

গুণময় বলে---একি কাণ্ড ঘটলো দারোগাবাবু কপিল ভালো মানুষ, নিরীহ। কারোও সাতে-পাঁচে থাকত না। তাকে ঘর ঢুকে কারা খুন করে গেল?

গ্রামের মানুষরা বলে--দোষীদের ধরতেই হবে দারোগাবাবু, নাহলে এমনি করে এবার নিরীহ গৃহস্থকেও ওরা রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে খুন করে যাবে!

দারোগাবাবু অভয় দেন—এর তদন্ত হবে, দোষীদের ধরতেই হবে।

কমলবাবুও এসেছে। এখন অঞ্চলপ্রধান সে, তারও কিছু কর্তব্য আছে। আর ভোটের মুখে। এখন জনসাধারণের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতেই হবে। কমল বলে

—জোরদার তদন্ত করুণ দারোগাবাবু! কি যে শুরু হলে এখানে। আগে তো এসব ছিল না।

প্রদীপ-কেদার-বরুণরাও এসেছে। এখানে বড় একটা আসেনা ওরা। দেখে বনের মধ্যে বেশ পাকাপাকি ডেরা করে গুণময় এখানে এখন তার কুটিরশিল্পকে ব্যবসায়িক রূপ দিয়েই চোলাই বানাচ্ছে।

আর কপিল ছিল এখানের অন্যতম প্রধান কর্মী।

প্রদীপরা দেখছে মাতনকে। মেয়েটাকে দেখেছে গ্রামের পথে। নীরব স্তব্ধ হয়ে গেছে মেয়েটা। মনে হয় কপিলের এই নিষ্ঠুর হত্যায় সেও বিচলিত।

কেদার এর মধ্যে এদিক-ওদিকে উকি মেরে দেখে চলেছে। দেখে কপিলের খাটের নীচে একটা পুটুলি, সুটকেশ রাখা। কেদার দেখছে মাতনকে। মেয়েটা গুম হয়ে বসেছিল।

তার ঘরেও একটা সুটকেশ পুটুলি বিছানার উপরে রাখা। কেদার শুধোয়—ওগুলো

কী থেকে কী।

ওহ্‌।

এত যে ক্লান্তি। এত যে বিষণ্ণতা। কোথায় কীভাবে যে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুমন্তর মনে হয়, সে কোন অন্ধকারের প্যাচপেচে পাঁকে জড়িয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে। রাশি রাশি অন্ধকার। নিঃশ্বাসে দারুণ অস্বস্তি। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা থেকে রক্তক্ষরণ।

মণিমালার নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। অপেক্ষা। যা মিথ্যে না। অলীক না। অভিনয় না। শুধুই শুদ্ধ ভালোবাসার কথা। কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না সুমন্ত। সে স্থানু। সে নিশ্চুপতার জগদ্দল। ফের মণিমালার ব্যগ্র কণ্ঠ ভেসে আসে—বলো সুমন্ত। কথা বলো। আমি আর কতো অপেক্ষা করবো?

সামনে সানুর চিঠিটা কি নড়ে উঠল?

হ্যাঁ। নড়ছে।

চিঠি নিজে নিজে নড়ে? নড়তে পারে? হয় কখনো এরকম? হাওয়া নেই। ঝড় ঝাপ্‌টা নেই। কী করে নড়ছে? কোনো অলৌকিকতায় কি?

ভয়। একটা হিমশীতল বরফের মতো ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত বয়ে যায় তার শিরায় শিরায়।

দম আটকে আসে। দলা পাকিয়ে যায় নিঃশ্বাসটা তার কণ্ঠায়।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাজেট! বেড়ে সত্তর, আশি লক্ষ হতে পারে।

গায়ে হলুদ। কোলকাতার সব থেকে নামী ক্যাটারার।

বিজনেস ম্যাগনেটরা।

এ তার স্বপ্নেরও অতীত। এই ঐশ্বর্য। এই বৈভব।

এ তার উচ্চারোহণের নব্বুই শতাংশ পর্ব।

সু! কথা বলো সু।

আর মণিমালার আর্তনাদ শোনার পরেও সানুর চিঠিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় সুমন্ত। এবং ভয়ানক এক পৈশাচিক আক্রোশে হাতের মুঠোয় দলে মুচড়ে একাকার করে ফেলে চিঠিটা। ফুঁসে ওঠে সংক্ষোভে।

যাহ্‌! যাহ্‌! তুই চলে যা। ক্যানো তুই এলি আমার হৃৎপিণ্ডকে রক্তাক্ত করতে? আমার সাজানো ঐশ্বর্যকে তচনচ করে দিতে? ক্যানো ভয় দেখাস তুই আমাকে? বলতে বলতে সক্রোধে দলা পাকানো চিঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুমন্ত।

সানু! সানু যেন আছড়ে পড়ল গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে।

আর তখুনি তার মনে হলো, ইকো হচ্ছে চারিদিক থেকে। সানু যেন আর্তনাদ

করে বলছে—বাবুজি...। বাবুজি গো। আমি তো আসছি গো। কত্তো চুমু খাবো তোমাকে।

বাবুজি! মা শুধু কাঁদে। আমি বলি আর কেঁদো না। আমরা তো বাবুজির কাছেই যাচ্ছি।

ওহ্। সাটাপ্। সাটাপ্। চিৎকার করে ওঠে সুমন্ত। —চিনি না। আমি সানু নামে কাউকে চিনি না। কে তোর মা? কি আসে যায় তার কান্নায় আমার? আমি শুধু ঐশ্বর্য চিনি। বৈভব চিনি। আর তার মধ্যমণি মণিমালাকে চিনি। আমার মুখে এখন ইন্টারনেটের সর্বাধুনিক মুখোশ। সে মুখোশ তো কাঁদে না। মুখোশ ক্যানো কাঁদবে? মুখোশ ক্যানো করুণা করবে? মুখোশের কোনো দয়া নেই। মুখোশের কোনো মায়া নেই। বোধ নেই। সে শুধুই শয়তান। শয়তানের আবার পিতৃত্ব কী? —তোরা নরকে যা। বিশুদ্ধ নরক।

সুমন্ত! হ্যালো সুমন্ত। হ্যালো।

চমকে অস্ফুট ধ্বনি করে সুমন্ত—কে? হু আর ইউ?

আমি যে লাইনে হোল্ড করে আছি। কী হচ্ছে এসব তোমার?

হাই মণি। ভেরি সরি। আমি একটা নাটক পড়ছিলাম। মাইণ্ড কোরো না মাই সুইট হার্ট। কাল ভোরেই তো দেখা হচ্ছে। তোমাকে একহাজারটা চুমু খাবো। প্রমিজ। এই বুকের মধ্যে জাপটে ধরে। জড়িয়ে। ভেঙে তচনচ করে। অ্যাতো আদর করবো—ইয়েস মাই ডার্লিং, মাই সানু। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ। ও সানু। এক্সপেকটিং ইউ, এনি মোমেন্ট। হাই সানু, মাই লাভ। কাম অন।

ইউ সাটাপ্ সুমন্ত!

সুমন্ত রিসিভারটা নামিয়ে রাখল খটাস করে। তারপর উঠে, পাগলের মতো ছুটে গেল দেয়ালের কাছে। হাঁটু গেড়ে যেন ডেসডিমোনার কাছে বসছে ওথেলো। সেই একই মুদ্রায় সে তুলে নিলো দুই করতলে ছুঁড়ে ফেলা সানুর চিঠিটা। নিয়ে বুকে চেপে ধরল। বুক থেকে ঠোঁটে। ঠোঁট থেকে গালে। তারপর অবিশ্রান্ত চুমু খেতে লাগল।

টুং টাং। টিং টাং।

কলিংবেল। ডাক। আহ্বান। সুমন্ত জেগে আছো?

আছি। জেগে আছি।

জেগে ওঠার, জেগে থাকার আশ্চর্যপ্রদীপ আমার দুই করতলে এখন।

অনাদি ডাকছে।

রাতের খাবার। বলেছিল, রাত এগারোটায় খাবো।

—কেন? গুণময় একটু অবাক হয়

দারোগাবাবু ওর মুখের ভাবটাও ভালো করেই লক্ষ্য করে। তবে সহজভাবে বলে—মানে তদন্তের জন্যই থাকা দরকার।

গুণময় বলে—নিশ্চয়ই। এদিক থেকে আমার সব রকম সাহায্যই পাবেন।

এমনি দিনে ঘটনাটা ঘটে যায় পাথরখাদানে। কমল দাস প্রতাপনারায়ণের কাছে ইজারা নিয়ে ওখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্লাস্টিং করে পাথর তুলছে, ওদিকে ক্রাশিং মিলেও কাজ চালু করেছে।

সেদিন পাথরখাদানে ব্লাস্টিং করার সময় এরা খেয়াল করেনি, খাদানের ওদিকে খাদে নীচে বেশ কিছু মজুর কাজ করছিল ডিনামাইট কয়েকটা এখান ওখানে পাথরের খাদে রেখে ওরা চার্জ করতে বিশাল পাথরের স্তূপ হুড়মুড় করে পড়ে যায়। ধোঁয়া ধুলোর ঝড় ওঠে, সেই বিস্ফোরণের শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে চারিদিকে।

ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই চাপা পড়ে দু তিনজন. আর বেশ কয়েকজন পাথরের ঘায়ে আহত হয়ে ছিটকে পড়ে। এখানে এই প্রথম একটা বিপজ্জনক ঘটনাই ঘটলো কিছু কর্মীদের গাফিলতির জন্যই।

খবরটা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গুণময়ও খবরটা শুনে মনে মনে খুশিই হয়। কারণ এই গাফিলতিকেই সে মূলধন করে সাদের চাপ সৃষ্টি করে কমলবাবুর নোমিনেশন ক্যানসেল করাতে পারবে।

তবু মুখে বলে—কোন ভয় নাই কমলদা। আমি যাচ্ছি-ওসবের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তবে কিছু খর্চা পড়বে। কে কে মরলো দেখি. বাকীগুলোকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

গুণময় পরম হিতৈষীর মতই চলে গেল খাদানে।

তখন সারা এলাকার খাদানের ক্রাশিং মিলের শ্রমিকরা এবার এসে পড়েছে। এতদিন ধরে তারা দাবী জানিয়ে আসছিল। মালিকরা সেই দাবীতে কান দেয়নি।

বরং তাদের বেআইনীভাবে খাটিয়েছে।

ব্লাস্টিংএর সময় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাও হয়নি। মাল তোলার কাজ যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য জেনে-শুনেই ওই এলাকার মধ্যে অন্যদের কাজ করানো হচ্ছিল আর তারপরেই এই প্রাণঘাতী এ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে।

পুলিশও এসে পড়ে। আহতদের কোন মতে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু কয়েকশো শ্রমিক এবার ওই মৃতদেহগুলোকে ঘিরে রেখেছে। মালিকদের আনাতে হবে।

এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আর তাদের দাবী মানতে হবে।

এই নিয়ে সারা এলাকায় একটা সাড়া পড়ে গেছে। সারা অঞ্চলের মানুষও এসেছে।

বন্ধুর বনপ্রান্তে উত্তেজিত মানুষের কলরব—ওদের স্লোগান উঠছে।

প্রদীপরাও খবরটা পেয়েই ছুটে যায়। কেদারও দলবল নিয়ে এসেছে। ওই আজকের দিনে হঠাৎ বড়লোক হওয়া মানুষগুলোর ভিতরের লোভী চেহাবাটা এবার যেন ফুটে উঠেছে।

গুণময়এর মদের কারবার চলে প্রকাশ্যেই, সারা এলাকার মানুষকে, শ্রমিকদের নেশা ধরিয়ে বাণিজ্য করছে সে, তাদের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন হরিশবাবু, ওদের মদের কারখানাতে সদ্য খুন হয়েছে কপিল, আর কমলবাবুর খাদানে বেআইনীভাবে কাজ করিয়ে বেশি লাভের জন্য আজ প্রাণ দিয়েছে তিনজন শ্রমিক, আর আহত হয়েছে পাঁচ-ছ'জন, তাদেব মধ্যে একজনের আঘাত খুবই গুরুতর। সেও বাঁচে কিনা সন্দেহ!

ওই লোভী মানুষগুলোর লোভ এখানে মানুষের জীবনকে, শান্ত সমাজের বাতাবরণকে কলুষিত করেছে। আজ তাই প্রদীপরাও এসে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ক্রমশ জনতার ভিড় বাড়ছে। এর মধ্যে প্রদীপের দল সদরের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই রাস্তা অবরোধ করেছে। সারবন্দী গাড়ি, ট্রাক-ভ্যান মায় যাত্রীবাহী বহু বাসও দাঁড়িয়ে গেছে।

গুণময় মনে মনে খুশিই হয়।

কারণ কপিলের খুনের পর কমলও ভেবেছে এতে গুণময়ের হাত আছে। ওজানে গুণময়ের চ্যালাদেব। তাদের অসাধ্য কোন কাজই নাই। ওরাই হরিশবাবুকে খুন করেছিল।

ওই মেয়েটাকে হাতে পাবার জন্যই হয়তো গুণময়ই কপিলকে সরিয়েছে। ইদানীং গুণময় শেঠ পিয়ারীলালেব সঙ্গেও বেশি মেলামেশা শুরু করেছিল। গুণময় বেড়ে উঠছে। কমল দাসের ভয়ও হয়েছিল গুণময়ই যে ভাবে বেড়ে উঠছে তাতে তাব বিপদই না হয়। আর ওই শেঠজীর সঙ্গে মেলামেশাটা কমলও পছন্দ করে না।

গতিলাল অনেক গভীর জলের মাছ।

সে এর মধ্যে বুঝেছে কমলবাবু আর গুণময়ের মধ্যে বাইরে যতই সদ্ভাব থাকুক না কেন ওদের দুজনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস জন্মেছে।

তাই গতিলাল কমলবাবুর কাছের মানুষ হবার চেষ্টা করে। গুণময়ের অনেক গোপন খবরও দেয়। মাতনের ওখানে যে রাত কাটায়, কপিল এটা পছন্দ করে না, মাতনকে নিয়ে যায় শেঠজীর মহফিলে সেখানে কে কে আসে সেসব খবরও দেয় গতিলাল কমলকে।

প্রথমে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণের স্বপ্নটাকে খুঁজতে থাকে। কোথাও কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। শুধু নিজের ভেতরে উত্তাল অস্থিরতার দাপাদাপি।

সানু নেই। মিনু বউদি নেই। টুস্কি নেই। ঘরের এককোণে দেয়াল ঘেঁষে দলা মুচড়ো হয়ে পড়ে আছে অরুণাচলের চিঠিটা। মাদার টেরেজার সেই ছায়া! বোগাস।

সুমন্তর কানে তখন অবিরত কলিংবেল বেজে চলার শব্দ।

সে হাসল নিষ্ঠুর বিদ্রূপে। তারপর বিছানা থেকে উঠে এসে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই চিঠিটার দিকে। খরিশ কেউটের বিস্কুম্ভ যেন ওটা। সুমন্ত ঝুঁকে পড়ল।

স্পর্শ করবে? কে সানু? কে সে? কার অস্তিত্ব? জীবনটা মেলোড্রামার নষ্টামি নয়। সেই পুতিদুর্গন্ধময় ড্রেনেজ থেকে উঠে এসে আবার ঘর্মাক্ত মাছি ভন্‌ভন্ বোট্‌কা এসেন্সের জগতে ফিরে যাওয়া?

সে তো নরক।

বস্তির সারসার বছর-বিয়োনো মেয়েছেলেদের মিছিল। নোখে টিপে টিপে উকুন মারার দৃশ্য। উদোম হয়ে ঝগড়া করা। চুল ছেঁড়াছেঁড়ি। ন্যাংটো, পিচুটি চোখের পেটফোলা শিশুমেলার পাতলা বাহ্যি।

রাতের ভ্যাপসা আঁধারের পার্টিশনে সঙ্গমক্রিয়া।

ওয়াক্। ওয়াক্।

সুমন্তর গা গুলিয়ে ওঠে।

সমস্ত শরীরে ঘৃণার বিষাক্ত ছোবল। পদাঘাত করো ভণ্ডামীর আদর্শকে। আর তখুনি প্রকাণ্ড একটা থাবা ছুটে গিয়ে তুলে নিয়ে আসে চিঠিটা। তাতে থুথু ছেটায়। তারপর খোলা জানালা দিয়ে চিঠিটা নিক্ষেপ করে বাইরে।

টুং টাং। টিং টাং। টিং টাং।

বেল বেজে চলে।

দরোজার দিকে এগিয়ে যায় সুমন্ত।

টুং টাং। টিং টাং। টিং টাং।

আহ্! কি হাল্কা ছন্দ। কি কোমল। নরম।

সুমন্ত। সুমন্ত। দরোজা খোলো।

কে? কে ডাকে?

মণি? মণিমালার উদ্বেগাকুল নরম মেঠোসুর বেজে চলেছে রাখালিয়া হাওয়ায়।

ওয়েট মণিমালা। ওয়েট। আমি আমার সমস্ত অতীতের অস্তিত্ব, সমস্ত মূল্যবোধকে এইমাত্র ওই জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছি মণিমালা। আমি একসময় কমিউনিস্ট ছিলাম। আমি এখন পরিপূর্ণভাবে সেই জগতের সঙ্গে ছিন্ন করেছি আমার সম্পর্ক।

দীপদা! তুমিও নপুংসক। তোমাকেও আমি ঘৃণা করি। করুণা করি। থুথু দিই। তবুও প্রকাশ্যে বলবো, ওহ্ ঈশ্বর। তুমিই ঈশ্বর। সত্যের শাশ্বত প্রতীক!

ধীরাজ চ্যাটার্জীকে আরো টাকা দেবো। আরো। আরো।

মুকুলেশদাকে আরো প্রশ্রয় দেবো। আরো অনেক পারমিট চাই। লাইসেন্স চাই।

আর মিনু বউদি নামের কোনো বেশ্যাকে?

আমি জীবনভর...তাকে টুকরো টুকরো করে, খণ্ড খণ্ড করে, একটু একটু করে...তিল তিল করে, হিংস্র, উদগ্র শিল্পময়তায় ন্যাংটো করে, রাঁদার নিপুণ ভাস্কর্য অবলোকন করবো।

হ্যাঁ। খুলছি। অর্গল খুলছি আমি। স্বর্গোদ্বার উন্মোচিত হবে আমার।

বাতাসে কার নিষ্ঠুর অমোঘ শাসানি শোনা যায়।

কে যেন মহাকালের কণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি নরকের দরোজা খুলছো সুমন্ত!

সাবধান।

শুনে হাহা করে অট্টহাসি হাসে সুমন্ত।

এবং অর্গলে হাত রেখে বলে ওঠে সেই অলক্ষ্যকে—নরক? নরক তো শয়তানের নির্মিত দেশ। আমি তার প্রধান পুরোহিত। আমাকে কী ভয় দেখাও নরকের?

হাসি দীর্ঘায়িত হয় সুমন্তর - কল্পিত ঈশ্বরের স্বর্গটাকে আমার চাই। চাই।

সাবধান সুমন্ত।

কে তুমি সাবধান করো আমাকে? কাউকে ভয় করি না আমি। কাউকে পরোয়া করি না আমি। আমি স্বর্গের দুয়ার খুলছি।

না। মহাকাল তোমাকে রোধ করবে। সে আছে তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

তাই?

হ্যাঁ। তাই।

একটানে অমনি দুয়ার উন্মুক্ত করে সুমন্ত। —কে? কে তুমি?

আমি। আমি।

অনাদি তুই?

আমি শুধু অনাদি নই। আমি অসীম। আমি অনন্ত। আমি কমরেড দীপঙ্কর

এই ক্ষমতা তার আছে।

ততক্ষণে ডি-এম, এস-পিকে প্রদীপরা ঘিরে ধরে শ্রমিকদের উপর ওদের অত্যাচার, শোষণের কথাও বলছে। আর সুখদা সুন্দরীর নেতৃত্বে এবার মণিকা, টগররাও এখানে মেয়েদের উপর বঞ্চনা, অত্যাচারের কথাও বলে।

চোলাই মদের কারখানার জন্যই শ্রমিকদের বৌ-বাচ্চারা খেতে পায় না। এবার মেয়েরাই বলে—যা রোজগার করে তার সবই মদশালে যায় বাবু। ওই গুণবাবু মদের ভাটিতেই খুন হলেক কপিল। মাতনকে উরাই হাতে রেখে খেলাতে চায় গ।

ডি-এম সাহেব, এস-পি সাহেবকে এবার মেয়েরাই এগিয়ে এসে এই অঞ্চলের হালফিল সমস্যা, খুন-জখমের কথা তার কারণও কিছু বলে চলেছে।

এমনসময় গুণময়ই খবর দিয়ে শেঠ পিয়ারীলালকেও আনিয়েছে। কমলবাবুদেরও এনেছে। গুণময় মেয়েদের ওই সব নালিশের কথা শুনে বলে—এ্যাই, হঠ হঠ তোরা। এই যে স্যার কমলবাবু আরও একজন খাদান মালিক শেঠজীও এসেছেন।

এর মধ্যে শ্রমিকরাও এবার বুঝেছে তাদের হয়ে কথা বলার মত ওই প্রদীপবাবুরাই আছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত তাদের সে আজ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কেদারই দুটো ট্রাক ধরে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

এর মধ্যে প্রদীপরাই তাদের চিকিৎসার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছে। মালিকরা কেউ আসেনি, আজ ফটিক-নিরাপদও এতদিন খাদানে কাজ করেছে পেটের দায়েল তারা বুঝেছে কমলবাবু, গুণময়দের কথায় সেদিন সমবায় ভেঙ্গেছিল তারাই।

আর মাল চুরির ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল ওই গুণময়ই।

সেটা ফটিক শুনেছিল ড্রাইভারদের কাছেই। পুরা মাল বিদেশে চালের বস্তার আড়ালে পাচার করেছিল ওই গুণময়ের দলই। তাদেরও দেখেছে ফটিকরা।

মনেহচ্ছে এবার ওরাই ফটিকদেব কেন সমবায়ের মানুষদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে আব গুণময়ই তাদেব এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। আজ পাথর ভেঙ্গে আধপেটা খেতে হচ্ছে তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে।

ওদের মজুরের দরকার, তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওদের খাদানে কাজ করে যেতে হবে।

তাই কাংস্যশিল্পী, ক্ষেতমজুরদের এনে এই মরণকূপে নামিয়েছে। ফটিক বলে প্রদীপদা, সেদিন ওদের চিনিনি। ওদের জালে পা দিয়ে নিজেদেরই সব্বোনাশ করেছি। ওদের ডাকাতির কথাও জানি। আজ এর জবাব দিতেই হবে। আর ভুল হবে না।

নিরাপদ বলে—কেদার আমরা তখন এসব চাল বুঝিনি রে, তোরা যা পারিস কর। আমাদিকে বাঁচা।

আজ তাই প্রদীপরাই ওদের হয়ে কথা বলে।

গুণময় বলে ওঠে—এ অন্যায় দাবী। এ মানতে রাজী নই।

ইদানীং সেও মিল খুলেছে। তাই তার অভিমতটা জানায়। শেঠজী-কমলও তাইই বলে।

অবরোধ তোলে প্রদীপরা।

ওরা জেলার কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে চেয়েছিল ব্যাপারটা ডি-এম সাহেবও মালিকদের তার অফিসে যেতে বলেন—তিনিই জনগণকে কথা দেন।

—আপনাদের সব অভিযোগ আমারা লিখে নিয়েছি, এর যথাযথ প্রতিকারের চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে। আমি কথা দিচ্ছি এর প্রতিকার হবে আপনারা এই অবরোধ তুলে নিন।

প্রদীপও সেই কথা জানাতে এবার জনতা অবরোধ তুলে পথমুক্ত করে দেয়। জয়ধ্বনি ওঠে ওদের কণ্ঠে।

আজ তারা যেন একটা নতুন স্বীকৃতি পেয়েছে। জনতার দাবীর কথা কর্তৃপক্ষ মানতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু শ্রমিকদের দাবীর কোন মীমাংসা হয়নি। তাই পরদিন থেকেই এই অঞ্চলের সব পাথরখাদান, ক্রাশিং মিলে কোন শ্রমিকই কাজ যায় না।

স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে ক্রাশিং প্ল্যান্টগুলো। ওদের গর্জনে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে থাকতো। যেন বিশাল একটা দৈত্য মড়মড় শব্দে পাথরগুলোকে চিবিয়ে গুড়ো করে দিচ্ছে।

পথে ঘাটে শ দরুনে ট্রাক বন প্রান্তর ভেদ করে লালধুলো উড়িয়ে মাল আনা নেওয়া করতো। পাথবখাদানের বিস্ফোরণের শব্দ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

পথের ধারে ঝুপড়ির চায়ের দোকানগুলোতেও আজ খদ্দের কেমন নাই। ওরাও বসে আছে। দু-চারজন পথচারী না হয় বেকার শ্রমিক বসে আলোচনা করে। সর্বত্র যেন চাপা নীরব একটা বিদ্রোহের স্তব্ধতা। কোন আগামী ঝড়ের পূর্বাভাস।

ওরা বলে—বিনিপয়সায় মাটির তলে সোনা পেয়েছে হে। ওই কমলবাবু, শেঠজী, ওই গুণময় কি ছিল কি হইছে? গাড়ি হাঁকায়, ফুটানি দেখায়, দুহাতে পয়সা কামায় আমাদের খাটিয়ে। কি দ্যায়? কাঁচকলা।

কেউ বলে—ওসব ছিল ওই প্রদীপবাবুদেরই। ওরা কিছুই পেল নাই। মজা লুটছে ওই নেপোর দল। দেখে লিব উয়াদের। মজুরি দ্বিগুণ করুক। নালে থাক শালার পাথর ওই খাদেই।

ওদিকে হাটতলায় বড় রাস্তার ধারে, থানার বাজারে যত্রতত্র পোস্টারও পড়ছে।

খুনী কমলবাবুর বিচার চাই।

কোন অদৃশ্য হাত এসব পোস্টার সাঁটাবার ব্যবস্থাই করছে। এসব গুণময়েরই কীর্তি। তার এসব কাজ করে ওই বুলেট, মান্টার দল। কলকাতা থেকেই ওরা এসব ছাপিয়ে এনে এখানে-ওখানে মায় সদর সহরে বেশ কিছু প্রধান পথে মেরেছে।

কিন্তু গুণময়ই বলে কমলকে

—এ এই প্রদীপদেরই কাজ। এতদিন চুপচাপ ছিল এবার তারা মৌকা পেয়েছে। ভোটের এই আন্দোলনকে তারা ক্যাস করতে চায়। যাতে তুমি ভোটে দাঁড়াতে না পারো তাই এসব করেছে।

কমলবাবু বলে—এসব অন্যায়।

গুণময় বলে—জবাব ওদের ত দোবই, মুখের মত জবাব কমলদা।

প্রদীপরাও ওই পোস্টার দেখে। প্রদীপই বলে—বরুণ, কেদার এসব কি হে? আমরা তো এসব পোস্টার দিইনি।

কেদারও ভাবছে কথাটা। বরুণই বলে—তাহলে এসব কারা সাঁটছে?

প্রদীপ বলে—শ্রমিকরা তো কেউ আমাদের না জানিয়ে কিছুই করবে না।

তাহলে এসব কে করছে?

ওদের দলের পাণ্ডু বলে।

—দেখছি আমি! শালাদের, ধরতেই হবে।

প্রদীপ বলে—ধরে কাজ নাই যেই করুক আমাদের ভালোই করছে। করতে দাও।

এর মধ্যে ভোটের কথাও উঠছে। মণিকাও আসে মিটিংএ। এবার এখানের ভোটে কমলবাবুর নামই উঠছিল, হঠাৎ ওইসব নানা ঝামেলার জন্য নামটা চাপা পড়ে গেছে। এখনও দলের কোন নাম ওঠেনি।

অবশ্য এই শ্রমিকদের ধর্মঘট মেটাতে হয়েছে কমলবাবুদেরও। কারণ দুর্গাপুরে তখন পুরদমে নানা কিছু গড়ার কাজ চলছে।

পাথরও আর নাই। যেটুকু স্টক ছিল তাও শেষ হতে এবার কর্তাদের টনক নড়ে। মাল চাই। আর সময় মত, দরকার মত মাল দিতে না পারলে পাকুড় থেকে অন্য কোম্পানী, বীরভূমের নতুন খাদানের অনেক মালিক ওই দরেই মাল সাপ্লাই দেবে।

এদের খাদান বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই কমলবাবু, শেঠজী মায় ওই দিলীপ সিংও এবার আলোচনায় বসে। গুণময় বলে

—মজুরি একবার বাড়ালে ওরা মাথায় চেপে বসবে। দু'দিন দম ধরে থাকুন। পেটে টান পড়লেই ঠিক কাজে আসবে।

সিংজী বলে,

—আরে তুম লোগ মুফৎসে কামাই করছে। উদের কিছু দেবে না? কাম চালাতে

হবে। নাহলে মাল আউর লিবেনা পার্টি। শেঠজী, কমলবাবু জানে মালের দাম তাদের খুবই কম। আর কোম্পানী মাল না নিলে তাদের এসব মাল পড়ে থাকবে। তাই তারা বলে—তাই দেব পঁচিশ টাকা থেকে বাড়িয়ে চল্লিশই করবো।

গুণময় বলে—বরুন পরে আমাকে দোষ দেবেন না। ওদের কাছে হেরে গেলে ওরা আবার মোচড় দেবে।

শেষ ওই দৈনিক চল্লিশেই রাজি হল প্রদীপের দল। ওই মালিকদের সঙ্গে বসেছে প্রদীপরা। বাইরে কয়েকশো শ্রমিক এসেছে। তারাও স্লোগান দিচ্ছে।

অঞ্চল অফিসে বসেছে আলোচনা সভা। সারা গ্রামের মানুষ আজ যেন অদৃশ্য কোন শত্রুব বিরুদ্ধে লড়াইএ নেমেছে। গোপগাঁয়ের সেই ঘুমন্ত মাটির যেন আজ ঘুম ভেকেছে। নতুন এক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে এই যান্ত্রিক সভ্যতা। আজ তারা আর নীরবে মুখ বুজে ওদের শাসন, শোষণ মানবে না। নিজেদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

শরৎ ভটচায বলে—ইকি কাণ্ড হে সতীশ!

সতীশ চাটুয্যেও এহেন দৃশ্য জীবনে দেখেনি। সে বলে—যুগই বদলে গেল হে! এ্যাঁ!

ওদেরই জিত হয়েছে। মালিকরা ওদের দাবী মানতে বাধ্য হয়েছে। মজুরিও বাড়িয়েছে। আর ওদের চিকিৎসার জন্যই সব খাদান, ক্রাশিং মিল থেকে প্রত্যেকে মাসিক কিছু টাকা দেবে যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়। সেখানে ডাক্তারও এসে যায়। প্রদীপরাও এই অবকাশে স্থানীয় মানুষদের চিকিৎসার কাজেও কিছু সাহায্য আদায় করে নেয়। ওই বড় ক্রাশিং মিল মালিকদের কাছ থেকেও।

জনতা গর্জন করে ওঠে উল্লাসে। আজ যেন এক গ্রামের বুকে পুরোনো আবর্জনার মাঝে এক নতুন সমাজ জন্ম নিতে চলেছে। আজ থেকে এই সমাজে যেন দুটো আলাদা শ্রেণীর চেতনাই জন্ম নিতে চলেছে।

পঞ্চতীর্থ সবই দেখেছেন। সব খবরই পান লোকজনের মুখে। তিনি গ্রামে কম বের হন। তবে তার আশ্রমে সকলেরই অবারিত দ্বার।

শেঠ পিয়ারীলালও গেছে সেখানে বাদলের সঙ্গে।

পঞ্চতীর্থের ভাইপো নিতু এখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে। বি-এস-সি করার পর এম-এস-সি পড়বে ভাবছিল। এমনিতে কৃতী, মেধাবী ছাত্র। স্কলারশিপের টাকাতেই সে পড়ে। অবশ্য সুধাময় এখন ভালোই রোজগার করছে। নিতু বাবার পয়সাও নেয়না। পঞ্চতীর্থের কিছু দেবোত্তর জমি আছে। তার আয় কিছু হয়। দরকার হলে তার কাছে থেকেই টাকা নেয় নিতু।

পঞ্চতীর্থ বলেন—তাহলে ডাক্তারিতেই গেলি।

নিতু বলে—প্রফেসাররা বললেন, আর স্কলারসিপও দিচ্ছে, কেন! তুমি এটা চাও না জেঠা?

পঞ্চতীর্থ বলে—না-না। আমি খুশি হয়েছি রে নিতু! মানুষের রোগ-যন্ত্রণার উপশম করবি, সেবা করবি তাদের। এতো মহৎ কাজ রে। পারিস তবে এখানের মানুষের সেবাই করবি। যে মাটিতে জন্মেছিস, সেই মাটির প্রতি, সেখানের মানুষের প্রতি তোর কিছু কর্তব্য আছে।

দেখতে দেখতে চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে। নিতু এখনও পুরো ডাক্তার হয়নি। এর মধ্যে কলেজেও ওর প্রতিভার পরিচয় অনেকেই জানে। মাঝে মাঝে আসে বাড়িতে।

পঞ্চতীর্থকে বলে—জ্যাঠা, তোমার শরীরটা ভেঙ্গে পড়ছে।

হাসেন পঞ্চতীর্থ। বলেন—আমার উপরই ডাক্তারি ফলাতে সুরু করলি দেখছি। আমি ভালোই আছি রে। যেদিন ডাক আসবে সেদিন তো যেতেই হবে।

নিতু বলে—তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

পঞ্চতীর্থ বলেন—মন দিয়ে পড়াশোনা কর। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। ডাক্তারিতে ফাঁকি নাইরে। মানুষের জীবন নিয়ে কথা। সেখানে ফাঁকি নাই।

নিতু বলে—তা সত্যি জ্যাঠা। কিন্তু এখানেও জানো অনেক অচল ছেলেও ডাক্তারিতে আসছে কোটার জোরে। কেউ বা নাকি মোটা টাকা ডোনেশন মানে চাঁদা দিয়েও ডাক্তারিতে ভর্তি হচ্ছে।

পঞ্চতীর্থ বলেন—সেকি রে! তারা তো বদ্যি না হয়ে মহাবদ্যি হবে রে। বলেনা—শতং মারী ভবেৎ বৈদ্য। এযে তাই রে। আর যারা ডোনেশন দিয়ে পড়তে আসছে তারা পাশ করে ডোনেশনের টাকা দশ গুণ তুলে নেবার জন্য ডাক্তারি নিয়ে বাণিজ্য করবে। সেবার কাজকে বেসাতিতে পরিণত করবে?

নিত্য বলে—হয়তো তাই হবে ক্রমশ, জ্যাঠামশাই।

পঞ্চতীর্থ বলেন—তাই ভাবি, আগামী দিনের সমাজে মানুষ বাঁচবে কি করে? কোন আশা নিয়ে? সেবার কাজেও বেসাতি হবে।

বাদল এখন গুণময়ের যোগ্য সহকারী হয়েছে। ওই চোলাই মদের ব্যবসা কদিন এখন বন্ধই রয়েছে। পুলিশ থেকে সাবধান করেছে—এখন খুন এর তদন্ত হচ্ছে। ওদিকে অবরোধের সময় মহিলারাও ডি. এম সাহেবকে মদের ভাটির খবর দিয়েছে। তাই আবগারী বিভাগও নড়ে বসেছে।

ওরা এতদিন মাসকাবারী নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওরাই খবর দিত। তখন মালপত্র

এরাই সব সরিয়ে দু-এক ড্রাম মদ হাঁড়ি-কুঁড়ি কিছু রাখতো। লোকজনও সরে যেতো সবাই।

আবগারীর লোক এসে সেইসব পচা মদ ফেলে দিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে—সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, রিপোর্ট দিয়ে ফিরে যেতো। আবার এদের কাজও সুরু হতো।

কিন্তু কিছুদিন ধরে মদের কাজ বন্ধ, শ্রমিক ধর্মঘট চলেছে। মালের খদ্দেরও কম। পুলিশেরও নজর আছে।

তাই বাদল এখন অঞ্চলের ঠিকাদারীর কাজএর নামে কিঞ্চিৎ রোজগার করে, আর শেঠজীর কারখানায় কাজও দেখছে। শেঠজীকে ওই শ্রমিক আন্দোলনে কিছু কম লাভ করেই খুশি থাকতে হয়েছে। কারখানা চালু করবে এইবার।

শেঠজী ভেবেছে সুধাময় মহারাজের তাবিজ, মন্ত্রের জোর কিছু আছে। তবে তার দাদা নাকি বাকসিদ্ধ পুরুষ, সুধাময়জীর চেয়েও অনেক তাগড়া সাধু। তিনি ইচ্ছা করলে শেঠজীর কারখানায় সোনা ফলিয়ে দিতে পারেন।

তাই শেঠজী বাদলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে আশ্রমে। সুন্দর শান্ত পরিবেশ। গ্রামের বাইরে। বকুল চাঁপা—নানা ফুলের গাছে সাজানো আশ্রম। ওদিকে মাটির ঘর, দাওয়া-উঠান সুন্দর করে নিকানো। ওদিকে যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলছে অনির্বাণ হোমাগ্নি। পঞ্চতীর্থ মশায় ওদিকে হাজী সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন।

পাশের গ্রামের হাজী মুর্শেদ সাহেবরা ছিলেন ওই অঞ্চলের দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার। মুর্শেদ সাহেব তখন তরুণ। তখন থেকেই কালিকান্তের বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়তেন। পরে মুর্শেদ সাহেব হজে যান। হজে যাবার আগেও এসেছেন পঞ্চতীর্থের এখানে। এখন এ যেন অন্য মানুষ। ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ। পঞ্চতীর্থ বলেন—ঈশ্বরের নির্দেশ যখন পেয়েছিস সেই পথেই চল মুর্শেদ।

মুর্শেদ সাহেব বলেন—তোকে দেখে মনে হয় এই পথেই শান্তি আছে রে। বিষয়-ভোগ তো করলাম। এবার আল্লাতালার কাছেই নিজেকে সপেঁ দিই।

সেই মানুষটি হজ থেকে ফিরে এসেছেন যেন অন্য মানুষ। এতদিন সারা জীবন ধরে যে বিষয়-আশয় করেছেন—সব ছেলেমেয়ে-ভাইদের মধ্যে দিয়ে। কিছু এতিম খানার জন্য বরাদ্দ করে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে ধানসোলের নির্জন প্রান্তরে একটা ছোট মসজিদ বানিয়ে সেখানেই থাকেন। লোকালয়ে আর যান না। মাঝে মাঝে কালিকান্ত পঞ্চতীর্থের কাছেই আসেন। দু'জনে দুই ধর্মের।

তবু দু'জনের মত যেন এক পথের সন্ধানেই চলেছে। নিতুও থাকে ওদের আলোচনার সময়। হাজী সাহেব নিতুকেও খুব স্নেহ করেন।

বাদলকে ওই শেঠজীকে নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইলেন পঞ্চতীর্থ। বাইরে গাড়িটাও দেখেন। হাজি সাহেব, পঞ্চতীর্থ নীরবে দেখছেন শেঠজীকে। শেঠজী এসে পঞ্চতীর্থকে

প্রণাম করে একটা পাঁচহাজার টাকার বাণ্ডিল পায়ের কাছে রেখে বলে—

আমাকে থোড়া কৃপা করেন মহারাজ। কারবার মন্দ চলছে, নয়া কারখানা যাতে তেজীসে চলে তার জন্য কৃপা করেন। কারোবার ঠিক সে চললে হামি আপনার ই মিট্টিকা ঘর একদম পাকা মকান করে দেবে। মন্দির বানিয়ে দেবে চকাচক্।

বাদল বলে—শেঠজীর অনেক দান-ধ্যান করেন জ্যাঠা। একটু এর জন্যে হোম-যজ্ঞি যদি করো।

শেঠজীও বলে—থোড়াসে কৃপা করিয়ে মহারাজ, হামি ভি আপনাকে মালামাল করিয়ে দিবে। বলে দিচ্ছে।

পঞ্চতীর্থমশায় দেখছেন ওই আজব মানুষটিকে। এখন গোপগাঁয়ে এদের মত অনেকেই আসছে। এখানের বাতাবরণ এরাই বদলে দিয়েছে। দেখেছেন তিনিও ঐ শান্ত গ্রামের জীবন একেবারে বদলে গেছে, বদলে গেছে সেই শান্ত নির্লোভ, অল্পে তৃপ্ত মাটির কাছাকাছি মানুষগুলো। তাদের চাওয়াও বেড়েছে তাই এখানের সেই প্রশান্তি মুছে গিয়ে এসেছে অশান্তির তাণ্ডব।

বলেন পঞ্চতীর্থ—আমি মানুষকে পাইয়ে দেবার মন্তর জানি না শেঠজী। তুমি বরং সুধাময়ের কাছেই গিয়ে ধর্না দাও গে। ওসব আমার জানা নাই, আমার প্রয়োজনও নাই।

শেঠজী বলে—নারাজ মৎ হইয়ে মহারাজ। পাকা মন্দির বানিয়ে দেবে, পাকা মকান।

পঞ্চতীর্থ বলেন—মহারাজও আমি নই শেঠজী, তাই মাটির ঘরেই শান্তিতে আছি। আমার দেবতা এখানেই শান্তিতে থাকবেন—তোমার পাকা মন্দিরে নয়। দয়া করে এসো—

শেঠজী উঠে দাড়ায় হতাশ হয়ে, বাদল তবু বলে—জ্যাঠা, অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলেন উনি।

পঞ্চতীর্থ বলেন—যা বলার বলেছি। শেঠজী, টাকাটাও নিয়ে যান। আমি প্রণামের মূল্য নিই না।

শেঠজী চলে গেলেন। বাদলকে ফেলেই। বাদলও অবশ্য শেঠজীর পিছু পিছুই চলে গেল রাগত ভাবে।

হাজী সাহেব বলেন—ঠিক করেছিস কালি!

পঞ্চতীর্থ হাসছেন বলেন—ওরা ঈশ্বরকেও ঘুষ দিতে চায় মুর্শেদ, সমাজের প্রতিটি স্তরকে কলুষিত করবে এরা, মায় ঈশ্বরকে যদি পায় তাকেও তবে তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সারা বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত তাই রক্ষে!

মাতন সেদিন গুণময়কে দেখে চাইল। মাতনও ভেবেছে কথাটা। সেই রাতের কথা সে ভোলেনি। কপিল মুক্তি চেয়েছিল কিন্তু পায়নি।

মাতনও বুঝেছে কপিলকে সরানোর দরকার ছিল কার। তাই সে তার কাজই করেছে। মাতন সেই ঘটনার পর গেছে ভাদুরীর কাছে।

এখানে বড় একটা আসেনি মাতন।

কপিলকে নিয়ে দিদির সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না। মাতন ধরা দিতে চায়নি কপিলের কাছে তার দিদির কথা ভেবেই।

কিন্তু কপিলই ভাদুরীকে সরিয়ে দিয়েছিল। মাতন এটাকে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদও করেছিল কিন্তু কপিল শোনেনি। আজ সেইই নাই।

সেদিন মাতন এসেছে দিদির ওখানে। এখন ভাদুরীর ব্যবসা ভালোই চলছে। ঝকঝকে সাজানো ধাবা ভাদুরীও বিয়ে করেছে সিংজীকে। লোকটাও নাকি ভালোই। মাতনকে দেখে বলে সিংজী।

—আরে আসো আসো। ভাদুরী দেখ্ কৌন আয়া।

ভাদুরী বোনকে দেখে চাইল। তুই!

ওর চেহারার সেই জৌলুস কিছুটা ম্লান তবু সেই যৌবনের মাতন যায়নি মাতানব দেহ থেকে। মাতনের চোখে জল। আজ সে অসহায় অবস্থায় ওই বনজগাতে পড়ে আছে।

মাতন বলে—ওখান থাকতে ভয় হয় রে। কুন্দিন ওরা আমাকেই শেষ না করে।

সিংজী শুনছে কথাগুলো। ভাদুরী দেখছে মাতনকে। আজ তার জন্য দুঃখ বোধ করে ভাদুরী। সে আজ অনেক কিছুই পেয়েছে। কিন্তু ওই মেয়েটা? তার হারিয়ে গেছে সবকিছুই।

মাতন বলে—বিশ্বাস কর দিদি আমি প্রথমে কপিলদাকে পাত্তা দিইনি। দিতেও চাইনি। তোদের ঘর ভাঙ্গতে চাইনি। ওই মেতে উঠলো।

তবু তুই সুখে আছিস দেখেই ওর কথায় মত দিয়ে চলে যেতে চাইলাম। যদি লোকটা সুখী হয় এই ভেবেই মত দিলাম। কিন্তু সুখী আর তাকে করতে পারিনি। তাকে কারা শেষ করে দিল।

সিংজী বলে আমার কাছেও পুলিশ এসেছিল। লেকিন হামি বলেছে কুছু জানেনা। ওই কপিলকে খুন করেছে কে হামি জানে। একদিন তাদের মুখ ভি খুলিয়ে দেবে।

ভাদুরী বলে—ওসবের মধ্যে তুমি যাবেনা।

মাতনকে বলে ভাদুরী—মাতন গাঁয়ে আমাদের বাড়িটা পড়েই আছে। তুই ওখানেই চলে যা। গাঁয়ে ঘরে থাকলে পাঁচজনের মধ্যে ভালোই থাকবি।

সিংজী বলে—ওই দারুভাটিতে আর কাম ভি করবেনা। ভাদুরী ওকে তুমি ধাবার

কামেই লাগাও। লোকজনকে তো দরকার।

মাতন ওই বনবাসের জীবন থেকে এবার মুক্তি পেতে চায় তার মনে হয় এইটাই ভালো ব্যবস্থা।

ভাদুরীও বলে—তাই কর। ওই বাড়িতে থাকবি আর দিনে এখানে কাজ করবি। খাবার পাবি। মাসে পাঁচশো করে টাকাও।

মাতন আজ দিদি, ওই সিংজীর কাছে কৃতজ্ঞ। বলে সে—সত্যি আজ তোরা আমাকে বাঁচালি দিদি। ওখানে থাকতে ভয় হয়। দিনরাত মনে পড়ে কপিলের কথা।

মাতন তাই ঠিক করেছে ওখান থেকে চলে যাবে গাঁয়ে। এর মধ্যে গ্রামে গিয়ে লোকজন লাগিয়ে ঘরটাকে সাফসুতরো করেছে পাড়ার বাঁকা, বাঁকারমা, ক্ষুদি বুড়ি অন্যরা বলে।

—তবু তুইই থাক ঘরে। ঘরটা পড়ো হয়েছিল। তবু কপিলের ভিটেটা বজায় থাকুক। পাড়াঘরে লোক একজন তবু আসুক।

মাতন তাই ওখানে এবার চলে যাবে। বনের ওই ডেরায় আর যাবে না। আগে ও গোছগাছ করেছিল একদিন। আজও করছে। তবে আজ আর সঙ্গে কেউ নাই। তাকে যেতে হবে একাই। এমনসময় গুণময়কে আসতে দেখে চাইল মাতন।

গুণময় বলে—আজ চল সহর থেকে কিছু কেনা কাটা করে আনবি।

মাতন বুঝেছে ওর মতলব। সেখানে তাকে নিয়ে যাবে বিশেষ কোন কারনে। তাই বলে—কিছু কিনতে হবে না।

হাসে গুণময়—সেকিরে পুজো আসছে, কেনাকাটা করবিনা? গাঁয়ে পড়ে থেকে ভালো লাগছে না তোর? চল সহরে ঘুরে আসবি।

মাতন বুঝেছে কোন বিশেষ কারণেই তাকে নিয়ে যেতে চায় লোকটা। মাতন ওর ব্যাপারটা দেখতে চায়। আর সে চলে যাবে গ্রামের বাড়িতে সেই কথাটাও জানায়নি। তবু শেষবারের মতই ভাবে মাতন। লোকটার ঘাঁটিগুলোর খবরও জানা যাবে।

টগর, মণিকাদিরাও বলেছে তাকে—এর ঠেকগুলো চিনে রাখবি। সেই মানুষ গুলোকেও।

এবার মাতন গুণময়ের সব খবরই জানতে চায়। তাই বলে

—যখন এত করে বলছো, চলো। তবে বাপু আর ওদিকে যেতে মন চায় না।

হাসে গুণময়—আরে ভোগ করার এই তো বয়েস, চল।

মাতন সহরে এসেছে।

সহরের কোন ঝকঝকে হোটেলে তুলেছে তাকে। গুণময় তার আগে মাতনের জন্য ভালো শাড়ি-সেন্ট, নানা কিছু কিনেছে। মাতন ঝকঝকে হোটেলের ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক চেয়ে আসবাবপত্র ডানলোপিলোর গদি এসব দেখে বলে

—অনেক দাম যে গো?

গুণময় বলে, ঠিক মত চললে তোরও এসব হবে মাতন।

হাসে মাতন—ওরে বাবাঃ দরকার নাই এসবে গো।

অতিথিরাও আসেন। ও সহরের কোন নামী নেতা। গুণময় তাকে আপ্যায়নের সব আয়োজনই করেছে, দামী খাবার, স্কচ হুইস্কি কি নেই?

গুণময় জানে ভোটে তার টিকিটই বাঁধা হয়ে গেছে। কমলবাবুর ওই খাদানের হত্যার মামলা এখনও চলছে। তাই নেতারা গুণময়বাবুকেই জনপ্রতিনিধি করার কথাই ভাবছে এই এলাকার।

মাতন দেখছে ওই নেতাকে। লোকটা যেন চলন্ত একটা পিপের মত দেখতে। হাসছে ঠা ঠা করে আর মদও গিলছে পিপে দরুনে। দুহাতে মুরগীর ঠ্যাং ধরে কামড়াচ্ছে। যেন একটা শিয়াল জঙ্গলের অন্ধকারে বসে পচা মাংস হাড় তৃপ্তিভাবে চিবিয়ে চলছে। গুণময় তার চারপাশে গাঁয়ের ঘিয়ে ভাজা রোমওঠা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়ছে। নেতাও খুশি ওর আপ্যায়নে।

বলে সে—তোমার নামই পাঠাচ্ছি হেড কোয়াটারে এবার ভোটের জন্য তৈরি হও। আর টাকাকড়ির ব্যবস্থাও রাখো।

গুণময় জানে কানের জল বের করতে হলে কানে জল দিতে হয়। তাই বলে — ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে দাদা। ভাববেন না।

মাতন শোনে ওদের কথাগুলো। ওদের অনেক গোপন লেনদেনর খবরও শোনে। নেতাই বলে।

কিন্তু কমলবাবুকে এখন এসব বলোনা। ও দু-একদিনের মধ্যেই ত আসবে, হাজার পঞ্চাশটাকা ও দিয়ে যাবে। ওটা হাতে নেবার পর তার পর তোমার নাম বের হবে। আগে নয়।

গুণময় বলে—ঠিক আছে। যা পারেন খিঁচে নিন ওর কাছে থেকেও।

মাতন কথাগুলো শোনে মাত্র। নেতা পকেট থেকে একটা চিঠিও দেখায় গুণময়কে দ্যাখ, হেড অফিস থেকে তোমার নামই নিয়ে এসেছি।

ভোটের জন্য তৈরি হচ্ছে কমলবাবুও। গুণময়ও এসেছে ওর কাছে অঞ্চলের কাগজপত্রে সইসাবুদ করিয়ে বলে

—ভোটের জন্য তোমার নাম ই উঠবে তাই বল্লেন দাদা।

তাহলে তৈরি হই কদিন বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে লেগে পড়বো। কমলও খুশি হয়।

গুণময়ের টাকার যোগাড় করতে হবে। তাই সে কলকাতার তার মহাজনদের কাছে গেছে। এখন বিদেশী মালও বেশি আনা নেওয়া করতে হবে। টাকার দরকার। এসব কথাই ভাবছে সে। তাই বেরুতে হয় গুণময়কে।

মাতন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল সে গুণময়ের শয়তানির জবাবই দেবে। কপিলের খুনী যে গুণময়ই তা বুঝেছে সে। আর ওদের টাকার জোরে কোন তদন্তই হল না। সব ধামা চাপা পড়ে গেছে।

ওই খাদানের শ্রমিক আন্দোলনটা মনে হয় এরাই বাধিয়েছিল। ওই কপিলের তদন্ত চাপা দেবার জন্যই। মানুষও এখন শ্রমিক আন্দোলন আর ভোটের কথাই ভাবছে এখন কিন্তু মাতন ভোলেনি।

গুণময় চলে যেতে সেও ওই বনের ঘর-কারখানা ছেড়ে মালপত্র নিয়ে চলে এসেছে ওই গ্রামের কপিলের বাড়িতেই। খুদু বুড়ি, বাঁকার মাও খুশি হয়। ভাদুরীর ধাবাতে বাঁকা কাজ করে, মাতন।

এপাড়ার বেশ কয়েকজনকে ভাদুরী তার ধাবায় কাজ দিয়েছে। ফলে এরাও ভাদুরীর বোনকে সহজেই কাছে টেনে নেয়। মাতনও এখন ধাবার কাজেই যেতে শুরু করেছে। কথাটা তবু ভোলেনি মাতন।

কমলবাবু স্বপ্ন দেখছে নেতা হবে সে।

তার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে তৈরি সে। গুণময়ও বলেছে তার জন্য ভোটে জান লড়িয়ে দেবে।

মাতন এর মধ্যে সেইরাতে কৌশলে নেতার পকেট থেকে সেই চিঠিখানাই বের করে নিয়েছিল। সেইটাই তার অস্ত্র। মাতন এখন কবছরেই এখানে এসে অনেক কিছুই দেখেছে। শিখেছেও। ওই নতুন গজিয়ে ওঠা মানুষগুলোর লোভ-লালসার বলিই হয়েছে। এবার এক এক করে সে তার জবাবই দেবে।

তাই এবার সে কমলবাবুর অফিসেই এসেছে।

কমল চেনে তাকে। তাই বলে—গুণময়ের খোঁজে এসেছিস? সে তো এখন বাইরে।

মাতন বলে—গুণময়ের খোঁজ নয় গো—তোমার কাছেই এসেছি।

কমল বলে—সদরে যেতে হবে জরুরী মিটিং আছে যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

মাতন বলে—তা সহরে যাচ্ছো দাদাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে?

চমকে ওঠে কমল—তুই কি করে জানলি?

—ভোটের টিকিট পাবার জন্যে টাকা দিছ, না? মাতন বলে।

কমল অবাক হয়। মেয়েটার গতিবিধি সর্বত্র। তবে কি সে সবই জানে।

মাতন বলে—উ টাকা নিয়ে ওরা গিলে ফেলবে। তোমার টিকিটও হবেনা। টাকাটাই জলে যাবে গো কমলবাবু!

—কেন? চমকে ওঠে কমল।

মাতন বলে—ভোটে গুণময়বাবুর টিকিই এসেগেছে। তোমাকে এতদিন ধাপ্পাই দিয়েছে গুণময়। তার গুণের কথা তো জানোনা। ভোটে দাঁড়াচ্ছে সেইই।

তারপর সেই নেতার পকেট থেকে বেরকরা কলকাতার অফিসের চিঠিটাই দেখায়। কমল চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠে। তার পায়ের তল থেকেই যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

গুণময়কে সে পথ থেকে তুলে এনে ঠাঁই দিয়েছিল। মদত দিয়ে আজ তাকে এইখানে তুলেছে। আর সেই গুণময়ই তাকে আড়াল থেকে এতবড় আঘাত দেবে সেটা ভাবতেও পারেনি কমল। কিন্তু খবরটা সত্যি তাতে সন্দেহ নাই।

মাতন দেখছে কমলবাবুকে। ওর মুখ-চোখ রাগে-অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। মাতন বলে।

—ওই খাদানে যে মানুষগুলো মরলেক এসব ওইই মতলব করেই করেছিল তা বুঝছো এবার। যাতে তোমার বদনাম হয়। ও দাঁড়াতে পারে এসব তার জন্যই করে ওই কাণ্ড বাধালেক।

কমল ক্রমশ ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথাতেও ভেবেছে। এখন মনে হয় সব সত্যিই। গুণময় তার সর্বনাশ করেছে নানা দিক থেকেই। কমল ও ছাড়বে না ওকে। কমল শুধোয়

—কপিলকে কে খুন করেছিল বলে মনে হয় তোর?

মাতন এবার সাবধানে পা ফেলতে চায়। ওদের দুজনের মধ্যেই এবার কঠিন সংঘাতই ঘটাবে সে।

মাতন বলে ওই তদন্তকে ধামা চাপা দেবার জন্যে আর তোমার সর্বনাশ করার জন্যই খাদানেই বোমা ফাটালো। এতে লাভ কার হয়েছে? ওই থেকেই বুঝে নাও কে খুনী। একবার একটা খুন করে পার পেতেই সে ওই দ্বিতীয়বারও তাই করলেক।

কমল বলে—হতে পারে।

মাতনই বলে—কিন্তু কি হল? তদন্ত চাপা পড়ে গেল। সব ফুস হয়ে গেল। ইবার ওই মদের কারবারী খুনীই লোকটা হবে এখানের মানুষরে নেতা। তুমিও হেরে গেলা কমলবাবু ওই ফেজেব্বাজ গুণময়ের কাছে। চলি, ইসব কথা কিন্তুক কমলবাবু ওই গুণময়কে বলোনা। তালে দেখবে আমার হালও ওই কপিলের মতই করে দেবে।

কমল এবার গুণময়ের সর্বনাশই করতে চায়।

তাই মাতনকে তার দরকার হবে। কমল বলে

—না-না। তুই এখন ওই বনেই আছিস নাকি?

—না গো। গাঁয়েই কপিলের ভিটেতেই চলে গেছি। আর উখানে কাজও করছি না। দিদির ধাবাতেই কাজ করছি। তবু ভয় হয়। গুণময়ের ওই দলবলকে চেন তো।

কমল বলে—কোন ভয় নাই তোর। তেমন কিছু দেখলে আমাকে বলবি। না হয় দিলীপ সিংকেই জানবি। ওই মানুষটা সত্যিই ভালো লোক রে? তারপর দেখছি গুণময়কে।

গুণময় কলকাতাতে বসেই কাগজে দেখেছে ওই এলাকায় তাকেই ভোটে দাঁড়াবার টিকিট দিয়েছে। সেও খুশি।

টাকা-কড়ির ব্যবস্থাও সে করেছে। এবার সে শুধু নেতাই নয় কলকাতার নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছে, তারাও আশা দিয়েছে ওখানে ভোটে জিতলে গুণময়কেই তারা ওই জেলার কোটা থেকে মন্ত্রীই করে দেবে। পথের মানুষ। পেশাদার এক মস্তানের ভাগ্যেই এবার মন্ত্রীর গদি জুটবে।

গুণময় ফিরেছে অনেক আশা নিয়েই।

গেছে কমলবাবুর কাছে। কমল দেখছে ওকে।

গুণময় জানে কিভাবে ব্যাপারটাকে সামলাতে হবে। সে এসেই বলে

—দেখছো কমলদা। সহরের নেতাদের কাণ্ড। তোমার নামে কেস রয়েছে আরে তার মাদনে দোষ তো প্রমাণিত হয়নি। আর তোমাকে কিনা বসিয়ে দিয়ে টিকিট দিতে চায় আমাকে?

কমলও দেখছে গুণময়কে।

সেও বুঝেছে ওর ভণ্ডামী। কমল যে এবার নাটকের ব্যাপারটা সবই জানে সেটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনা।

সে বলে—তা নেতারা যখন তোমাকেই চাইছেন। তুমিই দাঁড়াও।

বলে গুণময় না! ভাবছি আমি প্রতিবাদ করবো। ওরা কেন তোমাকে দেবেন না দাঁড়াতে? এটা অন্যায়।

গুণময়ের মুখে ন্যায়-অন্যায়ের কথা শুনে আজ কমলবাবু আদৌ অবাক হয় না। বলে—না-না গুণময়, এই সময় টালবাহানা করলে প্রদীপরা পেয়ে বসবে। তুমি আর আমি একই কথা। তুমিই দাঁড়াও। আমি তোমার পাশেই আছি। থাকবও।

গুণময় তবু বলে এটা কিন্তু নেতারা ঠিক করলেন না। শুধু তুমি বলছ তাই দাঁড়াচ্ছি কমলদা।

কমলকে ম্যানেজই করেছে গুণময় এইটাই ভেবে নিয়ে সেও খুশি। এবার ভোটের ক্যামপেনে মাতনকেও চায়। মেয়ে মহলে ক্যানভাসের জন্য মাতনকে দরকার আর বাকী মেয়েদের মাতনই জোটাবে টাকা, চাল ইত্যাদির যোগান দিয়ে।

গুণময় বনের মধ্যে ওই মদের ঠেকে এসে দেখে বাদল এখন কাজকর্ম দেখছে। ছেলেটারও ব্যবসায়ে মন আছে। গুণময় দেখে মাতনের ঘরটা বন্ধ।

কে বলে, মাতন ইখানের কাজ ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেছে।

চমকে ওঠে গুণময়। মাতনকে তার খুবই দরকার। সহরের দাদাদেরও সামলাতে হবে। এখানে ভোটেও কাজ করতে হবে তাকে।

আর এই দরকারের সময়ই মেয়েটা চলে গেছে এখান থেকে গাঁয়ের মধ্যে।

সেখানে মাতনকে একলা পাওয়া যাবে না। তাকে ইচ্ছামত কাজেও লাগানো যাবে না। বিপদে পড়ে গুণময়।

মাতন এখন ধাবার কাজেই ব্যস্ত। ভাদুরীও তার কাজে খুশি ওর জন্যই আরও অনেক গাড়ি এখন আসছে। খাবার-পানীয়ের বিক্রিও বেড়ে গেছে তার।

দিলীপ সিং বলে—আরে ভাদুরী মাতন কামাল কর দিয়া। বহুৎ কাম কা লেড়কী।

ভাদরী বলে—তুমি বাপু যেন আবার ওর দিকে নজর দিও না।

হাসে সিংজী, বলে—আরে আঁখো মা তু, দুসরা কোই নজরমে আসবে কি করে ভাদুরী?

ভাদুরীর মনে পড়ে কপিলের কথা। কপিল আজ নাই।

তবু ভয় হয় এখানে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তাই সে সাবধান হতে চায়।

মাতনও এখানে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। কাজের শেষে নিজের ঘরে ফিরে যায়। বাঁকার মা, খুদিবুড়ি আরও দু-চারজন মেয়ে আসে। কখনও ওরা টগরের ওখানেও যায়। এখন প্রদীপরা বয়স্ক মেয়েদের সেখানে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছে। মণিকাই দু-চারজন ছাত্রীকে নিয়ে ওদের লেখাপড়া শেখায়।

মাতনও যায় সেখানে পড়াশোনাতেও মন দেয় সে।

সেই অতীতের সব ভুলে নতুন করে বাঁচতে চায়। টগরও বলে

এত সহজে হেরে যাবি কেনে?

মাতনও বেশ রয়েছে।

হঠাৎ সেদিন মাতন কাজ সেরে ফিরছে মহুয়া বাগানে গুণময়কে দেখে চাইল। গুণময় এগিয়ে আসে। মাতন ওর ওখান থেকে চলে আসার বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আজ দেখছে তাকে গুণময়, বলে—কি ব্যাপার? ওখান থেকে চলে এলি যে?

মাতন বলে—ওখানে মন বসছে নাই। উ কাজ আর করবো নাই তাই চলে এলাম

উখান থেকে।

গুণময় বলে—ওখানেই ফিরে আয়, মাইনে আর দুশোটাকা বেশি দেব।

মাতন বলে—চাকরিও করছি দিদির ধাবায়। ওখান থেকে ছেড়ে যেতে পারবো বাবু। আমার আর তোমার কাজে যাওয়া হবেক নাই।

—শোন! গুণময় বলে এখন আমার খুব দরকার।

মাতন বলে—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না গো। তুমার কত ট্যাকা। খোঁজো কত মেয়েছেলে পাবে। সহরের কত দিদিমণির সঙ্গে তোমার জানা-চেনা। তাদেরই আনো।

মাতন চলে গেল। গুণময় আজ রেগে উঠেছে ওর কথায়।

ওকে দরকার হয় টেনে আনবে।

তাই বুলেট মণ্টাদের তার দরকার। এমনি নানা কাজেই ওদের এর আগেও লাগিয়েছে। আবার লাগাবে গুণময়।

মাতন রাতে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। বেশি রাত অবধি পড়াশোনা করেছে সে এখন সন্ধ্যায় টগরদির ওখানে মেয়েরা অনেকেই যায়।

এবার প্রদীপরাও ভোটের জন্য তৈরি হচ্ছে।

তারা জেনেছে কমলবাবু নয় এবার এখানে দাঁড়াচ্ছে গুণময়। গতিলালও এখন খুবই ব্যস্ত, সেইই গুণময়ের হয়ে কাজ করছে। বাদলও কাকার দলেই।

বরুণ কেদার অন্যরা প্রদীপকেই এখানে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। গোবিন্দবাবুও এখন ওদের সমর্থন করছেন। কিন্তু প্রদীপই বলে

—আমি কাজ করতে চাই এখানে ওই হেলথ সেন্টারের কাজ শেষ করে চালু করতেই হবে। ভোটে দাঁড়াক এমন একজন যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারবে। ওই টগরকেই আমি দাঁড়াতে বলছি।

কেদার বলে—মেয়েছেলে।

—কেন, এটা উদাহরণই হোক। ওই গুণময়ের বিরুদ্ধে টগরই দাঁড়াবে। সারা অঞ্চলের মেয়েরা ওকে চেনে। ওদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সে কাজ করে।

টগরও কথাটা শুনে চমকে ওঠে। সেকি? আমি দাঁড়াবো তোমরা থাকতে? প্রদীপ বলে—তুমিই হবে এখানের প্রতিনিধি। মেয়েরাও লড়াই করে দাঁড়াতে পারে তা তুমিই দেখিয়েছো। তাই তোমাকেই দাঁড়াতে হবে, আমরা তোমার পিছনে আছি।

টগর বলে—তুমি?

প্রদীপ বলে—আমার গায়ে নীলরক্তের ছাপ রয়ে গেছে। লোকে বলবে জমিদারী গেছে এবার নেতাগিরি করে জমিদারী চাল দেখাতে চায়। ওসব কথা যাতে না ওঠে

তাই তোমাকে দাঁড়াতে হবে

সুখদা ঠাকরুন বলে—আলবৎ দাঁড়াবি। মেয়েরাও একালে পিছিয়ে থাকবে কেনে? সব মেয়েরাই চায় তুই দাঁড়া টগর।

সেদিন স্কুলে এসে মাতনও কথাটা শুনে বলে—তুমিই দাঁড়াও দিদি মেয়েদের হয়ে কথা বলার কেউ নাই। পুরুষদের জুলুম-অত্যাচার সয়েই কি চিরকাল থাকতে হবেক? দিন বদলেছে। এবার আমাদেরও মুখ খুলতেই হবেক।

সমবেত জনতা—মহিলাদের চাপেই টগরই দাঁড়ালো। হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও দেখছে নতুন একটা যুগকে।

সেদিন এই গ্রামেই তাদের ঘরের বাইরে পা দিতে হলে ঘোমটায় ঢেকে বের হতে হতো। মুখ খোলারও উপায় ছিল না। এখন মেয়েদেরও পড়তে হচ্ছে স্কুলে, মেয়েরাও কলেজে যাতায়াত করছে বাসে। চাকরিই করছে গ্রামের মেয়েরাও।

হরিপ্রিয়া এখন কিছুটা স্বস্তিতে আছে।

বিজয়ের বিয়ে দিয়েছে বেলেতোড়ের কোন গরীব পরিবারের মেয়ের সঙ্গে।

বিজয়ের বৌ মালতীও এখানে এসে সংসারের ভার তুলে নিয়েছে আর বিজয়ের ভারও। বিজয় এখন স্বাভাবিকই। এসবই হয়েছে পঞ্চতীর্থর কথাতেই।

তিনিই বেলেতোড়ের ওই মেয়েটির সন্ধান দেন। বলেন—দিদি দেখবে ওই মেয়ে খুবই সুলক্ষণা, তোমার সংসারের কল্যাণ হবে ওকে আনলে।

হরিপ্রিয়া বলে—ওরা কি বিজয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবে?

পঞ্চতীর্থ বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। সে প্রকাশ্যে সহজে কিছুই বলে না। যদি বলে তা সত্য হবেই।

হরিপ্রিয়া এখন বিষয়-আশয়-জমিদারীর বন্ধন মুক্ত হয়ে এখন পঞ্চতীর্থের আশ্রমে আসে। টগরদের ওখানেও যায়। যুগ বদলেছে এখন হরিপ্রিয়াও এখানে গুণময়-কমলবাবুদের নানা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদেও মুখর।

প্রদীপ বলে—ঠাক্‌মা, এবার আপনাকেও মেয়েদের সামনে কিছু বলতে হবে। টগরকেই দাঁড় করাচ্ছি আমরা।

হরিপ্রিয়া বলে—নিশ্চয়ই বলবো।

সারা এলাকার মানুষ জেনেছে গুণময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে টগর। হাবু ঘোষের মেয়ে টগর। মেয়েটার দাপট আছে। আর মাতনও জানে গুণময়ের অনেক ভিতরের খবর। তাই গুণময় চায় মাতনকে ওদের কবল থেকে সরিয়ে আনতে।

রাতের বেলায় মাতন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘরের অন্ধকার আলোয় ভরে ওঠে। চমকে ওঠে। ঘরটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। কলরব চীৎকার ওঠে—আগুন! আগুন!

কোনমতে বের হবার চেষ্টা করে মাতন, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ ওদিকের চালাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পাড়ার লোকজনও জেগে গেছে।

খুদিবুড়ি রাতে ঘুমোয় না ঠিকমত। সে কাদের পায়ের শব্দ পেয়ে চাইল। দেখে দু-তিনটে ছায়া মূর্তি মাতনের খড়ের চালে কেরসিন তেল ছিটুচ্ছে।

—কে র‍্যা! কে ওখানে?

ছায়ামূর্তির দল এবার জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে দিতেই জ্বলে ওঠে চালটা। ওরা পালাচ্ছে। বুড়ি লোকদুটোকে ঠাওর করতে পারেনা। প্যান্ট পরা দুটো লোক পালাচ্ছে।

বুড়ি চীৎকার করে —আগুন, আগুন। ওরে ওঠ।

ধড়মড় করে পাড়ার লোকজন উঠে পড়ে। বাঁকা অন্যরা পলায়মান লোকদুটোকে আর দেখতে পায় না। মটরবাইকের শব্দ তুলে তারা পালায়। এরা তখন আগুনের সঙ্গে লড়ছে।

মাতনের বন্ধ ঘরের দরজাটা খুলে বাঁকাই টেনে বের করে আনে মাতনকে। ধোঁয়ায় কাসছে মেয়েটা, ঘরে তখনও জ্বলছে। সারা পাড়া জ্বলে যাবে এরা কোনমতে জল ঢেলে বালি ছিটিয়ে আগুন নেভায়।

তখন বরুণ কেদাররাও এসে পড়ে।

খুদিবুড়ি তখনও বলে চলেছে—ওই মেয়েটাকে দগ্ধে মারতে এসেছিল উরা। ঘরে ছেকল তুলে পুড়িয়ে ছাই করে দিত।

বাঁকাও বলে—আমিই শিকল খুলে মাতনদিকে বের করে আনলাম।

মাতন এবার বুঝেছে এ কার কাজ।

ভাদুরী সিংজীও এসেছে। গাঁয়ের লোকও এবার ভীত। সকলেরই প্রায় খড়ের ঘর। এবার প্রতিপক্ষ যদি ওদের পুড়িয়ে মারে? কেদার বলে—এ কাদের কাজ বুঝঝো নাই? খুন-খারাপি চলছিল। তাতে বাধা না পেয়ে এবার ঘরেই আগুন দে পুড়িয়ে মারতে চায়।

সারা গ্রামে, আশপাশের গ্রামেও এনিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ওরা ওই অপরাধীদের ধরতে পারেনি। মাতন বলে—ওরাই কপিলকেও খুনই করেছিল।

পুলিশও আসে। তদন্ত চলার আশ্বাস শুনিয়ে তারা বিদায় নেয়। মাতন বুঝেছে এ গুণময়ের দলেরই কাজ।

তবু গুণময় বসে নাই।

গতিলাল, বাদলদের সঙ্গে কিছু ছেলেকে টাকা দিয়ে নামিয়েছে। কমলকে বলে গুণময়—কিছু টাকা দিতে হবে!

কমলবাবু এবার বুঝেছে গুণময় আরও বাড়তে চায়। ইদানীং শেঠ পিয়ারীলালই

তার মূল খুঁটি।

কমল বলে—টাকাতো নাই গুণধর থাকলে তোমার ভোটের জন্য নিশ্চয়ই দিতাম।

গুণময় বলে—দিলে ভালোই হতো কমলদা।

কমল বলে—তোমার আবার টাকার ভাবনা? এখন তো ভালোই রোজগার করছ দু-নম্বরী ধান্দায়। আর চালের ব্যববসায় কি দরকার?

গুণময়ের চালের ট্রাকের আড়ালেই অন্য মাল পাচার হয়। চালের ব্যবসা উঠে গেলে বিপদই—হবে তার। তাই বলে গুণময় চালের ব্যবসাই আমার আসল দাদা।

কমল বলে—ওটা আর করবো না। সরকারকেই চাল দেব ঠিক করেছি।

গুণময়ের পিছনে যেন এবার কমল দাসই লাগতে চায়।

কমল চালের কারবারও বন্ধ করে দিল। টাকাও দিচ্ছেনা। আর আবগারী বিভাগকেই সেইই এবার খোঁচা দিয়ে মদের কারবারও বন্ধ করিয়েছে গুণময়ের।

ওদিকে প্রতিপক্ষ প্রদীপবাবুদের প্রচারও চলছে। একটা মেয়েকে তারা প্রার্থী করেছে। দেখেছে গুণময় সারা এলাকার মানুষ এখন ওই টগরেরই সমর্থক।

গতিলাল অবশ্য বলে—তুমিই জিতবে গুণময়দা। কাল জগন্নাথপুরের হাটতলায় বিরাট সমাবেশের আয়োজন করেছি। হাজার পাঁচেক টাকা চাই। দেখবে এই অঞ্চলের মানুষকে ঝেঁটিয়ে আনবো। তারপর গোঁসাইপুরের হাটবারে সেখানে মিটিং। কাল হরেকিষ্টপুর, জামাবাদাতে পদযাত্রা একেবারে ভোটারদের দোরে-দোরেই যাবে।

বাদল বলে—তারপর সোজাপথে ভোট না আসে তখন বুলেট মণ্টাদের দল তো আছেই। সেবার ওই সমবায়ের মিছিল যেমন ভেঙ্গেছিলাম, এবার ভোটের বাক্সও ঠিক তাই করে ভরিয়ে দেব কাকা।

গুণময় তবু যেন ভরসা পায় না।

তবু টাকাও দিতে হয়।

আর দেখে সেদিন প্রদীপদের মিটিং দোঁগায়ের ইস্কুলের মাঠে। লোক যেন উপছে পড়ছে। এবার ফটিক-নিরাপদরাও প্রদীপদের দলে। সব পাথরখাদানের শ্রমিকরাও এসেছে, এসেছে প্রচুর মেয়েরাও প্রদীপদের মিটিং-এ।

মঞ্চে হরিপ্রিয়া ঠাকরুনও রয়েছে টগরের পাশে। মণিকাও ভাষণ দেয়।

গুণময়ের মিটিং তার তুলনায় যেন সাদামাটা। গতিলাল তার কয়েকজন চ্যালা, বাদলের কিছু লোকজন আর মদের লোভে বেশ কিছু মানুষজন এসেছে।

গুণময়কে গতিলালই একগাদা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে মঞ্চে তুলেছে। গুণময় ভেবেছিল কমলবাবু আসবে। কিন্তু আজই তার কি যেন জরুরী কাজ পড়েছে। সে আসতে পারেনি। তবু গতিলাল মাইকে হৈ চৈ করিয়ে সভা শুরু করে। ও নিজেই বলে—হাততালি।

লোকজন তালিও দেয়। কে চীৎকার করে—ভোট ফর গুণময়বাবু ভোট ফর—

কমলবাবু সব খবরই রাখে। গুণময়কে আসতে দেখে চাইল। আজ গুণময় বলে—তুমি গেলে না কমলদা?

কমলবাবু বলে—এই ফিরছি। আর সহরের বাবুরো আসবেন বল্লে—তাঁরাও এলো না।

ইদানীং গুণময় বুঝেছে কমলবাবু তাকে এড়িয়েই চলেছে। তাই গুণময়ও এবার কমলবাবুকেও চরম আঘাত দিতে চায়। আর অস্ত্রগুলো তার হাতেই রয়েছে।

সেদিন গোসাইপুরের হাটতলাতে গুণময় সেই বোমাই ফাটায়। সে এর মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মিটিংএ সেদিন এলাকার মানুষের উপর নানা বঞ্চনার কথাই তোলে। কৃষিঋণ বলদঋণ—রিলিফের কাজের লাখ লাখ টাকা তছনছের প্রতিবাদ করেই পদত্যাগই করেছে গুণময়।

কমলবাবু বলে—এসব কি হচ্ছে গুণময়? এসব ব্যাপারে তুমিই যা বলেছিলে সেইমত কাজ করেছি। এখন তুমিই প্রশ্ন তুলছো? এসবের হিসাব তো তুমিই রাখতে।

—মোটেই না। তুমিই অঞ্চলপ্রধান। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবে তুমি। সরকারি টাকার জিম্মাদার তুমিই। আমি নই। তোমার কাজের প্রতিবাদেই পদত্যাগ করছি। এসব অন্যায়কে বরদাস্ত করবো না। তহবিল তছরূপ হবে?

আর সেই খবরটা সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ ছিলই। অঞ্চল থেকে কোন প্রকৃত কাজই হয় নাই। আজ গুণময়কে তার সোচ্চার প্রতিবাদ করতে অনেক মানুষই এসে গুণময়ের সত্যবাদিতা আর সাহসের পরিচয় পেয়ে তার পাশেই দাঁড়ায়।

অনেকেই স্বীকার করে—গুণময়ই যোগ্য প্রার্থী।

গুণময়ও দেখেছে এই এক চালে সে কমলবাবুকেই চোর প্রতিপন্ন করে নিজেকে সাধু, সৎ জনদরদী যোগ্য কর্মী বলেই প্রচার করতে পেরেছে।

গুণময় রাতারাতি আজ এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছে। ওই অঞ্চল পঞ্চায়েতে সে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় মানুষদের সেবার কাজেই, সেখানে দেখেছে অন্যায়, নানা ভাবে সরকারি অর্থ নয়ছয় করাই হয়েছে। কমলবাবু কাজের কাজ কিছুই করেনি।

তাই কমলবাবু তার হিতৈষী জেনেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনি গুণময়। পদত্যাগ করেছে আর জনতার সামনে সেই বঞ্চনার কথাই তুলে ধরেছে।

তাই সারা অঞ্চলের মানুষ এবার গুণময়ের দিকেই ঝুঁকেছে।

প্রদীপ, কেদাররাও অবাক হয়। জনমত যে এমনি ভাবে ঘুরে যাবে তা ভাবেনি

ওরা। টগর রাজনীতিতে নতুন। প্রদীপরা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে।

তাদের সমর্থন কিছু আছে। তবু বৃহত্তর জনতার সামনে হঠাৎ গুণময় হিরো হয়ে উঠতে কেদার বলে—প্রদীপদা, গুনো মহা ধড়িবাজ গো। নিজে করলো অঞ্চলের এত টাকা চুরি, আর চোর সাজালো কমলবাবুকে?

বরুণ বলে—তখন তো দেখি গুণময়ই সব কাজ করছে অঞ্চলের। কমল ওকে বিশ্বাস করে সব ছেড়েছিল। আর সেই গুণময়ই এত বড় বেইমানি করলো তার সঙ্গেই। এই এক নম্বর বেইমান হবে এম-এল-এ?

প্রদীপও ভাবছে কথাটা। সুখদাসুন্দরী মেয়েদের বলে—ডাকাত, ওই গুনোটা ডাকাত এ্যাঁ—অঞ্চলের সর্বস্ব পেটে পুরেছে ওইই, কমলকে বানালো চোর?

মাতন জানে গুণময়েক। কোন কাজই তার করতে বাধে না। মদের ব্যবসা, ওই রাতের অন্ধকারে দুনম্বরী ব্যবসা, মানুষ খুন, ঘর জ্বালিয়ে মানুষ মারা সব সে অনায়াসেই করতে পারে।

মাতন আজ প্রদীপদের জানায়—উ সব পারে গো বাবু, ওইই সদরের কত্তাদের হাত করে কমলবাবুকে ভোটে দাঁড়াতে না দিয়ে নিজেই দাঁড়িয়েছে। তারপর কমলবাবু ওসব জানতে পেরে টাকাও দেয়নি আর। তাই নিজে সব টাকা গিলে এখন কমলবাবুকেই চোর সাজিয়েছে। কপিলকে ওই খুন করেছে, আমাকেও ওর দলে যাইনি বলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

প্রদীপ ভাবছে কথাটা। ওই গুণময়এর মত লোকরাই যদি সমাজের, দেশের মাথা হয়ে ওঠে সারা দেশের অবস্থা যে কি হবে তা জানে না।

বাদল-গতিলাল এখন খুবই ব্যস্ত। মকা হাওয়া এবার এসে ওদের পালেই লেগেছে। সারা অঞ্চলের হাটতলায় পথে-ঘাটে ওদেরই পোস্টার, হ্যান্ডবিল। গাছের এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি গুণময় ভটচাযকে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ। দু-চারটে কাটআউটও করিয়ে এখান-ওখানে রেখেছে।

তার তুলনায় টগরের প্রচার মনে হয় কমই। এত টাকা তাদের নেই।

টগর তবু লড়বেই। সে বলে—আমি লড়াইএ পিছু হটি না। মেয়েদের এই লড়াই কোনদিন থামেনি, থামবেও না। নিজের লাভের জন্য কিছু করছি না।

টগর এবার আর এক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। সাধারণ নিঃস্ব মানুষদের জন্যই লড়ছে সে। কোন হঠাৎ ত্যাগের মূলধন তার নাই।

প্রদীপ-কেদাররা আজ সেই সাধারণ মানুষদের একত্রিত, সংহত করতে চায়—ওই গুণময়ের মত শয়তানের বিরুদ্ধে।

শেঠ পিয়ারীলালও গুণময়কে মদত দিয়ে চলেছে। তার কারখানা চালু করতে পারবে এবার। আর কমলবাবুর প্রতিপত্তিও শেষ করে সেখানে নিজেই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই গুণময়কে জেতাতে হবেই শেঠজীর।

তারজন্য শেঠজী ওই বুলেট, বল্টুদের দলকেও তৈরি রেখেছে। ভোটের আগে প্রচার যা চলার চলবে। তারপর ভোটের দিন গুণময় তার দলবল নিয়েই বুথের উপর হানা দেবে। সে জানে কি করে ভোটে জিততে হয়।

গুণময়ের ওই অন্ধকারের ব্যবসা এখন জোর চলছে। কমলের গুদামে আর মাল রাখতে হয় না তাকে।

এখন বুলেটরা রাতের অন্ধকারে মাল ভর্তি ট্রাক এনে পিয়ারীলালের গুদামেই রাখে, ওখান থেকেই মালপাচার হয়ে যায়। শেঠজীরও নগদ আমদানী হয়।

আর ভোটের জন্য স্থানীয় মানুষদের হাতে আনার জন্য মদও তৈরি করছে। কিছু শ্রমিক টাকা আর মদের লোভে গুণময়ের মিছিলেও যোগ দিচ্ছে। দলভারী করছে গুণময় ওইভাবেই।

ফটিক, নিরাপদরাও দেখেছে গুণময়ের ওই লোভ দেখানর ব্যাপারটা। পাথরখাদানের মজুরদের সে কম দামে মদ দিচ্ছে।

ফটিক বলে—ওসবে ভুলিস না তোরা।

লোকগুলো মদের লোভে সবই ভুলে যায়। নেশা ছুটলে বলে—গুনো ঠাকুরের দলে যাবো নাই।

আবার মদ পেলেই গিয়ে হাজির হয়।

কমল দাস এবার চিনেছে গুণময়কে। অঞ্চল অফিসের কাজ কমল বেশি দেখা-শোনা করতে পারত না। দুর্গাপুরে তার ব্যবসা বাড়ছে। ওখানে বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্স গড়ছে সে। ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে ফ্ল্যাটগুলো।

এখানের সব কাজ দেখতো কেরানীরা আর গুণময়। গুণময়ই ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করাতো, রিলিফের হিসাব রাখতো, ঋণের ব্যাপারে সেই যা করার করতো। কমলকে দিয়ে পরে কাগজপত্র, বিল-ভাউচার সই করতো।

হঠাৎ তারপর কমল এই ভোটের ব্যাপারে তার খেলাটা ধরে ফেলে। টাকা না দিতেই এবার গুণময় প্রকাশ্যে লাখ লাখ টাকা যে কমলবাবুই চুরি করেছে সেইটাই প্রমাণ করে দেয় জনসমক্ষে।

কমলও বিপদে পড়ে।

কমল বুঝেছে গুণময় তাকে চরম বিপদেই ফেলেছে। তাই সে আসে গোবিন্দবাবুর কাছেই আসে পরামর্শের জন্য।

গোবিন্দবাবু দীর্ঘদিন অঞ্চল প্রধান ছিলেন। কমল এবার তার কাছে এসে বলেছে সব কথা। গোবিন্দবাবুও বলেন—অফিসে গিয়ে দেখছি সব। তারপর কি করা যাবে ভাবতে হবে। কাগজপত্র না দেখলে কিছু বলা যাবে না কমল।

কমল কি করবে ভাবতে পারে না। সে আসে পঞ্চতীর্থ মশায়ের কছে। ওই নিরপেক্ষ পণ্ডিত মানুষটির কাছে কমল আজ অকপটে সব কথাই জানায়।

বৈকাল নামছে। ক'দিন ছুটিতে নিতুও এসেছে এখানে। তার ফাইন্যাল মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। আশ্রমের বুকে রোদের তাপ মুছে মুছে ক্রমশ বনের স্নিগ্ধতা নামে। বাতাসে ফুলের সুবাস। পাখিদের কলরব ওঠে। এ যেন স্নিগ্ধ শান্ত এক জগৎ।

লোভের গ্লানি নাই। চাওয়ার হাহাকার নাই। রয়েছে পূর্ণতার প্রসাদ।

কমল বলে—আমি নির্দোষ ভটচাযকাকা। আমি টাকা সরাইনি। গুণময়কে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আজ এইখানে তুলেছি। তার বদলে ও আমাকেই চোর বানিয়ে দিল সকলের সামনে।

নিতু বলে—জ্যাঠা, কাকার তো কিছুই ছিল না। আজ শুনি বিরাট লোক। অথচ তার এই কাজ! এইভাবে লোককে বিপদে ফেলবে?

পঞ্চতীর্থ বলেন—কমল, তুমি যখন কিছুই করোনি, তখন ভয় পাবার কিছুই নাই। দেখবে যা সত্য তার জয়ই হবে। একদিন সব কিছুই প্রকাশ পাবে। মিথ্যার ভিত্তিতে যা গড়ে ওঠে তা মিথ্যাতেই পরিণত হয়।

কমল বলে—আমিও ভুল করেছিলাম ব্যবসা বাড়িয়ে।

পঞ্চতীর্থ বলেন—ব্যবসা তো করবেই। বৈশ্য সমাজেরও প্রয়োজন আছে সমাজে। বৈদিক যুগেও ওই সমাজের অস্তিত্ব ছিল—আজও আছে, থাকবে। কিন্তু সেই অসাধুতাই যদি মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে তখন সমাজেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর লোভ-লালসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা বাড়বেই।

সেটা তারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে সৎ যদি থা কো—নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকতে পারবে।

কমল প্রণাম করে পঞ্চতীর্থকে। তিনি বলেন—ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো, সৎপথে চলো ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করবেন।

নিতু সব শোনে। বলে সে—কাকা এত সাংঘাতিক লোক? নোংরা ব্যবসা, খুন, দাঙ্গা, আগুন লাগানো সব শুরু হল শেষে এখানেও।

পঞ্চতীর্থ বলেন—এরও শেষ আছে নিতু। আর আমার বংশের মধ্যেই আজকের যুগের এই বিকৃতি ফুঠে উঠলো, এইটাই আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক।

নিত্য জানে তার বাবার ওই লোকঠকানো ধর্মের বেসাতির কথা। কাকার কীর্তি দেখে সেও ব্যাথিত। জ্যাঠামশাইএর মনের অতলের বেদনাটাকেও দেখেছে নিতু।

সে বলে—জ্যাঠা, তোমার দুঃখটা বুঝি।

পঞ্চতীর্থ দেখছেন নিতুকে। এই বংশের আর সবাইএর সঙ্গে তিনি সব কম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। গ্রামের বাড়িতেও যান না। একমাত্র নিতুই তার কাছে থাকতো, আজ সে ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়েছে। জানেন না পঞ্চতীর্থ সেও কোন পথে যাবে।

নিতু বলে—তোমার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা আমার নাই। তোমার প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য—

হাসেন পঞ্চতীর্থ

—যুগধর্ম হিসাবেও পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি, সংজ্ঞাও বদলায়। যে বিদ্যা দিয়ে মানুষের প্রকৃত সেবা করা যায় সেই বিদ্যাই প্রকৃত যুগবিদ্যা। তুমি তাই শিখছো—তাকে কাযে লাগালেই খুশি হবো নিতু। জানবো একজনও তবু এই বংশের ধারাকে প্রবহমান রাখবে।

সন্ধ্যা নামছে। নিতু শুনছে বৃদ্ধের কথাগুলো। আজ যেন বাইরের আঘাতগুলো ওকে বিচলিত করেছে. পঞ্চতীর্থের মনে হয় যেন হতাশার অন্ধকারই ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে। কোথাও কোন আশার আলোও নেই।

বনে বনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মনে হয় এত বড় অন্যায়ের কি কোন প্রতিকার হবে না? প্রতিষ্ঠিত হবে অন্যায়ের আসনই সমাজের বুকে।

ভোট এগিয়ে আসছে। সেদিন কোন গ্রাম থেকে টগরের দলের কিছু লোকজন ভোটের মিটিং সেরে ফিরছে। বনের পথ। হঠাৎ কয়েকজন বার হয়ে এসে মদন, নেউল অন্যদের ঘিরে ধরে বলে তারা

—কি রে টগরের ভোটে কাজ করছিস? ব্যাটারা মধুর লোভে ঘুর ঘুর করছিস? এ্যা—তোদের প্রদীপবাবুই মধু লুঠছে—তোরা খেটেই মলি—

নেউল গর্জে ওঠে—পথ ছাড়ো।

হাসছে বুলেট, মন্টা। বলে—তার আগে ঘা কতক দিয়েই যাবো, যাতে ক'দিন আর ভোটে না বেরুতে পারিস। বেরুলে জানে শেষ করে দোব।

মারধোরও করে ওদের। শাসায়—গুণময়বাবুর ভোটে বাধা দিলে জান খেয়ে লোব। বলিস সবাইকে। ধর ব্যাটাদের।

এরাও বাধা দেবার চেষ্টা করে। তার তাই মার-ধোরও করে এদের। নেউলের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যায়। টগরের ওখানেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। প্রদীপই থানায় খবর দেয়।

শুধোয়—ওদের চিনিস?

নেউল বলে—বাইরের লোক। ওদের দেখেছি গুণময়ের ট্রাকে মালপত্র আনা-নেওয়া করে।

কেদার বলে—সেই গুণ্ডার দল। ওরাই সেবার মিছিলে বোমা মেরেছিল। গুণময়ের লোকই ওরা।

টগরও অবাক হয়।

—এবার বাইরের গুণ্ডাও আনিয়েছে। গ্রামের মানুষদের ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করবে?

কেদার বলে—গুণময় সব কিছুই করবে। তবু আমরা পিছু হঠবো না। ওদের মোকাবিলা করবোই।

কামারপাড়ার ছেলেরা, মিলের সব শ্রমিকও এবার এগিয়ে আসে। দরকার হয় ওই ট্রাক তারা ঢুকতে দেবে না এই অঞ্চলে।

মাতন বলে—ও সাংঘাতিক লোগ গো।

গোবিন্দবাবু অঞ্চল অফিসে এসেছেন কমলের সঙ্গে। কাগজপত্র সবই দেখেন। কিছু কাগজপত্র পাওয়াও যায় না। হরিপদ কেরানী গোবিন্দবাবুদের দেখে বলে —সেসব কাগজ গুণময় বাবুই নিয়ে গেছেন।

গোবিন্দবাবু বলে—সেকি! লাখ লাখ টাকার কাজের বিল, অর্ডার, হিসাবপত্র, এসব অফিসে থাকার কথা। তা নয় চলে গেল বাইরে? তুমি কি করো হরিপদ? এসবের দায়িত্ব তোমার।

হরিপদ বলে—আমি কি করবো স্যার। সব করতেন ওই গুণময়বাবুই। হিসাবও তার কাছে। কাগজপত্র সব তিনিই রেখেছেন।

গোবিন্দবাবু বলেন—কমল, থানায় জানিয়ে রাখো, এসব কাগজ, কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব, বিল-ভাউচার গুণময়বাবু নিয়ে গেছে। এটা থানার রেকর্ডে থাকা দরকার।

কমলও তাই করেছে. আর এবার কমলও ক্রমশ প্রদীপদেরও এসব খবর দিয়েছে। প্রদীপরাও এবার সাধারণ সভায় গুণময়ের কীর্তির কথাও প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

ওরা ঘোষণা করে—বীরবাঁধের কয়েক লক্ষ টাকা মাটির কাজ, রিলিফের লাখ লাখ টাকার হিসাব দিতে হবে গুণময়কেই।

গুণময়ও এবার বুঝেছে প্রতিপক্ষও থামবে না। আর ওই টগরও এবার তাকে হারাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। প্রদীপই ওদের নেতা। গুণময় এবার ওইসব আলোচনা থামাবার জন্যই প্রদীপকেই চরম আঘাত হানতে চায়। ভেবেছিল টগরকেই শেষ করবে।

তাহলে ভোটই হবে না। আর এবার ভোটে টিকিট ম্যানেজ করেছে অনেক কৌশলে, এরপর কমল দাসও বসে থাকবে না। তাই এবার ভোট করাতেই হবে।

আর সে শেষ করবে প্রদীপকেই।

কেদার, বরুণরাও ওই নেউলদের উপর আক্রমণের পর থেকেই সাবধান হয়েছিল। ওরা জানতো গুণময়ের অবস্থা এবার শোচনীয় হয়ে উঠে।

ওদিকে পুলিশেও রিপোর্ট করেছে কমলবাবু। গোবিন্দবাবুও এবার হিসাবপত্র দেখছেন। গুণময়ের সই করা ভাউচারগুলোও খোঁজা হচ্ছে। এবার জনসাধারণও ক্রমশ বুঝেছে গুণময়ের কীর্তির কথা।

কপিলের খুনের তদন্তও চলছে। মাতন চায় ওই লোকটার মুখোস খুলে পড়ুক। কিন্তু কোন প্রমাণও মেলেনি।

রাতের বেলায় প্রদীপ ফিরছে বাড়িতে। গ্রাম তখন নিশুতি। হঠাৎ দুতিনটে লোক বাঁশবনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে।

ওরা দেখেনি ওদের পিছনেই ছিল কেদার আর কামারপাড়ার কয়েকজন। ওরা এমনি কিছুর আঁচও পেয়েছিল। তাই ওরা বনের ওদিকেই তৈরি হয়েছিল। একজন প্রদীপকে লক্ষ্য করে গুলিই করতে যাবে পাইপগান থেকে, কিন্তু তার হাতেই পড়েছে ডাণ্ডার কঠিন আঘাত। সে ছিটকে পড়ে বন্দুক সমেত। আর অন্যজনের পায়েই মেরেছে কেদার রড দিয়ে। হাতুড়িপেটা মজবুত হাতের আঘাত ছিটকে পড়ে লোকটা। ওঠার ক্ষমতা নাই। পায়ের হাড়ই ভেঙ্গে গেছে।

বাকী দুজন কোনমতে ছুটে পালায়। ধরা পড়ে যায় অস্ত্রসমেত মন্টাবু দলের অন্যতম নেতা বুলেট আর একজন। লোকজনও ছুটে যায়। তারাই বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়ে মেরামত করে ওদের।

তারমধ্যে পুলিশও এসে পড়ে। ওদের তুলে নিয়ে যায় থানাতেই। খবরটা গ্রামে-সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। টগরও এবার ভাবনায় পড়ে।

মাতনও এসেছে। সেই থানাতেই গিয়ে এবার সনাক্ত করে ওই বুলেটকে, অন্যজনকেও। ওরা গুণময়ের ট্রাকে কাজ করে। আসানসোল থেকেই আসে।

পুলিশ এবার খোঁজ-খবর শুরু করে ওই বুলেটদের সম্বন্ধে।

গুণময়ও এবার মিটিং করে, সেখানে সেও প্রতিবাদ করে এই ভোটকে বানচাল করার জন্যই ওই প্রদীপবাবুরাই বাইরে থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছে। গোলমাল বাধাতে চায় ওরাই।

নিজেদের হার নিশ্চিত জেনে তারাই এই এলাকার শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়। তাই নিজেরাই এইসব গোলমাল পাকিয়ে গুণময়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়।

বুলেটরাও ঘুঘু ক্রিমিন্যাল। জানে কখন কি করতে হয়। তারাও বলে গুণময়বাবুকে তো চিনি না।

পুলিশ জেরা করে—তাহলে এখানে এসে এইসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন?

বুলেট বলে সিনেমার ভিলেনের ভঙ্গীতে—পাপী পেট কা বারে দারোগাবাবু, ওই

বাবুরা মাল কড়ি দিয়ে বললেন—এইসা কর। করে দিলাম।

অর্থাৎ এবার ওরাই উল্টে দোষ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে প্রদীপদের ঘাড়েই। প্রদীপ বলে—মারার জন্য নিজের দলের ছেলেদের দিয়েই তো সে কাজটা করতাম দারোগাবাবু। তারজন্য পয়সা দিয়ে বাইরে লোকদের আনার দরকার কি? ওরা সত্যি কথা বলছে না।

দারোগাবাবুও বুঝেছেন ব্যাপারটা। তাই বলেন—সদরে চালান দিচ্ছি ওদের যা করার আদালতই করবে।

টগরও ভাবতে পারেনি যে ভোট নিয়ে এত সব নোংরা কাণ্ড হবে। এতদিন এখানে ভোট হয়েছে। মিটিং-গলাবাজীই হয়েছে। টুকটাক গোলমাল-বচসাও হয়েছে। কিন্তু এত কাদা ছোড়াছুড়ি, হানাহানি—মার-দাঙ্গা হয়নি।

টগর বলে—এসবে দরকার নাই প্রদীপদা। ভোটের নোংরামিতে আর নেই। এরাই জিতুক, আমি এসবে আর নাই।

টগরের মাও বলে—এসব মারদাঙ্গায় যাস্ নে টগর। টগরও ভাবছে কথাটা।

কিন্তু প্রদীপ, কেদাররা বলে—তুমি বসে যাবে না টগর। ওই শয়তানদের মুখের মত জবাব দেবই। ওকে জিততে দিলে সর্বনাশ হবে আমাদের। সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে এভাবে থামিয়ে দিও না।

প্রদীপ বলে—আমাদের জিততেই হবে।

সুখদা ঠাকরুনও গর্জে ওঠে—ডর পেয়ে পিছিয়ে যাবি কি লা, আমরা নাই? বলিস তো ওই গুনো হারামজাদাকে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে দিয়ে আসবো। তাতে জেল-ফাঁসী হয় হবেক।

কথাটা ভাবছে মাতন। তাকে চরম অপমান করেছে ওই গুণময়। কপিলকে খুন ওইই করেছে, তারপর তাকেও পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। এখন আবার প্রদীপদেরও মারতে চায়।

মাতন মাঝে মাঝে আসে ওই বনের দিকে। দূর থেকে দেখে ওই মদের ভাটি আবার চালু হয়েছে। সেখানে বাদলই এখন ম্যানেজার। গুণময়ও আসে। আর রাতের অন্ধকারে দেখে মাতন ওখানে আসে শেঠ পিয়ারীলাল ও আর তার সঙ্গে বেশ কয়েকেজন ছেলে।

মাতন বনের আড়াল থেকে দেখছে ওদের। ওদের দু'একজনকে চেনে সে। গুণময়ের হয়ে ওরাই মাল আনা-নেওয়া করে।

শেঠজী বলে—অনেক মাল এসেছে।

গুণময় বলে—পাচার করো কদিনের মধ্যেই। এখানে মালপত্র রাখা ঠিক হবে না। আর পুলিশ বুলেটকে চালানই দেবে।

মন্টা বলে—বুলেট না থাক। আমরা তো আছি। কোন ভয় নাই বস্।

শেঠজী বলে—সেদিন বুলেট কাজ সারতে পারলো না, উল্‌টে পাকড়ে গেল।

গুণময় বলে—কোন কম্মের নয় ওটা।

মন্টাই বলে—দশ হাজার ক্যাস ছাড়ো, প্রদীপটাকে আমিই ফুটিয়ে দোব।

শেঠজী বলে—ফের খুন-খারাবি হোবে—গুণময়, কপিলকে খতম করলে ব্যাস। আর উসব কাম করো না। বরং ভোটের দিন জরুরৎ পড়ে কুছ কিয়া যায় গা। ইখন আর উসব করলে পাবলিকে তোমাকে ভোটই দিবে না। কমলবাবু ভি বিগড়ে গেল।

গুণময় বলে—ভোটে জিতলে ওর কারবার গুটিয়ে দোব। অঞ্চলের এত টাকা চুরির কেসে জেলেই পুরে দেব ওকে।

শেঠজীও স্বপ্ন দেখছে তার কারখানা, রাতের অন্ধকারে বিদেশী মালের কারবারও চলবে। কমলবাবু জেলে গেলে ব্যাঙ্কের লোনও শোধ দিতে পারবে না। ওই ধানকলের দখল নেবে সেইই। এখানে শুরু হবে তারই রাজত্ব।

তাই গুণময়কে ভোটে জেতাতেই হবে।

মাতন শুনছে কথাগুলো। সে আগেও ভেবেছিল কপিলকে ওই গুণময়ই খুন করিয়েছে। আজ আবার ওদের কথা শুনে আরও নিশ্চিন্ত হয় মাতন। গুণময় যেন একটা রক্তপিশাচ দৈত্যই হয়ে উঠেছে।

পায়ে পায়ে সরে এল মাতন। যদি কোন প্রমাণ পেতো—তাহলে এই শয়তানের বিহিত সে করতোই। কিন্তু কোন প্রমাণই রাখেনি গুণময়।

ভোটের দিন এগিয়ে আসছে। গুণময়ের দলের মাইকগুলো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে।

সেদিন হঠাৎ বৃষ্টি নামে। অসময়ে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে বৃষ্টি নামে। অঝোর বৃষ্টি। বনপ্রান্তর ভাসিয়ে গেরুয়া মাটি ধোয়া জলস্রোত বয়ে চলেছে। ঘণ্টা কয়েক মুষলধারে বৃষ্টির পর আকাশ আবার ঝকঝকে রোদে ভরে ওঠে।

মাতন বনের দিকে এসেছিল। হঠাৎ ওদিকের উচু লাল খোয়াই এর নীচে মাটিটা বৃষ্টির তোড়ে ধুয়ে গিয়ে একটা চকচকে কি পদার্থ দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল বশে এগিয়ে যায় মাতন ওই দিকে।

দেখে একটা পুরু প্লাস্টিকের প্যাকেটের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। মাতন ওই নরম মাটিটা দুহাত দিয়ে খুঁড়তে থাকে। ক্রমশ প্যাকেটটা তোলে। দেখে প্যাকেটে রাখা জামা প্যান্ট। তাতে রক্তে ছোপ মাখা আর জামা-প্যান্টের ফাঁক দিয়ে একটা ছোরাও দেখা যায়।

চমকে ওঠে মাতন। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুণময়ের মূর্তিটা। ওই জামা-প্যান্ট তারই। আর যেদিন কপিল খুন হয় যতদূর মনে পড়ে ওই জামা-প্যান্টই পরেছিল

গুণময়। এই ছুরি দিয়েই কপিলকে খুন করেছিল। তারই রক্ত লেগে আছে ওই জামা-প্যান্টে।

এদিক ওদিকে চাইছে মাতন। উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে। না, কেউ নাই। মাতন শাড়ির নীচে প্যাকেটটা চাপা দিয়ে বনের কয়েকটা ডালপালা ভেঙ্গে নেয়। কেউ দেখলে ভাববে বনে শালপাতা তুলতেই এসেছিল। ওই ডালপালা নিয়েই সে এসে হাজির হয় টগরের কাছে।

প্রদীপরাও ছিল। মাতনকে ওইভাবে উত্তেজিত অবস্থায় আসতে দেখে চাইল।

—কি রে?

মাতন টেবিলে ওই প্যাকেটটা নামিয়ে দিয়ে বলে—দ্যাখ কি পেয়েছি। গুণময়ের রক্তমাখা জামা-প্যান্ট, মনিব্যাগ মায় সেই ছোরা অবধি রয়েছে ওই প্যাকেটের মধ্যে। কপিলকে ওইই খুন করেছিল।

প্রদীপ চমকে ওঠে। বলে—প্যাকেটের ভিতরে হাত দিসনি তো?

—না গো। য্যামন ছিল তেমনিই এনেছি। প্যাকেটের মুখ বন্ধই রইছে।

নতুন দারোগাবাবু এখানে এসে অবধি একটার পর একটা সমস্যাতে পড়েছেন। কয়েক বৎসরের চাকরিতে মানুষও চিনেছেন নতুন ও-সি সুকুমারবাবু। মনে হয়েছে ওই গুণময়ই এখানের সব গোলমালের মূলে। তার মদভাটিতে খুন হলো, বাইরের লোক নিশ্চয়ই তা করবে না। মাতনকেও দেখেছেন সুকুমারবাবু। ওকে নিয়েই খুনটা ঘটেছে সেটা অনুমান করেন তিনি, ওর ঘরে আগুন দেওয়ার পর। কেউ ধরা পড়েনি। তারপর প্রদীপবাবুদের উপর হামলার আসামীদের ধরেও কিছু প্রমাণ করতে পারেননি যে এসব গুণময়েরই কাজ। লোকটা এতসব করে চলেছে।

অঞ্চলের কয়েক লাখ টাকা সরে গেছে ওর সময়েই, কিন্তু কাগজপত্রও নাই। দোষ পড়েছে কমলবাবুর উপরই। অথচ সুকুমারবাবুর দৃঢ় ধারণা এসব গুণময়েরই কাজ, কিন্তু কোন প্রমাণই নাই। তাদের কাছে খবর আছে এখানে বিদেশী মালের বেআইনী বড় ব্যবসা চলে, কিন্তু ধরাও পড়েনি। তাই ভাবনাতেই রয়েছেন তিনি।

এমন সময় প্রদীপ, কেদারদের মাতনকে নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইলেন তিনি। প্রদীপই বলে—কপিলের খুনের কিছু প্রমাণ পেয়েছি সুকুমারবাবু। দেখুন সেই প্যাকেটটা নামিয়ে দেয় টেবিলে।

—একি! রক্তমাখা জামা-প্যান্ট, ছোরা—

মাতন বলে—এসব ওই গুণময়বাবুর জামা-প্যান্ট। কপিল খুন হবার রাতে এইসব ও পরেছিল। ছোরাটা দিয়েই খুন করেছিল। রক্তের দাগও রয়েছে।

সুকুমারবাবু খুশি হন—তাই নাকি! কিন্তু এই জামা-প্যান্ট ওর তার প্রমাণ কি?

প্রদীপ বলে—জামার পকেটে একটা মানিব্যাগও রয়েছে। আমরা হাত দিইনি। আপনি দেখুন—ওটা যে নিশ্চয়ই গুণময়ের তার কোন প্রমাণ পেতে পারেন।

গুণময়ের মানিব্যাগই—সেটা দেখে নিশ্চিন্ত সুকুমারবাবু। এবার গুণময়কে খুনের দায়ে এ্যারেস্ট করার প্রমাণও মিলেছে।

সুকুমারবাবু বলেন—এবার ধরতে পারবো ওকে। তারপর চাপ দিয়ে বাকী কথাও সবই বের হবে। গুণময়বাবুকে দেখছি এবার।

গুণময় তখন মালাপরে জগন্নাথপুরের হাটতলায় জিপে দাঁড়িয়ে জনতাকে আশার বাণী, দেশের মানুষের সেবার জন্য তার ত্যাগ এর কাহিনী শোনাচ্ছে।

—তালিয়া! চীৎকার করে ওঠে গতিলাল। গতিলালের আনা জনতার এক অংশ বৈকালে গুণময়ের মদভাটির তাজা মাল গিলে তৈরি। তারাই চোখ বুজে হাততালি দিতে থাকে।

গুণময় আবার দম নিয়ে শুরু করে—ভাইসব, আমি কথা দিচ্ছি ভোটে জিতলে এই এলাকার চেহারাই বদলে দোব। এতদিন তোমরা মালিকের জমিতে লাঙল দিয়ে দুমুঠো ভাত পেয়েছো। এবার আমি জিতলে লাঙ্গল যার জমিও তারই যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করবো। জমিদারী গেছে এবার জমির মালিকদেরও বসে খেতে দোব না। এ জমি হবে তোমাদেরই।

এবার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি ওঠে—গুণময় কি—জয়।

ভোট ফর গুণময়। জিতবে কে?

গতিলাল গলা ফাটিয়ে শূন্যে শীর্ণ হাত তুলে ঘোষণা করে—গুণময়, আবার কে?

হঠাৎ এমনি সময় বাদল সাইকেল নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে আসে। গুণময় থানাতে নতুন দারোগাবুকে বশ করতে না পারলেও দু-একজনকে ঠিক হাতে এনে রেখেছে। তাদের যথাসময়ে প্রণামীও পাঠিয়ে দেয়।

ফলে ভিতরের খবরগুলোও সব সময়মতই পেয়ে যায়। তারাই জরুরী খবরটা দিয়েছে। কপিলের খুনের দিনে পরা ওর জামা-প্যান্ট, ছোরা মায় পকেটের মনিব্যাগ অবধি পেয়ে গেছে পুলিশ। বনের কোন খোয়াইএর কাছে মাটির নীচে থেকে ওগুলো পেয়েছে। এবার গুণময়কে এ্যারেস্ট করবে দারোগাবাবু।

খবরটা শুনে চমকে ওঠে গুণময়। ওদিকে তখন মঞ্চে রামনিধি মাস্টার তারস্বরে মাইকে গুণময়বাবুর গুণপনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তাকে মহান দেশসেবক এক নেতায় পরিণত করেছে।

বাদল বলে—ওরা তোমাকে এ্যারেস্ট করবে।

কি ভাবছে গুণময়। মনে পড়ে ওই রাতে সেইই ওসব পোষাক মায় রক্তমাখা ছোরাটাকেও প্যাকেটে মুড়ে বনের কোন দুর্গম খুলের ধারে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছিল।

কেউ কোন খবরও পায়নি। কিন্তু বৃষ্টির ধারায় ওই মাটি ধুয়ে গিয়ে তার অপকর্মের পরিচয় বের হয়ে পড়বে তা ভাবেনি।

একটা ভুলের জন্যই সব তছনছ হয়ে গেল। গুণময় নিমেষের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করে নিতে পারে। গুণময় বুঝেছে তার সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। এতদিন ধরে যা করেছে এবার সবকিছুই ধরা পড়ে যাবে।

তার এত চেষ্টায় গড়া সাম্রাজ্য যে এমনি করে এক নিমেষে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে তা ভাবেনি। সে ধরা দেবে না।

আজকের রাতটা কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে মধ্যরাত্রেই বের হয়ে যাবে, সোজা চলে যাবে এদেশ থেকে অন্যদেশে। বাংলাদেশেও তার ভালো আশ্রয় আছে। কিছুদিনের জন্য সেখানেই পালাবে। কেউ তাকে ধরতেও পারবে না।

গুণময় গতিলালকেও এসব কথা বলে না। ওকে বলে—তোমরা মিটিং চালিয়ে যাও। গোসাইপুরে একটা মিটিং রেখেছে ওখানেই যাচ্ছি।

বাদলকে নিয়ে বের হয়ে গেল গুণময়।

তখনও রামনিধি মাস্টার গুণময়কে যে যোগ্য নেতা, দেশকে সেইই সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে সেই কথাই বলে চলেছে।

সন্ধ্যা নেমেছে। সুকুমারবাবু পুলিশ নিয়ে গুণময়ের নতুন বাড়িতে এসে ওকে পায় না। বনের মধ্যে মদের ভাটিতেও নাই। কে বলে—জগন্নাথপুর, গোসাইপুর ওদিকে মিটিংএ গেছে।

সুকুমারবাবু ওদিকেই যান। কিন্তু কোথাও তার কোন পাত্তাই নাই।

সন্ধ্যারতি শেষ করেছেন পঞ্চতীর্থ আশ্রমে। পঞ্চপ্রদীপের শিখা জ্বলছে। রাতের হিমেল বাতাস বনফুলের সৌরভে আমেদুর। হঠাৎ গুণময়কে ওদিকের মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে অবাক হন পঞ্চতীর্থ। —তুমি! এখানে?

গুণময়ের মুখে-চোখের উত্তেজনা তার নজরে পড়ে। গুণময় যেন কি গোপন করার চেষ্টাই করে। বলে সে—এমনিই চলে এলাম। অনেকদিন দেখিনি—তাই—

পঞ্চতীর্থ কথাটা যে মিথ্যা তা বুঝেছেন। তবু বলেন—বসো।

গুণময় জানে পুলিশ তাকে অন্যত্রই খুঁজবে। এই আশ্রমে খুঁজতে আসবেনা। কারণ পুলিশ, গ্রামের লোকরাও জানে পঞ্চতীর্থের সঙ্গে গুণময়ের কোন সম্পর্কও নাই।

গুণময় বলে—একটু পরেই চলে যাবো। এর মধ্যে কেউ খোঁজ করতে এলে বলো—আমি এখানে আসিনি।

পঞ্চতীর্থের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি চেনেন গুণময়কে। জানেন ওর অনেক কিছু অন্যায় কাজকর্মের কথাও।

রাত বাড়ছে।

গুণময় নিশ্চিন্ত হয়। পুলিশ এখানে আসবেনা। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বনের ওদিকে বাদল গাড়ি নিয়ে আসবে। ওই গাড়ি রাতভোর চালিয়ে ওরা সীমান্তর কাছে চলে যাবে। তারপর গুণময় ঢুকে যাবে ওদেশে।

তারপর আবার সে নিজের পথই করে নেবে।

হঠাৎ গাড়ি থামার শব্দ শুনে চাইল গুণময়। চারিদিকে জোরালো টর্চের আলোয় গাছগাছালি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুটের শব্দ ওঠে।

চমকে ওঠে গুণময়। এখানেও পুলিশ ঢুকবে তা ভাবতেও পারেনি। তার ষষ্ঠইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দেয়, ওদিকের পাঁচীল টপকেই পালাবে সে। বনের মধ্যে ঢুকে গেলে আর কেউ ধরতে পারবে না।

ওদিকে এগোতেই টর্চের আলো পড়ে তার মুখে।

সুকুমারবাবু বলেন—পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না গুণময়বাবু। পুলিশ আশ্রম ঘিরে রেখেছে। দুহাত উপরে তুলে দাঁড়ান—

গর্জে ওঠেন অফিসার—হ্যান্ডস্ আপ্! নাহলে স্যুট করবো। গুণময়ের চারিদিকেই পুলিশ। সুকুমারবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পঞ্চতীর্থ মশায়।

গুণময় গর্জে ওঠে— দাদা, শেষে তুমিই আমাকে ধরিয়ে দিলে?

পঞ্চতীর্থ বলেন—অন্যায় যে করে আমার ধর্ম তাকে ক্ষমা করে না, সে যেই হোক। পাপ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সামান্য নিয়ে তৃপ্ত হতে পারেনি, যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশিই পেতে চেয়েছিলে—তাই পাপের পথেই নেমেছিলে। তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে গুণময়!

—শেষে তুমিই।

পঞ্চতীর্থ বলেন—আমি তো নিমিত্তমাত্র। নিয়ে যান ওকে অফিসার। তোমাকে পালাতে দিলে ঈশ্বর কোনদিন আমাকে ক্ষমা করতেন না।

সারা অঞ্চলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশও এবার অনেক কিছু খবরই পায়। শেঠজীর গুদামে হানা দিয়ে পায় লাখ লাখ টাকার বিদেশী মাল, আর সেই অঞ্চলের কয়েক লক্ষ টাকার জাল ভাউচার, বিল ইত্যাদি। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা গোপগাঁয়ের বুকে এত বড় অপকর্ম চলছিল তা কেউ টেরও পায়নি।

এবারের ভোটে অকুণ্ঠ জনসমর্থন পেয়ে জিতেছে টগর। অপরিচিত একটি সাধারণ মেয়ে। এই প্রথম পুঞ্জীভূত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে জেদী একটি মাটির কাছাকাছি মেয়ে।

ওদিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন আর এদের বিজয় উৎসবের দিন পড়েছে একদিনেই। নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে আজ এসেছে সারা অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা।

হরিপ্রিয়া ঠাকরুন, সুখদা বুড়ি-বাসন্তী-মাতন অনেকেই এসেছে। আজ সারা অঞ্চলের মানুষ এসেছে নতুন আশা নিয়ে, টগর যেন সেই আশারই প্রতীক।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছেন পঞ্চতীর্থমশায়। আজ নিতু ডাক্তারী পাশ করে ফিরেছে গ্রামেই। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভার নিয়েছে সে।

পঞ্চতীর্থমশায় দেখছেন আজকের মানুষের এই বিজয়কে। শান্ত গোপগাঁ—একদিন ছিল এক অনাদৃত ঠাঁই। সেখানে আজকের সভ্যতা, বিজ্ঞান এনেছে আমূল পরিবর্তনের কঠিন আঘাত। সেই সমাজ ব্যবস্থাও বদলে গেছে। একদিন যারা সমাজে ছিল অনাদৃত, অবহেলিত সেই মানুষগুলো আজ স্বীকৃতি পেয়েছে।

নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সেই পটু বাউরীও আজ অঞ্চলের সভ্য।

কিন্তু এই পরিবর্তন, জাগরণকে যদি সঠিক পথেই চালাতে পারা যায় দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায় তবেই হবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ।

নাহলে এই আন্দোলনের মাঝেও নতুন গুণময়দের আবির্ভাব হতে দেরী হবে না। তারা দেশ প্রেমিক, সমাজসেবীর মুখোস পরে সব সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদাকে কুক্ষিগত করে এই আন্দোলনকে ব্যর্থই করে দেবে।

তাই বলেন তিনি—দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, শুধুমাত্র নিজেকেই নয়। নাহলে এই শুভযাত্রা, নবজাগরণও ব্যর্থই হয়ে যাবে।

প্রদীপ, বরুণরাও ভাবে কথাটা। শঙ্খধ্বনি, মেয়েদের উলুধ্বনির মধ্যে মঙ্গলাচরণ করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পঞ্চতীর্থ। আজ তার জীবনের এ যেন স্মরণীয় একটি মুহূর্ত।

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে যায়, চোখের সামনে নেমে আসে অন্ধকার। পঞ্চতীর্থের জ্ঞানহীন দেহটাকে প্রদীপ ধরে ফেলে। নিতুও এসে পড়ে।

জ্ঞান ফেরে পঞ্চতীর্থের। শান্ত সবুজ আশ্রমে আনা হয়েছে তাকে। নিতু ওষুধ দিতে যায়। হাসেন পঞ্চতীর্থ।

—আর ওষুধের দরকার নাই নিতু, একটু গঙ্গাজলই দে।

—জ্যাঠামশাই!

বাইরে ভিড় করে আছে এই অঞ্চলের মানুষ। কমলবাবুও এসেছে. আজ সেও শত্রুমুক্ত। ওই একটি মানুষই যেন এতদিন ধরে এই অঞ্চলে একটি আলোকস্তম্ভ রূপেই বিরাজমান ছিলেন। যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে তপোবনের ঋষির মত মানুষের কল্যাণ কামনাই করেছেন। হতাশার অন্ধকারে আশার আলোক সঞ্চারই করেছেন।

প্রদীপ বলে—পঞ্চতীর্থমশাই, এত কাল ধরে এত করে গেছেন, দিয়েছেন, যেদিন আমরা কিছু করার সুযোগ পেলাম সেদিনই চলে যাবেন?

হাসেন পঞ্চতীর্থ। মৃদুস্বরে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।

প্রদীপ, প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করে চলেছে। সংসারও তার সমস্তই গ্রহণ করে। রক্ষাও করে চলেছে। কিছুই নষ্ট হতে দেয় না। কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে নিজেকে—অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চায় তখনই বিফল হয় তার সেই চেষ্টা। যে জীবনকে এতদিন ধরে ভোগ করে গেলাম। সেই নিজেকে তার মাশুল হিসাবেই মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সব হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে।

— শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।।

তাই চলে যেতেই হবে। স্তব্ধ হয়ে আসেন পঞ্চতীর্থ। জীবনের সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে তিনি যাত্রা করেছেন অমৃতলোকে।

যেন সারা অঞ্চলের মানুষের মহাগুরু নিপাতের দিন। কাঁদরের জলসীমার ধারে চিতার আগুন জ্বলে ওঠে। আজ তাদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ের লগ্নে যেন পঞ্চতীর্থ মশায় তাদের স্মরণ করিয়ে গেলেন—এক নতুন শপথের কথাই। জীবনে থামা নয়—এগিয়ে যেতেই হবে।

প্রদীপ, কেদার আজ এসেছে কমল দাসও। মাতন, টগরের চোখে জল। স্তব্ধ হরিপ্রিয়া ঠাকরুন। সুখদাই বলে—মানুষ নয় রে—একটা দেবতাই চলে গেল।

আজ যেন এদের উপর এক কঠিন দায়ভারই তুলে দিয়ে গেছেন পঞ্চতীর্থ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূলমন্ত্র। টগর চাইল। আজ তার উপর এদের অনেক আশা। জীবনে সে কিছুই পায়নি। তার ঘরও নেই, প্রেমের কোন মূল্যই সে পায়নি। পেয়েছে শুধু জ্বালা—সেই জ্বালাই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কোন এক নতুন কর্মের যজ্ঞস্থলীতে। সামনে তাদের শীত শেষের উষ্ণ রৌদ্রের স্বপ্ন—সোনা ফসলের স্বপ্নভরা দিগন্তপ্রসারী নম্রশীর্ষ শস্যক্ষেত্র।

ও৩ষে

Daw/